তাফসীর
ইব্নে
কাসীর
সপ্তদশ খন্ড
মূলঃ
হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইবনে কাসীর

সপ্তদশ খণ্ড

সূরা ঃহুজুরাত, কা'ফ, যারিয়াত, তূর, নাজম, কামার, রহমান, ওয়াকি'আহ্, হাদীদ, মুজাদালাহ্, হাশ্‌র, মুমতাহিনা, সাফ্‌ফ, জুমু'আহ্, মুনাফিকূন, তাগাবুন, তালাক, তাহ্‌রীম, মুল্‌ক, কলম, হাক্‌কাহ্, মা'আরিজ, নূহ্, জ্বিন, মুয্‌যাম্মিল, মুদ্দাস্‌সির, কিয়ামাহ্, দাহ্‌র ও মুরসালাত।

মূলঃ

হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.drmujib.com

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

নবম সংস্করণ ঃ
মুহাররাম ১৪৩১ হিজরী
জানুয়ারী ২০১০ ঈসায়ী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মোঃ ওবাইদুর রহমান
বিনোদপুর বাজার
রাজশাহী

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাষ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। আমীন!

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১৭ নম্বর খণ্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুনঃ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় সপ্তদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। মুদ্রণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি ও তার সহকর্মীবৃন্দ কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিগত দিনে যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন উহার মালিক ও কর্মচারীবৃন্দদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া করছি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেযিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেয মাওঃ মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রবাসী ও দেশী কয়েকজন ভাই এবং কুরআনের তাফসীর-মজলিসের বোনেরা সপ্তদশ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য মুক্ত হস্তে যে অনুদান দিয়েছেন, সে জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা দোয়া করি মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনন্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাবগাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে তার সন্ধান ও অবিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্যলেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্বাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল-পঠিত সর্ব সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দূ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। দুঃখের বিষয় 'ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদগ্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি? তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই অনূদিত তাফসীর প্রকাশের আর্থিক সমস্যার কথা। জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন জনাব নূরুল আলম ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। এই কমিটি কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যাক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩ , ১৪, ১৫, ১৬ নং খণ্ড প্রকাশ করে। অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১৭ নম্বর খণ্ড সূরা ভিত্তিক প্রকাশ গ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহযোগী ও সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুম্মা আমীন!

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ফ্রেন্ডস্ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং-এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্ততির আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

বর্তমানে
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,
রিচমিণ্ড হিল, নিউইয়র্ক–১১৪১৮
যুক্তরাষ্ট্র

বিনয়াবনত
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

সূরা ঃ হুজুরাত মাদানী
(আয়াত ঃ ১৮, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا : ١٨، رُكُوْعَاتُهَا :٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২। হে মুমিনগণ! তোমরা নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেই রূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

৩। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

٣- اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর নবী (সঃ)-এর ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নবী (সঃ)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য। সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল

(সঃ)-এর পিছনে থাকা তাদের উচিত। তাদের উচিত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করা।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হযরত মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "তুমি কিসের মাধ্যমে ফায়সালা করবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে।" আবার তিনি প্রশ্ন করেনঃ "যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও?" জবাবে তিনি বলেনঃ "তাহলে সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে ফায়সালা করবো।" পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "যদি তাতেও না পাও?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "তাহলে আমি চিন্তা-গবেষণা করবো এবং ওরই মাধ্যমে ফায়সালা করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বুকে হাত মেরে বললেনঃ "আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যাতে তাঁর রাসূল (সঃ) সন্তুষ্ট।"[১] এখানে এ হাদীসটি আনয়নের উদ্দেশ্য আমাদের এই যে, হযরত মু'আয (রাঃ) স্বীয় ইজতিহাদকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ (সঃ)-এর পরে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং স্বীয় মতকে কিতাব ও সুন্নাতের আগে স্থান দেয়াই হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আগে বেড়ে যাওয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একথার ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত কথা তোমরা বলো না।' হযরত আওফী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার উপর কথা বলো না।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 'কোন বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পর্যন্ত কোন কিছু না বলেন সেই পর্যন্ত তোমরাও কিছুই বলো না, বরং নীরবতা অবলম্বন করো।' হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ 'আমরে দ্বীন ও আহকামে শরয়ীর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর হাদীস ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফায়সালা করো না।' হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 'তোমরা কোন কথায় ও কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অগ্রণী হয়ো না।' হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ 'তোমরা ইমামের পূর্বে দু'আ করো না।'

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনের ব্যাপারে মনে আল্লাহর ভয় রাখো।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

'আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনে থাকেন এবং তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের খবর তিনি রাখেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে আর একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তারা যেন নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু না করে। এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবূ মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দুই মহান ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) যেন প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাবেন, যেহেতু তাঁরা নবী (সঃ)-এর সামনে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন যখন বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হাযির হয়েছিলেন। তাঁদের একজন হযরত হাবিস ইবনে আকরার (রাঃ) প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং অপরজন ইঙ্গিত করেন অন্য একজনের প্রতি, বর্ণনাকারী নাফে' (রাঃ)-এর তাঁর নাম মনে নেই। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ "আপনি তো সব সময় আমার বিরোধিতাই করে থাকেন?" উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলেনঃ "আপনার এটা ভুল ধারণা।" এই ভাবে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ "এরপর হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে এতো নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হতো।"[১] অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলছিলেনঃ "হযরত কা'কা' ইবনে মা'বাদ (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করুন।" আর হযরত উমার (রাঃ) বলছিলেনঃ 'হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ)-কে আমীর বানানো হোক।" এই মতভেদের কারণে উভয়ের মধ্যে কিছু উচ্চবাচ্য হয় এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়। তখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ হতে وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ ... পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।[২]

যখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ .... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন হতে আমি আপনার সাথে এমনভাবে কথা বলবো যেমনভাবে কেউ কানে কানে কথা বলে।”[১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা যায়নি। একটি লোক বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে আমি তাঁর সম্পর্কে খবর দিবো।” অতঃপর লোকটি হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় বসে আছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আচ্ছা বলুন তো আপনার অবস্থা কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম। আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।” লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ হতে এক অতি বড় সুসংবাদ নিয়ে দ্বিতীয়বার হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলোঃ “আপনি জাহান্নামী নন, বরং জান্নাতী।”[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ হতে لَا تَشْعُرُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, আর হযরত সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শামাস (রাঃ) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট লোক, সুতরাং তিনি তখন বলেনঃ “আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর উঁচু করতাম, কাজেই আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।” তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় বাড়ীতেই বসে পড়েন এবং নবী (সঃ)-এর মজলিসে উঠাবসা ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর খোঁজ নিলে কওমের কোন একজন লোক তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে তাঁর মজলিসে না পেয়ে আপনার খোঁজ নিয়েছেন।” তখন তিনি বলেনঃ “আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করেছি। সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে।” লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এ খবর দেন। তখন নবী (সঃ) বলেনঃ “না, বরং সে জান্নাতী।” হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ “অতঃপর আমরা

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে জীবিত অবস্থায় চলাফেরা করতে দেখতাম এবং জানতাম যে, তিনি জান্নাতবাসী। অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধে যখন অমরা কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি তখন আমরা দেখি যে, হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ) সুগন্ধময় কাফন পরিহিত হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বলতে রয়েছেনঃ "হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা তোমাদের পরবর্তীদের জন্যে মন্দ নমুনা ছেড়ে যেয়ো না।" এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।"[১]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন যে, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا .... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আবূ আমর (রাঃ)! সাবিত (রাঃ)-এর খবর কি? সে কি অসুস্থ?" হযরত সা'দ (রাঃ) জবাবে বলেনঃ "হযরত সাবিত (রাঃ) আমার প্রতিবেশী। কিন্তু তিনি যে অসুস্থ এটা তো আমার জানা নেই।" অতঃপর হযরত সা'দ হযরত সাবিত (রাঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা শুনিয়ে দেন। তখন হযরত সাবিত (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন, আর আপনারা তো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের সবারই চেয়ে আমার কণ্ঠস্বর বেশী উঁচু। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী হয়ে গেছি।" হযরত সা'দ (রাঃ) তখন নবী (সঃ)-কে হযরত সাবিত (রাঃ)-এর একথা শুনিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "না, বরং সে জান্নাতী।"

অন্যান্য রিওয়াইয়াতে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ রিওয়াইয়াতটি মুআল্লাল এবং এটাই সঠিক কথাও বটে। কেননা, হযরত সা'দ (রাঃ) ঐ সময় জীবিতই ছিলেন না। বানু কুরাইযার যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আর বানু কুরাইযার যুদ্ধ হয়েছিল হিজরী পঞ্চম সনে এবং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধির আগমনের সময়। আর ওটা হিজরী নবম সনের ঘটনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ) রাস্তার উপর বসে পড়েন এবং কাঁদতে শুরু করেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

এমতাবস্থায় বানু আজলান গোত্রের হযরত আসিম ইবনে আদ্দী (রাঃ) তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কাঁদছেন কেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় আমি ভয় করছি যে, এটা হয়তো আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, আমার কণ্ঠস্বর খুব উঁচু।” তাঁর একথা শুনে হযরত আসিম ইবনে আদ্দী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করেন, আর এদিকে হযরত সাবিত (রাঃ) কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বাড়ী গিয়ে তাঁর স্ত্রী জামীলা বিনতু আবদিল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে বলেনঃ “আমি এখন বিছানার ঘরে (অর্থাৎ শয়ন কক্ষে) প্রবেশ করছি। তুমি বাহির হতে দরযা বন্ধ করে পেরেক মেরে দাও। অতঃপর তিনি বললেনঃ “আমি ঘর হতে বের হবো না। যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার মৃত্যু ঘটাবেন অথবা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।” এদিকে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে আর ওদিকে হযরত আসিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর খবর দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত আসিম (রাঃ)-কে বলেনঃ “তুমি তার কাছে গিয়ে তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।” হযরত আসিম (রাঃ) ঐ স্থানে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাড়ী এবং তাঁকে তাঁর শয়নকক্ষে ঐ অবস্থায় পান। তাঁকে তিনি বলেনঃ “চলুন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে ডাকছেন।” তখন তিনি হযরত আসিম (রাঃ)-কে বলেনঃ “পেরেক ভেঙ্গে ফেলুন।” অতঃপর তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে সাবিত (রাঃ)! তুমি কাঁদছিলে কেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমার কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং আমি ভয় করছি যে, এ আয়াতটি আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমার কান্না এসেছিল।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেন ঃ “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি প্রশংসিত অবস্থায় জীবন যাপন করবে, শহীদ রূপে মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে?” হযরত সাবিত (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর এই সুসংবাদ পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি এবং এর পরে আমি আর কখনো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করবো না।” তখন আল্লাহ তা'আলা اِنَّ الَّذِیْنَ یَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ ... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। এই ঘটনাটি এভাবে কয়েকজন তাবেয়ী হতেও বর্ণিত আছে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করতে নিষেধ করেছেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মসজিদে নববী (সঃ)-এর মধ্যে দুইজন লোককে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে তথায় গিয়ে তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা কোথায় রয়েছো তা কি জান?" অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা কোথাকার অধিবাসী?" উত্তরে তারা বললোঃ "আমরা তায়েফের অধিবাসী।" তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ "যদি তোমরা মদ্বীনার অধিবাসী হতে তবে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।"

উলামায়ে কিরামের উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কবরের পার্শ্বেও উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরূহ। যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরূহ ছিল। কেননা, তিনি যেমন জীবদ্দশায় সম্মানের পাত্র ছিলেন তেমনি সব সময় তিনি কবরেও সম্মানের পাত্র হিসেবেই থাকবেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলে থাকো, নবী (সঃ)-এর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না, বরং তাঁর সাথে অতি সম্মান ও আদবের সাথে কথা বলতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ "(হে মুসলমানগণ!) তোমরা রাসূল (সঃ)-কে এমনভাবে ডাকবে না যেমনভাবে তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।"(২৪ ঃ ৬৩)

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাদেরকে নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, হয়তো এর কারণে কোন সময় নবী (সঃ) তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং এর ফলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা মুখেই উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয় যে, এ কারণে তিনি তাকে জান্নাতবাসী করে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন খারাপ কথা নয়, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামী করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের এতো নিম্নস্তরে নামিয়ে দেন যে, ঐ গর্তটি আসমান ও যমীন হতেও গভীরতম।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বর নীচু করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেনঃ যারা রাসূল (সঃ)-এর সামনে

নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইমাম আহমাদ (রঃ) কিতাবুয্ যুহ্দের মধ্যে একটি রিওয়াইয়াত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট লিখিতভাবে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! এক ঐ ব্যক্তি যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনাই নেই এবং সে কোন অবাধ্যতামূলক কার্য করেও না এবং আর এক ব্যক্তি, যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা রয়েছে, কিন্তু এসব অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ হতে সে দূরে থাকে, এদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী উত্তম?" উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি রয়েছে, তথাপি সে এসব কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকে সেই বেশী উত্তম। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

৪। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করতো তবে তাই তাদের জন্যে উত্তম হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

٥- وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকগুলোর নিন্দে করছেন যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর বাড়ীর পিছন হতে ডাকতো, যেমন এটা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাই আল্লাহ পাক বলেন যে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

অতঃপর এই ব্যাপারে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করতো তবে ওটাই তাদের জন্যে উত্তম হতো।' অর্থাৎ তাদের উচিত ছিল যে, তারা নবী (সঃ)-এর অপেক্ষায় থাকতো এবং যখন তিনি বাড়ী হতে বের হতেন তখন তাঁকে যা বলার ছিল তাই তারা বলতো এবং বাহির হতে তাঁকে ডাক দেয়া

তাদের জন্যে মোটেই উচিত ছিল না। এরূপভাবে বাহির হতে তাঁকে ডাক না দিলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তারা লাভ করতো। অতঃপর মহান আল্লাহ যেন হুকুম দিচ্ছেন যে, এরূপ লোকদের উচিত আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এ আয়াতটি হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হে মুহাম্মাদ (সঃ), হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এভাবে নাম ধরে ডাক দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন জবাব দিলেন না। তখন সে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার প্রশংসা করা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এবং আমার নিন্দা করা লাঞ্ছনার কারণ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "এরূপ সত্তা তো হলেন একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হযরত হাবীব ইবনে আবি উমরা (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা বিশর ইবনে গালিব এবং লাবীদ ইবনে আতারিদ হাজ্জাজের সামনে বসেছিলেন। বিশর ইবনে গালিব লাবীদ ইবনে আতারিদকে বললেনঃ "তোমার কওম বানু তামীমের ব্যাপারে إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।" যখন হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করা হলো তখন তিনি বললেনঃ সে যদি আলেম হতো তবে এ সূরার يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا -এই আয়াত পাঠ করে জবাব দিতো। তারা বলেছিলঃ "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, সুতরাং বানু আসাদ গোত্র আপনার সাথে যুদ্ধ করবে না।"

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কতকগুলো আরব বেদুঈন একত্রিত হয় এবং তারা বলেঃ "চলো, আমরা এ লোকটির (নবী সঃ)-এর কাছে যাই। যদি তিনি নবী হন তাহলে তাঁর নিকট হতে সৌভাগ্য লাভ করার ব্যাপারে আমরাই বড় হকদার। আর যদি তিনি বাদশাহ হন তবে আমরা তাঁর ডানার নীচে পড়ে থাকবো।" আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর দিলাম। ইতিমধ্যে তারা এসে পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর ঘরের পিছন হতে হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে মুহাম্মাদ (সঃ)! বলে ডাকতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা'আলা إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার কান ধরে বললেনঃ "হে যায়েদ (রাঃ)! আল্লাহ তোমার কথা সত্যরূপে দেখিয়েছেন। হে যায়েদ (রাঃ)! অবশ্যই আল্লাহ তোমার কথা সত্যরূপে দেখিয়েছেন।"

٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

৬। হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।

٧- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ○

৭। তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

٨- فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৮। এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন পাপাচারীর খবরের উপর নির্ভর না করে। যে পর্যন্ত সত্যতা যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রকৃত ঘটনা জানা না যায় সেই পর্যন্ত কোন কাজ করে ফেলা উচিত নয়। হতে পারে যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বলে দিলো বা সে ভুল করে

ফেললো এবং তার খবর অনুযায়ী মুমিনরা কোন কাজ করে বসলো, এতে প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসরণ করা হলো। আর পাপাচারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের অনুসরণ করা আলেমদের মতে হারাম। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন মুহাদ্দিস ঐ ব্যক্তির রিওয়াইয়াতকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না যার অবস্থা জানা নেই। কেননা, হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি পাপাচারী। তবে কতক লোক এরূপ অজ্ঞাত লোকের রিওয়াইয়াতও গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেনঃ "ফাসিক বা পাপাচারী লোকের খবর কবূল করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর যার অবস্থা জানা নেই তার ফাসিক হওয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত নয়। আমরা শরহে বুখারীর কিতাবুল ইলমের মধ্যে এ মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবি মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বানু মুসতালিক গোত্রের নিকট যাকাত আদায় করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। যেমন মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর পিতা হযরত হারিস ইবনে আবি যরার খুযায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তা কবূল করলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি যাকাত ফরয হওয়ার কথা শুনালেন। আমি ওটাও মেনে নিলাম এবং বললামঃ আমি আমার কওমের নিকট ফিরে যাচ্ছি। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবো। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং যাকাত দিবে, আমি তাদের যাকাত জমা করবো। আপনি এতদিন পরে আমার নিকট কোন লোক পাঠিয়ে দিবেন। আমি তাঁর হাতে যাকাতের জমাকৃত মাল দিয়ে দিবো। এভাবে যাকাতের মাল আপনার নিকট পৌঁছে যাবে।" হযরত হারিস (রাঃ) ফিরে গিয়ে তাই করলেন অর্থাৎ যাকাতের সম্পদ একত্রিত করলেন। যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত তথায় গেলেন না, তখন তিনি তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাঁদেরকে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন দূতকে যে আমাদের নিকট পাঠাবেন না এটা অসম্ভব। আমার ভয় হচ্ছে যে, কোন কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হয়তো আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এজন্যেই কোন দূতকে আমাদের নিকট যাকাতের মাল নেয়ার জন্যে পাঠাননি। সুতরাং যদি আপনারা একমত হন তবে

আমি নিজেই এ মাল নিয়ে মদীনা শরীফ গমন করি এবং নবী (সঃ)-এর নিকট পেশ করি।" অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল এবং হযরত হারিস (রাঃ) যাকাতের মাল নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। আর ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে স্বীয় দূত হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে ভয়ে রাস্তা হতেই ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খবর দেয় যে, হারিস (রাঃ) যাকাতের মালও আটকিয়ে দিয়েছে এবং সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হলেন এবং কিছু লোককে হযরত হারিস (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। মদীনার কাছাকাছি পথেই এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী হযরত হারিস (রাঃ)-কে পেয়ে গেলেন। হযরত হারিস (রাঃ) তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি? তোমরা কোথা হতে আসছো এবং কোথায় যাচ্ছ?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "আমাদেরকে তোমারই বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে।" "কেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "কারণ এই যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূতকে যাকাতের মাল প্রদান করনি, এমনকি তাকে তুমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে।" হযরত হারিস (রাঃ) বললেনঃ "যে আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি তাকে দেখিওনি এবং আমার নিকট সে আসেওনি। চলো, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হচ্ছি।" অতঃপর সেখান হতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "তুমি যাকাতের মাল আটকিয়ে রেখেছিলে এবং আমার প্রেরিত দূতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে এটা কি সত্য?" তিনি জবাব দেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কখনো সত্য নয়। যিনি আপনাকে সত্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! না আমি তাকে দেখেছি এবং না সে আমার কাছে এসেছিল। বরং আমি যখন দেখলাম যে, আপনার কোন লোক যাকাতের মাল নেয়ার জন্যে আমাদের ওখানে গেল না তখন আমি ভয় করলাম যে, না জানি হয়তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এই কারণেই হয়তো আমাদের কাছে কোন লোককে প্রেরণ করা হয়নি, তাই আমি স্বয়ং যাকাতের মাল নিয়ে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ হতে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

ইমাম তিবরানীর (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত যখন হযরত হারিস (রাঃ)-এর বস্তীর নিকট পৌঁছে তখন বস্তীর লোকেরা খুশী হয়ে

তার অভ্যর্থনার বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ে। ওদিকে ঐ লোকটির মনে এই শয়তানী খেয়াল চেপে যায় যে, ঐ লোকগুলো তাকে আক্রমণ করতে আসছে। সুতরাং সে ফিরে চলে আসে। লোকগুলো তাকে ফিরে চলে যেতে দেখে নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে এসে হাযির হয়ে যায়। যোহরের নামাযের পরে তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আরয করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যাকাত আদায় করার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন দেখে আমাদের চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। কিন্তু আল্লাহ জানেন, কি হলো যে, আপনার প্রেরিত লোকটি রাস্তা হতেই ফিরে চলে আসে। তখন আমরা ভয় করলাম যে, আল্লাহ হয়তো আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই আমরা আপনার দরবারে হাযির হয়েছি।" এভাবে তারা ওযর পেশ করতে থাকে। এদিকে হযরত বিলাল (রাঃ) যখন আসরের আযান দেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবার এই খবরের পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বস্তী অভিমুখে কিছু লোক পাঠাবার চিন্তা করছিলেন এমতাবস্থায় তাদের প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এসে পড়ে। তারা আরয করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার দূত অর্ধেক রাস্তা হতেই ফিরে আসে। তখন আমরা ধারণা করলাম যে, আপনি হয়তো কোন অসন্তুষ্টির কারণে তাকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্যেই আমরা আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আমরা আল্লাহর ক্রোধ এবং আপনার অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং তাদের ওযর সত্য বলে ঘোষণা দেন।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, দূত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথাও বলেছিল ঃ "ঐ লোকগুলো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যদেরকে একত্রিত করেছে এবং তারা ইসলাম ত্যাগ করেছে।" তার এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে একদল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রাঃ)-কে তিনি উপদেশ দেনঃ "প্রথমে ভালভাবে খবরের সত্যাসত্য যাচাই করবে, ত্বরিৎগতিতে আক্রমণ করে বসবে না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উপদেশ অনুযায়ী হযরত খালিদ (রাঃ) সেখানে গিয়ে একজন গুপ্তচরকে শহরে পাঠিয়ে দেন। গুপ্তচর এ খবর আনেন যে, তারা দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মসজিদে আযান হচ্ছে এবং তিনি স্বয়ং তাদেরকে নামায পড়তে দেখেছেন। সকাল হওয়া মাত্রই

হযরত খালিদ (রাঃ) নিজে গিয়ে তথাকার ইসলামী দৃশ্য দেখে খুশী হন এবং ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খবর দেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সত্যতা পরীক্ষা, সহনশীলতা এবং দূরদর্শিতা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং তাড়াহুড়া ও দ্রুততা শয়তানের পক্ষ হতে।” হযরত কাতাদা (রঃ) ছাড়াও আরো বহু মনীষীও এটাই বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে আবি লাইলা (রঃ), ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রঃ), যহহাক (রঃ), মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) প্রমুখ। এঁদের সবারই বর্ণনা এই যে, এই আয়াত ওয়ালীদ ইবনে উকবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) রয়েছেন। তোমাদের উচিত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর নির্দেশাবলী ঠিক ঠিকভাবে মেনে চলা। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমাদেরকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তোমাদেরকে বিপদে ফেলতে তিনি কখনই চান না। তোমরা নিজেদের ততো কল্যাণকামী নও যতোটা তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ “নবী (সঃ) মুমিনদের সাথে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশী সম্পর্কযুক্ত।” (৩৩ ঃ ৬)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি মুহাম্মাদ (সঃ) বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনতেন এবং সেই মুতাবেক কাজ করতেন তবে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হতো। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْهِنَّ بَلْ اَتَیْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ -

অর্থাৎ “যদি সত্য প্রতিপালক তাদের চাহিদা বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলেন তবে আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যেতো, বরং আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ পৌঁছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ হতে বিমুখ হয়ে যায়।” (২৩ ঃ ৭১)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলাম প্রকাশ্য এবং ঈমান অন্তরের মধ্যে রয়েছে।" অতঃপর তিনি তিনবার স্বীয় হাত দ্বারা স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করেন। তারপর বলেনঃ "তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে।"[১]

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর এই ভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, উহূদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমরা সোজাভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাও, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করবো।" তখন জনগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের দু'আটি পাঠ করেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ، اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا ـ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلٰهَ الْحَقِّ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য। আপনি যাকে প্রশস্ততা দান করেন তার কেউ সংকীর্ণতা আনয়ন করতে পারে না, আর আপনি যাকে সংকীর্ণতা দেন তার কেউ প্রশস্ততা আনয়ন করতে পারে না। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না, আর আপনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আপনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে কেউ দিতে পারে না, আর আপনি যাকে দেন তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আপনি যাকে দূরে করেন তাকে কেউ কাছে করতে পারে না, আর আপনি যাকে কাছে করেন তাকে কেউ দূরে করতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনি আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও জীবিকা প্রশস্ত করে দিন! হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐ চিরস্থায়ী নিয়ামত যাঞ্চ্ঞা করছি যা না এদিক ওদিক হবে এবং না নষ্ট হবে। হে আল্লাহ! দারিদ্র্য ও প্রয়োজনের দিন আমি আপনার নিকট নিয়ামত প্রার্থনা করছি এবং ভয়ের দিন আমি আপনার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এবং যা দেননি এসবের অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনি ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপ্রিয় করুন! আর আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু ঘটান, মুসলমান অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে মিলিত করুন। আমাদেরকে অপমানিত করবেন না এবং ফিৎনায় ফেলবেন না। হে আল্লাহ! আপনি ঐ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন যারা আপনার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে ও আপনার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাদের উপর আপনার শাস্তি ও আযাব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকেও ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বূদ!"

মারফূ' হাদীসে রয়েছেঃ "যার কাছে পুণ্যের কাজ ভাল লাগে এবং পাপের কাজ মন্দ লাগে সে মুমিন।"

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ "এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ।" সুপথ প্রাপ্তির হকদার ও পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদারদেরকে তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٩- وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

৯। মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে— যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

١٠- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ ع

১০। মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা দুই ভাইএর মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি মুসলমানদের দুই দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য মুসলমানদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। পরস্পর বিবাদমান দু'টি দলকে মুমিনই বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, কোন মুসলমান যত বড়ই নাফরমান হোক না কেন সে ঈমান হতে বের হয়ে যাবে না, যদিও খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে। নিম্নের হাদীসটিও এ আয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ

হযরত আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-ও মিম্বরের উপর ছিলেন। কখনো তিনি হযরত হাসান (রাঃ)-এর দিকে

তাকাচ্ছিলেন এবং কখনো জনগণের দিকে দেখছিলেন। আর বলছিলেনঃ "আমার এ ছেলে (নাতী) নেতা এবং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরাট দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন।"[১] রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সিরিয়াবাসী ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বড় বড় ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তাঁরই মাধ্যমে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে এবং তাদেরকে আক্রমণ করে বসে তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক।" বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি সাহায্য করতে পারি অত্যাচারিতকে, কিন্তু আমি অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচার করা হতে বাধা দিবে ও বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার তাকে সাহায্য করা।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ)-কে বলা হয়ঃ "যদি আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট একবার যেতেন!" অতঃপর নবী (সঃ) গাধার উপর সওয়ার হয়ে চললেন এবং মুসলমানরাও তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। যখন তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট পৌঁছেন তখন সে নবী (সঃ)-কে বলেঃ "আপনি আমা হতে দূরে থাকুন। আল্লাহর কসম! আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।" তার একথা শুনে আনসারদের একজন লোক তাকে বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! তোমার গন্ধের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গাধার গন্ধ বহুগুণে উত্তম ও পবিত্র।" তাঁর একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর কতক লোক ভীষণ রেগে গেল এবং এরপর উভয় দলের প্রত্যেক লোকই রাগান্বিত হলো। অতঃপর অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, তাদের মধ্যে হাতাহাতি ও জুতা মারামারি শুরু হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।"[২]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কিছু ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার হুকুম এই আয়াতে রয়েছে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ইমরান নামক একজন আনসারী ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে যায়েদ। তিনি (তাঁর স্ত্রী) তাঁর পিত্রালয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর স্বামী বাধা দেন এবং বলে দেন যে, তাঁর স্ত্রীর পিত্রালয়ের কোন লোক যেন তাঁর বাড়ীতে না আসে। স্ত্রী তখন তাঁর পিত্রালয়ে এ খবর পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়ে সেখান হতে লোক এসে উম্মে যায়েদকে বাড়ী হতে বের করে এবং সাথে করে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে। ঐ সময় তাঁর স্বামী বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর লোক তাঁর চাচাতো ভাইদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা দৌড়িয়ে আসে এবং স্ত্রীর লোক ও স্বামীর লোকদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মারামারি ও জুতা ছুঁড়াছুঁড়িও হয়। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উভয়পক্ষের লোকদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা দুই দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়ায় ন্যায়-বিচারকারীরা পরম দয়ালু, মহিমান্বিত আল্লাহর সামনে মণি-মুক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকবে, এটা হবে তাদের দুনিয়ায় ন্যায়-বিচার করার প্রতিদান।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "ন্যায়-বিচারকারীরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ডান দিকে নূরের আসনে উপবিষ্ট থাকবে। তারা তাদের হুকুমে, পরিবার পরিজনের মধ্যে এবং যা কিছু তাদের অধিকারে ছিল সবারই মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করতো।"[২]

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' অর্থাৎ মুমিনরা সবাই পরস্পর দ্বীনী ভাই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার (মুমিন) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।" সহীহ হাদীসে আরো রয়েছেঃ যখন কোন মুসলমান তার (মুসলমান) ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্যে দু'আ করে তখন ফেরেশতা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেনঃ আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন।" এই ব্যাপারে আরো বহু সহীহ হাদীস রয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আরো সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "মুসলমানের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, দয়া-সহানুভূতি ও মিলামিশার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যখন কোন অঙ্গে ব্যথা হয় তখন গোটা দেহ ঐ ব্যথা অনুভব করে, সারা দেহে জ্বর এসে যায় এবং সারা দেহ জেগে থাকার (অর্থাৎ ঘুম না আসার) কষ্ট পায়।" অন্য সহীহ হাদীসে আছেঃ "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে একটি দেয়ালের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলোকে অপর হাতের অঙ্গুলিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুমিনের ঈমানদারের সাথে ঐ সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক মাথার দেহের সাথে রয়েছে। মুমিন ঈমানদারের জন্যে ঐ ব্যথা অনুভব করে যে ব্যথা অনুভব করে দেহ মাথার জন্যে (অর্থাৎ মাথায় ব্যথা হলে যেমন দেহ তা অনুভব করে, অনুরূপভাবে এক মুমিন ব্যথা পেলে অন্য মুমিনও তার ব্যথায় ব্যথিত হয়)।"[১]

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।' অর্থাৎ বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। আর সমস্ত কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চল। আর এটা এমন বিশেষণ যার কারণে তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের সাথেই আল্লাহর রহমত থাকে।

১১। হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে

১১- يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।	بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হলো সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। আল্লাহ তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদাবান। পুরুষকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকে এটা হতে নিষেধ করছেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করা এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বলে ঘোষণা করছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থাৎ "দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"(১০৪ ঃ ১) هَمَزَ হয় কাজ দ্বারা এবং لَمَزَ হয় কথা দ্বারা। অন্য একটি আয়াতে আছেঃ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ অর্থাৎ "পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরকে লাগিয়ে বেড়ায়।"(৬৮ ঃ ১১) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না।' যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের নফসকে হত্যা করো না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করো না।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।' অর্থাৎ তার এমন উপাধী বের করো না যা শুনতে সে অপছন্দ করে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালমা গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার

প্রত্যেকটি লোকের দু'টি বা তিনটি করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাউকেও যখন কোন একটি নাম ধরে ডাকতেন তখন লোকেরা বলতোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়।" তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত কাজ। সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।

١٢- يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ○

১২। হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কুধারণা পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া হতে এবং পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করা হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "তোমার মুসলমান ভাই এর মুখ হতে যে কালেমা বের হয় তুমি যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই পোষণ করবে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমি নবী (সঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছেন এবং বলছেনঃ “তুমি কতই না পবিত্র ঘর! তোমার গন্ধ কতই না উত্তম! তুমি কতই না সম্মানিত! তুমি কতই না মর্যাদা সম্পন্ন! যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুমিনের মর্যাদা, তার জান ও মালের মর্যাদা এবং তার সম্পর্কে শুধুমাত্র ভাল ধারণা পোষণ করা হবে এই হিসেবে তার মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমার মর্যাদার চেয়েও বেশী বড়।”[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাকো, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারো গোপন তথ্য সন্ধান করো না, একে অপরের বুযুর্গী লাভ করার চেষ্টায় লেগে থেকো না, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না এবং সবাই মিলে তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও।”[২]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো না, একে অপরের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলমান ভাইএর সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বলা ও মেলামেশা করা পরিত্যাগ করে।”[৩]

হযরত হারেসাহ্ ইবনে নু'মান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তিনটি অভ্যাস আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই থাকবে। (এক) লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করা, (দুই) হিংসা করা এবং (তিন) কু-ধারণা পোষণ করা।” একটি লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর সংশোধন কিরূপে হতে পারে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হিংসা করলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, কু-ধারণা পোষণ করলে তা ছেড়ে দিবে এবং লক্ষণ দেখে যখন শুভাশুভ নির্ণয় করবে তখন স্বীয় কাজ হতে বিরত থাকবে না, বরং সেই কাজ পুরো করবে।”

১. এ হাদীসটি আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন।
৪. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোককে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট আনয়ন করা হয় এবং তাঁকে বলা হয়ঃ "এটা অমুক ব্যক্তি, এর দাড়ি হতে মদ্যের ফোটা পড়তে রয়েছে।" তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেনঃ "আমাদের কারো গোপন বিষয় সন্ধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি আমাদের সামনে কারো কোন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আমরা তাকে ঐ জন্যে পাকড়াও করতে পারি।"[১]

বর্ণিত আছে যে, উকবার লেখক দাজীন (রাঃ)-এর নিকট হযরত আবুল হায়সাম (রঃ) গেলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "আমার প্রতিবেশীদের কতক মদ্যপায়ী রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে, আমি পুলিশ ডেকে তাদেরকে ধরিয়ে দিই।" হযরত দাজীন (রাঃ) বললেনঃ "না, না, এ কাজ করো না, বরং তাদেরকে বুঝাও, উপদেশ দাও। আর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকো।" কিছুদিন পর হযরত আবুল হায়সাম (রঃ) হযরত দাজীন (রাঃ)-এর নিকট আবার আসলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "আমি কোনক্রমেই তাদেরকে মদ্যপান হতে বিরত রাখতে পারলাম না। সুতরাং এখন অবশ্যই আমি পুলিশকে ডেকে এনে তাদেরকে ধরিয়ে দিবো।" হযরত দাজীন (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে এ কাজ না করতে অনুরোধ করছি। জেনে রেখো যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখে সে এতো বেশী পুণ্য লাভ করে যে, সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিতকৃতা মেয়েকে বাঁচিয়ে নিলো।"[২]

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যখন তুমি জনগণের গোপন দোষের সন্ধানে লেগে পড়বে তখন তুমি তাদেরকে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলবে।" তখন হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেনঃ "হযরত মুআবিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যে কথাটি শুনেছেন তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপকার সাধন করেছেন।"[৩]

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমীর বা বাদশাহ যখন নিজের অধীনস্থ লোকদের গোপন দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতে থাকে তখন সে যেন তাদেরকে বিনষ্টই করে থাকে।"[৪]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلَا تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ "তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করো না।"

تَجَسُّس শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ মন্দের উপরই হয়ে থাকে। আর تَحَسُّس -এর প্রয়োগ হয় ভাল কিছু সন্ধানের উপর। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেনঃ

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের (সহোদর ভাই-এর) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না।" (১২ ঃ ৮৭) আবার কখনো কখনো এ দুটো শব্দেরই প্রয়োগ মন্দের উপর হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

অর্থাৎ "তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না, একে অপরের প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে চলো না এবং তোমরা আল্লাহর বান্দারা সব ভাই ভাই হয়ে যাও।"

ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, تَجَسُّس বলা হয় কোন বিষয়ে খোঁজ নেয়াকে। আর تَحَسُّس বলা হয় ঐ লোকদের কানা-ঘুষার উপর কান লাগিয়ে দেয়াকে যারা কাউকেও নিজেদের কথা গোপনে শুনাতে চায় এবং تَدَابُر বলা হয় একে অপরের উপর বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গীবত করতে নিষেধ করছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গীবত কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "গীবত হলো এই যে, তুমি তোমার (মুসলমান) ভাইএর অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে অপছন্দ করে।" আবার প্রশ্ন করা হয়ঃ "তার সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয় তা যদি তার মধ্যে বাস্তবে থাকে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, গীবত তো এটাই। আর যদি বাস্তবে ঐ দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে ওটা তো অপবাদ।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "সুফিয়া (রাঃ) তো এরূপ এরূপ অর্থাৎ বেঁটে!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি এমন কথা বললে যে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিলানো যায় তবে সমুদ্রের সমস্ত পানিকে নষ্ট করে দিবে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্য একটি লোক সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বললে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি এটা শুনতে পছন্দ করি না যদিও এতে আমার বড় লাভ হয়।"[১]

হযরত হাসসান ইবনে মাখরিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা একটি মহিলা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। যখন সে ফিরে যেতে উদ্যতা হয় তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "মহিলাটি খুবই বেঁটে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেনঃ "তুমি তার গীবত করলে?"[২]

মোটকথা, গীবত হারাম বা অবৈধ এবং এর অবৈধতার উপর মুসলমানদের ইজমা হয়েছে। হ্যাঁ, তবে শরীয়তের যৌক্তিকতায় কারো এ ধরনের কথা আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সতর্ককরণ, উপদেশ দান এবং মঙ্গল কামনাকরণ। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন পাপাচারী লোকের সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "তাকে তোমরা আমার কাছে আসার অনুমতি দাও, তবে সে তার গোত্রের মধ্যে বড় মন্দ লোক।" যেমন তিনি আরো বলেছিলেনঃ "মুআবিয়া দরিদ্র লোক, আর আবুল জাহম বড়ই প্রহারকারী ব্যক্তি।" একথা তিনি ঐ সময় বলেছিলেন যখন তাঁরা দু'জন হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আরো এ ধরনের ব্যাপারে এর অনুমতি রয়েছে। বাকী অন্যান্য সর্বক্ষেত্রেই গীবত হারাম ও কবীরা গুনাহ। এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে?' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ভাই-এর গোশত খেতে যেমন ঘৃণাবোধ কর, গীবতকে এর চেয়েও বেশী ঘৃণা করা তোমাদের উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে কোন কিছু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে।" আরো বলেনঃ "খারাপ দৃষ্টান্ত আমাদের জন্যে সমীচীন নয়।" বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের উপর এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিনটি, এই মাসটি ও এই শহরটি।"

---

১. ইমাম আবূ দাঊদই (রঃ) এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের মাল, মান-সম্মান ও রক্ত হারাম (অর্থাৎ মাল আত্মসাৎ করা, মান-সম্মান হানী করা এবং খুন করা হারাম)। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করবে।"[১]

হযরত আবূ বুরদা আল বালভী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ হে ঐ লোকের দল! যারা শুধু মুখে ঈমান এনেছো, কিন্তু অন্তরে ঈমান রাখোনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করা ছেড়ে দাও, তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না। যদি তোমরা তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান কর এবং ওগুলোর পিছনে লেগে থাকো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন, এমন কি তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের কাছেও মন্দ লোক বলে বিবেচিত হবে এবং লজ্জিত হবে।"[২]

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ভাষণদান করেন, যা পর্দানশীন মহিলাদের কর্ণকুহরেও পৌঁছে। এই ভাষণে তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।"[৩]

একদা হযরত ইবনে উমার (রাঃ) কা'বার দিকে তাকিয়ে বলেনঃ "তোমার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন মুমিন মানুষের মর্যাদা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তোমার চেয়েও বেশী।"

হযরত মিসওয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতিসাধন করে এর বিনিময়ে এক গ্রাস খাদ্য লাভ করবে, (কিয়ামতের দিন) তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হতে ঐ পরিমাণ খাদ্য খাওয়াবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতিসাধন করে ওর বিনিময়ে পোশাক লাভ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ পরিমাণ জাহান্নামের পোশাক পরাবেন। যে ব্যক্তি কোন লোকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার ও শুনাবার জন্যে দাঁড়াবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখাবার শুনাবার জায়গায় দাঁড় করাবেন।"[৪]

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এহাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালায় বর্ণিত হয়েছে।
৪. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মি'রাজের রাত্রে আমি দেখি যে, কতকগুলো লোকের তামার নখ রয়েছে, ঐগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা নুচতে রয়েছে। আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কারা? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "এরা ওরাই যারা লোকদের গোশত খেতো (অর্থাৎ গীবত করতো)।"[১]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি মি'রাজের রাত্রিতে যা দেখেছিলেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেনঃ "জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বহু লোকের সমাবেশের পার্শ্ব দিয়ে নিয়ে গেলেন যাদের মধ্যে পুরুষও ছিল এবং নারীও ছিল। ফেরেশতারা তাদের পার্শ্বদেশের গোশ্ত কেটে নিচ্ছেন, অতঃপর তাদেরকে তা খেতে বাধ্য করছেন। তারা তা চিবাতে রয়েছে। আমি তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বলেনঃ "এরা হলো ঐ সব লোক যারা ছিল তিরস্কারকারী, গীবতকারী এবং চুগলখোর। আজ তাদেরকে তাদের নিজেদেরই গোশত খাওয়ানো হচ্ছে।"[২] এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস এবং আমরা পূর্ণ হাদীসটি সূরায়ে সুবহান বা বানী ইসরাঈলের তাফসীরেও বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে রোযা রাখার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ "আমি না বলা পর্যন্ত কেউ যেন ইফতার না করে।" সন্ধ্যার সময় জনগণ এক এক করে আসতে থাকে এবং তাঁর নিকট ইফতার করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি প্রত্যেককে অনুমতি দেন এবং তারা প্রত্যেকে ইফতার করে। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দু'জন স্ত্রীলোকও রোযা রেখেছিল যারা আপনার পরিবারেরই মহিলা। সুতরাং তাদেরকে আপনি ইফতার করার অনুমতি দিন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার আরয করলো। তখন তিনি বললেনঃ "তারা রোযা রাখেনি। যারা মানুষের গোশত খায় তারা কি রোযাদার হতে পারে? যাও, তাদেরকে বলো, যদি তারা রোযা রেখে থাকে তবে যেন বমি করে ফেলে দেয়।" সুতরাং তারা বমি করলো যার ফলে

১. এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)।

রক্তপিণ্ড বের হয়ে পড়লো। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সংবাদ দিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যদি তারা ঐ অবস্থাতেই মারা যেতো তবে অবশ্যই তারা জাহান্নামের গ্রাস হয়ে যেতো।"[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ লোকটি বলেছিলঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মহিলা দু'টির অবস্থা রোযার কারণে খুবই শোচনীয় হয়ে গেছে। পিপাসায় তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে।" ওটা ছিল দুপুর বেলা। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকলেন। লোকটি পুনরায় বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মহিলাদ্বয়ের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, অল্পক্ষণের মধ্যে হয়তো তারা মারাই যাবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসো।" তারা আসলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের একজনের সামনে দুধের একটি পেয়ালা রেখে বললেনঃ "এতে বমি কর।" সে বমি করলে তার মুখ দিয়ে পূজ, জমাট রক্ত ইত্যাদি বের হয়ে আসলো। তাতে পেয়ালাটির অর্ধেক ভর্তি হলো। অতঃপর অপর মহিলাটির সামনে পেয়ালাটি রেখে তাতে তাকেও বমি করতে বললেন। সে বমি করলে তার মুখ দিয়েও উপরোক্ত জিনিসগুলো এবং গোশতের টুকরা ইত্যাদি বের হলো। এখন পেয়ালাটি এসব জিনিসে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "মহিলা দু'টিকে তোমরা দেখো, তারা এমন জিনিস দ্বারা রোযা রেখেছিল যা আল্লাহ তাদের জন্যে হালাল করেছেন, আর তারা এমন জিনিস দিয়ে ইফতার করেছে যা আল্লাহ তাদের উপর হারাম করেছেন। তারা দু'জনে বসে মানুষের গোশত খাচ্ছিল (অর্থাৎ গীবত করছিল)।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়েয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি হযরত মায়েয (রাঃ) চারবার একথার পুনরাবৃত্তি করলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছো?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "জ্বী, হ্যাঁ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ "ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জান কি?" জবাবে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, মানুষ তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক তাই করেছি।" রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেনঃ "এখন তোমার উদ্দেশ্য কি?" "আমার

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদও দুর্বল এবং মতনও গারীব।

উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই গুনাহ্ হতে পবিত্র করবেন।" জবাব দিলেন তিনি। "তুমি কি তোমার গুপ্তাঙ্গকে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়েছিলে যেরূপভাবে শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং কাষ্ঠ কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করে?" প্রশ্ন করলেন তিনি। "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যাঁ এই ভাবেই।" তিনি উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে রজম করার অর্থাৎ অর্ধেক পুঁতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টি লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেনঃ "এ লোকটিকে দেখো, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লো না, ফলে কুকুরের মত তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথা শুনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা পড়ে রয়েছে। তিনি বললেনঃ "অমুক অমুক কোথায়?" তারা আসলে তিনি বললেনঃ "তোমরা সওয়ারী হতে অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর।" তারা বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, এটা কি খাওয়ার যোগ্য?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তোমরা তোমাদের (মুসলমান) ভাই এর যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে (অর্থাৎ হযরত মায়েয রাঃ) তো এখন জান্নাতের নদীতে সাঁতার দিচ্ছে।"[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (সফরে) ছিলাম এমন সময় মৃত সড়া-পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জান কি?" এটা হলো ঐ লোকদের দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করে।"[২]

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একবার এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ দুর্গন্ধময় বাতাস বইতে শুরু করে। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ "এটা হলো মুনাফিকদের দুর্গন্ধ যারা মুসলমানদের গীবত করে।"[৩]

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির ইসনাদ বিশুদ্ধ।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি হযরত আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক সফরে হযরত সালমান (রাঃ) দু'জন লোকের সঙ্গে ছিলেন যাঁদের তিনি খিদমত করতেন। তাঁরা তাঁকে খেতে দিতেন। একবার হযরত সালমান (রাঃ) শুয়ে পড়েছিলেন, ইতিমধ্যে যাত্রীদল তথা হতে প্রস্থান করেন। পরবর্তী বিশ্রামস্থলে পৌঁছে ঐ দুই ব্যক্তি দেখেন যে, হযরত সালমান (রাঃ) আসেননি। কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁদেরকে নিজেদের হাতেই তাঁবু খাটাতে হয়। তাই তাঁরা রাগান্বিত হয়ে বলেনঃ "সালমান (রাঃ)-এর কাজতো এটাই যে, অপরের রান্নাকৃত খাবার খাবে এবং অপরের খাটানো তাঁবুতে বিশ্রাম করবে (অর্থাৎ নিজে কিছুই করবে না)।" কিছুক্ষণ পর হযরত সালমান (রাঃ) আসলেন। ঐ দুই ব্যক্তির নিকট তরকারী ছিল না। সুতরাং তাঁরা তাঁকে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তুমি আমাদের জন্যে কিছু তরকারী নিয়ে এসো।" তিনি গেলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। যদি আপনার কাছে তরকারী থাকে তবে আমাকে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তারা তরকারী কি করবে? তারা তরকারী তো পেয়েই গেছে।" হযরত সালমান (রাঃ) ফিরে গেলেন এবং গিয়ে সঙ্গীদ্বয়কে ঐ কথা বললেন। তাঁরা উঠে তখন নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের কাছে তো তরকারী নেই এবং আপনি তা পাঠানওনি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "তোমরা তো সালমান (রাঃ)-এর গোশতের তরকারী খেয়েছো, যেহেতু তোমরা তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বলেছো।" ঐ সময় اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। مَيْتًا বলার কারণ এই যে, ঐ সময় হযরত সালমান (রাঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গীদ্বয় তাঁর গীবত করছিলেন।

হাফিয যিয়াউল মুকাদ্দাসী (রঃ) স্বীয় 'মুখতার' নামক গ্রন্থে প্রায় এ ধরনেরই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং ওটা হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর ঘটনা। তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "তোমাদের ঐ খাদেমের গোশত আমি তোমাদের দাঁতে লেগে থাকতে দেখছি।" তাঁদের গোলামটি তাঁদের খাদ্য রান্না করেই ঘুমিয়েছিল এমতাবস্থায় তার সম্পর্কে তাঁদের শুধু এটুকু বলা বর্ণিত আছেঃ "এ তো দেখি খুবই ঘুমাতে পারে?" তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন!" তিনি তখন তাঁদেরকে বলেনঃ "তোমরা তাকেই (গোলামকেই) তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল। সেই তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার (মুসলিম) ভাই এর গোশত খেয়েছে (অর্থাৎ তার গীবত করেছে), কিয়ামতের দিন ঐ গোশত তার সামনে আনয়ন করা হবে এবং তাকে বলা হবেঃ "যেমন তুমি তার জীবিতাবস্থায় তার গোশত খেয়েছিলে তেমনই এখন মৃত অবস্থায়ও তার গোশত ভক্ষণ কর।" সে তখন ভীষণ চীৎকার ও হায় হায় করবে। তাকে জোরপূর্বক ঐ গোশত ভক্ষণ করানো হবে।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।' অর্থাৎ তাঁকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়। তাওবাকারীর তাওবা আল্লাহ কবূল করে থাকেন। যে তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়, তিনি তার উপর দয়া করেন। যেহেতু তিনি তাওবা কবূলকারী ও পরম দয়ালু।

জমহূর উলামা বলেনঃ গীবতকারীর তাওবার পন্থা এই যে, সে ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করবে এবং আর কখনো ঐ পাপ করবে না।

পূর্বে যা করেছে ওর উপরও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কি না এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটাও শর্ত নয়। কারণ হয় তো সে কোন খবরই রাখে না। সুতরাং যখন সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে তখন সে হয় তো দুঃখিত হবে। সুতরাং এর উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, যে মজলিসে তার দোষ সে বর্ণনা করতো সেই মজলিসে তার গুণ বর্ণনা করবে। আর ঐ অন্যায় হতে সে যথাসাধ্য নিজেকে বিরত রাখবে। এটাই বিনিময় হয়ে যাবে।

হযরত আনাস জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের সহায়তা করে এমন অবস্থায় যে, কোন মুনাফিক তার দুর্নাম করছে, আল্লাহ তখন একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত করে দেন যিনি কিয়ামতের দিন তার (দেহের) গোশতকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনের উপর কোন অপবাদ দিবে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় শুধু তাকে কলংকিত করা, আল্লাহ তা'আলা তাকে পুলসিরাতের উপর আটক করে দিবেন, যে পর্যন্ত না প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।"[২]

১. এটা হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল রিওয়াইয়াত।
২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত আবূ তালহা ইবনে সাহল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের বে-ইযযতী করে এমন জায়গায় যেখানে তার মানহানী করা হয়, তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গায় অপমানিত করবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশী। আর যে ব্যক্তি এরূপ স্থলে তার (মুসলিম) ভাই এর সহায়তা করবে, আল্লাহ তা'আলাও এরূপ জায়গায় তাকে সাহায্য করবেন।"[১]

۱۳- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

১৩। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে। হযরত আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ দু'জন হতে তিনি সমস্ত মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন। شُعُوْب শব্দটি قَبَائِل শব্দ হতে عَام বা সাধারণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরব شُعُوْب-এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর কুরায়েশ, গায়ের কুরায়েশ, এরপর আবার এটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া এসবগুলো قَبَائِل-এর মধ্যে পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, شُعُوْب দ্বারা অনারব এবং قَبَائِل দ্বারা আরব দলগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বানী ইস্রাঈলকে اَسْبَاط বলা হয়েছে। আমি এসব বিষয় একটি পৃথক ভূমিকায় লিখে দিয়েছি, যেগুলো আমি আবূ উমার ইবনে আবদিল বারর (রঃ)-এর 'কিতাবুল ইশবাহ' হতে এবং 'কিতাবুল ফাসদ ওয়াল উমাম ফী মা'রেফাতে আনসাবিল

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আরাবে ওয়াল আজামে’ হতে সংগ্রহ করেছি। এই পবিত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত আদম (আঃ) যাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাঁর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে সারা জাহানের মানুষ একই মর্যাদা বিশিষ্ট। এখন যিনি যা কিছু ফযীলত লাভ করেছেন বা করবেন তা হবে দ্বীনি কাজকর্ম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের ভিত্তিতে। রহস্য এটাই যে, এই আয়াতটিকে গীবত হতে বিরত রাখা এবং একে অপরকে অপদস্থ, অপমানিত এবং তুচ্ছ ও ঘৃণিত জ্ঞান করা হতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের পরে আনয়ন করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান। জাতি, গোত্র ইত্যাদি শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে। যেমন বলা হয়ঃ অমুকের পুত্র অমুক, অমুক গোত্রের লোক। আসলে মানুষ হিসেবে সবাই সমান।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, হুমায়ের গোত্র তাদের মিত্রদের দিকে সম্পর্কিত হতো এবং হিজাযী আরব নিজেদেরকে নিজেদের গোত্রসমূহের দিকে সম্পর্কযুক্ত করতো।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা নসবনামা বা বংশ তালিকার জ্ঞান লাভ কর, যাতে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতে পার। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে জনগণ তোমাদেরকে মহব্বত করবে এবং তোমাদের ধন-মাল ও জীবন-আয়ুতে বরকত হবে।”[১]

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেনঃ (আল্লাহ তা‘আলার নিকট বংশ গরিমা মর্যাদা লাভের কোন কারণ নয়, বরং) আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি)।” সাহাবীগণ (রাঃ) বললেনঃ “আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করিনি।” তখন তিনি বললেনঃ “তাহলে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। তিনি নিজে আল্লাহর নবী ছিলেন, আল্লাহর নবীর তিনি পুত্র ছিলেন, তাঁর দাদাও ছিলেন নবী এবং তাঁর দাদার পিতা তো ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)।” তাঁরা

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই সনদে এ হাদীসটি গারীব।

পুনরায় বললেনঃ "আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি।" তিনি বললেনঃ "তাহলে কি তোমরা আমাকে আরবদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো?" তাঁরা জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ।" তিনি তখন বললেনঃ "অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা দ্বীনের বোধশক্তি লাভ করবে।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেন না এবং তোমাদের ধন-মালের দিকেও দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে।"[২]

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি মনে রেখো যে, তুমি লাল ও কালোর কারণে কোন মর্যাদা রাখো না। হ্যাঁ, তবে তুমি মর্যাদা লাভ করতে পার আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে।"[৩]

হযরত খারাশ আল আসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "মুসলমানরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই। কারো উপর কারো কোন ফযীলত নেই, শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে ফযীলত রয়েছে।"[৪]

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। (মানব) সম্প্রদায় যেন তাদের বাপ-দাদাদের নামের উপর গৌরব প্রকাশ করা হতে বিরত থাকে, নতুবা তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট বালুর ঢিবি অথবা আবী পাখি হতেও হালকা হয়ে যাবে।"[৫]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা তিনি রুকনগুলো চুম্বন করেন। অতঃপর মসজিদে উষ্ট্রীটিকে বসাবার মত জায়গা ছিল না বলে জনগণ তাঁকে হাতে হাতে নামিয়ে নেন এবং উষ্ট্রীটিকে বাতনে সায়েলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। অতঃপর

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৫. এ হাদীসটি আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন যাতে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর তিনি বলেনঃ "এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে অজ্ঞতার যুগের উপকরণসমূহ এবং বাপ দাদার নামে গর্ব করার প্রথা দূর করে দিয়েছেন। দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ তো নেককার, পরহেযগার এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ বদকার এবং আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।" অতঃপর তিনি

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى ....اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আমি আমার এ কথা বলছি এবং আমি আমার জন্যে ও তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[১]

হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এই নসবনামা বা বংশ-তালিকা তোমাদের জন্যে কোন ফলদায়ক নয়। তোমরা সবাই সমভাবে হযরত আদম (আঃ)-এরই সন্তান। তোমাদের কারো উপর কারো কোন মর্যাদা নেই। মর্যাদা শুধু তাকওয়ার কারণে রয়েছে। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে হবে কর্কশ ভাষী, কৃপণ ও অকথ্যভাবে উচ্চারণকারী।"[২]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক আল্লাহভীরু।

হযরত দুররাহ বিনতে আবি লাহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা মিম্বরের উপর ছিলেন এমন সময় একটি লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম লোক কে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "যে সবচেয়ে বেশী অতিথি সেবক, সর্বাপেক্ষা বেশী পরহেযগার, সবচেয়ে বেশী ভাল কাজের আদেশদাতা, সর্বাপেক্ষা অধিক মন্দ কাজ হতে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিতকারী (সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক)।"[৩]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহকে ভয় করে এরূপ লোক ছাড়া দুনিয়ার কোন জিনিস এবং কোন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কখনো মুগ্ধ করতো না।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের খবর রাখেন।' হিদায়াত লাভের যে যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করে থাকেন এবং যে এর যোগ্য নয় সে সুপথ প্রাপ্ত হয় না। করুণা ও শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ফযীলত বা মর্যাদা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান তাকে বুযুর্গী দান করে থাকেন। সমস্ত বিষয়ের খবর তিনি রাখেন। কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

এই আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোকে দলীল রূপে গ্রহণ করে আলেমগণ বলেন যে, বিবাহে বংশ ও আভিজাত্য শর্ত নয়। দ্বীন ছাড়া অন্য কোন শর্তই ধর্তব্য নয়। কোন কোন আলেমের মতে বংশ ও আভিজাত্যের বিচার বিবেচনা করাও শর্ত। এঁদের অন্য দলীল রয়েছে, যা ইলমে ফিকাহর কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। আর আমরাও এগুলোকে কিতাবুল আহকামে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু হাশেম গোত্রের একটি লোককে তিনি বলতে শুনেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমিই সবচেয়ে বেশী সম্পর্কযুক্ত।" তখন আর একটি লোক বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তোমার যে সম্পর্ক রয়েছে তদপেক্ষা বেশী সম্পর্ক তাঁর সাথে আমার রয়েছে।"[২]

১৪। আরব মরুবাসীগণ বলেঃ আমরা ঈমান আনলাম; তুমি বলঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বলঃ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা

١٤- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ

---

১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫। তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

١٥- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৬। বলঃ তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছো? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

١٦- قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৭। তারা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলঃ তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না। বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١٧- يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৮। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

١٨- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ ع

যেসব আরব বেদুঈন ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে-চাড়িয়ে নিজেদের ঈমানের দাবী করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই দাবী করতে নিষেধ করছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেই হেতু তারা ঈমান এনেছে একথা যেন না বলে, বরং যেন বলে যে, তারা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে এসেছে এবং নবী (সঃ)-এর অনুগত হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঈমান ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট, যেমন এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব। হযরত জিবরাঈল (আঃ) যুক্ত হাদীসটিও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (হযরত জিবরাইল আঃ) ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। সুতরাং সাধারণ হতে ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে উঠে যান। তারপর উঠে যান আরো খাস বা বিশিষ্টের দিকে।

হযরত সা'দ ইবনে আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতগুলো লোককে (দানের মাল হতে) প্রদান করলেন এবং একটি লোককে কিছুই দিলেন না। তখন হযরত সা'দ (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি অমুক, অমুককে দিলেন আর অমুককে দিলেন না, অথচ সে মুমিন?" একথা তিনি তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "অথবা সে মুসলিম?" এই জবাবই তিনিও তিনবার দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "নিশ্চয়ই আমি কতক লোককে প্রদান করি এবং তাদের মধ্যে আমার নিকট যে খুবই প্রিয় তাকে ছেড়ে দিই, কিছুই দিই না এই ভয়ে যে, (যাদেরকে প্রদান করি তাদেরকে প্রদান না করলে) তারা (হয়তো ইসলাম পরিত্যাগ করবে এবং এর ফলে) উল্টো মুখে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১] সুতরাং এ হাদীসেও

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাঁদের নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করলেন এবং জানা গেল যে, ইসলামের তুলনায় ঈমান অধিক খাস বা বিশিষ্ট। আমরা এটাকে দলীল প্রমাণাদিসহ সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের শরাহতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, এ লোকটি মুসলমান ছিল, মুনাফিক ছিল না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কিছু প্রদান করেননি এবং তাকে তার ইসলামের উপর সমর্পণ করে দেন। সুতরাং জানা গেল যে, এই আয়াতে যে বেদুঈনদের বর্ণনা রয়েছে তারা মুনাফিক ছিল না, তারা ছিল তো মুসলমান, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়নি। তারা ঈমানের এমন উচ্চ স্তরে পৌছার দাবী করেছিল যেখানে তারা আসলে পৌঁছতে পারেনি। এ জন্যেই তাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই ভাবার্থই হবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তির। এটাকেই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) গ্রহণ করেছেন। আমাদের এসব কথা এজন্যেই বলতে হলো যে, ইমাম বুখারী (রঃ)-এর মতে এলোকগুলো মুনাফিক ছিল, যারা নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে মুমিন রূপে প্রকাশ করতো, কিন্তু আসলে মুমিন ছিল না।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ঐ সময় পার্থক্য হবে যখন ইসলাম স্বীয় হাকীকতের উপর না হবে। যখন ইসলাম হাকীকী হবে তখন ঐ ইসলামই ঈমান। ঐ সময় ঈমান ও ইসলামের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকবে না। এর বহু সবল দলীল প্রমাণ ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেনঃ 'বরং তোমরা أَسْلَمْنَا বল' এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমরা নিহত হওয়া থেকে এবং বন্দী হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে ফরমানের প্রতি অনুগত হলাম।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি বানু আসাদ ইবনে খুযাইমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা মনে করেছিল যে, তারা ঈমান এনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক কথা যে, এই আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা ঈমানের স্থানে পৌঁছে যাওয়ার দাবী

করতো, অথচ সেখানে তারা পৌঁছতে পারেনি। সুতরাং তাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয় যে, তখন পর্যন্ত তারা ঈমানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। যদি তারা মুনাফিক হতো তবে অবশ্যই তাদেরকে ধমকানো হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো। আর করা হতো তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত। যেমন সূরায়ে বারাআতে মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে তো শুধু তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব হবে না।' যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ -

অর্থাৎ "আমি তাদের আমল হতে কিছুই কমিয়ে দিই নি।" (৫২ ঃ ২১)

মহান আল্লাহ্ এরপর বলেনঃ যারা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। কেননা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তারাই পূর্ণ মুমিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না, বরং ঈমানের উপর অটল থাকে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ এরাই এমন লোক যারা বলতে পারে যে, তারা ঈমান এনেছে। তারা ঐ লোকদের মত নয় যারা শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়ায় তিন প্রকারের মুমিন রয়েছে। (এক) যারা আল্লাহ্র উপর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের মাল-ধন ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে। (দুই) যাদের থেকে লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। তারা না তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে, না তাদেরকে হত্যা করে। (তিন) যারা লোভনীয় বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়ার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র (ভয়ের) জন্যে তা পরিত্যাগ করে।"[১]

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা তোমাদের ঈমান ও দ্বীনের কথা আল্লাহ্কে জানাচ্ছ? অথচ আল্লাহ্ এমনই যে, যমীন ও আসমানের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অণুপরিমাণ জিনিসও তাঁর নিকট গোপন নেই। যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে সবই তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেসব আরব বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছে তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা ইসলাম কবূল করেছো বলে আমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিয়ো না। তোমরা ইসলাম কবূল করলে, আমার আনুগত্য করলে এবং আমাকে সাহায্য করলে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, এটা তোমাদের প্রতিই আল্লাহর বড় অনুগ্রহ, যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাউকেও ঈমানের পথ দেখানো অর্থ তার উপর তার ইহসান বা অনুগ্রহ করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুনায়েনের যুদ্ধের শেষে (যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের ক্ষেত্রে) আনসারদেরকে বলেছিলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছিলাম না? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার কারণে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরা তো পৃথক পৃথক হয়েছিলে? অতঃপর আমার কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করেছেন? তোমরা তো দরিদ্র ছিলে? অতঃপর আল্লাহ আমার কারণে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন?" তাঁরা তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সমস্বরে বলতে থাকেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর চেয়েও বেশী আমাদের উপর অনুগ্রহকারী।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু আসাদ গোত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা মুসলমান হয়েছি এবং আরবরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সম্পর্কে বলেনঃ "এদের বোধশক্তি কম এবং তাদের মুখ দ্বারা শয়তানরা কথা বলছে।" তখন ... يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ...-এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞান এবং বান্দাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁর বান্দাদের সমস্ত আমলের তিনি পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা ঃ হুজুরাত এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ কা'ফ মাক্কী

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৪৫, রুকূ'ঃ ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٤٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

যেসব সূরাকে মুফাস্সাল সূরা বলা হয় ওগুলোর মধ্যে সূরায়ে কা'ফই প্রথম। তবে একটি উক্তি এও আছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলো সূরায়ে হুজুরাত হতে শুরু হয়েছে। সর্ব-সাধারণের মধ্যে এটা যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলো عم হতে শুরু হয় এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। আলেমদের কেউই এর উক্তিকারী নন। মুফাস্সাল সূরাগুলোর প্রথম সূরা এই সূরায়ে কা'ফই বটে। এর দলীল হচ্ছে সুনানে আবি দাউদের ঐ হাদীসটি যা 'বাবু তাহযীবিল কুরআন'-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আউস ইবনে হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ সাকীফ প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল হয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই। আহলাফ তো হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ)-এর ওখানে অবস্থান করেন। আর বানু মালিককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের ওখানে অবস্থান করান। তাঁদের মধ্যে মুসাদ্দাদ (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি বলেনঃ "প্রত্যহ রাত্রে ইশা'র নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আসতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে তাঁর নিজের কথা শুনাতেন। এমন কি বিলম্ব হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর পা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতো। কখনো তিনি এই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং কখনো ঐ পায়ের উপর। প্রায়ই তিনি আমাদের সামনে ঐ সব দুঃখপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করতেন যেগুলো কুরায়েশরা ঘটিয়েছিল। অতঃপর তিনি বলতেনঃ "কোন দুঃখ নেই, আমরা মক্কায় দুর্বল ছিলাম, শক্তিহীন ছিলাম। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম। এরপর মক্কাবাসী ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ফল হয় বালতির মত অর্থাৎ কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী হই এবং কখনো তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়।" মোটকথা, প্রত্যহ রাত্রে আমরা তাঁর প্রিয় সাহচর্য লাভ করে গৌরবান্বিত হতাম। একদা রাত্রে তাঁর আগমনের সময় হয়ে গেল কিন্তু তিনি আসলেন না। বহুক্ষণ পর আসলেন। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ তো আসতে আপনার খুব বিলম্ব হলো (কারণ কি?) উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, কুরআন কারীমের যে অংশ আমি দৈনিক পাঠ করে থাকি তা এই সময় পাঠ করছিলাম। অসমাপ্ত ছেড়ে আসতে আমার মন চাইলো না (তাই সমাপ্ত করে আসতে বিলম্ব হলো)।" হযরত আউস (রাঃ) বলেনঃ আমি সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ আপনারা কুরআন

কারীমকে কিভাবে ভাগ করতেন? তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "আমাদের ভাগ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

প্রথম তিনটি সূরার একটি মনযিল, তারপর পাঁচটি সূরার এক মনযিল, এরপর সাতটি সূরার এক মনযিল, তারপর নয়টি সূরার এক মনযিল, অতঃপর এগারোটি সূরার এক মনযিল এবং এরপর তেরোটি সূরার এক মনযিল আর শেষে মুফাসসাল সূরাগুলোর এক মনযিল।" এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহতেও রয়েছে। সুতরাং প্রথম ছয় মনযিলে মোট আটচল্লিশটি সূরা হচ্ছে। তারপর মুফাসসালের সমস্ত সূরার একটি মনযিল হলো। আর এই মনযিলের প্রথমেই সূরায়ে কা'ফ রয়েছে। নিয়মিতভাবে গণনা নিম্নরূপ ঃ

প্রথম মনযিলের তিনটি সূরা হলোঃ সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে আলে ইমরান এবং সূরায়ে নিসা। দ্বিতীয় মনযিলের পাঁচটি সূরা হলোঃ সূরায়ে মায়েদাহ, সূরায়ে আনআ'ম, সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে আনফাল এবং সূরায়ে বারাআত। তৃতীয় মনযিলের সাতটি সূরা হচ্ছেঃ সূরায়ে ইউনুস, সূরায়ে হূদ, সূরায়ে ইউসুফ, সূরায়ে রা'দ, সূরায়ে ইবরাহীম, সূরায়ে হিজর এবং সূরায়ে নাহল। চতুর্থ মনযিলের নয়টি সূরা হলোঃ সূরায়ে সুবহান, সূরায়ে কাহাফ, সূরায়ে মারইয়াম, সূরায়ে তোয়া-হা, সূরায়ে আম্বিয়া, সূরায়ে হাজ্ব, সূরায়ে মু'মিনূন, সূরায়ে নূর এবং সূরায়ে ফুরকান। পঞ্চম মনযিলের এগারোটি সূরা হচ্ছেঃ সূরায়ে শুআ'রা, সূরায়ে নামল, সূরায়ে কাসাস, সূরায়ে আনকাবূত, সূরায়ে রূম, সূরায়ে লোকমান, সূরায়ে আলিফ-লাম-মীম-আস্সাজদাহ, সূরায়ে আহ্যার, সূরায়ে সাবা, সূরায়ে ফাতির এবং সূরায়ে ইয়াসীন। ষষ্ঠ মনযিলের তেরোটি সূরা হলোঃ সূরায়ে আস-সফফাত, সূরায়ে সা'দ, সূরায়ে যুমার, সূরায়ে গাফির, সূরায়ে হা-মীম আসসাজদাহ, সূরায়ে হা-মীম-আইন-সীন-কা'ফ, সূরায়ে যুখরুফ, সূরায়ে দুখান, সূরায়ে জাসিয়াহ, সূরায়ে আহকাফ, সূরায়ে কিতাল, সূরায়ে ফাতহ এবং সূরায়ে হুজুরাত। তারপর শেষের মুফাসসাল সূরাগুলোর মনযিল, যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন এবং এটা সূরায়ে কা'ফ হতেই শুরু হয়েছে যা আমরা বলেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবূ ওয়াফিদ লাইসীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি পড়তেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরায়ে কা'ফ এবং সূরায়ে ইকতারাবাত পাঠ করতেন।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারেসাহ (রাঃ) বলেনঃ "দুই বছর অথবা এক বছর ও কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এবং আমাদের চুল্লী একটিই ছিল। আমি সূরায়ে কা'ফ-ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। কেননা, প্রত্যেক জুমআর দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্যে মিম্বরের উপর দাঁড়াতেন তখন এই সূরাটি তিনি তিলাওয়াত করতেন। মোটকথা, বড় বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ ও জুমআতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সূরাটি পড়তেন। কেননা, এর মধ্যে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ

১। কা'ফ, শপথ কুরআনের (তুমি অবশ্যই সতর্ককারী)।

٢- بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ۚ

২। কিন্তু কাফিররা তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলেঃ এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

٣- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۚ

৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হবো?

٤- قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۚ

৪। আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।

٥- بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۚ

৫। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য আসার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

ق হুরূফে হিজার মধ্যে একটি হরফ বা অক্ষর যেগুলো সূরাসমূহের প্রথমে এসে থাকে। যেমন الٓمٓ، نٓ، صٓ، طٰسٓ، حٰمٓ ইত্যাদি। আমরা এগুলোর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, কা'ফ একটি পাহাড় যা সারা যমীনকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। মনে হয় এটা বানী ইসরাঈলের বানানো কথা যা কতক লোক তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছে এই মনে করে যে, তাদের থেকে রিওয়াইয়াত গ্রহণ করা বৈধ। যদিও তা সত্যও বলা যায় না এবং মিথ্যাও না। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, এটা এবং এই ধরনের আরো বহু রিওয়াইয়াত তো বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসী লোকেরা গড়িয়ে বা বানিয়ে নিয়েছে যাতে দ্বীনকে তারা জনগণের উপর মিশ্রিত করে দিতে পারে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, যদিও এই উম্মতের মধ্যে বড় বড় আলেম, হাফিয, দ্বীনদার ও অকপট লোক সর্বযুগে ছিল এবং এখনো আছে তথাপি আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী লোকেরা অতি অল্প কালের মধ্যে মাওযূ' হাদীসসমূহ রচনা করে ফেলেছে। তাহলে বানী ইসরাঈল, যাদের উপর দীর্ঘ যুগ অতীত হয়েছে এবং যাদের মধ্যে হাফিয ও আলেমের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল, যারা আল্লাহর কালামকে মূলতত্ত্ব হতে সরিয়ে দিতো, যারা মদ্য পানে লিপ্ত থাকতো, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে বদলিয়ে দিতো, তারা যে অনেক কিছু নিজেরাই বানিয়ে নিবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সুতরাং হাদীসে তাদের হতে যে রিওয়াইয়াতগুলো গ্রহণ করা জায়েয রাখা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঐ রিওয়াইয়াত যেগুলো কমপক্ষে জ্ঞানে ধরে ও বুঝে আসে। ওগুলো নয় যেগুলো স্পষ্টভাবে বিবেক বিরোধী। যেগুলো শোনামাত্রই জ্ঞানে ধরা পড়ে যে, ওগুলো মিথ্যা ও বাজে। ওগুলো মিথ্যা হওয়া এমনই প্রকাশমান যে, এর জন্যে দলীল আনয়নের কোনই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং উপরে বর্ণিত রিওয়াইয়াতটিও অনুরূপ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বড়ই দুঃখজনক যে, পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগের বহু গুরুজন আহলে কিতাব হতে এই ধরনের বর্ণনা ও কাহিনীগুলো কুরআন কারীমের তাফসীরে আনয়ন করেছেন। আসলে কুরআন মাজীদ এই প্রকারের রিওয়াইয়াতের মোটেই মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতিম আর রাযীও (রঃ) এখানে এক অতি বিস্ময়কর আসার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা

করেছেন, যার সনদ সঠিক নয়। তাতে রয়েছেঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন যা গোটা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। এই সমুদ্রের পিছনে একটি পাহাড় রয়েছে যা ওকে পরিবেষ্টন করে আছে, ওরই নাম কা'ফ। আকাশ ও পৃথিবী ওরই উপর উঠানো রয়েছে। আবার এই পাহাড়ের পিছনে আল্লাহ তা'আলা এক যমীন সৃষ্টি করেছেন যা এই যমীন হতে সাতগুণ বড়। ওর পিছনে আবার একটি সমুদ্র রয়েছে যা ওকে ঘিরে রয়েছে। আবার ওর পিছনে একটি পাহাড় আছে যা ওকে পরিবেষ্টন করে আছে। ওটাকেও কা'ফ বলা হয়। দ্বিতীয় আকাশকে ওরই উপর উঁচু করা আছে। এই ভাবে সাতটি যমীন, সাতটি সমুদ্র, সাতটি পাহাড় এবং সাতটি আকাশ গণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহর নিম্নের উক্তির তাৎপর্য এটাই ঃ

وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ-

অর্থাৎ "এই যে সমুদ্র এর সহিত যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়।" (৩১ ঃ ২৭) এর ইসনাদ ছেদ কাটা।

হযরত আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে যা বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে যে, قٓ আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, قٓ অক্ষরটিও الٓمٓ، طٓسٓ، حٓمٓ، نٓ، صٓ প্রভৃতি হুরূফে হিজার মতই একটি হরফ বা অক্ষর। সুতরাং এসব উক্তি দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত বলে ধারণাকৃত পূর্বের উক্তিটি দূর হয়ে যায়। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছেঃ 'আল্লাহর কসম! কাজের ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে' এবং قٓ বলে অবশিষ্ট বাক্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন কবির উক্তিঃ

قُلْتُ لَهَا قِفِى فَقَالَتْ قٓ অর্থাৎ "আমি তাকে (মহিলাটিকে) বললামঃ থামো, তখন সে قٓ বললো।" কিন্তু এই তাফসীরের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, উহ্যের উপর ইঙ্গিতকারী কালাম পরিষ্কার হওয়া উচিত। তাহলে এখানে কোন্ কালাম রয়েছে যদ্দ্বারা এতো বড় বাক্য উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করছে?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মহাসম্মানিত কুরআনের শপথ করছেন যার সামনে হতে ও পিছন হতে বাতিল আসতেই পারে না, যা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত।

এই কসমের জবাব কি এ সম্পর্কেও কয়েকটি উক্তি রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) তো কোন কোন নাহভী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর জবাব হলো قَدْ عَلِمْنَا হতে পূর্ণ আয়াত পর্যন্ত। কিন্তু এ ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বরং এই কসমের জবাব হলো কসমের পরবর্তী কালামের বিষয় অর্থাৎ নবুওয়াত এবং দ্বিতীয় বারের জীবনকে সাব্যস্ত করণ, যদিও শব্দ দ্বারা এটা বলা হয়নি। এরূপ কসমের জবাব কুরআন কারীমে বহু রয়েছে। যেমন সূরায়ে صٓ -এর শুরুতে এটা গত হয়েছে। এখানেও ঐরূপ হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'কিন্তু কাফিররা তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলেঃ এটা তো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার!' অর্থাৎ তারা এ দেখে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হয়ে গেল! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ ...

অর্থাৎ "লোকেরা কি এতে বিস্ময় বোধ করেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন লোকের উপর অহী অবতীর্ণ করেছি (এই বলার জন্যে) যে, তুমি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর....?" (১০ ঃ ২) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে চান রিসালাতের জন্যে মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে যাকে চান রাসূলরূপে মনোনীত করেন। এরই সাথে এটাও বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকেও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলেছেঃ আমরা যখন মরে যাবো এবং আমাদের মৃতদেহ গলে পচে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাবে, এরপরেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তা তো আমি জানি। অর্থাৎ তাদের মৃতদেহের অণু-পরমাণু মাটির কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকে না। আমার নিকট যে রক্ষিত ফলক রয়েছে তাতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের গোশত, চামড়া, হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এটাকে অসম্ভব মনে করার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করছেন যে, তারা আসলে তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান

করেছে। আর যারা এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাল বোধশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়। مَرِيْجٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, অস্থির, প্রত্যাখ্যানকারী এবং মিশ্রণ। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ـ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমরা বিভিন্ন উক্তির মধ্যে রয়েছো। কুরআনের অনুসরণ হতে সেই বিরত থাকে যাকে কল্যাণ হতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।"(৫১ ঃ ৮-৯)

٦- أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ○

৬। তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?

٧- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ○

৭। আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বত-মালা এবং ওতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।

٨- تَبْصِرَةً وَّذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ○

৮। আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।

٩- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيدِ ○

৯। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।

١٠- وَالنَّخْلَ بَسِقَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ○

১০। ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।

১১। আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এই ভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

١١- رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ওর চেয়েও নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেনঃ তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, ওর নির্মাণ কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং লক্ষ্য কর যে, ওর কোন জায়গায় কোন ছিদ্র বা ফাটল নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ - ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ -

অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?" অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ ঃ ৩-৪)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলা-দোলা না করে । কেননা, যমীন চতুর্দিক হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। আর আমি ওতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ "প্রত্যেক জিনিসকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর।"(৫১ ঃ ৪৯)

অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আসমান, যমীন এবং এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার আরো বহু নিদর্শন রয়েছে, এগুলো আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি এবং সমুন্নত খর্জুর

বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। এগুলো আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত ও শুষ্ক ভূমিকে সঞ্জীবিত করে থাকি। ভূমি তখন সবুজ-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। এভাবেই মৃতকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং পুনরুত্থান এভাবেই ঘটবে। মানুষ তো এসব নিদর্শন দৈনন্দিন দেখছে। এরপরেও কি তাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরবে না? তারা কি এখনো বিশ্বাস করবে না যে, আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ -

অর্থাৎ "অবশ্যই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানব সৃষ্টি অপেক্ষা খুব বড় (ভারী বা কঠিন)।"(৪০ ঃ ৫৭) আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ "তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবনদান করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্বশক্তিমান।"(৪৬ ঃ ৩৩) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ - اِنَّ الَّذِىْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى - اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ "এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊর্বর, অতঃপর আমি ওতে বারি বর্ষণ করলে ওটা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"(৪১ ঃ ৩৯)

১২। তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, রাস্স ও সামূদ সম্প্রদায়,

١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ○

১৩। আ'দ, ফিরাউন ও লূত সম্প্রদায়,

١٣- وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝

১৪। এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।

١٤- وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝

১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করবে!

١٥- اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করছেন যা তাদের পূর্বে তাদের মত মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর আপতিত হয়েছিল। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং আসহাবুর রাস্‌স, যাদের পূর্ণ ঘটনা সূরায়ে ফুরকানের তাফসীরে গত হয়েছে। আর সামূদ, আ'দ, ফিরাউন এবং হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়, যাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঐ যমীনকে আল্লাহ সড়া-পচা পাঁকে পরিণত করেছেন। এসব ছিল তাদের কুফরী, ঔদ্ধত্য এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণেরই ফল। আসহাবে আয়কাত দ্বারা হযরত শু'আয়েব (আঃ)-এর কওমকে এবং কাওমু তুব্বা দ্বারা ইয়ামনীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরায়ে দুখানে তাদের ঘটনাও গত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীর করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। এসব উম্মত তাদের রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। তাই তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন রাসূলকে (আঃ) অস্বীকারকারী যেন সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকারকারী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করে।"(২৬ ঃ ১০৫)

অথচ তাদের নিকট তো শুধু হযরত নূহই (আঃ) আগমন করেছিলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা এমনই ছিল যে, যদি তাদের নিকট সমস্ত রাসূলও আসতেন তবুও তারা সকলকেই অবিশ্বাস করতো, একজনকেও বিশ্বাস করতো না। তাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। অতএব মক্কাবাসী এবং অন্যান্য সম্বোধনকৃত লোকদেরও এই বদভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। নচেৎ হয়তো ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হবে।

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করবে? প্রথমবার সৃষ্টি করা হতে তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুব সহজই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْـخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ "প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং পুনর্বার সৃষ্টিও তিনিই করবেন এবং এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।" (৩০ ঃ ২৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ـ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "যে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে– অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (৩৬ ঃ৭৮-৭৯)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে– আল্লাহ আমাকে পুনর্বার কখনই সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হতে আমার কাছে মোটেই সহজ নয়।

১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

١٦- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○

১৭। স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।

١٧- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ○

১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।

١٨- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

১৯। মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে; এটা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।

١٩- وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ○

২০। আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ওটাই শাস্তির দিন।

٢٠- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ○

২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।

٢١- وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيدٌ ○

২২। তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

٢٢- لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি মানুষের মনে যে ভাল-মন্দ ধারণার উদ্রেক হয় সেটাও তিনি জানেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের অন্তরে যে ধারণা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না তা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।' অর্থাৎ তাঁর ফেরেশতাগণ। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহর ইলম বা অবগতিকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য এই যে, যাতে মিলন ও একত্রিত হওন অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে যা হতে তাঁর পবিত্র সত্তা বহু দূরে রয়েছে এবং তিনি এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু শব্দের চহিদা এটা নয়। কেননা, এখানে وَانَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ একথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -এই কথা। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটকারীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।"(৫৬ ঃ ৮৫) এর দ্বারাও ফেরেশতাদের তার এরূপ নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি যিকর (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফাযতকারী।"(১৫ ঃ ৯) ফেরেশতারাই কুরআন কারীমকে নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং এখানেও ফেরেশতাদের এরূপ নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। এর উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সুতরাং মানুষের উপর ফেরেশতাদেরও প্রভাব থাকে এবং শয়তানেরও প্রভাব থাকে। শয়তান মানুষের দেহের মধ্যে রক্তের মত চলাফেরা করে। যেমন আল্লাহর চরম সত্যবাদী নবী (সঃ) বলেছেন। এজন্যেই এর পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ দু'জন ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ـ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই আছে তোমাদের জন্যে তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর।" (৮২ ঃ ১০-১২)

হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতারা মানুষের ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ)-এর দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তিতো এটাই এবং অপর উক্তিটি

এই যে, যে আমলের উপর পুরস্কার ও শাস্তি আছে শুধু ঐ আমলগুলোই লিখেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। কেননা, প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা হচ্ছেঃ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।

হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় সওয়াবের কথা মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ ওরই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্যে লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যেটাকে সে তেমন কোন বড় গুনাহর কথা মনে করে না, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ স্বীয় সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্যে তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন।"[১] হযরত আলকামা (রঃ) বলেনঃ "এ হাদীসটি আমাকে বহু কথা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছে।"

আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) বলেন যে, ডান দিকের ফেরেশতা পুণ্য লিখেন এবং তিনি বাম দিকের ফেরেশতার উপর আমানতদার। বান্দা যখন কোন পাপকার্য করে তখন তিনি বাম দিকের ফেরেশতাকে বলেনঃ "থামো।" যদি সে তাড়াতাড়ি বা সাথে সাথে তাওবা করে নেয় তবে তিনি তাঁকে পাপ লিখতে দেন না। কিন্তু তাওবা না করলে বাম দিকের ফেরেশতা ওটা লিখে নেন।[২]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর বলেনঃ "হে আদম সন্তান! তোমার জন্যে সহীফা খুলে দেয়া হয়েছে। দু'জন সম্মানিত ফেরেশতাকে তোমার উপর নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন আছেন তোমার ডান দিকে এবং একজন আছেন বাম দিকে। ডানের জন তোমার পুণ্যগুলো লিপিবদ্ধ করছেন এবং বামের জন লিপিবদ্ধ করছেন তোমার পাপগুলো। এখন তুমি যা ইচ্ছা আমল কর, বেশী কর অথবা কম কর। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করবে তখন এই দফতর জড়িয়ে নেয়া হবে এবং তোমার কবরে রেখে দেয়া হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তুমি কবর হতে উঠবে তখন এটা তোমার সামনে পেশ করা হবে। একথাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

২. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَكُلَّ اِنسَانٍ اَلزَمنهُ طَئِرَهُ فِى عُنُقِهِ وَنُخرِجُ لَهُ يَومَ القِيمَةِ كِتَبًا يَلقَهُ مَنشُورًا

اِقرَا كِتَبَكَ كَفَى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسِيبًا -

অর্থাৎ “প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (তাকে বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট।”(১৭ ঃ ১৩-১৪) তারপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহর কসম! তিনি বড়ই ন্যায় বিচার করেছেন যিনি তোমাকেই তোমার নিজের হিসাব রক্ষক করে দিয়েছেন।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাল-মন্দ যা কিছু কথা মুখ হতে বের হয় তার সবই লিখা হয়। এমন কি মানুষ যে বলেঃ 'আমি খেয়েছি', 'আমি পান করেছি', 'আমি গিয়েছি', 'আমি এসেছি' ইত্যাদি সব কিছুই লিখিত হয়। তারপর বৃহস্পতিবারে তার কথা ও কাজগুলো পেশ করা হয়। অতঃপর ভাল ও মন্দ রেখে দেয়া হয় এবং বাকী সব কিছুই সরিয়ে ফেলা হয়। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির অর্থ এটাইঃ

يَمحُوا اللهُ مَايَشَاءُ وَيُثبِتُ وَعِندَهُ اُمُّ الكِتَبِ -

অর্থাৎ “আল্লাহ যা চান মিটিয়ে দেন এবং যা চান ঠিক রাখেন এবং তাঁর নিকট উম্মুল কিতাব রয়েছে।” (১৩ ঃ ৩৯)

হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। তখন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত তাঊস (রঃ)-এর মতে ফেরেশতারা এটাও লিখে থাকেন। তখন তিনি কাতরানোও বন্ধ করে দেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন যে, তিনি মৃত্যুর সময় উহ পর্যন্ত করেননি।

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে মানুষ! মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে। ঐ সময় ঐ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যাতে তুমি এখন জড়িয়ে পড়েছো। ঐ সময় তোমাকে বলা হবেঃ এটা ওটাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছো। এখন ওটা এসে গেছে। তুমি ওটা হতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পেতে পার না। না তুমি এটাকে রোধ করতে পার, না পার এর সাথে মুকাবিলা করতে, না তোমার ব্যাপারে কারো কোন সাহায্য ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে। সঠিক কথা এটাই যে, এখানে সম্বোধন সাধারণভাবে মানুষকে করা হয়েছে, যদিও কেউ কেউ বলেন যে, এ সম্বোধন কাফিরদের প্রতি এবং অন্য কেউ অন্য কিছু বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর শিয়রে বসেছিলাম। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আমি নিম্নের ছন্দটি পাঠ করলামঃ

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقْنِعًا * فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مَرَّةً مَدْفُوقٌ

অর্থাৎ "যার অশ্রু থেমে আছে, ওটাও একবার টপ টপ করে পড়বে।" তখন তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি যা বললে তা নয়, বরং আল্লাহ যা বলেছেন এটা তা-ই। তা হলোঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ـ

অর্থাৎ "মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে; এটা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।" এই আসারের আরো বহু ধারা আমি সীরাতে সিদ্দীক (রাঃ)-এর মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর বর্ণনায় আনয়ন করেছি।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তখন তিনি চেহারা মুবারক হতে ঘাম মুছতে মুছতে বলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা!"

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ এর কয়েক প্রকার অর্থ করা হয়েছে। প্রথম এই যে, مَا এখানে مَوْصُوْل হয়েছে, অর্থাৎ এটা ওটাই যেটাকে বহু দূরের মনে করতে। দ্বিতীয় এই যে, مَا এখানে نَافِيَة বা নেতিবাচক। তখন অর্থ হবেঃ 'এটা ওটাই, যা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার এবং যাকে সরিয়ে ফেলার তুমি ক্ষমতা রাখো না।'

হযরত সুমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত ঐ খেঁকশিয়ালের মত যার কাছে যমীন তার ঋণ চাইলো, তখন সে পালাতে শুরু করলো। পালাতে পালাতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন নিজের গর্তে প্রবেশ করলো। যেহেতু যমীন সেখানেও ছিল সেহেতু ঐ যমীন তাকে বললোঃ "ওরে খেঁকশিয়াল! তুই আমার ঋণ পরিশোধ কর।" তখন সে সেখান হতে আবার পালাতে শুরু করলো। অবশেষে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো। মোটকথা, ঐ খেঁকশিয়াল যেমন যমীন হতে পালাবার রাস্তা পায়নি, অনুরূপভাবে মানুষেরও মৃত্যু হতে পালাবার রাস্তা বন্ধ।[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) স্বীয় 'মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস গত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিরূপে আমি শান্তি ও আরাম পেতে পারি, অথচ শিংগায় ফুৎকার দানকারী ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়ে রয়েছেন এবং গ্রীবা ঝুঁকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন তিনি নির্দেশ দিবেন, আর ঐ নির্দেশ অনুযায়ী তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন!" সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি বলবো?" উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বলোঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ "আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।"

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।' একজন তাকে আল্লাহ তা'আলার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং অপরজন তার কর্মের সক্ষ্য দিবেন। প্রকাশ্য আয়াত তো এটাই এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) মিম্বরের উপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "একজন চালক তাকে হাশরের ময়দানের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সাক্ষী হবেন যিনি তার কর্মের সাক্ষ্য দান করবেন।" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, سَائِق দ্বারা ফেরেশতাকে এবং شَهِيْد দ্বারা আমলকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, سَائِق ফেরেশতাদের মধ্য হতে হবেন এবং شَهِيْد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বয়ং মানুষ, যে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

মহান আল্লাহর "তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।" এই উক্তিতে সম্বোধনকৃত কে? এ সম্পর্কে তিনটি উক্তি রয়েছে। (এক) এই সম্বোধন কাফিরকে করা হবে। (দুই) এই সম্বোধন সাধারণ মানুষকে করা হয়েছে, ভাল ও মন্দ সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। (তিন) এর দ্বারা স্বয়ং নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তির তাৎপর্য হচ্ছেঃ 'আখিরাত ও দুনিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্ক রয়েছে যে সম্পর্ক রয়েছে জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থার মধ্যে।' আর তৃতীয় উক্তির তাৎপর্য হলোঃ 'হে নবী (সঃ)! এই কুরআনের অহীর পূর্বে তুমি উদাসীন ছিলে! আমি তোমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করে তোমার চোখের উপর হতে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর হয়ে গেছে।' কিন্তু কুরআন কারীমের শব্দ দ্বারা তো এটাই প্রকাশমান যে, এটা সাধারণ সম্বোধন। অর্থাৎ প্রত্যেককে বলা হবেঃ 'তুমি

এই দিন হতে উদাসীন ছিলে। কেননা, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের চক্ষু পূর্ণভাবে খুলে যাবে। এমনকি কাফিরও সেদিন সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু তার সেদিন সোজা হওয়া তার কোন উপকারে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا -

অর্থাৎ "যেদিন তারা আমার নিকট আসবে সেদিন তারা খুব বেশী শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হয়ে যাবে।" (১৯ ঃ ৩৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ -

অর্থাৎ "হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন; আমরা সৎ কর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।"(৩২ ঃ ১২)

٢٣- وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ○

২৩। তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেঃ এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।

٢٤- اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

২৪। আদেশ করা হবেঃ তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে–

٢٥- مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِنِ ○

২৫। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।

٢٦- الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করতো তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

٢٧- قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ

২৭। তার সহচর শয়তান বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমি

وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

٢٨- قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَیَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ○

২৮। আল্লাহ বলবেনঃ আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করেছি।

٢٩- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○ ع

২৯। আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে ফেরেশ্তা আদম সন্তানের আমলের উপর নিযুক্ত রয়েছে সে কিয়ামতের দিন তার আমলের সাক্ষ্যদান করবে। সে বলবেঃ এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত। এতে একটুও কম-বেশী করা হয়নি।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা ঐ ফেরেশতার কথা হবে যাঁকে سَائِق বলা হয়েছে, যিনি তাকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবেন। ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) বলেনঃ "আমার নিকট পছন্দনীয় উক্তি এটাই যে, এটা অন্তর্ভুক্ত করে এই ফেরেশতাকেও এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাকেও।

আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের মধ্যে ফায়সালা করবেন।

اَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবচনের রূপ। কোন কোন নাহভী বলেন যে, কোন কোন আরব একবচনকে দ্বিবচন করে থাকে। যেমন হাজ্জাজের উক্তি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি তাঁর জল্লাদকে বলতেনঃ اِضْرِبَا عُنُقَهٗ অর্থাৎ "তোমরা দু'জন তার গর্দান মেরে দাও।" অথচ জল্লাদ তো একজনই ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটা নূনে তাকীদ, যার তাসহীল আলিফের দিকে করা হয়েছে। কিন্তু এটা খুব দূরের কথা। কেননা, এরূপ তো ওয়াকফ-এর অবস্থায় হয়ে থাকে।

বাহ্যতঃ এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সম্বোধন উপরোক্ত দু'জন ফেরেশতার প্রতি হবে। হাঁকিয়ে আনয়নকারী ফেরেশতা তাকে হিসাবের জন্যে পেশ করবেন এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা সাক্ষ্য দিয়ে দিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা

দু'জনকেই নির্দেশ দিবেনঃ "তোমরা দু'জন তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর।" যা অত্যন্ত জঘন্য স্থান। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন!

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেনঃ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী লোককে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

হাদীস গত হয়েছে যে, এই লোকদেরকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম স্বীয় গর্দান উঁচু করে হাশরের ময়দানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলবেঃ "আমি তিন প্রকারের লোকের জন্যে নিযুক্ত হয়েছি। (এক) উদ্ধত ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীর জন্যে, (দুই) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীর জন্যে এবং (তিন) ছবি তৈরীকারীর জন্যে।" অতঃপর জাহান্নাম এসব লোককে জড়িয়ে ধরবে। মুসনাদে আহমাদের হাদীসে তৃতীয় প্রকারের লোক ওদেরকে বলা হয়েছে যারা অন্যায়ভাবে হত্যাকারী।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তার সহচর অর্থাৎ শয়তান বলবে- হে আল্লাহ! আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। বাতিলকে সে স্বয়ং গ্রহণ করে নিয়েছিল। সে নিজেই সত্যের বিরোধী ছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার

উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্যে তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছেই।" (১৪ ঃ ২২)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি মানুষ ও তার সঙ্গী শয়তানকে বলবেনঃ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না, কেননা আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ আমি রাসূলদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম। আর তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, জেনে রেখো যে, আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করবো। প্রত্যেকের উপর হুজ্জত পুরো হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাপের যিম্মাদার।

৩০। সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবোঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবেঃ আরো আছে কি?

٣٠- يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ○

৩১। আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের– কোন দূরত্ব থাকবে না।

٣١- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ○

৩২। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল– প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী, হিফাযতকারীর জন্যে।

٣٢- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ○

৩৩। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়–

٣٣- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ○

৩৪। তাদেরকে বলা হবেঃ শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন।

٣٤- ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ○

৩৫। সেথায় তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।

٣٥- لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ওকে পূর্ণ করবেন, সেহেতু কিয়ামতের দিন যেসব দানব ও মানব ওর যোগ্য হবে তাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "তুমি পূর্ণ হয়েছো কি?" উত্তরে জাহান্নাম বলবেঃ "যদি আরো কিছু পাপী বাকী থাকে তবে তাদেরকেও আমার মধ্যে নিক্ষেপ করুন!" সহীহ বুখারী শরীফে এই আয়াতের তাফসীরে এই হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পাপীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে আরো বেশী চাইতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পা তাতে রাখবেন, তখন সে বলবেঃ "যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।" মুসনাদে আহমাদে এটাও রয়েছে যে, ঐ সময় জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে যাবে এবং বলবেঃ আপনার ইযযতের কসম! এখন যথেষ্ট হয়েছে।" আর জান্নাতে জায়গা ফাঁকা থেকে যাবে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা একটা নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে ঐ জায়গা আবাদ করবেন।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, একবার জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন হয়। জাহান্নাম বলেঃ "আমাকে প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির জন্যে তৈরী করা হয়েছে।" আর জান্নাত বলেঃ "আমার অবস্থা এই যে, যারা দুর্বল লোক, যাদেরকে দুনিয়ায় সম্মানিত মনে করা হতো না তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে।" আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলেনঃ "তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই রহমত দান করবো।" আর জাহান্নামকে তিনি বলবেনঃ "তুমি আমার শাস্তি। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবো। হ্যাঁ, তোমরা উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।" তখন জাহান্নাম তো পূর্ণ হবে না, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পদ ওতে রাখবেন। তখন সে বলবেঃ "যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।" ঐ সময় ওটা ভরে যাবে এবং ওর সমস্ত জোড় পর পর সংকুচিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের কারো প্রতি কোন যুলুম করবেন না। জান্নাতে যে জায়গা বেঁচে যাবে ওটা পূর্ণ করার জন্যে মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য মাখলূক সৃষ্টি করবেন।

মুসনাদে আহমাদে জাহান্নামের উক্তি নিম্নরূপ রয়েছেঃ "ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী ও অহংকারী বাদশাহ ও শরীফ লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে।" মুসনাদে

আবূ ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর সত্তার পরিচিতি প্রদান করবেন। আমি তখন সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা তাতে খুবই সন্তুষ্ট হবেন। তারপর আমি তাঁর এমন প্রশংসা করবো যে, তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। এরপর আমাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে। অতঃপর আমার উম্মত জাহান্নামের উপরের পুল অতিক্রম করতে শুরু করবে। কেউ কেউ তো চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। কেউ কেউ তা অতিক্রম করবে দ্রুতগামী ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে। এমন কি এক ব্যক্তি হাঁটুর ভরে চলতে চলতে তা অতিক্রম করবে এবং এটা হবে আমল অনুযায়ী। আর জাহান্নাম আরো বেশী চাইতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাতে তাঁর পা রেখে দিবেন। তখন সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং বলবেঃ 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।' আমি হাউযের উপর থাকবো।" সাহাবীগণ (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাউয কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আল্লাহর কসম! ওর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা এবং মৃগনাভী অপেক্ষাও সুগন্ধময়। তথায় বরতন থাকবে আকাশের তারকার চেয়েও বেশী। যে ব্যক্তি ওর পানি পেয়ে যাবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি ওর থেকে বঞ্চিত থাকবে সে কোন জায়গাতেই পানি পাবে না যদ্দ্বারা সে পরিতৃপ্ত হতে পারে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নাম বলবেঃ "আমার মধ্যে কোন জায়গা আছে কি যে, আমার মধ্যে আরো বেশী (সংখ্যক দানব ও মানবের অবস্থানের ব্যবস্থা) করা যেতে পারে?" হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, জাহান্নাম বলবেঃ "আমার মধ্যে একজনেরও আসার জায়গা আছে কি? আমি তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছি।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওর মধ্যে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, শেষ পর্যন্ত সে বলবেঃ "আমি পূর্ণ হয়ে গেছি।" সে আরো বলবে ঃ "আমার মধ্যে বেশীর জায়গা আছে কি?" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) প্রথম উক্তিটিকেই গ্রহণ করেছেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটির ভাবার্থ এই যে, যেন ঐ গুরুজনদের মতে এই প্রশ্ন এর পরে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পদ ওর মধ্যে রেখে দিবেন। এরপর যখন তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ "তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো?" সে তখন জবাব দিবেঃ "আমার মধ্যে এমন কোন জায়গা বাকী আছে কি যে, কেউ সেখানে আসতে পারে?" অর্থাৎ একটুও জায়গা ফাঁকা নেই।

হযরত আউফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ এটা ঐ সময় হবে যখন তাতে একটা সুচ পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা থাকবে না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যা দূরে নয়। কেননা, যার আগমন নিশ্চিত সেটাকে দূরে মনে করা হয় না।

اَوَّابٌ -এর অর্থ হলোঃ প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী ও গুনাহর কাজ হতে দূরে অবস্থানকারী। حَفِيْظ হলো ঐ ব্যক্তি যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং তা ভঙ্গ করে না। হযরত উসায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) বলেন যে, اَوَّابٌ حَفِيْظ হলো ঐ ব্যক্তি যে কোন মজলিস হতে উঠে না যে পর্যন্ত না ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যে পরম করুণাময় আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে অর্থাৎ নির্জনেও আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখে। হাদীসে আছে যে, ঐ ব্যক্তিও কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় তাদেরকে বলা হবেঃ শান্তির সাথে তোমরা ওতে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ কর। আল্লাহর সমস্ত শাস্তি হতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করলে। আর ভাবার্থ এও হবে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবেন।

এটা অনন্ত জীবনের দিন অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে, যেখানে কখনো মৃত্যু হবে না, যেখান হতে কখনো বের করে দেয়ার কোন আশংকা থাকবে না এবং স্থানান্তরও করা হবে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারো অধিক।

হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ (রঃ) বলেনঃ مَزِيْد -এর মধ্যে এও রয়েছে যে, জান্নাতবাসীর পার্শ্বদিয়ে একখণ্ড মেঘ চলবে যার মধ্য থেকে শব্দ আসবেঃ 'তোমরা কি চাও? তোমরা যা চাইবে তাই বর্ষিয়ে দিবো।' সুতরাং তারা যা কামনা করবে তাই বর্ষিত হবে। হযরত কাসীর (রঃ) বলেনঃ যদি আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ঐ মেঘ হাযির করে এবং আমি কি চাই তা জিজ্ঞেস করা হয় তবে আমি অবশ্যই বলবোঃ সুন্দর পোশাক পরিহিতা সুন্দরী কুমারী যুবতী মহিলা বর্ষণ করা হোক।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমাদের যে পাখীরই গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হবে, তৎক্ষণাৎ ওটা ভাজা অবস্থায় তোমাদের সামনে হাযির হয়ে যাবে।"

মুসনাদে আহমাদের মারফূ' হাদীসে রয়েছেঃ "জান্নাতবাসী যদি সন্তান চায় তবে একই সময়ে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তানের যৌবনাবস্থা হয়ে যাবে।"[১] জামে' তিরমিযীতে রয়েছেঃ "সে যেভাবে চাইবে সেভাবেই হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক।' যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ـ

অর্থাৎ "যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্যে উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আরো অধিক রয়েছে।"(১০ ঃ ২৬)

সুহায়েব ইবনে সিনান রূমী (রঃ) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দর্শন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতবাসীরা প্রত্যেক শুক্রবারে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। مَزِيْد -এর অর্থ এটাই।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একটি সাদা দর্পণ নিয়ে আগমন করেন যার মধ্যস্থলে একটি বিন্দু ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'এটা কি?' উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এটা জুমআর দিন, যা খাস করে আপনাকে ও আপনার উম্মতকে দান করা হয়েছে, যাতে সবাই আপনাদের পিছনে রয়েছে, ইয়াহূদীরাও এবং খৃষ্টানরাও। এতে বহু কিছু কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। এতে এমন এক সময় রয়েছে যে, ঐ সময় আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায়। আমাদের ওখানে এর নাম হলো يَوْمُ الْمَزِيْد বা আধিক্যের দিন।" নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! يَوْمُ الْمَزِيْد কি?" জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "আপনার প্রতিপালক জান্নাতুল ফিরদাউসে একটি প্রশস্ত ময়দান বানিয়েছেন যাতে মৃগনাভির টিলা রয়েছে। জুমআর দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করেন। ওর চতুর্দিকে আলোর মিম্বরসমূহ থাকে যেগুলোতে নবীগণ (আঃ) উপবেশন করেন। শহীদ ও সিদ্দীকগণ তাঁদের পিছনে ঐ মৃগনাভীর টিলাগুলোর উপর থাকবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ "আমি তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছি। এখন তোমরা আমার নিকট যা ইচ্ছা চাও, পাবে।" তাঁরা

১. এ হাদীসটি হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

সবাই বলবেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমি তো তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েই গেছি। এ ছাড়াও তোমরা চাও, পাবে। আমার নিকট আরো অধিক রয়েছে।" তাঁরা তখন জুমআর দিনকে পছন্দ করবেন। কেননা, ঐ দিনেই তাঁরা বহু কিছু নিয়ামত লাভ করেন। এটা ঐ দিন যেই দিন আপনার প্রতিপালক আরশের উপর সমাসীন হবেন। ঐ দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। ঐ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।"[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে একটি খুব বড় 'আসার' আনয়ন করেছেন যাতে বহু কথাই গারীব বা দুর্বল।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত এক দিকেই মুখ করে বসে থাকবে। অতঃপর একজন হূর আসবে যে তার স্কন্ধে হাত রেখে তার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরিয়ে দিবে। সে এমন সুন্দরী হবে যে, সে তার গণ্ডদেশে তার চেহারা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমনভাবে আয়নায় দেখা যায়। সে যেসব অলংকার পরে থাকবে ওগুলোর এক একটি ক্ষুদ্র মুক্তা এমন হবে যে, ওর কিরণে সারা দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সে সালাম দিবে, তখন ঐ জান্নাতী উত্তর দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ "তুমি কে?" সে উত্তরে বলবেঃ "আমি হলাম সে-ই যাকে কুরআনে مزيد বলা হয়েছে।" তার গায়ে সত্তরটি হুল্লা (পোশাক বিশেষ) থাকবে, এতদসত্ত্বেও তার সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে বাহির হতেই তার পদনালীর মজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে। তার মাথায় মণি-মুক্তা বসানো মুকুট থাকবে যার সমান্যতম মুক্তা পূর্ব ও পশ্চিমকে আলোকিত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।"[২]

৩৬। আমি তাদের পূর্বে আরো কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরতো; পরে তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল রইলো না।

٣٦- وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ○

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইমাম শাফেয়ীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর কিতাবুল উম্মের কিতাবুল জুমআর মধ্যেও এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

٣٧- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○

৩৭। এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

٣٨- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

৩৮। আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

٣٩- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

৩৯। অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

৪০। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাযের পরেও।

ইরশাদ হচ্ছেঃ এই কাফিররা কতটুকু ক্ষমতা রাখে? এদের পূর্বে এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক লোকদের এই অপরাধের কারণেই আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শহরে বহু কিছু স্মৃতিসৌধ ছেড়ে গেছে। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। তারা দীর্ঘ সফর করতো। আল্লাহর শাস্তি দেখে তা হতে বাঁচার পথ তারা অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু তাদের ঐ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। আল্লাহর পাকড়াও হতে কে বাঁচতে পারে? প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা মনে রেখো যে, যখন আমার শাস্তি এসে যাবে তখন ভূষির মত উড়ে যাবে। প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির জন্যে এতে যথেষ্ট উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যে নিবিষ্ট চিত্তে এটা শ্রবণ করে তার জন্যেও এতে শিক্ষা ও উপদেশ আছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে এবং এতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। এতেও এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। কেননা, এতো বড় মাখলূককে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মৃতকে পুনর্জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আর ঐ দিনটি ছিল শনিবার। ঐ দিনের নামটিই তারা يَوْمُ السَّبْتِ রেখে তবে ছেড়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবনদান করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"(৪৬ ঃ ৩৩) আর যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক আয়াতে বলেনঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা বহুগুণে বড় (কঠিন)।" (৪০ঃ ৫৭) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ـ

অর্থাৎ "তোমাদেরকেই কি সৃষ্টি করা কঠিন, না আকাশ, যা তিনি বানিয়েছেন?"(৭৯ ঃ ২৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! অতএব তারা তোমাকে যা বলে তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না বরং ধৈর্যধারণ কর, তাদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মি'রাজের পূর্বে ফজরের ও আসরের নামায ফরয ছিল এবং রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এবং তাঁর উম্মতের উপর এক বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায ওয়াজিব থাকে। তারপর তাঁর উম্মতের উপর হতে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর মি'রাজের রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়, যেগুলোর মধ্যে ফজর ও আসরের নাম যেমন ছিল তেমনই থাকে। সুতরাং 'সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে' এ কথার দ্বারা ফজর ও আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত জারীর ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা (একদা) নবী (সঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেনঃ "তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে হাযির করা হবে এবং তাঁকে তোমরা এমনিভাবে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই চাঁদকে দেখছো। সুতরাং তোমরা পারলে অবশ্যই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযকে কখনো ছাড়বে না।" অতঃপর তিনি ... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"[১]

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে আরো বলেনঃ 'রাত্রেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।' যেমন অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

অর্থাৎ "এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত বর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।" (১৭ঃ ৭৯)

اَدْبَارَ السُّجُوْدِ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে নামাযের পরে তাসবীহ পাঠকে বুঝানো হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ধনী লোকেরা তো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ করে ফেলেছেন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "কিরূপে?" তাঁরা জবাবে বললেনঃ আমাদের মত তাঁরাও নামায পড়েন ও রোযা রাখেন। কিন্তু তাঁরা দান-খায়রাত করেন যা আমরা করতে পারি না এবং তাঁরা গোলাম আযাদ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করেন, আমরা তা করতে সমর্থ হই না।" তিনি তখন তাদেরকে বললেনঃ "এসো, আমি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিই যা তোমরা করলে তোমরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হয়ে যাবে, তোমাদের উপর কেউই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে না। কিন্তু তারাই পারবে যারা তোমাদের মত আমল করবে। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পরে 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার করে পাঠ করবে।" (কিছু দিন পর) তাঁরা আবার আসলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের ধনী ভ্রাতাগণও আমাদের এ আমলের মত আমল করতে শুরু করেছেন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।"

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা মাগরিবের পরে দুই রাকআত নামাযকে বুঝানো হয়েছে। হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) এবং হযরত আবূ উমামাও (রাঃ) এ কথাই বলেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ), হযরত নাখঈ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা (রঃ)-এরও এটাই উক্তি।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দুই রাকআত নামায পড়তেন, শুধু ফজর ও আসরের পরে পড়তেন না।[১] আব্দুর রহমান (রঃ) 'প্রত্যেক নামাযের পরে' একথা বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি রাত্রি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অতিবাহিত করি। তিনি ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায হালকাভাবে আদায় করেন। তারপর তিনি (ফরয) নামাযের জন্যে বাড়ী হতে বের হন এবং আমাকে বলেনঃ "হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! ফজরের পূর্বে দুই রাকআত নামায হলো أَدْبَارَ النُّجُوْمِ এবং মাগরিবের পরে দুই রাকআত নামায হলো أَدْبَارَ السُّجُوْدِ।"এটা ঐ রাত্রির ঘটনা, যে রাত্রিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাজ্জুদের তেরো রাকআত নামায রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আদায় করেছিলেন এবং ঐটি ছিল তাঁর খালা হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর পালার রাত্রি।[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন। হ্যাঁ, তবে তাহাজ্জুদের মূল হাদীস তো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কথাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিজের কথাই হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪১। শুনো, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে,

٤١- وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○

৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে মহানাদ, সেই দিনই বের হবার দিন।

٤٢- يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ○

৪৩। আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

٤٣- اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ○

৪৪। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্যে সহজ।

٤٤- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○

৪৫। তারা যা বলে, তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

٤٥- نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○ ع

হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশ্তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে একথা বলার নির্দেশ দিবেনঃ "সড়া-গলা অস্থিসমূহ এবং হে দেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমাদের মধ্যে তিনি ফায়সালা করবেন।" সুতরাং এর দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। এই সত্য ঐ সন্দেহ ও মতভেদকে দূর করে দিবে যা ইতিপূর্বে ছিল। এটা হবে কবর হতে বের হয়ে যাওয়ার দিন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রথমে সৃষ্টি করা, তারপর ফিরিয়ে আনা এবং সমস্ত মাখলূককে এক জায়গায় একত্রিত করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। ঐ সময়

প্রত্যেককে আমি তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবো। প্রত্যেকে তার ভাল-মন্দের প্রতিফল পেয়ে যাবে। যমীন ফেটে যাবে। সবাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে মাখলূকের দেহ অংকুরিত হতে শুরু করবে, যেমন কাদায় পড়ে থাকা শস্য বৃষ্টি বর্ষণের ফলে অংকুরিত হয়। যখন দেহ পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম করবেন। সমস্ত রূহ শিংগার ছিদ্রে থাকবে। হযরত ইসরাফীল (আঃ)-এর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে রূহগুলো আসমান ও যমীনের মাঝে ফিরতে শুরু করবে। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ "আমার ইয্যত ও মর্যাদার কসম! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে চলে যাবে। যাকে সে দুনিয়ায় আবাদ করে রেখেছিল।" তখন প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে চলে যাবে এবং যেভাবে বিষাক্ত জন্তুর বিষক্রিয়া চতুষ্পদ জন্তুর শিরায় শিরায় অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় সেই ভাবে ঐ দেহের শিরা উপশিরায় অতিসত্বর রূহ চলে যাবে। আর সমস্ত মাখলূক আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী দৌড়তে দৌড়তে অতি তাড়াতাড়ি হাশরের মাঠে হাযির হয়ে যাবে। এই সময়টি হবে কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ـ

অর্থাৎ "যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাক দিবেন তখন তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, তোমরা খুব অল্পই বসবাস করেছো।"(১৭ঃ ৫২)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বপ্রথম আমার কবরের যমীন ফেটে যাবে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্যে সহজ।' যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ "আমার হুকুম একবার ছাড়া নয়, চক্ষু অবনত হওয়ার মত।"(৫৪ঃ ৫০) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা একটি প্রাণকে মেরে পুনর্জীবিত করার মতই (অতি সহজ), নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।"(৩১ঃ ২৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'তারা যা বলে তা আমি জানি (এতে তুমি মন খারাপ করো না)।' যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ - وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলছে এতে তোমার মন সংকীর্ণ হচ্ছে। (কিন্তু তুমি সংকীর্ণমনা হয়ো না বা মন খারাপ করো না, বরং) তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অর্থাৎ নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার পতিপালকের ইবাদতে লেগে থাকো যে পর্যন্ত না তোমার মৃত্যু হয়। (১৫ঃ ৯৭-৯৯)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও' অর্থাৎ তুমি তাদেরকে জোরপূর্বক হিদায়াতের উপর আনতে পার না এবং এরূপ করতে আদিষ্টও নও। এও অর্থ হয়ঃ 'তুমি তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করো না।' কিন্তু প্রথম উক্তিটিই উত্তম। কেননা, শব্দে 'তুমি তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করো না' এরূপ নেই। বরং আছে– 'তুমি তাদের উপর জাব্বার নও'। অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি শুধু তাবলীগ করেই তোমার কর্তব্য সমাপ্ত কর।' جَبَّرَ শব্দটি اَجْبَرَ শব্দের অর্থেও এসে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।' অর্থাৎ যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, তাঁর শাস্তিকে যে ভয় করে এবং তাঁর রহমতের আশা করে, তাকে তুমি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক পথে চলে আসবে। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ -

অর্থাৎ "তোমার দয়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।"(১৩ঃ ৪০) আর এক জায়গায় আছেঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ -

অর্থাৎ "অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।" (৮৮ ঃ ২১-২২)

অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ـ

অর্থাৎ “তাদেরকে হিদায়াত করা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করে থাকেন।”(২ ঃ ২৭২) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ـ

অর্থাৎ “তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দান করতে পার না, বরং আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করে থাকেন।”(২৮ঃ ৫৬) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ ‘তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।’

হযরত কাতাদা (রঃ) দু'আ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ ـ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার নিয়ামতের আশা রাখে, আমাদেরকে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! হে অনুগ্রহশীল, হে করুণাময়!”

সূরা ঃ কা'ফ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ যারিয়াত মাক্কী

(আয়াত ঃ ৬০, রুকূ' ঃ ৩)

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٦٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ○

১। শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,

٢- فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ○

২। শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের,

٣- فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ○

৩। শপথ স্বচ্ছন্দ গতি নৌযানের,

٤- فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ○

৪। শপথ কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাদের–

٥- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ○

৫। তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

٦- وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ؕ○

৬। কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।

٧- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ○

৭। শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের,

٨- اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ○

৮। তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।

٩- يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ؕ○

৯। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা পরিত্যাগ করে,

١٠- قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ○

১০। অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,

١١- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ○

১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন!

١٢- يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ○

১২। তারা জিজ্ঞেস করেঃ কর্মফল দিবস কবে হবে?

١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ○

১৩। (বলঃ) সেই দিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে,

১৪। (এবং বলা হবেঃ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

١٤- ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ○

হযরত তুফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে জনগণকে বলেনঃ "তোমরা আমাকে যে কোন আয়াত বা যে কোন হাদীস সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার।" তখন ইবনুস সাকওয়া দাঁড়িয়ে বললোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলার وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا-এই উক্তির অর্থ কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "বাতাস।" " حَامِلَات -এর অর্থ কি?" সে জিজ্ঞেস করলো। "এর অর্থ মেঘ।" উত্তর দিলেন তিনি। "جَارِيَات -এর ভাবার্থ কি?" প্রশ্ন করলো সে। তিনি জবাবে বললেনঃ "এর ভাবার্থ হলো নৌযানসমূহ।" সে জিজ্ঞেস করলোঃ " مُقَسِّمَات-এর অর্থ কি?" "এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।" উত্তর দিলেন তিনি।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাবীগ তামীমী হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! ذَارِيَات সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন!" উত্তরে তিনি বললেনঃ "ওটা হলো বাতাস। আমি যা বললাম তা যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি বলতে না শুনতাম তবে তোমাকে এটা বলতাম না।" সে প্রশ্ন করলোঃ مُقَسِّمَات -এর অর্থ কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "مُقَسِّمَات হলেন ফেরেশতামণ্ডলী। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই অর্থ বলতে না শুনলে আমি তোমার কাছে এ অর্থ বলতাম না।" সে আবার প্রশ্ন করলোঃ "جَارِيَات কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ " جَارِيَات হলো নৌযানসমূহ। এ অর্থ যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে আমি না শুনতাম তবে তোমার কাছে আমি এ অর্থ বলতাম না।" অতঃপর তিনি তাকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে একশ' চাবুক মারা হলো এবং একটি ঘরে রাখা হলো। যখন তার দেহের ক্ষত ভাল হয়ে গেল তখন তাকে ডাকিয়ে নিয়ে পুনরায় একশটি বেত্রাঘাত করা হলো এবং তাকে সওয়ার করিয়ে দিয়ে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট হযরত উমার (রাঃ) পত্র লিখলেনঃ "এ ব্যক্তি যেন কোন মজলিসে না বসে।" কিছুদিন পর সে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট এসে কঠিনভাবে শপথ করে বললোঃ "এখন আমার মনের কু-ধারণা দূর হয়ে গেছে। আমার অন্তরে বদ-আকীদা আর নেই যা পূর্বে

ছিল।” তখন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে এ খবর অবহিত করলেন এবং সাথে সাথে একথাও লিখলেনঃ “আমারও ধারণা যে, সে এখন বাস্তবিকই সংশোধিত হয়ে গেছে।” উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-কে লিখেনঃ “তাকে এখন মজলিসে বসার অনুমতি দেয়া হোক।”[১]

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) সাবীগ তামীমীকে যে বেত্রাঘাত করিয়েছিলেন তার কারণ এই যে, তার বদ-আকীদা তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তার প্রশ্ন ছিল প্রত্যাখ্যান ও বিরুদ্ধাচরণ মূলক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তার এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যা হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তো এ আয়াতগুলোর তাফসীরে অন্য কোন উক্তি আনয়নই করেননি।

حَامِلَاتٌ-এর ভাবার্থ যে মেঘ তা নিম্নের কবিতাংশের পরিভাষাতেও রয়েছেঃ

وَاَسْلَمْتُ نَفْسِىْ لِمَنْ اَسْلَمَتْ * لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلَالًا

অর্থাৎ “আমি নিজেকে তাঁরই বশীভূত করছি যাঁর বশীভূত হয়েছে ঐ মেঘ যা পরিষ্কার সুমিষ্ট পানি উঠিয়ে নিয়ে থাকে।”

جَارِيَاتٌ -এর অর্থ কেউ কেউ ঐ নক্ষত্ররাজি নিয়েছেন যেগুলো আকাশে চলাফেরা করে। এই অর্থ নিলে নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যাওয়া হবে। প্রথমে বাতাস, তারপর মেঘ, তারপর নক্ষত্ররাজি এবং এরপর ফেরেশতামণ্ডলী, যাঁরা কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন এবং কখনো পাহারার কাজ করার জন্যে তাশরীফ আনয়ন করেন। যেহেতু এসব কসম এই ব্যাপারে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং লোকদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে সেই হেতু এগুলোর পরেই বলেনঃ 'তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।' অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশের কসম

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি দুর্বল। সঠিক কথা এটাই জানা যাচ্ছে যে, হাদীসটি মাওকুফ অর্থাৎ হযরত উমার (রাঃ)-এর নিজের ফরমান। এটা মারফূ' হাদীস নয়।

খেয়েছেন যা সুন্দর, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। পূর্বযুগীয় গুরুজনদের অনেকেই حُبُك শব্দের এ অর্থই করেছেন। হযরত যহহাক (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, পানির তরঙ্গ, বালুকার কণা, ক্ষেতের ফসলের পাতা জোরে প্রবাহিত বাতাসে যখন আন্দোলিত হয় তখন এগুলোতে যেন রাস্তা হয়ে যায়। ওটাকেই حُبُك বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের পিছনে মিথ্যাবাদী বিভ্রান্তকারী। তার মাথার চুল পিছনের দিকে 'হুবুক' 'হুবুক' অর্থাৎ কুঞ্চিত। আবূ সালেহ্ (রঃ) বলেন যে, حُبُك দ্বারা কাঠিন্য বুঝানো হয়েছে। খাসীফ (রঃ) বলেন حُبُك -এর অর্থ হলো সুদৃশ্য। হাসান ইবনে হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, আকাশের সৌন্দর্য হলো নক্ষত্ররাজি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, حُبُك দ্বারা সপ্তম আকাশকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবতঃ তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিষ্ঠিত থাকে এমন তারকারাজি আকাশে রয়েছে। অধিকাংশ জ্যোতির্বিদের বর্ণনা এই যে, এটা অষ্টম আকাশে রয়েছে, যা সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই সমুদয় উক্তির সারাংশ একই অর্থাৎ এর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশকে বুঝানো হয়েছে। আরো বুঝানো হয়েছে আকাশের উচ্চতা, ওর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওর পবিত্রতা, ওর নির্মাণ চাতুর্য, ওর দৃঢ়তা, ওর প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা ওর জাঁক-জমকপূর্ণ হওয়া, যেগুলোর মধ্যে কতকগুলো চলতে ফিরতে থাকে এবং কতকগুলো স্থির থাকে, ওর সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুষমামণ্ডিত হওয়া। এসব হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্যের উপকরণ।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'হে মুশরিকের দল! তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত রয়েছো। কোন কিছুর উপর তোমরা একমত হতে পারনি।' হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাদের কেউ কেউ তো সত্য বলে বিশ্বাস করতো এবং কেউ কেউ মিথ্যা মনে করতো।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই ওটা পরিত্যাগ করে।' অর্থাৎ এই অবস্থা ওদেরই হয় যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট। তারা নিজেদের বাতিল, মিথ্যা ও বাজে উক্তির কারণে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সঠিক বোধ ও সত্য জ্ঞান তাদের মধ্য হতে লোপ পেয়ে যায়। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ـ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ـ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ـ

অর্থাৎ "তোমরা ও তোমাদের বাতিল মা'বূদরা জাহান্নামী লোকদেরকে ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।" (৩৭ঃ ১৬১-১৬৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পথভ্রষ্ট শুধু সেই হয় যে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর থেকে ঐ ব্যক্তিই দূর হয় যাকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম হতে ঐ ব্যক্তিই সরে পড়ে যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই এটাকে অবিশ্বাস করার উপর উঠে পড়ে লেগেছিল।

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 'বাজে ও অযৌক্তিক উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক।' অর্থাৎ তারাই ধ্বংস হোক যারা বাজে ও মিথ্যা উক্তি করতো, যাদের মধ্যে ঈমান ছিল না, যারা বলতোঃ আমাদের পুনরুত্থান ঘটবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ সন্দেহ পোষণকারীরা অভিশপ্ত। হযরত মুআযও (রাঃ) স্বীয় ভাষণে এ কথাই বলতেন। এরা প্রতারক ও সন্দিহান।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ধ্বংস হোক তারা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। যারা বেপরোয়াভাবে কুফরী করতে রয়েছে। তারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেঃ কর্মফল দিবস কবে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেনঃ এটা হবে সেই দিন, যেই দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। যেমনভাবে সোনাকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয় তেমনিভাবে তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। একথা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে।

১৫। সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে।

১৬। উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রদান করবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

১৭। তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়;

١٥- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ○

١٦- اٰخِذِينَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ○

١٧- كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ○

১৮। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো,	١٨- وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○
১৯। এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।	١٩- وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○
২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে	٢٠- وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○
২১। এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না?	٢١- وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○
২২। আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।	٢٢- وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○
২৩। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক-স্ফূর্তির মতই এসব সত্য।	٢٣- فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ○ ع ١ ١٨

আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরু লোকদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন তারা প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে অবস্থান করবে। তাদের অবস্থা হবে ঐ অসৎ লোকদের অবস্থার বিপরীত যারা শাস্তি-সাজার মধ্যে, শৃংখল-জিঞ্জীরের মধ্যে এবং কঠিন মার-পিটের মধ্যে থাকবে। এই মুমিনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য এসেছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন করতো। আর এর পূর্বেও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতো। কিন্তু দুই কারণে এই তাফসীরের ব্যাপারে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) করেছেন এ কথা বলা হয়। কিন্তু সহীহ্ সনদে এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে না। ওর এ সনদটি সম্পূর্ণরূপে দুর্বল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, اٰخِذِيْنَ পূর্বের বাক্য হতে حَال হয়েছে। সুতরাং ভাবার্থ হবে ঃ আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতরাশি লাভ করবে। ইতিপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা ভাল কাজ করতো। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ـ

অর্থাৎ "(তাদেরকে বলা হবেঃ) তোমরা পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।" (৬৯ঃ ২৪)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন যে, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়। কোন কোন মুফাসসির বলেন যে, এখানে مَا শব্দটি نَافِيَةٌ বা নেতিবাচক। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি হিসেবে অর্থ হবেঃ তাদের উপর এমন কোন রাত্রি অতিবাহিত হতো না যার কিছু অংশ তাঁরা আল্লাহর স্মরণে না কাটাতেন। হয় রাত্রির প্রথমাংশে কিছু নফল পড়তেন, না হয় রাত্রির মধ্যভাগে পড়তেন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাত্রের কোন না কোন সময় কিছু না কিছু নামায অবশ্যই পড়তেন। সারা রাত তাঁরা শুয়ে কাটিয়ে দিতেন না।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ লোকগুলো মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝে কিছু নফল নামায পড়তেন। হযরত ইমাম আবূ জা'ফর বাকির (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাঁরা ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমাতেন না।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এখানে مَا শব্দটি مَوْصُوْلَه হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের নিদ্রা রাত্রে খুব কম হতো। কিছু সময় ঘুমাতেন এবং কিছু সময় জেগে থাকতেন। আর যখন ইবাদতে মনোযোগ দিতেন তখন সকাল হয়ে যেতো।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।' হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) এই আয়াতের এই ভাবার্থ বর্ণনা করার পর বলতেনঃ "বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার যে, আমার মধ্যে এটা নেই।" তাঁর ছাত্র খাজা হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, তিনি প্রায়ই বলতেনঃ "আমি যখন আমার আমল জান্নাতীদের আমলের সামনে রাখি তখন আমার আমলকে তাঁদের আমলের তুলনায় অতি নগণ্য দেখি। পক্ষান্তরে, যখন আমি আমার আমল জাহান্নামীদের আমলের সামনে রাখি তখন দেখি যে, তারা তো কল্যাণ হতে সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিল। তারা ছিল আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অবিশ্বাসকারী। সুতরাং আমার অবস্থা ঐ লোকদের মত যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا অর্থাৎ "তারা ভাল ও মন্দ আমল মিশ্রিত করেছে।" (৯ ঃ ১০২)

বানু তামীম গোত্রের একটি লোক হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ)-কে বললোঃ "হে আবূ সালমা (রঃ)! এই গুণ তো আমাদের মধ্যে নেই যে, আমরা রাত্রে খুব কম ঘুমাই? আমরা তো খুব কম সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে থাকি।" তখন তিনি বললেনঃ "ঐ ব্যক্তিও বড় ভাগ্যবান যে ঘুম আসলে শুয়ে পড়ে এবং যখন জেগে ওঠে তখন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আগমন করেন তখন জনগণ তাঁকে দেখার জন্যে ভীড় জমায়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আল্লাহর কসম। তাঁর চেহারা মুবারকে আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই জ্যোতির্ময় চেহারা কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সর্বপ্রথম যে কথা আমার কানে পৌঁছেছিল তা ছিলঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খাওয়াতে থাকো, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখো, (মানুষকে) সালাম দিতে থাকো এবং রাত্রে নামায আদায় করো যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।" একথা শুনে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কাদের জন্যে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তাদের জন্যে, যারা নরম কথা বলে, (দরিদ্রদেরকে) খানা খেতে দেয় এবং রাত্রে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকে।"[১]

হযরত যুহরী (রঃ) এবং হাসান (রঃ) বলেনঃ "এই আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তারা রাত্রির অধিকাংশ তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দেয়।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ "তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করে।" হযরত যহহাক (রঃ) كَانُوْا قَلِيْلًا কে এর পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেন এবং مِنَ الَّيْلِ হতে শুরু বলে থাকেন। কিন্তু এই উক্তিতে বড় কৃত্রিমতা রয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।' মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 'তারা নামায পড়ে।' অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছেঃ 'তারা রাত্রে (ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে এবং সকাল হলে তারা নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ অর্থাৎ "সকালে তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী।" (৩ঃ ১৭) এই ক্ষমা প্রার্থনা যদি নামাযেই হয় তবে তো খুবই ভাল।

সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে সাহাবীদের একটি জামাআতের কয়েকটি রিওয়াইয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন শেষ তৃতীয়াংশ রাত্রি অবশিষ্ট থাকে তখন প্রতি রাত্রে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ "কোন তাওবাকারী আছে কি? আমি তার তাওবা কবূল করবো। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। কোন যাঞ্চ্ঞাকারী আছে কি? আমি তাকে প্রদান করবো।" ফজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপই বলতে থাকেন।"

আল্লাহ তা'আলা যে হযরত ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেনঃ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيْ অর্থাৎ "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন যে, তাঁর এই ক্ষমা প্রার্থনা রাত্রির শেষ প্রহরেই ছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেমন নামায পড়ে আল্লাহর হক আদায় করেন, অনুরূপভাবে মানুষের হকের কথাও তাঁরা ভুলে যান না। তাঁরা যাকাত আদায় করে থাকেন। তাঁরা জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন। তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। যেমন হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ভিক্ষুকের হক রয়েছে যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে আসে।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর মতে মাহরূম বা বঞ্চিত হলো ঐ ব্যক্তি যার ইসলামে কোন অংশ নেই অর্থাৎ বায়তুল মালে কোন অংশ নেই, কোন কাজ-কামও হাতে নেই এবং কোন শিল্প ও কলা-কৌশলও তার

১. এ হাদীস ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

জানা নেই যার দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করতে পারে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, মাহরূম দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কাজ-কাম কিছু জানে বটে, কিন্তু তা দ্বারা যা সে উপার্জন করে তা তাদের জীবন ধারণের জন্যে যথেষ্ট হয় না। যহহাক (রঃ) বলেন যে, মাহরূম হলো ঐ ব্যক্তি যে পূর্বে ধনী ছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন ইয়ামামায় যখন জলোচ্ছ্বাস হলো এবং এক ব্যক্তির সমস্ত মাল-ধন ও আসবাব পত্র পানিতে ভেসে গেল তখন একজন সাহাবী (রাঃ) বললেনঃ "এ লোকটি মাহরূম বা বঞ্চিত। অন্যান্য বুযুর্গ মুফাসসিরগণ বলেন যে, মাহরূম হলো ঐ ব্যক্তি যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং যাকে তুমি দু' এক গ্রাস খাবার বা দু' একটি খেজুর প্রদান করে থাকো, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে এই পরিমাণ উপার্জন করে যা তার জন্যে যথেষ্ট নয় বা যা তার প্রয়োজন মিটায় না এবং তার এমন অবস্থা প্রকাশ পায় না যে, মানুষ তার অভাবের কথা জানতে পেরে তাকে কিছু দান করে।"[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) মক্কা যাচ্ছিলেন। পথে একটি কুকুর এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি যবেহকৃত একটি বকরীর কাঁধ কেটে কুকুরটির সামনে নিক্ষেপ করেন এবং বলেনঃ "লোকেরা বলে যে, এটাও মাহরূম বা বঞ্চিত।" হযরত শা'বী (রঃ) বলেন ঃ "আমি 'মাহরূম' এর অর্থ জানতে অপারগ হয়ে গেছি।"

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ "মাহরূম হলো ঐ ব্যক্তি যার মাল নেই, তা যে কারণেই হোক না কেন। অর্থাৎ সে হয়তো মাল উপার্জন করতেই সক্ষম নয়, কিংবা হয়তো তার মাল ধ্বংস হয়ে গেছে কোন দুর্যোগের কারণে।"

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাফিরদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাঁদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাঁরা গানীমাতও লাভ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এমন কতগুলো লোক আগমন করে যারা গানীমাতের মাল বন্টনের সময় উপস্থিত ছিল না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনা দ্বারা তো বুঝা যায় যে, এই আয়াতটি মাদানী। কিন্তু আসলে তা নয়, বরং এটি মক্কী আয়াত।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে ধরিত্রীতে নিদর্শন রয়েছে।' অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন রয়েছে। এগুলো মহান সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব প্রমাণ করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কিভাবে তিনি দুনিয়ায় জীব-জন্তু ও গাছ-পালা ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিভাবে তিনি পর্বতরাজিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, মাঠ-ময়দানকে করেছেন বিস্তৃত এবং সমুদ্র ও নদ-নদীকে করে রেখেছেন প্রবাহিত। মানুষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাদের বর্ণ, আকৃতি, ভাষা, কামনা-বাসনা, বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন প্রকারের করেছেন। তাদের অঙ্গ-ভঙ্গী তাদের পাপ পুণ্য এবং দৈহিক গঠনের কথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। প্রত্যেক অঙ্গ কেমন উপযুক্ত জায়গায় রয়েছে। এ জন্যেই এরপরেই বলেছেনঃ 'তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?'

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, নিজের গ্রন্থীগুলোর বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যেই।

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ 'আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস অর্থাৎ বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু অর্থাৎ জান্নাত।' হযরত ওয়াসিল আহদাব (রঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ "আমার রিয্ক তো রয়েছে আসমানে, অথচ আমি তা অনুসন্ধান করছি যমীনে, এটা বড়ই দুঃখজনক ব্যাপারই বটে।" একথা বলে তিনি লোকালয় ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যান। তিনি তিন দিন পর্যন্ত তো কিছুই পেলেন না। কিন্তু তৃতীয় দিনে দেখেন যে, টাটকা খেজুরের একটি গুচ্ছ তাঁর পার্শ্বে আছে। তাঁর ভাই, যিনি তাঁর চেয়েও বেশী বিশুদ্ধ ও খাঁটি অন্তকরণ বিশিষ্ট লোক ছিলেন, তাঁর সাথেই বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরা দুই ভাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত জঙ্গলেই জীবন কাটিয়ে দেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বয়ং নিজেরই শপথ করে বলেনঃ আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি অর্থাৎ কিয়ামত, পুনরুত্থান, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি সবই সত্য। যেমন তোমাদের মুখ হতে বের হওয়া কথায় তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে না, অনুরূপভাবে এসব বিষয়েও তোমাদের সন্দেহ

করা মোটেই উচিত নয়। হযরত মুআয (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেনঃ "নিশ্চয়ই এটা সত্য যেমন তুমি এখানে রয়েছো।"

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ কওমগুলোকে ধ্বংস করুন যাদের জন্যে তাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) শপথ করেছেন, অতঃপর তারা তা বিশ্বাস করেনি।"[১]

২৪। তোমার নিকট ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?

٢٤- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

২৫। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললোঃ সালাম। উত্তরে সে বললোঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক।

٢٥- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ○

২৬। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি ভাজা মাংসল গো-বৎস নিয়ে আসলো

٢٦- فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۙ○

২৭। ও তাদের সামনে রাখলো এবং বললোঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন?

٢٧- فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ○

২৮। এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললোঃ ভীত হয়ো না। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

٢٨- فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَ بَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

---

১. এ হাদীসটি মুরসাল। কেননা, হযরত হাসান বসরী (রঃ) একজন তাবেয়ী। তিনি কোন সাহাবীর (রাঃ) নাম না নিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

২৯। তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে আসলো এবং মুখ চাপড়িয়ে বললো- এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে?	٢٩- فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ○
৩০। তারা বললোঃ তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেনঃ তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	٣٠- قَالُوْا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

এ ঘটনাটি সূরায়ে হূদ ও সূরায়ে হিজরে গত হয়েছে। মেহমান বা অতিথিরা ফেরেশতা ছিলেন, যাঁরা মানুষের আকারে আগমন করেছিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্মান দান করেছিলেন। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং অন্যান্য আলেমদের একটি জামা'আত বলেন যে, অতিথিদেরকে আতিথ্য দান করা ওয়াজিব। হাদীসেও এটা এসেছে এবং কুরআন কারীমের বাহ্যিক শব্দও এটাই।

মানবরূপী ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে সালাম করেন এবং তিনি সালামের জবাব দেন। দ্বিতীয় سَلَامٌ শব্দের উপর দুই পেশ হওয়াটাই এর প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এজন্যেই বলেনঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ

অর্থাৎ "যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা ওর চেয়ে উত্তম (শব্দ) দ্বারা জবাব দিবে অথবা ওটাই ফিরিয়ে দিবে।" (৪ঃ ৮৬) হযরত খলীল (আঃ) উত্তম পন্থাটিই গ্রহণ করেন। তাঁরা যে আসলে ফেরেশতা ছিলেন তা হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতেন না বলে তিনি বলেনঃ "এরা তো অপরিচিত লোক।" ফেরেশতারা ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ) এবং হযরত ইসরাফীল (আঃ)। তাঁরা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তাঁদের চেহারায় মর্যাদা ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের খাদ্য তৈরীর কাজে মগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশব্দে অতি তাড়াতাড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই গো-বৎসের ভাজা গোশত নিয়ে তাঁদের সামনে হাযির হয়ে যান। তিনি ঐ গোশত তাঁদের নিকটে রেখে দেন এবং বলেনঃ "আপনারা খাচ্ছেন না কেন?" এর দ্বারা জিয়াফতের

আদব জানা যাচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমানকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই এবং তাঁদের জন্যে তিনি যে খাবার আনছেন এ অনুগ্রহের কথা তাঁদেরকে না বলেই নিঃশব্দে তাঁদের নিকট হতে চলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতম যে জিনিস তিনি পেলেন তা প্রস্তুত করে নিয়ে আসলেন। তা ছিল অল্প বয়স্ক একটি তাজা গো-বৎসের ভাজা গোশত। এ খাদ্য তাঁদের সামনে রেখে দিয়ে তিনি তাঁদেরকে 'খেয়ে নেন' একথা বললেন না। কেননা, এতে এক ধরনের হুকুম পাওয়া যাচ্ছে। বরং তিনি তাঁর সম্মানিত মেহমানদেরকে অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার সুরে বলেনঃ "আপনারা খেতে শুরু করছেন না কেন?" যেমন কোন ব্যক্তি কাউকেও বলে থাকেঃ "যদি আপনি দয়া, অনুগ্রহ ও সদাচরণ করতে চান তবে করতে পারেন।"

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো।' যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ـ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ ـ

অর্থাৎ "সে যখন দেখলো যে, তাদের হস্তগুলো ওর দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলো এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললোঃ ভয় করো না, আমরা লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসলো।" (১১ঃ ৭০-৭১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ "অতঃপর আমি তাকে ইসহাক (আঃ)-এর ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূব (আঃ)-এর সুসংবাদ দিলাম। সে বললোঃ কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হবো আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বললোঃ আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছো? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।"

মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ 'তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।' এ আয়াতে আছে যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, আর পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে, এ সংবাদ তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। সুতরাং ভাবার্থ এই যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কেননা, সন্তানের জন্মগ্রহণ উভয়ের জন্যেই খুশীর বিষয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ সুসংবাদ শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীর মুখ দিয়ে জোর শব্দ বেরিয়ে আসলো এবং কপালে হাত মেরে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বললেনঃ "যৌবনে আমি বন্ধ্যা ছিলাম। এখন আমিও বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এমতাবস্থায় আমি গর্ভবতী হবো?" তাঁর এই কথা শুনে ফেরেশতারা বললেনঃ "এই সুসংবাদ আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে দিচ্ছি না। বরং মহামহিমান্বিত আল্লাহই আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আপনারা যে মহা সম্মান পাওয়ার যোগ্য এটা তিনি ভালরূপেই জানেন। তাঁর ঘোষণা এই যে, এ বৃদ্ধ বয়সেই তিনি আপনাদেরকে সন্তান দান করবেন। তাঁর কোন কাজই প্রজ্ঞাশূন্য নয় এবং তাঁর কোন হুকুমও হিকমত শূন্য হতে পারে না।"

ষষ্ঠ বিংশতিতম পারা সমাপ্ত

٣١- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

৩১। সে (ইবরাহীম আঃ) বললোঃ হে প্রেরিত (ফেরেশতা)গণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?

٣٢- قَالُوْآ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

৩২। তারা বললোঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

٣٣- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ○

৩৩। তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্যে মাটির শক্ত ঢেলা,

٣٤- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ○

৩৪। যা সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে।

٣٥- فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩৫। সেথায় যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।

٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৩৬। এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি।

٣٧- وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৩৭। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্যে ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি।

ইতিপূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেনঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ـ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ يٰاِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার নিকট সুসংবাদ আসলো তখন সে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলো। ইবরাহীম (আঃ) তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী। হে ইবরাহীম (আঃ)! এটা হতে তুমি বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে; তাদের উপর তো শাস্তি আসবে যা অনিবার্য।" (১১ঃ ৭৪-৭৬)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, তিনি ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'হে প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?' অর্থাৎ আপনাদের শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি? ফেরেশতাগণ জবাবে বলেনঃ 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।' এই সম্প্রদায় দ্বারা তাঁরা হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। তাঁরা আরো বলেনঃ 'আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি; যা সীমালংঘনকারীদের জন্যে আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে চিহ্নিত।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ঐ পাপীদের নাম ঢেলাগুলোর উপর পূর্ব হতেই লিখিত আছে। প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক ঢেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সূরায়ে আনকাবূতে রয়েছেঃ

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ -

অর্থাৎ "সে (ইবরাহীম আঃ) বললোঃ এই জনপদে তো লূত (আঃ) রয়েছে। তারা বললোঃ সেথায় কারা আছে তা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূত (আঃ)-কে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, তার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (২৯ঃ ৩২)

অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।' এর দ্বারাও হযরত লূত (আঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, যে ঈমান আনয়ন করেনি। মহান আল্লাহ বলেনঃ 'সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি।' এ আয়াত দু'টি ঐ লোকদের দলীল যাঁরা বলেন যে, ঈমানের নামই ইসলাম। কেননা, এখানে যাদেরকে মুমিন বলা হয়েছে তাদেরকেই

মুসলিম বলা হয়েছে। মুতাজিলাদের মাযহাবও এটাই যে, ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। কিন্তু তাঁদের এ দলীল খুবই দুর্বল। কেননা, এ লোকগুলো মুমিন ছিলেন। আর আমরাও তো এটা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম হয়, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মুমিন হয় না। সুতরাং অবস্থার বিশেষত্বের কারণে তাঁদেরকে মুমিন ও মুসলিম বলা হয়েছে। এর দ্বারা সাধারণভাবে এটা প্রমাণিত হয় না যে, প্রত্যেক মুসলিম মুমিন হয়ে থাকে। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মাযহাব এই যে, যখন ইসলাম প্রকৃত ও সঠিক হয় তখন ঈমান ও ইসলাম একই হয়। তবে ইসলাম প্রকৃত ও বাস্তবরূপী না হলে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য অবশ্যই হবে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার মধ্যে ঐ লোকদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে। তারা ঐ সব লোকের কৃতকর্মের পরিণাম দেখে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৩৮। এবং নিদর্শন রেখেছি মূসা (আঃ)-এর বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম,

٣٨- وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ○

৩৯। তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললোঃ এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।

٣٩- فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

৪০। সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

٤٠- فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ○

৪১। এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু;

٤١- وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ○

৪২। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

٤٢- مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

৪৩। আরো নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হলোঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল।

٤٣- وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ۝

৪৪। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা দেখতেছিল।

٤٤- فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

৪৫। তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না, এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলো না।

٤٥- فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ۝

৪৬। আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

٤٦- وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের পরিণাম দেখে মানুষ যেমন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফিরাউন ও তার লোকদের ঘটনার মধ্যেও তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমি তাদের কাছে আমার পয়গাম্বর হযরত মূসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের নেতা অহংকারী ফিরাউন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং আমার ফরমান হতে বেপরোয়া হয়ে যায়। আল্লাহর এই শত্রু স্বীয় শক্তির দাপট দেখিয়ে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে তাঁর ফরমানের অসম্মান করে। সে তার অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্ষতি সাধনে ও বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যায়। হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করে

যে, তিনি যাদুকর অথবা পাগল। সুতরাং এই অহংকারী, পাপী, কাফির এবং উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার লোক লশকরসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন। সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায়, যখন আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণকর বায়ু। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। ওটা সড়াপচা হাড়ের মত হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বায়ু দ্বিতীয় যমীনে প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন আ'দ জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তখন বায়ুর রক্ষক (ফেরেশতা)কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাদেরকে (আ'দ জাতিকে) ধ্বংস করার জন্যে বায়ু প্রবাহিত করেন। ফেরেশতা তখন আরয করেনঃ "আমি বাতাসের ভাণ্ডারে কি ততটুকু ছিদ্র করে দিবো যতটুকু ছিদ্র গরুর নাকে রয়েছে?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বায়ুর ভাণ্ডারে যদি তুমি ততটুকু ছিদ্র কর তবে তো ওটা যমীনকে এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছুকেই ওলট-পালট করে দিবে। বরং তুমি ওতে অঙ্গুরীর বৃত্তের সমান ছিদ্র কর।" এটা ছিল ঐ বায়ু যার কথা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।'[১] এটা ছিল দক্ষিণা বায়ু। সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে পূবালী বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর আ'দ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।"

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'আরো নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তোমাদের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমরা সুখসম্ভার ভোগ করে নাও।' এটা প্রকাশমান যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই ফরমান রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে হওয়া অস্বীকৃত। এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর উক্তি। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি আহলে কিতাবের কিতাবগুলোর দু'টি থলে পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ওগুলো হতেই তিনি এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ -

অর্থাৎ "সামূদ সম্প্রদায়কে আমি হিদায়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে পছন্দ করেছিল, সুতরাং লাঞ্ছনাকর শাস্তিরূপ বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করলো।" (৪১ঃ ১৭) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আরো নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা দেখছিল।'

তিন দিন পর্যন্ত তারা শাস্তির লক্ষণ দেখতে থাকে। অবশেষে চতুর্থ দিন অকস্মাৎ তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়ে যায়। তারা অচেতন ও বোধশূন্য হয়ে পড়ে। এতোটুকু তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি যে, দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবন রক্ষার চিন্তা করতে পারে। তাই তো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলো না।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

ফিরাউন, আ'দ, সামূদ এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ঘটনাবলী ইতিপূর্বে কয়েকটি সূরার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৭। আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।

٤٧- وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

৪৮। এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা!

٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

৪৯। আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৫০। আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥٠- فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৫১। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করো না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥١- وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত সাওরী (রঃ) এবং আরো বহু তাফসীরকার একথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। আমি মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাঁড় করে রেখেছি এবং প্রতিষ্ঠিত করেছি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্যে বিছানা বানিয়েছি। আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা। সমস্ত মাখলূককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। যেমন আসমান ও যমীন, দিবস ও রজনী, সূর্য ও চন্দ্র, জল ও স্থল, আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর, জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, জান্নাত ও জাহান্নাম, এমন কি জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়া রয়েছে। এটা এ জন্যে যে, যেন তোমরা উপদেশ লাভ কর। তোমরা যেন জেনে নাও যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি শরীক বিহীন ও একক। সুতরাং তোমরা তাঁর দিকে দৌড়িয়ে যাও এবং তাঁরই প্রতি মনোযোগী হও। আমার নবী (সঃ) তো তোমাদেরকে স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধান! তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করো না। আমার রাসূল (সঃ) তো তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

৫২। এই ভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছেঃ তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ!

٥٢- كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

٥٣- اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

৫৩। তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

٥٤- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ○

৫৪। অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এতে তুমি অপরাধী হবে না।

٥٥- وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।

٥٦- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

৫৬। আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এই জন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।

٥٧- مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○

৫৭। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে।

٥٨- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

৫৮। আল্লাহ্ই তো রিযক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

٥٩- فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ○

৫৯। যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম-মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্যে আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

٦٠- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ○ ع

৬০। কাফিরদের জন্যে দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের, যেই দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! এই কাফিররা যা বলছে তা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্ববর্তী কাফিররাও নিজ নিজ যুগের রাসূলদেরকে একথাই বলেছিল। কাফিরদের এই উক্তিই ক্রমান্বয়ে চলে আসছে। যেন তারা পরস্পর এই অসিয়তই করে গিয়েছে। সত্য কথা তো এটাই যে, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। এ জন্যেই এদের পূর্ববর্তীদের মুখ দিয়ে যে কথা বের হয়েছিল ঐ কথাই এদের মুখ দিয়েও বের হচ্ছে। কেননা, শক্ত অন্তরের দিক দিয়ে এরা সবাই একই। সুতরাং তুমি এদের কথা চোখ বুঁজে সহ্য করে যাও। এরা তোমাকে পাগল বলছে, যাদুকর বলছে, তুমি তাদের এসব কথার উপর ধৈর্যধারণ করতে থাকো। হ্যাঁ, তবে উপদেশের তাবলীগ চালিয়ে যাও, এটা ছেড়ে দিয়ো না। আল্লাহ পাকের বাণী তাদের কাছে পৌঁছাতে থাকো। যাদের অন্তরে ঈমান কবূল করে নেয়ার মাদ্দা রয়েছে তারা একদিন না একদিন অবশ্যই সত্যের পথে আসবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি দানব ও মানবকে আমার নিজের কোন প্রয়োজনের জন্যে সৃষ্টি করিনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুধু এজন্যে যে, তাদের নিজেদেরই লাভ ও উপকারের জন্যে তাদেরকে আমার ইবাদত করার নির্দেশ দান করবো। আর করেছিও তাই। তারা যেন সন্তুষ্টচিত্তে অথবা বাধ্য হয়ে আমাকে প্রকৃত মা'বূদ মেনে নেয়। তারা যেন আমার পরিচয় লাভ করে।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, কতক ইবাদত উপকার পৌঁছিয়ে থাকে, আবার কতক ইবাদতে মোটেই কোন উপকার হয় না। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ -

অর্থাৎ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবেঃ 'আল্লাহ'।" (৩৯ : ৩৮) তাহলে যদিও এটাও একটি ইবাদত, তথাপি মুশরিকদের এই উত্তর তাদের কোন উপকারে আসবে না। মোটকথা, ইবাদতকারী সবাই, ঐ ইবাদত তাদের জন্যে উপকারী হোক বা নাই হোক।

হযরত যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঈমানদার মানব ও দানবকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নিম্নরূপ পড়িয়েছেনঃ

اِنِّیۡ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُوالۡقُوَّۃِ الۡمَتِیۡنُ ۔

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি রিযকদাতা ও প্রবল পরাক্রান্ত।”[১] মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যারা তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলূক সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় তাঁর পূর্ণ মুখাপেক্ষী। তারা তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও দরিদ্র। তিনি একাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আহার্যদাতা।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতে লেগে পড়, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্য ও অমুখাপেক্ষিতা দ্বারা পূর্ণ করে দিবো এবং তোমার দারিদ্রকে দূর করবো। আর যদি তুমি এরূপ না কর তবে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করবো এবং তোমার দরিদ্রতাকে কখনো বন্ধ করবো না।”[২]

হযরত খালিদ (রাঃ)-এর হযরত হিব্বাহ (রাঃ) ও হযরত সাওয়াহ (রাঃ) নামক দুই পুত্র বর্ণনা করেনঃ “একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই। ঐ সময় তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন অথবা তিনি দেয়াল তৈরী করছিলেন কিংবা কোন জিনিস মেরামত করছিলেন। আমরাও তাঁকে ঐ কাজে সাহায্য করি। কাজ শেষ হলে তিনি আমাদের জন্যে দু'আ করেন এবং বলেনঃ “তোমাদের মাথা নড়া পর্যন্ত তোমরা রিযক হতে নিরাশ হয়ো না। দেখো, মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মাতা তাকে একটা লাল গোশত-খণ্ড রূপে প্রসব করে, দেহের উপর কোন আবরণ থাকে না, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সবকিছুই দান করেন এবং তাকে রিযক দিয়ে থাকেন।”[৩]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন আসমানী কিতাবে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি, সুতরাং তুমি তাতে অবহেলা করো না। তোমার রিয্কের যামিন আমিই। তুমি তাতে অযথা কষ্ট করো না। তুমি আমাকে তালাশ কর, পাবে। যদি তুমি আমাকে পেয়ে যাও তবে বিশ্বাস রেখো যে, তুমি সব কিছুই পেয়ে গেলে। আর যদি আমাকে না পাও তবে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, তুমি সমস্ত কল্যাণ হারিয়ে ফেলেছো। জেনে রেখো যে, তোমার অন্তরে আমারই প্রেম সর্বাধিক থাকা চাই।"

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ এই কাফিররা কেন আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে? এ শাস্তি তো নির্ধারিত সময়ে তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের উপর আপতিত হয়েছিল। যে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে ঐ দিন তাদের জন্যে হবে বড়ই দুর্ভোগের দিন।

সূরা ঃ যারিয়াত -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ তূর মাক্কী

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৪৯, রুকূ' ঃ ২)

(اٰيَاتُهَا : ٤٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) বলেনঃ "আমি মাগরিবের নামাযে নবী (সাঃ)-কে সূরায়ে তূর পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুমিষ্ট সুর বিশিষ্ট উত্তম কিরআতকারী লোক আমি একটিও দেখিনি।"[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "হজ্বের সময় আমি রুগ্না হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি আমাকে বলেনঃ "তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে জনগণের পিছনে পিছনে তাওয়াফ করে নাও।" সুতরাং আমি সওয়ারীর উপর বসে তাওয়াফ করলাম। ঐ সময় নবী (সঃ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক কোণে নামায পড়ছিলেন এবং وَالطُّوْرِ. وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ-এর তিলাওয়াত করছিলেন।"[২]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। শপথ তূর পর্বতের,

١- وَالطُّوْرِ ۙ

২। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে

٢- وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ

৩। উন্মুক্ত পত্রে;

٣- فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ

৪। শপথ বায়তুল মা'মূরের,

٤- وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ

৫। শপথ সমুন্নত আকাশের,

٥- وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ

৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের-

٦- وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ

৭। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

٧- اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ

৮। এর নিবারণকারী কেউ নেই।

٨- مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ

৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে।

٩- يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক তাঁর 'মুআ'ত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠- وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ○

১০। এবং পর্বত চলবে দ্রুত।

١١- فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

১১। দুর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদের–

١٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ○

১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

١٣- يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ○

১৩। সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে,

١٤- هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

১৪। এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

١٥- اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ○

১৫। এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখছো না?

١٦- اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৬। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।

যেগুলো আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও মহাশক্তির নিদর্শন সেগুলোর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তাঁর শাস্তি অবশ্যই আসবে। যখন তাঁর শাস্তি আসবে তখন কারো ক্ষমতা নেই যে, তা প্রতিরোধ করতে পারে।

যে পাহাড়ের উপর গাছ থাকে ঐ পাহাড়কে 'তূর' বলে। যেমন ঐ পাহাড়টি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং যেখান হতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। আর শুষ্ক পাহাড়কে 'জাবাল' বলা হয়। এটাকে 'তূর' বলা হয় না।

كتب مسطور দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'লাওহে মাহফূয' বা রক্ষিত ফলক। অথবা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবতারিত ও লিখিত কিতাব সমূহকে বুঝানো

রয়েছে যেগুলো মানুষের সামনে পাঠ করা হয়। এ জন্যেই এর পরেই বলা হয়েছেঃ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ অর্থাৎ 'উন্মুক্ত পত্রে'।

'বায়তুল মা'মূর' এর ব্যাপারে মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সপ্তম আকাশ হতে সামনে অগ্রসর হওয়ার পর আমাকে বায়তুল মা'মূর দেখানো হয় যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে থাকেন। দ্বিতীয় দিনও এই সংখ্যকই ফেরেশতাদের সমাবেশ সেখানে ঘটে থাকে। কিন্তু প্রথম দিন যাঁদের সমাবেশ হয়, কিয়ামত পর্যন্ত আর তাঁদের পালা পড়বে না। ভূ-পৃষ্ঠে যেমন কা'বা শরীফের তাওয়াফ হয়ে থাকে তেমনই বায়তুল মা'মূর হলো আকাশবাসীদের তাওয়াফ ও ইবাদতের জায়গা।" ঐ হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মা'মূরের সাথে কোমর লাগিয়ে বসে থাকতে দেখেন। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই রয়েছে যে, যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর হাতেই তা নির্মিত হয়েছে সেই হেতু সেখানেও তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর সাথে লেগে থাকতে দেখতে পান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে তাঁর আমলেরই অনুরূপ প্রতিদান দিলেন। এই বায়তুল মা'মূর কা'বা শরীফের ঠিক উপরে রয়েছে। আর ওটা রয়েছে সপ্তম আকাশের উপর। এমন তো প্রতিটি আকাশে এমন একটি ঘর রয়েছে যেখানে ঐ আকাশের ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে থাকেন। প্রথম আকাশে এরূপ যে ঘরটি রয়েছে ওটাকে বলা হয় বায়তুল ইয্যত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "সপ্তম আকাশে একটি ঘর রয়েছে যাকে মা'মূর বলা হয়, যা কা'বার দিকে রয়েছে। চতুর্থ আকাশে একটি নহর আছে যার নাম হাইওয়ান। তাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রত্যহ ডুব দিয়ে থাকেন এবং উঠে দেহ ঝেড়ে থাকেন। ফলে তাঁর দেহ হতে সত্তরটি বিন্দু ঝরে পড়ে। প্রত্যেক বিন্দু হতে আল্লাহ তা'আলা এক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তাঁরা যেন বায়তুল মা'মূরে গিয়ে নামায আদায় করেন। তারপর তাঁরা সেখান হতে বেরিয়ে আসে। অতঃপর আর তাঁদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ ঘটে না। তাঁদের একজন নেতা থাকেন যাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন তাঁদেরকে নিয়ে কোন

জায়গায় দাঁড়িয়ে যান। তারপর তাঁরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে থাকেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের এই ব্যস্ততাই থাকে।"[১]

হযরত খালিদ ইবনে আরআরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "বায়তুল মা'মূর কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ওটা আকাশে রয়েছে। ওটাকে সুরাহ বলা হয়। কা'বার ঠিক উপরে ওটা রয়েছে। যমীনের কা'বা যেমন মর্যাদা সম্পন্ন স্থান, অনুরূপভাবে ওটা আসমানে মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। প্রত্যহ তাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে থাকেন। কিন্তু একদিন যাঁরা তাতে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আর তাঁদের সেখানে যাওয়ার পালা পড়বে না। কেননা, ফেরেশতা অসংখ্য রয়েছেন।"[২] একটি রেওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এই প্রশ্নকারীর নাম ছিল ইবনুল কাওয়া (রাঃ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বায়তুল মা'মূর আরশের পাদদেশে রয়েছে।

একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "বায়তুল মা'মূর কি তা তোমরা জান কি?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন তিনি বললেনঃ "ওটা হলো আসমানী কা'বা। ওটা যমীনী কা'বার ঠিক উপরে রয়েছে। যদি ওটা পড়ে যায় তবে যমীনের কা'বার উপরই পড়বে। ওতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে থাকেন। এক দল যখন ওটা হতে বের হন তখন কিয়ামত পর্যন্ত আর তাঁরা সেখানে ফিরে যান না।

যহহাক (রঃ) বলেন যে, এই ফেরেশতাগুলো ইবলীস গোত্রের জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

'সমুন্নত ছাদ' দ্বারা আকাশকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا

অর্থাৎ "আমি আকাশকে রক্ষিত ছাদ করেছি।"(২১ঃ ৩২)

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা খুবই গারীব হাদীস। এর বর্ণনাকারী রাওহ্ ইবনে সবাহ এতে একাকী রয়েছেন। হাফিযদের একটি দল তাঁর উপর এ হাদীসটিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জাওযাজানী (রঃ), আকীল (রঃ), হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নীশাপুরী (রঃ) প্রমুখ। হাকিম (রঃ) হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাবী' ইবনে আনাস (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 'আরশ'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ওটা সমস্ত মাখলূকের ছাদ স্বরূপ। এই উক্তির ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আ'ম বা সাধারণ।

بَحْرٌ مَسْجُوْر বা উদ্বেলিত সমুদ্র দ্বারা ঐ পানি উদ্দেশ্য যা আরশের নীচে রয়েছে। ওটা বৃষ্টির মত বর্ষিত হবে যার দ্বারা কিয়ামতের দিন মৃতরা পুনর্জীবন লাভ করে নিজ নিজ কবর হতে উত্থিত হবে। জমহূর বলেন যে, এর দ্বারা সাধারাণ সমুদ্র উদ্দেশ্য।

এটাকে بَحْرٌ مَسْجُوْر বলার কারণ এই যে, কিয়ামতের দিন এতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ "সমুদ্র যখন স্ফীত হবে।" (৮১ঃ ৬) অর্থাৎ যখন তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং ওটা ছড়িয়ে গিয়ে সারা হাশরের মাঠকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

হযরত আ'লা ইবনে বদর (রঃ) বলেনঃ এটাকে উদ্বেলিত সমুদ্র বলার কারণ এই যে, ওর পানি পানের অযোগ্য হয়ে যাবে। ওটাকে জমিতে দেয়াও চলবে না। কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলোর অবস্থা এরূপই হবে। এর অর্থ 'প্রবাহিত সমুদ্র'ও করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলোঃ পরিপূর্ণ সমুদ্র, যার পানি এদিকে ওদিকে প্রবাহিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَسْجُوْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খালি বা শূন্য। কোন দাসী পানি আনতে যায়, অতঃপর ফিরে এসে বলেঃ اِنَّ الْحَوْضَ مَسْجُوْرٌ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই চৌবাচ্ছা শূন্য।" এটাও বলা হয়েছেঃ এর অর্থ এই যে, এটাকে যমীন হতে থামিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন ডুবিয়ে না দেয়।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রতি রাত্রে সমুদ্র তিন বার করে আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে যে, সমস্ত মানুষকে ডুবিয়ে দেয়ার যেন তাকে হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে থামিয়ে দেন।"[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি, যিনি একজন মুজাহিদ ছিলেন এবং সমুদ্রের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থানকারী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণে সেখানে অবস্থান করছিলেন, তিনি বলেনঃ "একদা রাত্রে আমি পাহারার উদ্দেশ্যে বের হই। ঐ রাত্রে অন্য কোন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রহরী ছিল না। আমি টহল দিতে দিতে ময়দানে পৌঁছি। সেখান হতে আমি সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এরূপ মনে হয় যে, সমুদ্র যেন পর্বতের চূড়ার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। বার বার এই দৃশ্যই আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি ঘটনাটি হযরত আবূ সালেহ (রঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি আমাকে শুনিয়ে দেন।"[১]

যে বিষয়ের উপর এসব শপথ করা হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা নিশ্চিত রূপেই আসবে এবং যখন তা এসে পড়বে তখন ওর নিবারণকারী কেউই হবে না।

হাফিয আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাত্রে হযরত উমার (রাঃ) শহরের অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে বের হন। একজন মুসলমানের বাড়ীর পার্শ্বদিয়ে গমনকালে তিনি দেখতে পান যে, লোকটি নামায পড়ছেন এবং সূরায়ে তূর পাঠ করছেন। তখন তিনি সওয়ারী থামিয়ে দিয়ে কুরআন শুনতে শুরু করেন। লোকটি যখন পড়তে পড়তে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ "কা'বার প্রতিপালকের শপথ! এ কথা সত্য।" অতঃপর তিনি স্বীয় গাধার উপর হতে নেমে পড়েন এবং দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। চলাফেরার শক্তি তাঁর থাকলো না। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর যখন তিনি শক্তি ফিরে পেলেন তখন বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের কালামের এই ভীতিপূর্ণ আয়াত তাঁর উপর এমন ক্রিয়াশীল হলো যে, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় থাকলেন। জনগণ তাঁকে দেখতে আসতো, কিন্তু তিনি কি রোগে ভুগছেন তা তারা জানতে পারতো না। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হযরত আবূ উবায়েদ (রঃ) ফাযায়িলুল কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত উমার (রাঃ) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ـ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ-এই আয়াতগুলো পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর হেঁচকী বন্ধ হয়ে যায় এবং এটা তাঁর অন্তরে এমন ক্রিয়াশীল হয় যে, তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ দিন পর্যন্ত জনগণ তাঁকে দেখতে আসতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঐ দিন আকাশ আন্দোলিত হবে এবং ফেটে যাবে ও ঘুরতে শুরু করবে। আর পর্বত দ্রুত চলতে থাকবে। ওটা নিজ স্থান হতে সরে যাবে, এদিক হতে ওদিক চলে যাবে, কাঁপতে কাঁপতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে

১. এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অস্পষ্ট রয়েছেন, যাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এবং ধুনো তূলার মত এদিক-ওদিক উড়তে থাকবে। এভাবে ওটার কোন নাম ও নিশানা থাকবে না। ঐ দিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হবে, যারা ক্রীড়াস্থলে আসার কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকে। আল্লাহর শাস্তি, ফেরেশতাদের মার এবং জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যে হবে যারা দুনিয়ায় মগ্ন ছিল। যারা দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে নির্ধারণ করে নিয়েছিল। সেই দিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে বলবেনঃ "এটা ঐ অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।" তারপর আরো ধমকের সুরে বলা হবেঃ "এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছো না? যাও, তোমরা এতে প্রবেশ কর। এটা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তোমরা এখন ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। কোনক্রমেই তোমরা এখান হতে বের হতে পারবে না। এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যুলুম নয়, বরং তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।

১৭। মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে,

١٧- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍ ○

১৮। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে,

١٨- فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

১৯। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাকো।

١٩- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২০। তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হূরের সঙ্গে।

٢٠- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, তারা ঐ সব শাস্তি হতে রক্ষা পাবে যেসব শাস্তি হতভাগ্যদেরকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে

সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। সেখানে তারা উন্নতমানের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। সেখানে তাদের জন্যে সর্ব প্রকারের ভোগ্যবস্তু, নানা প্রকারের সুখাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের সুপেয় পানীয়, উন্নত মানের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাল ভাল সওয়ারী, সুউচ্চ অট্টালিকা এবং সব রকমের নিয়ামতরাশি প্রস্তুত রয়েছে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের ভয়-ভীতি থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাকো। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْـًٔا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

অর্থাৎ "তোমরা পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।"(৬৯ ঃ ২৪)

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।' হযরত হায়সাম ইবনে মালিক তাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "মানুষ বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে এভাবে আরামে বসে থাকবে, তার নড়াচড়া বা উঠবার কোনই প্রয়োজন হবে না। যা তার মনে চাইবে এবং যাতে তার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে তাই তার কাছে এসে যাবে।"[১]

হযরত সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, জান্নাতে মানুষ সত্তর বছর পর্যন্ত বালিশে হেলান দিয়ে আরামে বসে থাকবে। তার কাছে পরমা সুন্দরী হূরীগণ বিদ্যমান থাকবে। তারা তার মনের চাহিদা মেটাবে। বহু খাদেম তার খিদমতের জন্যে তার চারদিকে ঘোরা ফেরা করবে। অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে সে ডুবে থাকবে। সত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন সে অন্য দিকে ঘুরবে তখন সে সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্য দেখতে পাবে। সে এমন হূরদেরকে দেখতে পাবে যাদেরকে পূর্বে কখনো দেখেনি। তারা তাকে বলবেঃ "আমরা আপনার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ যে, আপনার দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়েছে।" মোটকথা, এভাবে মন মাতানো ও প্রাণ ভুলানো নিয়ামতরাশির মধ্যে তারা নিমগ্ন থাকবে।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ مَصْفُوفَةٍ অর্থাৎ তাদের একের মুখ অপরের মুখের দিকে থাকবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ "তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।"(৩৭ ঃ ৪৪)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হূরের সঙ্গে। অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে রাখবো উত্তম সঙ্গিনী ও সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে আয়ত-লোচনা হূরদের মধ্য হতে। আর মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আমি আয়ত-লোচনা হূরদের সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দিবো। এদের গুণাবলী সম্বলিত হাদীসগুলো কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওগুলোর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

২১। এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।

২১ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

২২। আমি তাদেরকে দিবো ফল-মূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে।

٢٢- وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

২৩। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না।

٢٣- يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ○

২৪। তাদের সেখানে নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।

٢٤- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○

২৫। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে	٢٥- وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○
২৬। এবং বলবেঃ পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।	٢٦- قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○
২৭। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।	٢٧- فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ○
২৮। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।	٢٨- اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ○ ع

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ফযল ও করম এবং স্নেহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মুমিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের অনুসারী হয়, কিন্তু সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য হয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের পার্শ্বে দেখে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরীরাও যেন পূর্বসূরীদের পার্শ্বে থাকতে পেরে সুখী হতে পারে। মুমিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে তা নয়, বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হতে তা দান করবেন। এই বিষয়ের একটি মারফূ' হাদীসও আছে।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সেখানে পাবে না তখন তারা আরয করবেঃ "হে আল্লাহ! তারা কোথায়?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তারা তোমাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি।" তারা তখন বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো নিজেদের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে নেক আমল করেছিলাম!" তখন মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে এদেরকেও ওদের সমমর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যেসব সন্তান ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে তো তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত শা'বী (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), হযরত ইবরাহীম (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত আবূ সালেহ (রঃ), হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ) এবং হযরত যহহাকও (রঃ) একথাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-কে তাঁর ঐ দুই সন্তানের অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা জাহেলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তারা দু'জন জাহান্নামে রয়েছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দুঃখিতা হতে দেখে বলেনঃ "তুমি যদি তাঁদের বাসস্থান দেখতে তবে অবশ্যই তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে।" হযরত খাদীজা (রাঃ) পুনরায় বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়?" জবাবে তিনি বলেনঃ "জান্নাতে।" তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "নিশ্চয়ই মুমিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে এবং মুশরিকরা ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ .... এ- আয়াতটি পাঠ করেন।[১] এতো হলো পিতাদের আমলের বরকতে পুত্রদের মর্যাদার বর্ণনা। এখন পুত্রদের দু'আর বরকতে পিতাদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হঠাৎ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবেঃ "হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়ার কারণ কি?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ "তোমাদের সন্তানরা তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই আমি তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি।"[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির ইসনাদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ শব্দগুলোর দ্বারা এভাবে বর্ণিত হয়নি।

তিনটি আমলের সওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়াহ। (দুই) দ্বীনী ইলম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। (তিন) সৎ সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্যে দু'আ করতে থাকে।"[১]

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুমিনদের সন্তানরা আমলহীন হলেও তাদের আমলের বরকতে তাদের সন্তানদের মর্যাদাও তাদের সমপর্যায়ে আনয়ন করা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কাউকেও অন্য কারো আমলের কারণে পাকড়াও করা হবে না, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী থাকবে। পিতার পাপের বোঝা পুত্রের উপর এবং পুত্রের পাপের বোঝা পিতার উপর চাপানো হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ـ اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ـ فِىْ جَنّٰتٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ـ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা নয়, তারা থাকবে উদ্যানে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে– অপরাধীদের সম্পর্কে।"(৭৪ঃ ৩৮-৪১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তাদেরকে দিবো ফলমূল এবং গোশ্ত যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। এটা পানে তারা অজ্ঞান হবে না। এতে তারা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করবে। এটা পান করে তারা আবোল তাবোল বকবে না এবং পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে না। দুনিয়ার মদের অবস্থা এই যে, যারা এটা পান করে তাদের মাথায় চক্কর দেয়, জ্ঞান লোপ পায় এবং বক্‌বক্ করে বকতে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় এবং চেহারার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। কিন্তু জান্নাতের মদ এসব বদ অভ্যাস হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। এর রঙ সাদা ও পরিষ্কার। এটা সুপেয়। এটা পানে কেউ অজ্ঞানও হবে না এবং বাজে কথা বকবেও না। এতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনাই নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ـ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ـ

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ “শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।”(৩৭ঃ ৪৬-৪৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ـ

অর্থাৎ “সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে না।”(৫৬ঃ ১৯)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ـ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ـ

অর্থাৎ “তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা পান-পাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ-নিসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।”(৫৬ঃ ১৭-১৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে অর্থাৎ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে। তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবেঃ পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। আজকের দিনের শাস্তি সম্পর্কে আমরা সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। পূর্বেও আমরা তাঁকেই আহ্বান করতাম। তিনি আমাদের দু'আ কবূল করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে তার (মুমিন) ভাইদের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা করবে, আর ওদিকে তার বন্ধুর মনেও তার সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগবে। অতঃপর দু'দিক হতে দু'জনের আসন উড়বে এবং পথে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটবে। তারা উভয়ে নিজ নিজ আসনে আরামে বসে থাকবে এবং পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে। তারা তাদের পার্থিব কাথাবার্তা বলবে। তারা একে অপরকে বলবেঃ “অমুক দিন অমুক জায়গায় আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করেছেন।”[১]

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

হযরত মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ـ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ এ আয়াত দু'টি পাঠ করে দু'আ করতেনঃ اَللّٰهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ اِنَّكَ اَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ـ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! নিশ্চয়ই আপনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।" হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আ'মাশ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তিনি কি নামাযে এই দু'আ করেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ।"[১]

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও।

٢٩- فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ○

৩০। তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি? আমরা তার জন্যে কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।

٣٠- اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ○

৩১। বলঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

٣١- قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ○

৩২। তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

٣٢- اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

৩৩। তারা কি বলেঃ এই কুরআন তাঁর নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী।

٣٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩৪। তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না।

٣٤- فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ○

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর রিসালাত তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছাতে থাকেন। সাথে সাথে দুষ্ট লোকেরা তাঁকে যে দোষে দোষী করছে তা হতে তাঁকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। কাহেন বা গণক ঐ ব্যক্তিকে বলে যার কাছে মাঝে মাঝে কোন জ্বিন কোন খবর পৌঁছিয়ে থাকে। তাই আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি উপদেশ দান করতে থাকো। তোমার প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও।

এরপর কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, তারা বলেঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) একজন কবি ছাড়া কিছুই নন। তিনি ইন্তেকাল করলে কেই বা তাঁর মত হবে এবং কেই বা তাঁর দ্বীন রক্ষা করবে? তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর দ্বীন বিদায় গ্রহণ করবে।" তাদের একথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও– তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। ভাল পরিণাম এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ কার হয় তা দুনিয়া শীঘ্রই জানতে পারবে।

দারুন নাদওয়াতে কুরায়েশরা পরামর্শ করে যে, অন্যান্য কবিদের মত মুহাম্মাদও (সঃ) একজন কবি। সুতরাং তাঁকে বন্দী করা হোক, যাতে তিনি সেখানে ধ্বংস হয়ে যান। যেমন পরিণাম হয়েছিল কবি যুহায়ের ও কবি নাবেগার, অনুরূপ পরিণাম তাঁরও হবে। তখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তবে কি তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এরা বড়ই হঠকারী, উদ্ধত এবং বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হিংসা ও শত্রুতার কারণেই তারা জেনে শুনে নবী (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করছে। তারা বলে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ (সঃ) স্বয়ং রচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। কিন্তু তাদের কুফরী তাদের মুখ দিয়ে এই মিথ্যা কথা বের করছে। তারা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয় তবে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না! এই কাফির কুরায়েশরা শুধু নয়, বরং যদি তাদের সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত জ্বিন এবং মানুষও যোগ দেয় তবুও তারা এই কুরআনের অনুরূপ কিতাব পেশ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। গোটা কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও কিয়ামত পর্যন্ত তারা আনতে পারবে না।

৩৫। তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?

٣٥- اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

৩৬। না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী।

٣٦- اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

৩৭। তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা?

٣٧- اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

৩৮। না কি তাদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!

٣٨- اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩৯। তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্যে এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে?

٣٩- اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

৪০। তবে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে?

٤٠- اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?

٤١- اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪২। অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

٤٢- اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

৪৩। না কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র।	٤٣- اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এখানে রবূবিয়্যাত ও তাওহীদে উলূহিয়্যাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেনঃ তারা কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? প্রকৃতপক্ষে এ দু'টোর কোনটাই নয়। বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। পূর্বে তারা কিছুই ছিল না। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) বলেনঃ "আমি নবী (সঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরায়ে তূর পড়তে শুনি। যখন তিনি اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন আমার অন্তর উড়ে যাবার উপক্রম হয়।"[১] এই জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর নবী (সঃ)-এর নিকট বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। এই আয়াতগুলোর শ্রবণই তাঁর ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? না, এটাও নয়। বরং তারা জানে যে, স্বয়ং তাদের ও সমস্ত সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এটা জানা সত্ত্বেও তারা তাদের অবিশ্বাস হতে বিরত থাকছে না।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কি তাদের হাতে আছে, না তারা সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক? তারাই সারা মাখলূকের রক্ষক? না, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং মালিক ও ব্যবস্থাপক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ উঁচু আকাশে উঠে যাওয়ার কোন সিঁড়ি তাদের কাছে আছে না কি? যদি থেকে থাকে তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে কথা শুনে আসে সে তার কথা ও কাজের কোন আসমানী দলীল পেশ করুক না কেন? কিন্তু না তারা কোন দলীল পেশ করতে পারে, না তারা কোন সত্য পথের অনুসারী।

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটাও তাদের একটা বড় অন্যায় কথা যে, তারা বলেঃ ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা (নাঊযুবিল্লাহ্)। এটা কতই না জঘন্য ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্যে যে কন্যাদেরকে অপছন্দ করে তাদেরকেই আবার স্থির করে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে! তারা যখন শুনতে পায় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন দুঃখে ও লজ্জায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অথচ ঐ কন্যাদেরকেই তারা সাব্যস্ত করছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্যে! শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের ইবাদতও করছে! তাই তো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ অত্যন্ত ধমকের সুরে বলছেনঃ তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্যে এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে?

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তবে কি তুমি তোমার তাবলীগী কাজের উপর তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা তাদের উপর ভারী হচ্ছে? অর্থাৎ নবী (সঃ) তো তাঁর তাবলীগী কাজের উপর কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না! তাহলে তাদের কাছে তাঁর আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াতে তাদের অসন্তুষ্ট হবার কারণ কি? না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে? না, না, যমীন ও আসমানের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কেউই অদৃশ্যের খবর রাখে না। এই লোকগুলো আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলে স্বয়ং রাসূল (সঃ)-কে, মুমিনদেরকে এবং সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায়। কাফিরদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? কেন তারা আল্লাহর ইবাদতে প্রতিমা ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করছে? আল্লাহ তা'আলা তো মুশরিকদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট। তারা যাকে শরীক স্থির করে তিনি তা হতে পবিত্র।

৪৪। তারা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবেঃ এটা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।

٤٤- وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○

৪৫। তাদেরকে উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।

٤٥- فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○

৪৬। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।	٤٦- يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا و لاهم ينصرون ○
৪৭। এ ছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে যালিমদের জন্যে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।	٤٧- وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون ○
৪৮। ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছো। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।	٤٨- واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ○
৪৯। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্ত গমনের পর।	٤٩- ومن اليل فسبحه وادبار النجوم ○ ع

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের ঔদ্ধত্য, জিদ ও হঠধর্মীতে এতো বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবে না। তারা যদি দেখতে পায় যে, আকাশের কোন টুকরা শাস্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর শাস্তির সত্যতা স্বীকার করবে না। বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, যা পানি বর্ষাবার জন্যে আসছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ـ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ـ

অর্থাৎ "যদি আমি তাদের জন্যে আকাশের কোন দরযা খুলেও দিই এবং তারা সেখানে আরোহণও করে তবে তখনো তারা অবশ্যই বলবেঃ আমাদের

নযরবন্দী করা হয়েছে, বরং আমরা যাদুকৃত হয়েছি।" (১৫ঃ ১৪-১৫) অর্থাৎ তারা যে মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে তা যদি তাদেরকে দেখিয়ে দেয়াও হয়, এমন কি যদি তাদেরকে আকাশে উঠিয়ে নেয়াও হয় তথাপি তারা কোন কথা বানিয়ে নিয়ে ওটাকে অস্বীকার করে বসবে। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সাঃ)! তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই জানতে পারবে। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না। সেদিন তারা চালাক-চাতুরী সব ভুলে যাবে। আজ তারা যাদেরকে আহ্বান করছে এবং নিজেদের সাহায্যকারী মনে করছে, ঐ দিন তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। এমন কেউ হবে না যে তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে। তারা এদের পক্ষ থেকে কোন ওযরও পেশ করতে পারবে না।

তাদেরকে যে শুধু কিয়ামতের দিনই শাস্তি দেয়া হবে এবং এখানে তারা আরামে ও শান্তিতে থাকবে তা নয়, বরং এই দুর্বৃত্তদের জন্যে ওর পূর্বে দুনিয়াতেও শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

অর্থাৎ "গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে।"(৩২ঃ ২১)

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। অর্থাৎ তারা যে দুনিয়াতেও ধৃত হবে তা তারা জানে না। এই অজ্ঞতাই তাদেরকে এ কাজে উত্তেজিত করে যে, তারা পাপের উপর পাপ এবং যুলুমের উপর যুলুম করতে থাকে, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হয় এবং তারা শিক্ষাগ্রহণ করে। কিন্তু যখনই বিপদ কেটে যায় তখনই আবার তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। কোন কোন হাদীসে আছে যে, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত উটের মত। উটকে কেন বাধা হয় এবং খোলা হয় তা যেমন সে জানে না বা বুঝে না, অনুরূপভাবে মুনাফিককে কেন রোগগ্রস্ত করা হয় এবং কেন সুস্থ রাখা হয় তা সে জানে না।

আসারে ইলাহীতে রয়েছেঃ "আমি কতবার তোমার অবাধ্যাচরণ করবো এবং তুমি আমাকে শাস্তি দিবে না?" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি কতবার তোমাকে নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য দান করেছি যার তুমি খবরই রাখো না।"

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাদের দুর্ব্যবহারে ও কষ্ট প্রদানে মনক্ষুণ্ন হয়ো না। তাদের পক্ষ হতে কোন বিপদে পড়ার তুমি মোটেই ভয় করো না। জেনে রেখো যে, তুমি আমার হিফাযতে রয়েছো।

আমি সব সময় তোমাকে দেখছি। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার। সমস্ত শত্রু হতে তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমারই উপর ন্যস্ত।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।' এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করা হয়েছেঃ 'যখন তুমি নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তখন তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।' দ্বিতীয় ভাবার্থঃ 'যখন রাত্রে জাগ্রত হবে তখন তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করবে।' দু'টো ভাবার্থই সঠিক।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী (সঃ) নামায শুরু করেই পাঠ করতেনঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য, আপনার নাম কল্যাণ ও বরকতময়, আপনার মর্যাদা সমুচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।"[১]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম হতে জেগে নিম্নের কালেমাটি পাঠ করেঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই ও প্রশংসাও তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লারই জন্যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, পাপকার্য হতে ফিরার ও পুণ্যকার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।" এটা পাঠ করার পর সে ক্ষমা প্রার্থনাই করুক বা কিছু যাঞ্চা করুক, আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে থাকেন। তারপর সে যদি দৃঢ় সংকল্প করে এবং অযু করে নামাযও আদায় করে তবে ঐ নামাযও কবূল করা হয়।"[২]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি রয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও সুনান গ্রন্থসমূহেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার হুকুম প্রত্যেক মজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময়ই রয়েছে। হযরত আবুল আহওয়াস (রঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, কেউ কোন মজলিস হতে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তার নিম্নলিখিত কালেমাটি পাঠ করা উচিতঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি।"

হযরত আবূ রাবাহ্ (রঃ) বলেন যে, যদি ঐ মজলিসে ভাল কথা আলোচিত হয় তবে তো পুণ্য আরো বেড়ে যাবে। আর যদি অন্য কিছু আলোচিত হয় তবে এই কালেমা ওর কাফ্ফারা হয়ে যাবে অর্থাৎ পাপ মোচনের কারণ হবে।[১]

হযরত আবূ উসমান ফাকীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে শিক্ষা দেন যে, যখন তিনি কোন মজলিস হতে উঠে যাবেন তখন যেন পাঠ করেনঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবা করছি।" এর বর্ণনাকারী হযরত মা'মার (রঃ) বলেনঃ 'আমি এও শুনেছি যে, এই কালেমা ঐ মজলিসের কাফ্ফারা হয়ে যায়।'[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে ও বহুকিছু বাক-বিতণ্ডা করে, অতঃপর ঐ মজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -এই কালেমাটি পাঠ করে, তাহলে ঐ মজলিসে যা কিছু (ভুল-ত্রুটি) হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।"[৩]

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আব্দুর রায্যাক (রঃ) তাঁর জামে' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এটা মুরসাল হাদীস। কিন্তু মুস্তানাদ বহু হাদীসও এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যার সনদগুলো একে অপরকে সবল করে থাকে।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম (রঃ) এ হাদীসটিকে স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে রিওয়াইয়াত করার পর বলেন যে, এর সনদ ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এতে ইল্লাত বের করেছেন। আমি বলি যে, ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ হাতিম (রাঃ), ইমাম আবূ যারআহ্ (র), ইমাম দারকুতনী (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণও এটাকে মা'লূল বলেছেন এবং অহাম বা সন্দেহের সম্পর্ক ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর দিকে করেছেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি সুনানে আবি দাউদে যে সনদে বর্ণিত হয়েছে তাতে ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর নামই নেই।

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর শেষ বয়সে যে মজলিস হতে উঠে যেতেন সেখানে উপরোক্ত কালেমা পাঠ করতেন। এটা দেখে একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আপনি ইতিপূর্বে তো এটা পাঠ করতেন না (সুতরাং এখন পড়ার কারণ কি)?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "মজলিসে যা কিছু (দোষ-ক্রটি) হয়, এই কালেমা ওর কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।"[১]

ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ "এই কালেমা এমনই যে, কেউ যদি এগুলোকে কোন মজলিস হতে উঠার সময় পড়ে নেয় তবে তার জন্যে এটা কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। ভাল মজলিস ও যিকরের মজলিসে এগুলো পড়লে তা মোহরের মত হয়ে যায়।"[২]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, আমি একটি পৃথক অংশে এই সমুদয় হাদীসকে, এগুলোর শব্দগুলোকে ও ওগুলোর সনদগুলোকে একত্রিত করেছি, ওর কারণগুলোও বর্ণনা করেছি এবং ওগুলোর সম্পর্কে যা কিছু লিখার ছিল সবই লিখে দিয়েছি।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে' অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে ও তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে রাত্রিকালে তাঁর ইবাদত ও যিক্‌র্‌ করতে থাকো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

অর্থাৎ "এবং রাত্রের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।"(১৭ঃ ৭৯)

'তারকার অস্তগমনের পর' দ্বারা ফজরের ফরয নামাযের পূর্বের দুই রাকআত নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তরকা যখন অস্তমিত হবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে তখন এই দুই রাকআত নামায পড়া হয়ে থাকে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছেঃ "তোমরা ঐ দুই রাকআত সুন্নাত নামায ছেড়ে দিয়ো না যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে দলিত করে।"[৩]

---

১. এ রিওয়াইয়াতটি মুরসাল সনদেও হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২. এটা সুনানে আবি দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর কতক অনুসারী এই দুই রাকআত সুন্নাত নামাযকে ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে নবী (সঃ) বলেছিলেনঃ "দিন ও রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয করা হয়েছে)।" প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করেনঃ "এ ছাড়া আমার উপর আর কিছু (ফরয) আছে কি?" জবাবে তিনি বলেনঃ "না, তবে তুমি নফল পড়তে পার।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফজরের দুই রাকআত নামাযের চেয়ে অন্য কোন নফল নামাযের বেশী পাবন্দী করতেন না।

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "ফজরের ফরয নামাযের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত নামায সারা দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।"

সূরা ঃ তূর -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ নাজম মাক্কী
(আয়াত ঃ ৬২, রুকূ' ঃ ৩)

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا: ٦٢، رُكُوْعَاتُهَا: ٣)

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সিজদা বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয় তা হলো এই আন্ নাজম সূরা। নবী (সঃ) সিজদা করেন এবং তাঁর পিছনে যত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন সবাই সিজদা করেন। শুধু একটি লোক তার মুষ্টির মধ্যে মাটি নিয়ে ওরই উপর সিজদা করে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "আমি দেখি যে, এরপর ঐ লোকটি কুফরীর অবস্থাতেই মারা যায়। ঐ লোকটি ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ।" কিন্তু এতে জটিলতা রয়েছে। তা এই যে, অন্য রিওয়াইয়াতে ঐ লোকটি উৎবা ইবনে রাবীআ নামে বর্ণিত হয়েছে।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা হয় অস্তমিত,

২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,

৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

৪। এটা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

١- وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○

٢- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○

٣- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○

٤- اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○

হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টবস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটারই কসম খেতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো কসম খেতে পারে না।"[১]

নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফজরের সময় সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা যুহ্‌রা নামক তারকা উদ্দেশ্য। যহ্‌হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওটা ঝরে গিয়ে শয়তানের দিকে ধাবিত হওয়া।

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ উক্তিটির ভাল ব্যাখ্যা হতে পারে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই বাক্যটির তাফসীর হলোঃ শপথ কুরআনের যখন তা অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটি হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলোর মতইঃ

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ - وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ - اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِیْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থাৎ "আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"(৫৬ ঃ ৭৫-৮০)

তারপর যে বিষয়ের উপর শপথ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, নবী (সঃ) পুণ্য, সততা ও হিদায়াতের উপর রয়েছেন। তিনি সত্যের অনুসারী। তিনি অজ্ঞতা বশতঃ কোন ভুল পথে পরিচালিত নন বা জেনে শুনে কোন বক্র পথের পথিক নন। পথভ্রষ্ট খৃষ্টান এবং জেনে শুনে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ইয়াহূদীদের মত চরিত্র তাঁর নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, ইলম অনুযায়ী তাঁর আমল, তাঁর পথ সোজা ও সরল, তিনি আযীমুশ্শান শরীয়তের আইন রচয়িতা এবং তিনি সত্য মধ্যম পথের উপর দণ্ডায়মান। তাঁর কোন কথা ও আদেশ তাঁর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে বিষয়ের তাবলীগের হুকুম করেন তা-ই তিনি তাঁর মুখ দিয়ে বের করেন। সেখান হতে যা কিছু বলা হয় সেটাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম বেশী করা হতে তাঁর কালাম পবিত্র।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "নবী নয় এই রূপ একজন লোকের শাফাআতের দ্বারা দু'টি গোত্র বা দু'টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্রের সংখ্যার সমান লোক জান্নাতে যাবে। গোত্র দু'টি হলো রাবীআহ ও মুযার।" তাঁর একথা শুনে একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রাবীআহ কি মুযারের অন্তর্ভুক্ত নয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি তো ওটাই বলছি যা আমি বলেছি।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। অতঃপর কুরায়েশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করে বললোঃ "তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনছো তার সবই লিখে নিচ্ছ, অথচ তিনি তো একজন মানুষ। তিনি কখনো কখনো ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন?" আমি তখন লিখা হতে বিরত থাকলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমাকে বললেনঃ "তুমি আমার কথাগুলো লিখতে থাকো। আল্লাহর শপথ! সত্য কথা ছাড়া আমার মুখ দিয়ে অন্য কোন কথা বের হয় না।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমি তোমাদেরকে যে খবর দিয়ে থাকি তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।"[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" তখন কোন একজন সাহাবী তাঁকে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো আমাদের সাথে রসিকতাও করে থাকেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তখনও আমি সত্য কথাই বলে থাকি (রসিকতার সময়েও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয় না)।"[৩]

৫। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,

٥- عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ○

৬। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল,

٦- ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ○

৭। তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে,

٧- وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ○

৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী।

٨- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ○

৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা ওরও কম।

٩- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি শায়বা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

١٠- فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ۝

১০। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।

١١- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝

১১। যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি।

١٢- اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝

১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে?

١٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۝

১৩। নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।

١٤- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝

১৪। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট,

١٥- عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝

১৫। যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।

١٦- اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝

১৬। যখন বৃক্ষটি, যদ্‌দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্‌দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,

١٧- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝

১৭। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।

١٨- لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝

১৮। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তাঁকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন (ফেরেশতা)। তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ـ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী, যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন।" (৮১ ঃ ১৯-২১) এখানেও বলা হয়েছে যে, তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) শক্তিশালী।

ذُوْ مِرَّةٍ -এর একটি তাফসীর উপরোক্ত রূপে করা হয়েছে। দ্বিতীয় তাফসীর এই যে, তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট। হাদীসেও مِرَّةٍ শব্দটি এসেছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাদকা ধনীর জন্যে ও সুস্থ-সবলের জন্যে হারাম।" এখানে لِذِىْ مِرَّةٍ শব্দ রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।' অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে ছিল, যেখান হতে সকাল হয়, যা সূর্য উদিত হওয়ার স্থান।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল রূপে বা আসল আকৃতিতে মাত্র দু'বার দেখেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে প্রকাশিত হন। আকাশের সমস্ত প্রান্ত তাঁর দেহে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার তাঁকে তাঁর দর্শন ছিল ঐ সময় যখন তাঁকে নিয়ে তিনি ঊর্ধ্বগগনে উঠে যান। وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই তাফসীরে এমন একটি উক্তি করেছেন যা অন্য কেউই করেননি। তিনি নিজেও এই উক্তির সম্বন্ধ অন্য কারো দিকে যুক্ত করেননি। তাঁর উক্তির সারমর্ম এই যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) উভয়েই ঊর্ধ্বগগনের প্রান্তসমূহে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আর এটা ছিল মি'রাজের ঘটনা। অন্য কেউই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর এই উক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। ইমাম সাহেব আরবী ভাষা হিসেবে এটাকে সাব্যস্ত করলেও এবং আরবী ব্যাকরণের দিক দিয়ে এটা হতে পারলেও এটা বাস্তবতা-বিরোধী উক্তি। কেননা, এটা মি'রাজের পূর্বের ঘটনা। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভূ-পৃষ্ঠেই ছিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে নেমে এসেছিলেন ও তাঁর নিকটবর্তী হয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি নিজের আসল আকৃতিতে ছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছিলেন। তাহলে এটা ছিল দ্বিতীয়বারের দেখা। কিন্তু প্রথমবারের দেখা তো ছিল রিসালাতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। প্রথম অহী ... اِقْرَاْ بِاسْمِ -এই সূরার কতকগুলো আয়াত তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়। তারপর অহী বন্ধ হয়ে যায়। এতে তিনি (নবী সঃ) খুবই দুঃখিত হন।

এমন কি কয়েকবার তিনি ইচ্ছা করেন যে, পাহাড়ের চূড়া হতে নীচে পড়ে যাবেন। কিন্তু সদা আকাশের দিক হতে তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর নিম্নের উক্তি শুনতে পেতেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি আল্লাহর প্রকৃত ও সত্য রাসূল এবং আমি জিবরাঈল।" এ শব্দ শুনে তাঁর দুঃখ দূর হয়ে যেতো। তিনি মনে প্রশান্তি লাভ করতেন। তারপর ফিরে আসতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতো এবং আল্লাহ তা'আলার অহীর স্বাদ তাঁর স্মরণে এসে যেতো। সুতরাং পুনরায় তিনি বেরিয়ে পড়তেন এবং পাহাড়ের চূড়া হতে নিজেকে ফেলে দিতে চাইতেন। আবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে প্রশান্তি ও সান্ত্বনা দান করতেন। শেষ পর্যন্ত একবার আবতাহ নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিজের প্রকৃত আকৃতিতে প্রকাশিত হন। তাঁর ছয়শটি ডানা ছিল। তাঁর দেহ আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলে। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটবর্তী হন এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর অহী তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মর্যাদা অনুভব করেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনি যে মহামর্যাদার অধিকারী তা জানতে পারেন।

মুসনাদে বায্যারের একটি রিওয়াইয়াত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পেশ করা যেতে পারে, কিন্তু ওর বর্ণনাকারী হলেন শুধু হারিস ইবনে উবায়েদ, যিনি বসরায় বসবাসকারী একজন প্রসিদ্ধ লোক। তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ কুদামাহ আয়াদী। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে রিওয়াইয়াত সমূহ এসেছে, কিন্তু ইমাম ইবনে মুঈন ওগুলোকে দুর্বল বলেছেন এবং বলেছেন যে, এগুলো কিছুই নয়। ইমাম আবূ হাতিম রাযীর (রঃ) উক্তি এই যে, তাঁর হাদীসগুলো লিখে নেয়া যাবে, কিন্তু ওগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে না। ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন যে, তিনি বড়ই সন্দেহযুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁর থেকে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, এ হাদীসটি শুধু তিনি রিওয়াইয়াত করেছেন। কাজেই এটা গারীব হওয়ার সাথে সাথে মুনকারও বটে। আর যদি এটা সাব্যস্ত হয়েও যায় তবে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা স্বপ্নের ঘটনা হবে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি বসেছিলাম এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন। তিনি আমার দুই কাঁধের মাঝে সজোরে হাত রাখেন এবং আমাকে দাঁড় করিয়ে দেন। আমি একটি গাছ দেখলাম, যাতে পাখীর বাসার মত দুটো বসার জায়গা বানানো রয়েছে। একটাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বসলেন এবং অপরটিতে আমি বসলাম।

অতঃপর গাছটি উঁচু হতে শুরু করলো, এমনকি আমি আকাশের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। আমি ডানে-বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলাম। আমি ইচ্ছা করলে হাত বাড়িয়ে আকাশ স্পর্শ করতে পারতাম। আমি দেখলাম যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঐ সময় আল্লাহর ভয়ে অত্যন্ত জড়সড় হয়ে পড়েছেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর মর্যাদা ও তাজাল্লীর জ্ঞানে আমার উপর তাঁর ফযীলত রয়েছে। আকাশের দরযাসমূহের মধ্যে একটি দরযা আমার সামনে খুলে গেল। আমি খুব বড় আযীমুশ্মান নূর দেখলাম এবং দেখলাম যে, পর্দার পাশে মণি-মুক্তা দুলছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা যা অহী করার ইচ্ছা তা করলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শটি পালক ছিল। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে ফেলছিল। ওগুলো হতে পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার জন্যে তাঁর কাছে আবেদন জানান। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেনঃ "আপনি এ জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। ওটা দেখেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর মুখের থুথু মুছিয়ে দেন।

ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লাহাব এবং তার পুত্র উৎবাহ সিরিয়ার সফরে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তার পুত্র উৎবাহ তাকে বললোঃ "সফরে গমনের পূর্বে একবার আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে তার সামনে তার প্রতিপালককে গালমন্দ দিয়ে আসি?" অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি তো (তোমার প্রতিপালকের) 'অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা ওরও কম' এ উক্তিকে অস্বীকার করি।" তার একথা শুনে নবী (সঃ) তার প্রতি বদদু'আ করে বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনার কুকুরগুলোর মধ্যে একটি কুকুরকে তার উপর নির্ধারণ করুন।" সে ফিরে গিয়ে তার পিতার সামনে যখন ঘটনাটি বর্ণনা করলো তখন তার পিতা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবূ লাহাব তাকে বললোঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! এখন তো আমি তোমার জীবনের ব্যাপারে আতংকিত হয়ে পড়লাম! তার দু'আ তো অগ্রাহ্য হয় না।" এরপর তারা যাত্রা শুরু করে দিলো। ঐ যাত্রীদল সিরিয়ায় পৌঁছে একজন আবেদের ইবাদতখানার পার্শ্বে শিবির স্থাপন করলো। আবেদ তাদেরকে বললেনঃ "এখানে তো নেকড়ে বাঘ বকরীর পালের মত চলাফেরা করে থাকে। তোমরা এখানে কেন আসলে?" এ কথা শুনে আবূ লাহাবের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তাই যাত্রীদলের সমস্ত লোককে একত্রিত করে সে বললোঃ "দেখো, আমার বার্ধক্যের অবস্থা তোমাদের জানা আছে এবং তোমাদের উপর আমার কি প্রাপ্য রয়েছে সেটাও তোমাদের অজানা নেই। এখন আমি তোমাদের কাছে একটা আবেদন করছি এবং আশা করছি যে, সেটা তোমরা কবূল করবে। তা এই যে, নবুওয়াতের দাবীদার লোকটি আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রের উপর বদদু'আ করেছে। সুতরাং আমি আমার এই পুত্র উৎবার জীবনের ভয় করছি। তোমরা তোমাদের সমস্ত আসবাব পত্র এই ইবাদতখানার পার্শ্বে জমা করে রাখো এবং ওর উপর আমার এই পুত্রকে শয়ন করিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা সবাই ওর চতুর্দিকে পাহারা দাও।" যাত্রীদল তার এ আবেদন মঞ্জুর করলো। তারা সবাই খুব সতর্ক থাকলো, ইতিমধ্যে সিংহ এসে পড়লো এবং সবারই মুখ শুঁকতে লাগলো। কিন্তু যাকে সে চায় তাকে পেলো না। অতঃপর সে খুব জোরে লাফ দিয়ে ঐ আসবাব পত্রের উপর চলে গেল এবং উৎবার মুখ শুঁকলো। তাকেই যেন সে চেয়েছিল। সুতরাং সে তাকে ফেড়ে টুকরা টুকরা করে দিলো। ঐ সময় আবূ লাহাব বলে উঠলোঃ "আমার পূর্ব হতেই এটা বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বদদু'আর পর আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা পেতে পারে না।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'অতঃপর সে (হযরত জিবরাঈল আঃ) তার (হযরত মুহাম্মাদ সঃ-এর) নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা ওরও কম।" এখানে أَوْ শব্দটি যার খবর দেয়া হচ্ছে ওকে সাব্যস্ত করা ও ওর উপর যা অতিরিক্ত হবে তা অস্বীকার করার জন্যে এসেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً অর্থাৎ "বরং ওর চেয়েও বেশী কঠিন।" (২ঃ ৭৪) অর্থাৎ পাথর হতে কম শক্ত কোন অবস্থাতেই নয়, বরং শক্ততে পাথরের চেয়েও বেশী। আর এক জায়গায় আছেঃ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً অর্থাৎ "তারা মানুষকে এমন ভয় করে যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয়, বরং এর চেয়েও বেশী ভয়।" অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

وارسلنه إلى مِائَةِ الفٍ او يزيدون ـ

অর্থাৎ "আমি তাকে এক লক্ষ লোকের নিকট পাঠিয়েছিলাম অথবা এর চেয়েও বেশী লোকের নিকট।" (৩৭ ঃ ১৪৭) অর্থাৎ তারা এক লক্ষের চেয়ে কমতো ছিলই না, বরং প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ ছিল অথবা ওর চেয়ে বেশীই ছিল। সুতরাং او এখানে খবরের সত্যতা প্রকাশের জন্যে এসেছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্যে নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খবর সন্দেহের সাথে বর্ণিত হতেই পারে না। এই নিকটে আগমনকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ), যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবূ যার (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) উক্তি করেছেন। এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোও আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আনয়ন করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অন্তরে তাঁর প্রতিপালককে দুই বার দেখেছেন। একবারের দেখার বর্ণনা .... ثُمَّ دَنَا -এই আয়াতে রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত মি'রাজের হাদীসে রয়েছেঃ "অতঃপর রাব্বুল ইযযত নিকটবর্তী হন ও নীচে আসেন।" আর একারণেই মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং কতকগুলো বিস্ময়কর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যদি ওগুলো সত্যও হয় তবে ওগুলোকে অন্য সময় ও অন্য ঘটনার উপর স্থাপন করা হবে, ওগুলোকে এই আয়াতের তাফসীর বলা যেতে পারে না। এটা তো ঐ সময়ের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। মি'রাজের রাত্রির ঘটনা এটা নয়। কেননা, ওর বর্ণনার পরেই বলেছেনঃ

ولقد راه نزلة اخرى ـ عِند سِدرةِ المنتهى

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।" সুতরাং এই সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখাতো মি'রাজের ঘটনা, আর প্রথমবারের দেখা ছিল পৃথিবীর উপর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) فكان قاب قوسين او ادنى -এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলাম, তাঁর ছয়শ'টি পাখা ছিল।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় স্বপ্নে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেন। অতঃপর তিনি তাঁর (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্যে বের হন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে মুহাম্মাদ (সঃ)!' বলে ডাক দেন। এ ডাক শুনে তিনি তাঁর ডানে-বামে তাকান, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাননি। তিন বার এরূপই ঘটে। তৃতীয়বারে তিনি উপরের দিকে তাকালে দেখতে পান যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর দুই পায়ের এক পাকে অপর পায়ের সাথে মোড়িয়ে আকাশের প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! (ভয়ের কোন কারণ নেই) আমি জিবরাঈল (আঃ), আমি জিবরাঈল (আঃ)।" কিন্তু নবী (সঃ) ভয় পেয়ে পালিয়ে যান এবং লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপর তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন ও উপরের দিকে তাকিয়ে ঐ দৃশ্যই দেখতে পান। আল্লাহ তা'আলার وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى হতে ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى পর্যন্ত উক্তিগুলোর মধ্যে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।"[১] قَابَ অঙ্গুলির অর্ধেক ভাগকেও বলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, দুই হাতের ব্যবধান ছিল। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর দেহের উপর দুই রেশমী পোশাক ছিল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।' এর ভাবার্থ তো এই যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নিকট অহী নাযিল করলেন। অথবা ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অহী নাযিল করলেন। উভয় অর্থই সঠিক।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, ঐ সময়ের অহী ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলোঃ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا (৯৩ঃ ৬) এবং وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (৯৪ঃ ৪) অর্থাৎ "তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?" এবং "আর আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।" অন্য কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় নবী (সঃ)-এর প্রতি অহী করেনঃ "নবীদের উপর জান্নাত হারাম যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ কর এবং উম্মতদের উপর জান্নাত হারাম যে পর্যন্ত না তোমার উম্মত তাতে প্রবেশ করে।"

১. এটা ইবনে আহাব (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি তাঁকে অন্তরে দুইবার দেখেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) দর্শনকে মুতলাক বা সাধারণ রেখেছেন। অর্থাৎ অন্তরের দর্শনই হোক অথবা প্রকাশ্য চোখের দর্শনই হোক। সম্ভবতঃ এই অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অন্তরেই দেখেছিলেন। যেসব মনীষী চোখের দর্শনের কথা বলেছেন তাঁরা একটা গারীব উক্তি করেছেন। কেননা, সাহাবীগণ (রাঃ) হতে এ ব্যাপারে কোন কিছু সঠিকভাবে বর্ণিত হয়নি। ইমাম বাগাভী (রঃ) বলেন যে, একটি জামাআত চোখের দর্শনের দিকে গিয়েছেন। যেমন হযরত আনাস (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত ইকরামা (রাঃ)। কিন্তু তাঁদের এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন।" তখন হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননিঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

অর্থাৎ "কোন চক্ষু তাঁকে পেতে পারে না এবং তিনি সমস্ত চক্ষুকে পেয়ে থাকেন।" (৬ ঃ ১০৩) উত্তরে তিনি বলেনঃ "এটা ঐ সময় যখন তিনি তাঁর নূরের পূর্ণ তাজাল্লী প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুইবার স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন।"[১]

হযরত শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরাফায় হযরত কা'ব (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে একটা প্রশ্ন করেন যা তাঁর কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমরা বানু হাশিম।" তখন হযরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও তাঁর কালাম হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে দুইবার কথা বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দুইবার স্বীয় দর্শন দেন।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

একদা হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন?" উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি এমন কথা বলেছ যে, একথা শুনে আমার দেহের লোম খাড়া হয়ে গেছে।" তখন হযরত মাসরূক (রাঃ) বলেনঃ "হে উম্মুল মুমিনীন! কুরআন কারীমে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

অর্থাৎ "সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন বলেনঃ "তুমি কোথায় যাচ্ছ? এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দর্শন করা বুঝানো হয়েছে। যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন বা তিনি আল্লাহ তা'আলার কোন কথা গোপন করেছেন অথবা নিম্নের বিষয়গুলোর কোন একটা তিনি জানেনঃ (এক) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? (দুই) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে ও কি পরিমাণ বর্ষিত হবে? (তিন) পেটে পুত্র সন্তান আছে কি কন্যা সন্তান আছে? (চার) কে আগামী কাল কি করবে? (পাঁচ) কে কোথায় মারা যাবে? সে বড়ই মিথ্যা কথা বলেছে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন। দুইবার তিনি আল্লাহর এই বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং আরেকবার দেখেছিলেন আজইয়াদে। তাঁর ছয়'শটি পাখা ছিল এবং আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছিলেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছো যে, বন্ধুত্ব ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে, কালাম ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে এবং দীদার (দর্শন) ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্যে?"[১]

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন। উত্তরে তিনি বললেনঃ "তিনি তো নূর (জ্যোতি), সুতরাং কি করে আমি তাঁকে দেখতে পারি?"[২] অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি নূর দেখেছি।"

১. এটা ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি আমার অন্তরে আমার প্রতিপালককে দুইবার দেখেছি।" অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى অর্থাৎ "যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তো তা অস্বীকার করেনি।"[১]

নবী (সঃ)-এর কোন একজন সাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?" জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি তাঁকে আমার চক্ষু দ্বারা দেখিনি, অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى অর্থাৎ "অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী।"[২]

হযরত ইবাদ ইবনে মানসূর (রাঃ) হযরত ইকরামা (রাঃ)-কে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى -এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে বলেনঃ "নবী (সঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন কি না তাই কি তুমি আমার কাছে জানতে চাচ্ছ?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ।" তিনি তখন বলেনঃ "হ্যাঁ, তিনি তাঁকে দেখেছেন।" হযরত ইবাদ (রাঃ) তখন হযরত হাসান (রাঃ)-কে এ প্রশ্নই করলে তিনি জবাবে বলেনঃ "তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঔজ্জ্বল্য ও বড়ত্বের চাদর দেখেছিলেন।"

হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "আপনি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?" জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি নহর দেখেছি, নহরের পিছনে পর্দা দেখেছি এবং পর্দার পিছনে নূর দেখেছি। এ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিনি।"[৩]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে দেখেছি।"[৪]

এ হাদীসটি স্বপ্নের হাদীসের একটি অংশ বিশেষ। সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আজ রাত্রিতে স্বপ্নে আমার প্রতিপালক অত্যন্ত উত্তম আকৃতিতে আমার নিকট এসেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতারা কি বিষয়ের উপর আলোচনা করছে তা কি তুমি

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)।

৩. এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব।

৪. এ হাদীসটির ইসনাদ সহীহ এর শর্তের উপর রয়েছে।

জান?” আমি আরয করলামঃ না, আমি জানি না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতখানা আমার দুই কাঁধের মাঝে রেখে দেন যার শীতলতা আমি আমার বক্ষে অনুভব করি। অতঃপর যমীন ও আসমানের সমস্ত কিছু আমি জেনে ফেলি। এরপর পুনরায় আমার প্রতিপালক আমাকে উপরোক্ত প্রশ্ন করেন। আমি তখন উত্তরে বলিঃ এখন আমি জানতে পারছি। তাঁরা পরস্পর ঐ সৎকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছেন যা গুনাহকে মিটিয়ে দেয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে বলেনঃ “আচ্ছা, তাহলে বল তো গুনাহ মিটিয়ে দেয় ঐ পুণ্য কর্মগুলো কি কি?” আমি জবাবে বললামঃ নামায শেষে মসজিদে বসে থাকা, জামাআতের জন্যে (মসজিদের দিকে) চলা এবং কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণভাবে অযু করা। যে এরূপ করবে সে উত্তমরূপে জীবন যাপন করবে, মঙ্গলের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যাবে যে, আজই যেন সে দুনিয়ায় এসেছে বা আজই যেন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে। ঐ সময় মহান আল্লাহ আমাকে বলেনঃ ‘হে মুহাম্মাদ (সঃ)! ‘যখন তুমি নামায পড়বে তখন নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَنِیْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ـ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভাল কাজ করার, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার এবং মিসকীনদেরকে ভালবাসবার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আর যখন আপনি আপনার বান্দাদেরকে ফিৎনায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন তখন আমাকে ফিৎনায় ফেলার পূর্বেই আপনার নিকট উঠিয়ে নিবেন (এই প্রার্থনা করছি)।” আর মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমলগুলো হলোঃ খাদ্য খাওয়ানো, ইসলাম ছড়িয়ে দেয়া এবং লোকদের নিদ্রার অবস্থায় রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়া।”

এরই অনুরূপ রিওয়াইয়াত সূরায়ে সোয়াদের তাফসীরের শেষে গত হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ রিওয়াইয়াতটি অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে বহু গারাবাত রয়েছে। তাতে কাফফারার বর্ণনায় রয়েছেঃ জুমআর নামাযের জন্যে চলার পদক্ষেপ এবং এক নামায শেষে অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষমান থাকা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আপনার বন্ধু বানিয়েছেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে করেছেন আপনার কালীম (কথোপকথনকারী)। আর এরা এটা বলেছেন ও করেছেন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ "আমি কি তোমার বক্ষ খুলে দিইনি? তোমার বোঝা কি আমি অপসারণ করিনি? এবং অমুক অমুক অনুগ্রহ কি তোমার উপর করিনি?" অন্যান্য আরো অনুগ্রহ ও ইহসানের কথা তিনি বললেন যেগুলো তোমাদের সামনে বলার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়নি।" এরই বর্ণনা ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ـ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ـ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ـ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى -এই আয়াতগুলোতে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখের জ্যোতি আমার অন্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি তাঁকে আমার অন্তর দ্বারা দেখেছি।"[১]

উপরে উৎবা ইবনে আবি লাহাবের একথা বলাঃ "এই নিকটে আগমনকারীকে আমি স্বীকার করি না" এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তার উপর বদদু'আ করা এবং পরে সিংহের তাকে ফেড়ে ফেলার বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনাটি যারকা অথবা সুরাতে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সে এভাবে ধ্বংস হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জিবরাঈল (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মি'রাজের রাত্রির ঘটনা। মি'রাজের হাদীসগুলো খুবই বিস্তারিতভাবে সূরায়ে বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলোর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। এ বর্ণনাও গত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দীদার লাভের উক্তিকারী। পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় একটি জামাআতের উক্তিও এটাই। অন্যান্য সাহাবীদের বহু দল এই উক্তির বিপরীত মত পোষণকারী। অনুরূপভাবে তাবেয়ী ও অন্যান্য গুরুজনও এর উল্টো মত পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর পাখাসহ দর্শন ইত্যাদি রিওয়াইয়াত সমূহও উপরে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাসরূক (রাঃ)-এর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা এবং তাঁর উত্তর দেয়ার ঘটনাও এখনই বর্ণিত হলো।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে উম্মুল মুমিনীন! হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কি তাঁর মহিমান্বিত প্রতিপালককে দেখেছেন?" উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেছে। তুমি কোথায় রয়েছো?" অর্থাৎ তুমি কি কথা বললে? জেনে রেখো যে, এই তিনটি কথা যে তোমাকে বলে সে মিথ্যা কথা বলেঃ (এক) যে তোমাকে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে" অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

১. এর ইসনাদ দুর্বল।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

অর্থাৎ "কোন চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি চক্ষুগুলোকে পেয়ে যান।" (৬ ঃ ১০৩) আরো পাঠ করলেনঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ـ

অর্থাৎ "অহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া কোন মানুষের সাথে আল্লাহর কথা বলা সম্ভব নয়।" (৪২ ঃ ৫১) এরপর তিনি বলেনঃ (দুই) "যে তোমাকে খবর দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আগামীকালের খবর জানেন সে মিথ্যা বলে।" অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না যে, আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।"(৩১ঃ ৩৪) তারপর তিনি বলেনঃ (তিন) "আর যে তোমাকে খবর দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) (আল্লাহ তা'আলার কথা কিছু) গোপন করে সে মিথ্যাবাদী।" অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

অর্থাৎ "হে রাসূল (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা তুমি পৌঁছিয়ে দাও।" (৫ ঃ ৬৭) এরপর তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন।"[১]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করেনঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ـ অর্থাৎ "অবশ্যই সে তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে।"(৮১ঃ ২৩) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ـ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।" তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এই আয়াতগুলো সম্পর্কে আমিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "এর দ্বারা আমার হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দর্শন বুঝানো হয়েছে।" তিনি মাত্র দুইবার আল্লাহর এই বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার তাঁর আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছিলেন। ঐ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাঁকা জায়গা তাঁর দেহে পূর্ণ ছিল।"[১]

মুসনাদে আহমাদেই রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ) হযরত আবূ যার (রাঃ)-কে বলেনঃ "আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতাম তবে অবশ্যই তাঁকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।" তাঁর একথা শুনে হযরত আবূ যার (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "তুমি তাঁকে কি জিজ্ঞেস করতে?" জবাবে হযরত শাকীক (রঃ) বলেনঃ "তিনি মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে দেখেছিলেন কি না তা জিজ্ঞেস করতাম।" তখন হযরত আবূ যার (রাঃ) তাঁকে বলেন, আমি তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেনঃ "আমি নূর দেখেছিলাম। তিনি তো নূর, সুতরাং কি করে আমি তাঁকে দেখতে পারি?"[২] হযরত আহমাদ (রঃ) বলেনঃ "এই হাদীসের ব্যাখ্যা যে কি করবো তা আমার বোধগম্য হয় না।"

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্তর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন, চক্ষু দ্বারা নয়। ইমাম ইবনে খুযাইয়া (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ) ও হযরত আবূ যার (রাঃ)-এর মাঝে ইনকিতা বা বিয়োগ রয়েছে (অর্থাৎ তাঁদের দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি)। ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন যে, সম্ভবতঃ হযরত আবূ যার (রাঃ) এই প্রশ্ন মি'রাজের ঘটনার পূর্বে করেছিলেন এবং ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই উত্তর দিয়েছিলেন। এই প্রশ্ন যদি তাঁকে মি'রাজের ঘটনার পরে করা হতো তবে অবশ্যই তিনি ঐ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলতেন, অস্বীকার করতেন না। কিন্তু এই উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে দুর্বল। কেননা, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রশ্ন তো ছিল মি'রাজের পরের ঘটনা। ঐ সময়েও রাসূলুল্লাহ (সঃ) অস্বীকৃতি সূচক উত্তর দিয়েছিলেন।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে।

২. সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি দু'টি সনদে বর্ণিত হয়েছে। সনদ দু'টির শব্দগুলোর মধ্যে কিছু হেরফের রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী ছিল কিংবা এই যে, তাঁর এটা ভুল ধারণা ছিল। যেমন ইবনে খুযাইমা (রঃ) কিতাবুত তাওহীদের মধ্যে এটাই লিখেছেন, এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আনাস (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলাকে অন্তর দ্বারা দেখেছিলেন, চক্ষু দ্বারা নয়। তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে স্বীয় চক্ষু দ্বারা দুই বার তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। সিদরাতুল মুনতাহায় ঐ সময় বহু সংখ্যক ফেরেশতা ছিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর উপর আল্লাহর নূর চমকাচ্ছিল। আর তিনি বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গে রঞ্জিত ছিলেন যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যমীন হতে যে জিনিস উপরে উঠে যায় তা এখান পর্যন্ত উঠে। তারপর ওটাকে এখান হতে উঠিয়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অবতারিত হয় তা এখান পর্যন্তই পৌঁছে। তারপর এখান হতে ওটাকে নামিয়ে নেয়া হয়। ঐ সময় ঐ গাছের উপর সোনার ফড়িং পরিপূর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এখান হতে তিনটি জিনিস দান করা হয়। (এক) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (দুই) সূরায়ে বাকারার শেষের আয়াতগুলো এবং (তিন) তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা মুশরিক নয় তাদের পাপরাশি ক্ষমাকরণ।[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) অথবা অন্য সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন গাছকে কাকসমূহ যেমনভাবে ঘিরে নেয় ঠিক তেমনিভাবে সিদরাতুল মুন্তাহার উপর ফেরেশতাগণ ছেয়ে গিয়েছিল। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পৌঁছলে তাঁকে বলা হয়ঃ "যা যাচ্ঞা করার তা যাচ্ঞা করুন।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ঐ গাছের শাখাগুলো ছিল মণি-মাণিক্য, ইয়াকূত ও যবরজদের। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা দেখেন এবং স্বীয় অন্তর চোখে তিনি আল্লাহ তা'আলাকেও দর্শন করেন।

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সিদরাতুল মুনতাহায় আপনি কি দেখেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ঐ গাছকে সোনার ফড়িংগুলো ঘিরেছিল এবং প্রত্যেক পাতার উপর একজন করে ফেরেশ্তা দাঁড়িয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছিল।" তাঁর দৃষ্টি ডানে বামে যায় না। যে জিনিস দেখার নির্দেশ ছিল ওরই প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। স্থিরতা ও পূর্ণ আনুগত্যের এটা পুরো দলীল যে, তাঁর উপর যে হুকুম ছিল তাই তিনি পালন করেছেন এবং ওটা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কোন কবি কতইনা চমৎকার কথা বলেছেনঃ

رَأَى جَنَّةَ الْمَاوٰى وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ * رَأَى غَيْرُهُ مَا قَدْ رَاٰهُ لَاتَّهَا

অর্থাৎ "তিনি জান্নাতুল মাওয়া এবং ওর উপরে যা রয়েছে তা দেখেছেন, তিনি যা দেখেছেন তা যদি অন্য কেউ দেখতো তবে সে তা অবশ্যই নিয়ে আসতো।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى অর্থাৎ "সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى

অর্থাৎ "যেন আমি তোমাকে আমার মহান নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করি।" (২০ঃ ২৩) এগুলো আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ আয়াত দু'টিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেননি। কেননা, মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শনগুলো দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতেন তবে ঐ দর্শনেরই উল্লেখ করা হতো। আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হতো।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্তি গত হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী দ্বিতীয়বার আকাশে উঠার সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখানো হয়। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন মহামহিমান্বিত আল্লাহকে খবর দেন তখন তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে পরিবর্তিত করে দেয়া হয় এবং তিনি সিজদা আদায় করেন। সুতরাং সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার দেখার দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখাই উদ্দেশ্য।[১]

১. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে এবং এটা গারীব রিওয়াইয়াত।

١٩- أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ○

১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে

٢٠- وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ○

২০। এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?

٢١- أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ○

২১। তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে?

٢٢- تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

২২। এই প্রকার বন্টন তো অসঙ্গত।

٢٣- إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى ○

২৩। এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসেছে।

٢٤- أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ○

২৪। মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?

٢٥- فَلِلّٰهِ الْآخِرَةُ وَالْأُوْلٰى ○

২৫। বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।

٢٦- وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضٰى ○

২৬। আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলোতে মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা প্রতিমাগুলোকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং যেমনভাবে আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর ঘর নির্মাণ করেছেন তেমনিভাবে তারা নিজেদের বাতিল মা'বূদগুলোর জন্যে ইবাদতখানা বানিয়েছে।

লাত ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। ওর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। ওর উপর তারা গেলাফ উঠিয়েছিল। ওর জন্যে তারা খাদেম, রক্ষক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল। ওর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারাম শরীফের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতো। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। সাকীফ গোত্র এর উপাসক ছিল। তারাই ছিল এর মুতাওয়াল্লী। কুরায়েশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আরব গোত্রের উপর তারা নিজেদের গৌরব প্রকাশ করতো।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো আল্লাহ শব্দ হতে লাত শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে। তারা যেন একে স্ত্রী লিঙ্গ রূপে ব্যবহার করেছিল। আল্লাহ তা'আলার সত্তা সমস্ত শরীক হতে পবিত্র।

একটি কিরআতে لَاتّ শব্দটির ت অক্ষরটি তাশদীদের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ পানি দ্বারা মিশ্রিতকারী। ওকে لَاتّ এই অর্থে বলার কারণ এই যে, সে একটি সৎলোক ছিল। হজ্বের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান করাতো। তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কবরের খিদমত করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার ইবাদতের প্রচলন শুরু হয়। অনুরূপভাবে عُزّٰى শব্দটি عَزِيْزٌ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত 'নাখলা' নামক স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল। ওর উপরও গম্বুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হতো। কুরায়েশরা ওর খুবই সম্মান করতো। আবূ সুফিয়ানও (রাঃ) উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেনঃ "আমাদের উয্যা আছে এবং তোমাদের (মুসলমানদের) উয্যা নেই।" এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ আমাদের মাওলা এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি (ভুলক্রমে) লাত ও উয্যার কসম খেয়ে ফেলবে সে যেন তৎক্ষণাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নেয়। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলবেঃ 'এসো, আমরা জুয়া খেলি।' সে যেন সাদকা করে।"[১] ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগে

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু এ ধরনের কসম খাওয়া হতো, সেই হেতু ইসলাম গ্রহণের পরেও যদি কারো মুখ দিয়ে পূর্বের অভ্যাস হিসেবে এ শব্দগুলো বেরিয়ে পড়ে তবে তার কালেমা পড়ে নেয়া উচিত।

এমনিভাবে একদা হযরত সা'দ ইবনে আবি অক্কাস (রাঃ) লাত ও উয্যার কসম খেয়ে বসেন। জনগণ তাঁকে সতর্ক করলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেন, তুমি নিম্নের কালেমাটি পাঠ করঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।' তারপর তিনবার পাঠ করঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এরপর বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলো এবং ভবিষ্যতে আর এরূপ করো না।[১]

মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে কাদীদের পার্শ্বে মুসাল্লাল নামক স্থানে মানাত ছিল। অজ্ঞতার যুগে খুযাআহ, আউস ও খাযরাজ গোত্র ওর খুব সম্মান করতো। এখান হতে ইহরাম বেঁধে তারা কা'বার হজ্বের জন্যে যেতো। অনুরূপভাবে এই তিনটি মূর্তি ছাড়া আরো বহু মূর্তি ও থান ছিল আরবের লোকেরা যেগুলোর পূজা করতো। কিন্তু এই তিনটির খুব খ্যাতি ছিল বলে এখানে শুধু এই তিনটিরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঐ লোকগুলো এই জায়গাগুলোর তাওয়াফও করতো। তারা তথায় কুরবানীর জন্তুগুলো নিয়ে যেতো এবং তাদের নামে ওগুলোকে কুরবানী করতো। এতদসত্ত্বেও কিন্তু তারা কা'বা শরীফের মর্যাদার কথা স্বীকার করতো। ওটাকে তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মসজিদ বলে বিশ্বাস করতো এবং ওর খুবই সম্মান করতো।

সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, কুরায়েশ ও বানু কিনানাহ গোত্র উয্যার পূজারী ছিল যা ছিল নাখলায়। ওর রক্ষক ও মুতাওয়াল্লী ছিল বানু শায়বান গোত্র। ওটা ছিল সালীম গোত্রের শাখা। বানু হাশিমের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল।

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) ঐ মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেনঃ

يَاعُزَّى كُفْرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ * اِنِّيْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَدْ اَهَانَكِ

অর্থাৎ "হে উয্‌যা! আমি তোমাকে অস্বীকার করছি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি না। আমি দেখছি যে, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।" ওটা বাবলার তিনটি গাছের উপর ছিল। গাছগুলোকে কেটে ফেলা হয়। গম্বুজকেও ভেঙ্গে ফেলা হয়। অতঃপর হযরত খালিদ (রাঃ) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি কিছুই করনি। আবার যাও।" তখন হযরত খালিদ (রাঃ) পুনরায় গেলেন। তথাকার রক্ষক ও খাদিমরা বড় বড় কৌশল অবলম্বন করলো। তারা খুব চীৎকার করে 'হে উয্‌যা! হে উয্‌যা!' বলে ডাক দিলো। হযরত খালিদ (রাঃ) দেখলেন যে, একটি উলঙ্গ নারী রয়েছে, যার চুলগুলো এলোমেলো, আর সে তার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করছে। হযরত খালিদ (রাঃ) তরবারী দ্বারা তাকে শেষ করে ফেলেন। তারপর ফিরে গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, ওটাই ছিল উয্‌যা।[১]

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল তায়েফের অধিবাসী। ওর মুতাওয়াল্লী ও খাদেম ছিল বানু মু'তাব। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) ও হযরত আবূ সুফিয়ান সাখ্‌র ইবনে হারব (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তাঁরা ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ওর স্থলে মসজিদ নির্মাণ করেন।

মানাত ছিল আউস, খাযরাজ এবং তাদের ন্যায় মত পোষণকারী ইয়াসরিববাসী অন্যান্য লোকদের মূর্তি। ওটা মুসাল্লালের দিকে সমুদ্র তীরবর্তী কাদীদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ওকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। কারো কারো মতে ঐ কুফরিস্তান ধ্বংস হয় হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে।

যুলখালসা ছিল দাউস, খাশআম, বাজীলাহ এবং তাদেরই দেশস্থ আরবীয় অন্যান্য লোকদের বুতখানা। ওটা ছিল তাবালায় অবস্থিত এবং ঐ লোকগুলো ওটাকে কা'বায়ে ইয়ামানিয়্যাহ বলতো। আর মক্কার কা'বাকে তারা বলতো

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কা'বায়ে শামিয়্যাহ। ওটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে হযরত জারীর ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ)-এর হাতে ধ্বংস হয়।

কাল্‌স ছিল তাই গোত্র এবং তাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য আরবীয়দের বুতখানা। ওটা সালমা ও আজ্জার মধ্যস্থিত তাই পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওটাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেখান হতে দু'টি তরবারী নিয়ে যান। একটির নাম রাসূব এবং অপরটির নাম মুখযিম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তরবারী দু'টি তাঁকেই দিয়ে দেন।

হুমায়ের গোত্র এবং ইয়ামনবাসী সানআ নামক স্থানে তাদের বুতখানা নির্মাণ করেছিল। ওটাকে রাইয়াম বলা হতো। কথিত আছে যে, ওর মধ্যে একটি কালো কুকুর ছিল। দুই জন হুমাইরী, যারা তুব্বার সঙ্গে বের হয়েছিল, তারা ঐ কুকুরটিকে বের করে হত্যা করে দেয় এবং ঐ বুতখানাকে ধ্বংস করে ফেলে।

বানু রাবীআহ ইবনে সা'দের বুতখানাটির নাম ছিল রিযা। ওটাকে মুসতাওগার ইবনে রাবীআহ্ ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইসলামে ভেঙ্গে ফেলেন। ইবনে হিশাম (রাঃ) বলেন যে, তাঁর বয়স ৩৩০ (তিনশ ত্রিশ) বছর হয়েছিল, যার বর্ণনা তিনি স্বয়ং তাঁর কবিতার মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

সানদাদ নামক স্থানে বকর, তাগলিব এবং আয়াদ গোত্রের একটি দেবমন্দির ছিল যাকে যুলকা'বাত বলা হতো।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে?' কেননা এই মুশরিকরা নিজেদের বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো। (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন করতে বস তখন যদি কাউকেও শুধু কন্যা দাও এবং কাউকেও শুধু পুত্র দাও তবে যাকে শুধু কন্যা দেয়া হবে সে কখনো এতে সম্মত হবে না এবং এই প্রকার বন্টনকে অসঙ্গত বন্টন মনে করা হবে। অথচ তোমরা আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করছো কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্যে সাব্যস্ত করছো পুত্র সন্তান! এই প্রকার বন্টন তো খুবই বে-ঢংগা ও অসঙ্গত!

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা প্রকৃতপক্ষে মা'বূদও নয় এবং তারা কোন পবিত্র নামের হকদারও নয়। এ

লোকগুলো নিজেরাও ঐ দেবতাদের উপাসনা করার উপর কোন দলীল পেশ করতে সক্ষম হবে না। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে তারা যা করতো তাই করছে মাত্র। তারা মাছির উপর মাছি মেরে চলছে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসে গেছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করছে না। এটা চরম পরিতাপের বিষয়ই বটে।

মহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? সে যে বলে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে, তবে সে কি বাস্তবিকই সত্যের উপর রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে? তারা যতই লম্বা চওড়া দাবী করুক না কেন, তাদের দাবী দ্বারাই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের কেউ কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তখন সে কিসের আকাঙ্ক্ষা করছে তা যেন চিন্তা করে। কারণ সে জানে না যে, তার ঐ আকাঙ্ক্ষার জন্যে তার জন্যে কি লিখা হবে।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।' দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনিই করে থাকেন। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।' অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বড় ও মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাও কারো জন্যে সুপারিশের কোন শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" (২ ঃ ২৫৫) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ـ

অর্থাৎ "তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কারো জন্যে কারো সুপারিশ উপকারী হবে না।" (৩৪ ঃ ২৩) সুতরাং বড় বড় নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের যখন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এই অবস্থা, তখন হে নির্বোধের দল! তোমাদের পূজনীয় এই মূর্তি ও থানগুলো তোমাদের কি উপকার করতে পারে? তাদের উপাসনা করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এটা করেছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাসূলের ভাষায় এবং তাঁর সমুদয় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে।

২৭। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই নারী বাচক নাম দিয়ে থাকে ফেরেশতাদেরকে।

٢٧- إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ○

২৮। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।

٢٨- وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ○

২৯। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সে তো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে।

٢٩- فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

৩০। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।

٣٠- ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ○

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এই উক্তি খণ্ডন করছেন যে, আল্লাহর ফেরেশতারা তাঁর কন্যা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "রহমানের (আল্লাহর) বান্দা (এবং তাঁর আজ্ঞাবহ) ফেরেশতাদেরকে তারা নারীরূপে স্থাপন করেছে, তাদের সৃষ্টির সময় তারা কি হাযির ছিল, তাদের সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে এবং তারা (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।" (৪৩ ঃ ১৯) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।' এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল। তাদের এটা মিথ্যা, অপবাদ এবং স্পষ্ট শিরক ছাড়া কিছুই নয়। এটা তাদের অনুমান মাত্র। আর এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা অনুমান ও ধারণা করা হতে বেঁচে থাকো, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে তুমি উপেক্ষা করে চল। সে তো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে তার পরিণাম কখনো ভাল হতে পারে না। তার জ্ঞানের সীমাও এটাই যে, দুনিয়া সন্ধানেই সে সদা ডুবে থাকে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার (আখিরাতে) ঘর নেই এবং দুনিয়া ঐ ব্যক্তির মাল যার (আখিরাতে) মাল নেই। আর ওটাকে জমা করার চেষ্টায় ঐ ব্যক্তি লেগে থাকে যার বিবেক-বুদ্ধি নেই।"[১] একটি দু'আয়ে মাসূরায় নবী (সঃ)-এর নিম্নলিখিত ভাষাও এসেছেঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বড় চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও সীমা শুধুমাত্র দুনিয়াকেই করবেন না।"

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন। যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। সবকিছু তাঁরই ক্ষমতা, জ্ঞান ও নৈপুণ্য দ্বারা হচ্ছে। তিনি ন্যায় বিচারক। স্বীয় শরীয়তে এবং পরিমাপ নির্ধারণে অন্যায় ও যুলুম কখনো করেন না।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝

৩১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার,

٣٢- اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

৩২। যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোট খাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আসমান ও যমীনের মালিক, অভাবমুক্ত, প্রকৃত শাহানশাহ, ন্যায় বিচারক ও সঠিক সৃষ্টিকর্তা এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা'আলাই বটে। তিনি প্রত্যেককেই তার আমলের প্রতিদান প্রদানকারী। পুণ্যের ভাল প্রতিদান এবং পাপের মন্দ শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন। তাঁর নিকট সৎলোক তারাই যারা তাঁর হারামকৃত জিনিস ও কাজ হতে, বড় বড় পাপ হতে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কার্য হতে দূরে থাকে। মানুষ হিসেবে তাদের দ্বারা কোন ছোট-খাট গুনাহ হলেও আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰۤئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا -

অর্থাৎ "যদি তোমরা বড় বড় পাপরাশি হতে বেঁচে থাকো তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করবো।" (৪ ঃ ৩১) আর এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি মানবীয় ছোট-খাট অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাঁর মতে لَمَمٌ -এর যে তাফসীর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে করা হয়েছে তা হতে উত্তম তাফসীর আর কিছু হতে পারে না। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের উপর তার জেনা বা ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যা সে অবশ্যই পাবে। চক্ষুর জেনা হলো দর্শন করা, মুখের জেনা হলো বলা, অন্তরে অনুরাগ, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগে, এখন লজ্জাস্থান ওকে সত্য করে দেখায় অথবা মিথ্যারূপে প্রদর্শন করে।"[১]

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হলো তাকানো, ওষ্ঠদ্বয়ের জেনা হচ্ছে চুম্বন করা, হস্তদ্বয়ের ব্যভিচার ধরা এবং পদদ্বয়ের জেনা হলো চলা, আর লজ্জাস্থান ওটাকে সত্য অথবা মিথ্যারূপে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে যদি সে বাধা দিতে না পারে এবং কুকার্য করেই বসে তবে সমস্ত অঙ্গেরই জেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে লজ্জাস্থান বা গুপ্তাঙ্গকে সামলিয়ে নিতে পারে এবং কুকার্যে লিপ্ত না হয় তবে ঐগুলো সবই لَمَمٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, لَمَمٌ হলো চুম্বন করা, দেখা ও স্পর্শ করা। আর যখন গুপ্তস্থানগুলো মিলিত হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং ব্যভিচার সাব্যস্ত হয়ে পড়বে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এই বাক্যের তাফসীর এটাই বর্ণিত আছে যা উপরে বর্ণিত হলো।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, পাপে অপবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তা ছেড়ে দিলে ওটা لَمَمٌ -এর মধ্যে গণ্য হবে। একজন কবি বলেনঃ

إِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا * وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّا

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যদি আপনি ক্ষমা করেন তবে সবকিছুই ক্ষমা করে দেন, আর আপনার কোন এমন বান্দা আছে যে, সে অপরাধ করেনি?"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করার সময় প্রায়ই এই ছন্দটি পাঠ করতো। তাফসীরে ইবনে জারীরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপরোক্ত শ্লোকটি পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) ওটাকে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। বায্যার (রঃ) বলেন যে, তাঁর এ হাদীসের অন্য কোন সনদ জানা নেই। শুধু এই সনদেই মারফূ' রূপে ওটা বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং বাগাভীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। বাগাভী (রঃ) এটাকে সূরায়ে তানযীলের তাফসীরে রিওয়াইয়াত করেছেন। কিন্তু এটা মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "لَمَمٌ-এর ভাবার্থ এই যে, জেনার নিকটবর্তী হওয়ার পর তাওবা করে এবং আর ওদিকে ফিরে আসে না। চুরির নিকটবর্তী হওয়ার পর চুরি করলো না এবং তাওবা করে ফিরে আসলো। অনুরূপভাবে মদ্যপানের নিকটবর্তী হয়ে মদ্যপান করলো না এবং তাওবা করে ফিরে আসলো। এগুলো সবই لَمَمٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর জন্যে মুমিন ক্ষমার্হ।

হযরত হাসান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। একটি রিওয়াইয়াতে সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রায়ই এটা বর্ণিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, لَمَمٌ হলো হদ্দে জেনা ও আযাবে আখিরাতের মধ্যবর্তী গুনাহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, لَمَمٌ হলো ঐ জিনিস যা দুই হদ্দের মাঝে অবস্থিত, হদ্দে দুনিয়া ও হদ্দে আখিরাত। নামায এর কাফফারা হয়ে যায়। لَمَمٌ হলো জাহান্নাম ওয়াজিবকারী হতে ক্ষুদ্রতর পাপ। হদ্দে দুনিয়া তো ঐ পার্থিব শাস্তি যা আল্লাহ তা'আলা কোন পাপের কারণে নির্ধারণ করেছেন। আর হদ্দে আখিরাত হলো ওটাই যার কারণে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন, কিন্তু ওর শাস্তি দুনিয়ায় নির্ধারণ করেননি।

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 'তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম। ওটা প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে নিয়েছে এবং সমস্ত পাপকে ওটা পরিবেষ্টনকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ! আমার এ কথাটি আমার বান্দাদেরকে) তুমি বলঃ হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করেছো! তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (৩৯ ঃ ৫৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত– যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আঃ)-কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করেছেন, যারা পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন, একদলকে জান্নাতের জন্যে এবং অপর দলকে জাহান্নামের জন্যে।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অর্থাৎ ঐ সময় আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের জীবিকা, বয়স, পুণ্য এবং পাপ লিখে নেয়। বহু শিশু পেট হতেই পড়ে যায়, অনেক শিশু দুগ্ধপান অবস্থায় মারা যায়, বহু শিশু মারা যায় দুধ ছাড়ানোর পর, অনেকে মারা যায় যৌবনে পদার্পণ করার পূর্বেই, যৌবনাবস্থাতেই বহু লোক ইহলোক ত্যাগ করে। এখন এই সমুদয় মনযিল অতিক্রম করার পর যখন বার্ধক্য এসে পড়ে, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কোন মনযিল নেই, এখনো যদি আমরা না বুঝি ও সতর্ক না হই তবে আমাদের চেয়ে বড় উদাসীন আর কে হতে পারে?

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না।’ অর্থাৎ তোমাদের সৎ আমলের প্রশংসা তোমরা নিজেরা করো না।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে, কার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে তা আল্লাহ তা‘আলাই খুব ভাল জানেন।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -

অর্থাৎ "তুমি কি ঐ লোকদেরকে দেখোনি, যারা নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই করেছে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পাক পবিত্র করে থাকেন এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।" (৪ ঃ ৪৯)

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি আমার কন্যার নাম বিররাহ রেখেছিলাম। তখন আমাকে হযরত যায়নাব বিনতু আবি সালমা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। স্বয়ং আমার নামও বিররাহ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ "তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তোমাদের পুণ্যবানদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবহিত।" তখন সাহাবীগণ বললেনঃ "তাহলে এর নাম কি রাখতে হবে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তোমরা এর নাম যায়নাব রেখে দাও।"[১]

হযরত আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে কোন একটি লোকের খুব প্রশংসা করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ "তোমার অকল্যাণ হোক! তুমি তো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে?" একথা তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, কারো প্রশংসা যদি করতেই হবে তবে বলবেঃ "আমার ধারণা অমুক লোকটি এই রূপ। সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে।"[২]

হযরত হারিস ইবনে হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত উসমান (রাঃ)-এর সামনে তাঁর প্রশংসা করে। তখন হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) লোকটির মুখে মাটি নিক্ষেপ করেন এবং বলেনঃ "আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করি।"[৩]

৩৩। তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;

৩৪। এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়?

৩৫। তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে?

٣٣- اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ○

٣٤- وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ○

٣٥- اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩৬। তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসা (আঃ)-এর কিতাবে,

٣٦- اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ○

৩৭। এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?

٣٧- وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ○

৩৮। ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না,

٣٨- اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ○

৩৯। আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে,

٣٩- وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ○

৪০। আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে-

٤٠- وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ○

৪১। অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান,

٤١- ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰى ○

যারা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিন্দে করছেন। তিনি বলেনঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى - وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -

অর্থাৎ "সে বিশ্বাস করেনি, বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।" (৭৫ ঃ ৩১-৩২)

এখানে বলেনঃ 'সে দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়।' অন্তরকে সে উপদেশ গ্রহণকারী করেনি। কখনো কখনো কিছু মেনে নেয়, অতঃপর রজ্জু কর্তন করে পৃথক হয়ে যায়।

আরবের লোকেরা اَكْدٰى ঐ সময় বলে, যেমন কিছু লোক কূপ খনন করতে রয়েছে, মাঝে যখন কোন শক্ত পাথর এসে পড়ে তখন তারা সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকে এবং বলেঃ اَكْدَيْنَا অর্থাৎ "আমরা কাজ বন্দ করে দিলাম।" অতঃপর তারা কাজ ছেড়ে দেয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে?' অর্থাৎ সে কি জানবে যে, যদি সে আল্লাহর পথে খরচ করে তবে সে রিক্ত হস্ত হয়ে

যাবে? আসলে তা নয়, বরং সে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণমনার কারণেই দান-খায়রাত করা হতে বিরত থাকছে।

এ জন্যেই হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে বেলাল (রাঃ)! তুমি খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের নিকট হতে তুমি কমে যাওয়ার ভয় করো না।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু খরচ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার বিনিময় প্রদান করবেন এবং তিনি উত্তম রিয্কদাতা।" (৩৪ ঃ ৩৯)

وَفّٰى-এর এক অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থ এই করা হয়েছে যে, যে হুকুম তারা পেয়েছে তা তারা পূর্ণরূপে পালন করেছে। সঠিক কথা এই যে, অর্থ দুটোই হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ـ

অর্থাৎ "ইবরাহীম (আঃ)-কে যখনই তাঁর প্রতিপালক কোন কিছু দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তখনই তিনি ওগুলো পূর্ণ করেছেন (এবং এভাবে কৃতকার্য হয়েছেন), তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ আমি তোমাকে লোকদের নেতা করলাম।" (২ ঃ ১২৪) যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তোমার কাছে অহী করলাম যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করবে এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (১৬ ঃ ১২৩)

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "وَفّٰى কি তা তুমি জান কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তিনি (হযরত ইবরাহীম আঃ) প্রত্যহ দিনের প্রথমভাগে চার রাকআত নামায পড়তেন। এটাই ছিল তাঁর ওফাদারি বা পুরোপুরিভাবে দায়িত্ব পালন।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জা'ফর ইবনে যুবায়ের (রঃ)-এর হাদীস হতে ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। এটা দুর্বল হাদীস।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) ও হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্যে দিনের প্রথম ভাগে চার রাকআত নামায পড়ে নাও, তাহলে আমি দিবসের শেষ ভাগ পর্যন্ত তোমার জন্যে যথেষ্ট হবো (অর্থাৎ আমি তোমাকে যথেষ্ট পুণ্য প্রদান করবো)।"[১]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে وَفّٰى শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত কালেমাগুলো পাঠ করতেনঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে।" (৩০ ঃ ১৭) রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন।

এরপর হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবে ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কিতাবে কি ছিল তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ ওগুলোতে এই ছিল যে, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর যুলুম করেছে, যেমন শিরক ও কুফরী করেছে অথবা সাগীরা বা কাবীরা গুনাহ করেছে, তার শাস্তি স্বয়ং তারই উপর আপতিত হবে। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

অর্থাৎ "যদি কোন বোঝা বহনকারী তার বোঝা বহন করতে আহ্বান করে তবে তা হতে কিছুই বহন করা হবে না যদিও সে তার নিকটতম আত্মীয় হয়।" (৩৫ ঃ ১৮) ঐ কিতাবগুলোতে এও ছিলঃ মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। অর্থাৎ যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবে না এবং অন্যের দুষ্কার্যের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না, অনুরূপভাবে অন্যের পুণ্যও তার কোন উপকারে আসবে না। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন পাঠের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছালে তা তার কাছে পৌঁছে না। কেননা, না এটা তার আমল এবং না তার উপার্জিত জিনিস। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) না এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন, না এ কাজে স্বীয় উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন, কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারাও নয় এবং কোন ইঙ্গিত দ্বারাও নয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর মধ্য হতে কোন একজন

১. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (রঃ)।

হতেও এটা প্রমাণিত নয় যে, তাঁরা কুরআন পড়ে ওর সওয়াবের হাদিয়া মৃতের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা যদি পুণ্যের কাজ হতো এবং শরীয়ত সম্মত আমল হতো তবে সওয়াবের কাজে আমাদের চেয়ে বহুগুণে অগ্রগামী সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ কাজ অবশ্যই করতেন। সাথে সাথে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, পুণ্যের কাজ কুরআন ও হাদীস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কোন প্রকারের মত ও কিয়াসের স্থান সেখানে নেই। হ্যাঁ, তবে দু'আ ও দান-খায়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে থাকে। এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে এবং শরীয়ত প্রবর্তকের শব্দ দ্বারা প্রমাণিত।

যে হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল (বন্ধ হয় না)। (এক) সৎ সন্তান, যে তার জন্যে দু'আ করে, (দুই) ঐ সাদকা, যা তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে এবং (তিন) ঐ ইলম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।" এর ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও আমল। অর্থাৎ অন্য কারো আমলের প্রতিদান তাকে দেয়া হয় না। যেমন হাদীসে এসেছে যে, মানুষের সবচেয়ে উত্তম খাদ্য ওটাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। আর মানুষের সন্তানও তারই উপার্জিত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সন্তান, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্যে দু'আ করে সেও প্রকৃতপক্ষে তারই আমল। অনুরূপভাবে সাদকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই আমলের ফল এবং তারই ওয়াকফকৃত জিনিস। স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছেঃ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

অর্থাৎ "আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়।" (৩৬ ঃ ১২) এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তার পিছনে ছেড়ে আসা সৎকার্যগুলোর সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকে। এখন থাকলো ঐ ইলম যা সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার ইন্তেকালের পরেও জনগণ ওর উপর আমল করতে থাকে, ওটাও প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টা ও আমল যা তার পরে বাকী রয়েছে এবং ওর সওয়াব তার কাছে পৌঁছতে রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে এবং যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিদায়াতের অনুসারী হয়, তাদের সবারই কাজের প্রতিদান তাকে প্রদান করা হয়, আর তাদের পুণ্যের কিছুই কম করা হয় না।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাকে তার কর্ম দেখানো হবে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ তোমরা আমল করে যাও, সত্বরই তোমাদের আমল দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনরা, অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।" (৯ ঃ ১০৫)

অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।

٤٢- وَ اَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝

৪২। আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।

٤٣- وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۝

৪৩। আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

٤٤- وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝

৪৪। এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,

٤٥- وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

৪৫। আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী,

٤٦- مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝

৪৬। শুক্র বিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়,

٤٧- وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝

৪৭। আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই,

٤٨- وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۝

৪৮। আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন,

৪৯। আর এই যে, তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

٤٩- وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۝

৫০। এবং এই যে, তিনিই প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন

٥٠- وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَا ۨالْاُوْلٰى ۝

৫১। এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও– কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি–

٥١- وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى ۝

৫২। আর এদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কেও, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।

٥٢- وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۝

৫৩। উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন

٥٣- وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ۝

৫৪। ওকে আচ্ছন্ন করলো কি সর্বগ্রাসী শাস্তি!

٥٤- فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ۝

৫৫। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

٥٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ۝

ঘোষিত হচ্ছে যে, শেষে প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর নিকট। কিয়ামতের দিন সবকেই তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। হযরত মুআয (রাঃ) বানু আওদ গোত্রের মধ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ "হে বানু আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূতরূপে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। তোমরা সবাই এ বিশ্বাস রেখো যে, তোমাদের সবকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى-এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

জায়েয নয়।” এটা ঐ হাদীসের মতই যা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে যেয়ো না। তাঁকে জ্ঞান ও চিন্তা পেতে পারে না।”[১]

এ হাদীসটি এ শব্দগুলো দ্বারা সুরক্ষিত না হলেও সহীহ হাদীসেও এ বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। তাতে রয়েছেঃ “তোমাদের কাছে এসে বলে– এটা কে সৃষ্টি করেছেন? ওটা কে সৃষ্টি করেছেন?” শেষ পর্যন্ত সে বলেঃ “আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছেন?” তোমাদের মধ্যে কারো অন্তরে এই কুমন্ত্রণা আসলে সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং অন্তর হতে ঐ ধারণা দূর করে দেয়।”

সুনানের অন্য একটি হাদীসে রয়েছেঃ “তোমরা সৃষ্টজীব ও বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো না। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা এমন একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন যাঁর কানের নিম্নভাগ হতে কাঁধ পর্যন্ত স্থান তিনশ বছরের পথ।” অথবা যেরূপ বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।' অর্থাৎ হাসি-কান্নার মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক। 'তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান।' যেমন তিনিঃ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ “যিনি সৃষ্টি করেন মৃত্যু ও জীবন।”

ঘোষিত হচ্ছেঃ 'তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়।' যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ـ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ـ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ـ

অর্থাৎ “মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?” (৭৫ ঃ ৩৬-৪০)

১. ইমাম বাগাভী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই।' অর্থাৎ যেমন তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব তাঁরই। 'তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।' ধন-সম্পদ তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা তাঁর কাছে পুঁজি হিসেবে থাকে। অধিকাংশ তাফসীরকারের উক্তি এ স্থলে এটাই, যদিও কিছু লোক হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তিনি মাল দিয়েছেন ও গোলাম দিয়েছেন। তিনি দিয়েছেন ও খুশী হয়েছেন। তিনি নিজেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন এবং স্বীয় মাখলূককে তাঁর মুখাপেক্ষী করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেছেন। কিন্তু এই পরবর্তী দু'টি উক্তি শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

'শি'রা' ঐ উজ্জ্বল তারকার নাম যাকে 'মারযামুল জাওযা'ও বলা হয়। আরবের একটি দল ওর ইবাদত করতো।

আ'দে ঊলা অর্থাৎ হযরত হূদ (আঃ)-এর কওম, যাকে আ'দ ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ) বলা হতো। এই কওমকে আল্লাহ তা'আলা ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেনঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ـ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ـ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ـ

অর্থাৎ "তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আ'দ বংশের- ইরাম গোত্রের প্রতি- যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি।" (৮৯ ঃ ৬-৮) এই সম্প্রদায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং সাথে সাথে তারা ছিল আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্য ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরম বিরোধী। তাদের উপর ঝড়ের শাস্তি আপতিত হয়, যা সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অনুরূপভাবে সামূদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দেন এবং তাদের কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি। তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য। আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করে সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে একটি জিনিস ঢেকে ফেলে, অর্থাৎ পাথর সমূহ, যেগুলোর বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐ গ্রামে চার লক্ষ লোক বসবাস করতো। আবাসভূমির সবটাই অগ্নি, গন্ধক ও তেল হয়ে তাদের উপর প্রজ্বলিত হয়েছিল।

হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এটাই যার সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এটা মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাহলে হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

কেউ কেউ বলেন যে, এটা নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সম্বোধনকে সাধারণ রাখাই বেশী যুক্তিযুক্ত। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) সাধারণ রাখাকেই পছন্দ করেছেন।

٥٦- هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ○

৫৬। অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবী (সঃ)-ও এক সতর্ককারী;

٥٧- اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ○

৫৭। কিয়ামত আসন্ন,

٥٨- لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ○

৫৮। আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।

٥٩- اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ○

৫৯। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছো!

٦٠- وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ○

৬০। এবং হাসি-ঠাট্টা করছো! ক্রন্দন করছো না?

٦١- وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ○

৬১। তোমরা তো উদাসীন,

السجدة

٦٢- فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ○ ع

৬২। অতএব আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।

ইনি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ভয় প্রদর্শক। তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী রাসূলদের রিসালাতের মতই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ - অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ আমি নতুন রাসূল তো নই।" (৪৬ ঃ ৯) অর্থাৎ রিসালাত তো আমা হতে শুরু হয়নি। বরং আমার পূর্বে দুনিয়ায় বহু রাসূল আগমন করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত আসন্ন। না এটাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে, না এর নির্ধারিত সময়ের অবগতি আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া এটা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় কারো জানা নেই।

আরবী ভাষায় نَذِيرٌ ওকে বলা হয়, যেমন একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্যে একটি লোক কোন ভয়ের জিনিস দেখে দলের লোককে সতর্ক করে। অর্থাৎ ভয়ের খবর শুনিয়ে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

অর্থাৎ "তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র।" (৩৪ ঃ ৪৬)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী বা ভয় প্রদর্শনকারী।" অর্থাৎ যেমন কেউ কোন খারাপ জিনিস দেখে নেয় যে, ওটা তার কওমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন সে যে অবস্থায় রয়েছে ঐ অবস্থাতেই ভয়ে দৌড়িয়ে এসে হঠাৎ করে স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেয় এবং বলেঃ "দেখো, এই বিপদ আসছে, সুতরাং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর।" অনুরূপভাবে কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তিও জনগণের উদাসীনতার অবস্থায় তাদের একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা হতে তাদেরকে সতর্ক করছেন। যেমন এর পরবর্তী সূরায় রয়েছেঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ অর্থাৎ "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে।" (৫৪ ঃ ১)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা ছোট ছোট গুনাহগুলোকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে বেঁচে থাকো। ছোট ছোট গুনাহ্গুলোর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি যাত্রীদল কোন জায়গায় অবতরণ করলো। সবাই এদিক ওদিক চলে গেল এবং কিছু কিছু করে জ্বালানী কাষ্ঠ নিয়ে আসলো। এখন যদিও প্রত্যেকের কাছে অল্প অল্প কাষ্ঠ রয়েছে, কিন্তু যখন ওগুলো একত্রিত করা হলো, তখন একটা বড় স্তূপ হয়ে গেল যার দ্বারা হাঁড়ি হাঁড়ি খাদ্য রান্না করা যাবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে ঢেরি হয়ে যায় এবং আকস্মিকভাবে ঐ পাপীকে পাকড়াও করা হয়। সুতরাং সে ধ্বংস হয়ে যায়।"[১]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার এবং কিয়ামতের দৃষ্টান্ত এ দুটির মত।" অতঃপর তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝে কিছুটা ফাঁকা রেখে দেন। তারপর তিনি বলেনঃ "আমার এবং কিয়ামতের দৃষ্টান্ত দু'টি ঘোড়ার মত।" এরপর তিনি বলেনঃ 'আমার এবং আখিরাতের দিনের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যাকে তার সম্প্রদায় নৈশ পাহারায় পাঠালো। অতঃপর সে যখন শত্রু সেনাবাহিনীকে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

একেবারে নিকটে চলে আসতে দেখলো তখন সে একটি টিলার উপর চড়ে তার কাপড় নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিতে তার কওমকে সতর্ক করলো।" তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমিও ঐরূপ।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ কাজের উপর ঘৃণা প্রকাশ করছেন যে, তারা কুরআন শ্রবণ করে বটে, কিন্তু তা হতে বিমুখ হয়ে যায় ও বেপরোয়া হয় এবং বিস্মিতভাবে ওর রহমতকে অস্বীকার করে বসে। আর হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ-উপহাস করে থাকে। তাদের উচিত ছিল যে, মুমিনদের মত ওটা শুনে কাঁদতো এবং উপদেশ গ্রহণ করতো। যেমন মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহর কালাম শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, সিজদায় পড়ে যায় এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি পায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, سَمَدٌ গানকে বলা হয়। এটা ইয়ামানী ভাষা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই سَامِدُوْنَ-এর অর্থ বিমুখ হওয়া এবং অহংকার করাও বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো উদাসীন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা একত্ববাদী ও অকপট হয়ে যাও। বিনয়ের সাথে তোমরা ভূমিতে লুটিয়ে পড়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরায়ে নাজমের সিজদার স্থলে নবী (সঃ) সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানরা, মুশরিক এবং দানব ও মানব সবাই সিজদা করে।[২]

হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি অদাআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় সূরায়ে নাজম পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং ঐ সময় তাঁর কাছে যারা ছিল তারা সবাই সিজদা করে। বর্ণনাকারী মুত্তালিব (রাঃ) বলেনঃ "আমি তখন আমার মাথা উঠালাম এবং সিজদা করলাম না।" তখন পর্যন্ত মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে নি। এরপরে যে কেউই এই সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং যিনি শুনতেন তখন তিনিও তাঁর সাথে সিজদা করতেন।[৩]

সূরা ঃ নাজম -এর তাফসীর সমাপ্ত

---

১. এই হাদীসের সাক্ষী হিসেবে আরো বহু হাসান ও সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ কামার, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫০, রুকূ' ঃ ৩)

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

হযরত আবূ ওয়াকিদ (রঃ)-এর রিওয়াইয়াত পূর্বে গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে সূরায়ে قٓ ও সূরায়ে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বড় বড় মাহফিলেও তিনি এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। কেননা, এতে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা, প্রথম সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এর সাথে সাথে তাওহীদ ও রিসালাত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে।'

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে,

١- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

২। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ এটা তো চিরাচরিত যাদু।

٢- وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

৩। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারেই লক্ষ্যে পৌঁছবে।

٣- وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

৪। তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী।

٤- وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ○

৫। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

٥- حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ○

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার খবর দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ اَتٰى اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) আসবেই; সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।" (১৬ঃ ১) আরো বলেনঃ اِقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِىۡ غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُوۡنَ অর্থাৎ "মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।" (২১ঃ ১) এই বিষয়ের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদের সামনে ভাষণ দান করেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হতে অতি অল্প সময় বাকী ছিল। ভাষণে তিনি বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! অতীত যুগের তুলনায় দুনিয়ার হায়াতও এই পরিমাণ বাকী আছে যে পরিমাণ সময় এই দিনের বাকী আছে দিনের গত হয়ে যাওয়া সময়ের তুলনায়। সূর্যের তো আমরা সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছি।"[১]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসরের পর যখন সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "অতীত যুগের লোকদের বয়সের তুলনায় তোমাদের বয়স ততটুকু যতটুকু এই বাকী সময়, এই দিনের গত হয়ে যাওয়া সময়ের তুলনায়।"[২]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি ও কিয়ামত এই ভাবে প্রেরিত হয়েছি।" অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। অন্য রিওয়াইয়াতে এটুকু বেশী আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কিয়ামত আমা হতে বেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।"[৩]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) ওয়ালিদ ইবনে আবদিল মালিকের নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে কিয়ামত সম্বলিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত খালফ ইবনে মূসা (রঃ)-কে ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেন বটে, কিন্তু বলেন যে, তিনি কখনো কখনো ভুলও করে থাকেন। দ্বিতীয় রিওয়াইয়াতটি একে সবল করে। এমন কি এর ব্যাখ্যা করে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবূ হাফিয সালমা ইবনে দীনার (রঃ)-এর হাদীস হতে এটা তাখরীজ করেছেন।

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "তোমরা ও কিয়ামত এ দু'টি অঙ্গুলির মত।" এর সাক্ষ্য এ হাদীস দ্বারাও হতে পারে, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুবারক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হাশির এসেছে। আর হাশির হলেন তিনি যাঁর পদদ্বয়ের উপর জনগণের হাশর হবে।

হযরত বাহায (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উৎবা ইবনে গায্ওয়ান (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেন এবং কখনো বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানার পর বলেনঃ "দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা হয়ে গেছে। এটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাচ্ছে। যেমন পাত্রের খাদ্য খেয়ে নেয়া হয় এবং ধারে কিছু লেগে থাকে, তদ্রূপ দুনিয়ার বয়সের সমস্ত অংশই বেরিয়ে পড়েছে, শুধু নামে মাত্র বাকী আছে। তোমরা এখান হতে এমন জগতের দিকে গমনকারী যা কখনো ধ্বংস হবার নয়। সুতরাং সম্ভব হলে তোমরা এখান হতে কিছু পুণ্য সাথে নিয়ে যাও। জেনে রেখো, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামের ধার হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে যা সত্তর বছর ধরে নীচের দিকে অনবরত নামতে থাকবে, তবুও ওর তলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! জাহান্নামের এই গভীর গর্ত মানুষ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। তোমরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করো না। আমাদের কাছে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের চৌকাঠের দুটি কাঠের মধ্যবর্তী ব্যবধান চল্লিশ বছরের পথ। আর এটাও একদিন এমনভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে যে, খুবই ভীড় দেখা যাবে (শেষ পর্যন্ত)।"

আবূ আবদির রহমান সালমী (রঃ) বলেনঃ "আমি আমার পিতার সাথে মাদায়েনে গমন করি। জনপদ হতে তিন মাইল দূরে আমরা অবস্থান করি। জুমআর নামাযের জন্যে আমিও আমার পিতার সাথে গমন করি। হযরত হুযাইফা (রাঃ) মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি খুৎবায় বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।' কিয়ামত নিকটে এসে গেছে এবং অবশ্যই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। নিশ্চয়ই দুনিয়া বিচ্ছিন্নতার সতর্কধ্বনি করেছে। আজকের দিনটি হলো চেষ্টা ও প্রস্তুতির দিন। আগামী কাল তো হবে দৌড়াদৌড়ি করে আগে বেড়ে যাওয়ার দিন।" আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলামঃ কালকে দৌড় হবে কি যাতে আগে বেড়ে যেতে হবে? তিনি উত্তরে আমাকে বললেনঃ "তুমি তো একেবারে

অগ্রে ছেলে! এখানে একথার দ্বারা আমলের দিক দিয়ে একে অপরের আগে বেড়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে।" দ্বিতীয় জুমআর দিন যখন আমরা আসলাম তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে প্রায় আগের জুমআর দিনের মতই ভাষণ দিতে শুনলাম। শেষে তিনি একথাও বললেনঃ "পরিণাম হলো আগুন। سَابِق হলো ঐ ব্যক্তি যে জান্নাতে সর্বপ্রথম পৌঁছে গেল।"

আল্লাহ তা'আলার উক্তি – 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।' এটা নবী (সঃ)-এর যুগের ঘটনা। যেমন মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে বিশুদ্ধতার সাথে এটা বর্ণিত হয়েছে। সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "পাঁচটি জিনিস গত হয়েছে। (এক) রূম, (দুই) ধূম্র, (তিন) লিযাম, (চার) বাত্‌শাহ এবং (পাঁচ) চন্দ্র বিদীর্ণ হওন।"

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসী নবী (সঃ)-এর কাছে মু'জিযা দেখানোর আবেদন জানালো। ফলে দুই বার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়, যার বর্ণনা এই আয়াত দু'টিতে রয়েছে।"[১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে মু'জিযা দেখাবার আবেদন করলে তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। সুতরাং তারা হিরার এদিকে এক খণ্ড এবং ওদিকে এক খণ্ড দেখতে পায়।"[২]

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। এক খণ্ড এক পাহাড়ে এবং অপর খণ্ড অন্য পাহাড়ে পতিত হয়। তখন তারা বলেঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদের উপর যাদু করেছে।" তখন জ্ঞানীরা বললোঃ "যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন তবে তিনি তো সমস্ত মানুষের উপর যাদু করতে পারেন না।"[৩]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এটা হিজরতের পূর্বের ঘটনা। আরো বহু রিওয়াইয়াত রয়েছে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চন্দ্র গ্রহণ হলে কাফিররা বলতে শুরু করে যে, চন্দ্রের উপর যাদু করা হয়েছে। তখন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ হতে مُّسْتَمِرٌّ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওর দু'টি টুকরো হয়, একটি পাহাড়ের পিছনে এবং অপরটি পাহাড়ের সামনে, ঐ সময় নবী (সঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।"[১]

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জনগণ ভালভাবে তা লক্ষ্য করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা সাক্ষী থাকো।"[২] অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "ঐ সময় আমরা মক্কায় ছিলাম।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়। তখন কুরায়েশরা বলেঃ "ইবনে আবি কাব্‌শাহর (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর) এটা যাদু।" কিন্তু তাদের জ্ঞানী লোকেরা বলেঃ "যদি এটা মেনে নেয়াই হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন, কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত লোকের উপর তো তিনি যাদু করতে পারেন না? এখন যারা সফর থেকে আসবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হোক যে, তারাও ঐ রাত্রে চন্দ্রকে বিদীর্ণ হতে দেখেছে কি না?" অতঃপর যখন তারা ফিরে আসলো তখন তারাও এটা স্বীকার করলো যে, সত্যি তারা ঐ রাত্রে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে। কাফিরদের সমাবেশে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, যদি বাহিরের লোক এসে একথাই বলে তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতায় সন্দেহ করার কিছুই থাকবে না। অতঃপর যখন বাহির হতে লোক আসলো এবং যেখান হতেই আসলো সবাই এই সাক্ষ্য দান করলো যে, তারা স্বচক্ষে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, চন্দ্রের দুই খণ্ডের মধ্যে পাহাড় দেখা যেতো। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হলে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে নবী (সঃ) বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! তুমি সাক্ষী থাকো।" আর মুশরিকরা এই বিরাট মু'জিযাকেও যাদু বলে দিয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। এরই

১. সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলেঃ এটা তো চিরাচরিত যাদু। এই বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নবী (সঃ)-এর হুকুমের বিপরীত নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা হতে বিরত থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে। অর্থাৎ ভাল ভালদের ও মন্দ মন্দদের সাথে। এও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলোঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যাপারই সংঘটিত হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী; এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত করেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, এতেও তাঁর পরিপূর্ণ নিপুণতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে হতভাগ্য এটা তাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদেরকে কেউই হিদায়াত দান করতে পারে না। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও– আল্লাহর যুক্তি সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই হিদায়াত দান করতে পারতেন।" (৬ ঃ ১৪৯) অনুরূপ নিম্নের উক্তিটিওঃ

وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ "বেঈমানদেরকে কোন মু'জিযা এবং কোন ভয় প্রদর্শনকারী কোন উপকার পৌঁছায় না।" (১০ ঃ ১০১)

৬। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,

٦- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝

৭। অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন তারা কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়,

٧- خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝

৮। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিররা বলবেঃ কঠিন এই দিন।

٨- مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেসব কাফির মু'জিযা দেখার পরও বলে যে, এটা যাদু, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষা করতে দাও। ঐদিন তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দাঁড়াবার জন্যে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। যেখানে তাদেরকে বিপদ আপদে ঘিরে ফেলবে। তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। লজ্জায় তাদের চক্ষু অবনমিত হবে। তারা কবর হতে বের হয়ে পড়বে। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত তারা দ্রুত গতিতে হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে। তাদের কান থাকবে আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত চলবে। না তারা পারবে বিরুদ্ধাচরণ করতে, না বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে। ঐ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চীৎকার করে বলবেঃ এটা তো বড়ই কঠিন দিন!

৯। এদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল– মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিলঃ এতো এক পাগল। আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

১০। তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলঃ আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি আমার প্রতিবিধান কর।

১১। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে,

٩- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ○

١٠- فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ○

١١- فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○

১২। এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে।

١٢- وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ

১৩। তখন নূহ (আঃ)-কে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,

١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۙ

১৪। যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এটা পুরস্কার তার জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

١٤- تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

১৫। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

١٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

১৬। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

١٦- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ

১৭। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

١٧- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার এই উম্মতের পূর্বে হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মতও তাদের নবী আমার বান্দা হযরত নূহ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল, পাগল বলেছিল এবং শাসন গর্জন ও ধমক দিয়ে বলেছিলঃ 'হে নূহ (আঃ)! যদি তুমি তোমার এ কাজ হতে বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করবো।' আমার বান্দা ও রাসূল হযরত নূহ (আঃ) তখন আমাকে ডাক দিয়ে বললোঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো অসহায়। আমি কোনক্রমেই আর নিজেকে বাঁচাতে পারছি না এবং আপনার দ্বীনেরও হিফাযত করতে পারছি না। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং

আমাকে বিজয় দান করুন।' তাঁর এ প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করলেন এবং ঐ কাফির কওমের উপর প্রসিদ্ধ তুফান পাঠালেন। আকাশ হতে মুষল ধারের বৃষ্টির দরযা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রস্রবণের মুখ খুলে দিলেন। এমন কি যা পানির জায়গা ছিল না, যেমন উনান ইত্যাদি হতে পানি উঠতে লাগলো। চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হলো না এবং যমীন হতে পানি উঠাও বন্ধ হলো না। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এটা চলতেই থাকলো। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময় আকাশ হতে পানির দরযা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। না এর পূর্বে কখনো এতো বেশী পানি বর্ষিত হয়েছিল, না এর পরে কখনো এরূপ পানি বর্ষিত হয়েছে। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলিয়ে দেয়। সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আকাশের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং ওগুলো দিয়ে অনবরত পানি বর্ষিত হতে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে (নূহ আঃ-কে) আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে।

دُسُرٌ শব্দের অর্থ হলো নৌকার বাম দিকের অংশ এবং প্রাথমিক অংশ যার উপর ঢেউ এসে লাগে। ওর মূল জোড়কেও বলা হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'ওটা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলতো, এটা পুরস্কার তার জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।' হযরত নূহ (আঃ)-কে সাহায্য করার মাধ্যমে এটা ছিল কাফিরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ।

ইরশাদ হচ্ছেঃ আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে। অর্থাৎ ঐ নৌকাকে শিক্ষণীয় বিষয় রূপে বাকী রেখেছি।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরাও ঐ নৌকাটি দেখেছে। কিন্তু এর প্রকাশ্য অর্থ হলোঃ ঐ নৌকার নমুনায় অন্যান্য নৌকাগুলো আমি নিদর্শন হিসেবে দুনিয়ায় কায়েম রেখেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। আর তাদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।" (৩৬ ঃ ৪১-৪২) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ - لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ -

অর্থাৎ "যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।" (৬৯ঃ ১১-১২) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ 'সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পড়িয়েছেন।"[১] স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতেও এই শব্দের কিরআত এরূপই বর্ণিত আছে।

হযরত আসওয়াদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "এই শব্দটি دَال না ذَال হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে পড়তে শুনেছি دَال দ্বারা এবং তিনি বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে دَال দ্বারাই পড়তে শুনেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।' অর্থাৎ যারা আমার সাথে কুফরী করেছিল, আমার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আমার উপদেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! কিভাবেই না আমি আমার রাসূলদের শত্রুদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর কেমন করে আমি সত্য ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি কুরআন কারীমের শব্দ ও অর্থ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্যে সহজ করে দিয়েছি যে এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়।' যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ -

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ “আমি তোমার প্রতি (নবী সঃ-এর প্রতি) বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং যেন জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।” (৩৮ ঃ ২৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ ـ

অর্থাৎ “আমি কুরআনকে উপদেশের জন্যে সহজ করেছি।” আরো বলেনঃ

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ـ

অর্থাৎ “আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওটা দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।” (১৯ ঃ ৯৭)

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর কিরআত ও তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা একে সহজসাধ্য না করতেন তবে মাখলূকের ক্ষমতা ছিল না যে, তারা আল্লাহর কালাম পড়তে পারে। আমি বলি যে, ঐ সহজগুলোর মধ্যে একটি সহজ ওটাই যা পূর্বে হাদীসে গত হয়েছে। তা এই যে, এই কুরআন সাতটি কিরআতের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই হাদীসের সমস্ত পন্থা ও শব্দ আমরা ইতিপূর্বে জমা করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? অর্থাৎ কেউ এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সাহায্য করা হবে।

১৮। আ'দ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

১৮- كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

১৯। তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে,

١٩- اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ○

২০। মানুষকে ওটা উৎখাত করেছিল উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

٢٠- تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝

২১। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

٢١- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝

২২। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٢٢- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, হূদ (আঃ)-এর কওমও আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নূহ (আঃ)-এর কওমের মতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। ফলে তাদের প্রতি কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করা হয়। ওটা ছিল তাদের জন্যে সরাসরি অশুভ ও অকল্যাণকর। ঐ বায়ু তাদের উপর অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। ঐ ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রবাহ তাদের উপর আসতো এবং তাদের কাউকেও উঠিয়ে নিয়ে যেতো, এমন কি সে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতো। অতঃপর তাকে অধঃমুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করতো। তার মস্তক পিষ্ট করতো এবং দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। দেখে মনে হতো যেন উন্মূলিত খর্জুর গাছের কাণ্ড।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ দেখো, কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে। সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩। সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল,

٢٣- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۝

২৪। তারা বলেছিলঃ আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ রূপে গণ্য হবো।

٢٤- فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝

২৫। আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

٢٥- ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ○

২৬। আগামীকল্য তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

٢٦- سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ○

২৭। আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী; অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

٢٧- اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○

২৮। আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে।

٢٨- وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ○

২৯। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে ওকে ধরে হত্যা করলো।

٢٩- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ○

৩০। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

٣٠- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩১। আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

٣١- اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

৩২। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٣٢- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

এখানে খবর দেয়া হচ্ছে যে, সামূদ সম্প্রদায় আল্লাহর রাসূল হযরত সালিহ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নবী হওয়াকে অসম্ভব মনে করে বিস্মিত হয়ে বলেঃ "এটা কি হতে পারে যে, আমরা আমাদেরই একটি লোকের অনুগত হয়ে যাবো? তার এতো বড় মর্যাদা লাভের কারণই বা কি?" এর চেয়ে আরো বেড়ে গিয়ে বলেঃ "আমরা এটা মেনে নিতে পারি না যে, আমাদের সবারই মধ্য হতে শুধুমাত্র এই লোকটিরই উপর আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে।" তারপর এরও আগে পা বাড়িয়ে গিয়ে আল্লাহর নবী (আঃ)-কে প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় চরম মিথ্যাবাদী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন, এখন তোমরা যা চাও তাই বল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যায় সীমালংঘনকারী কে তা কালই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী। ঐ লোকদের চাহিদা অনুযায়ী পাথরের এক কঠিন পাহাড় হতে এক বিরাট গর্ভবতী উষ্ট্রী বের হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (আঃ)-কে বলেনঃ তাদের পরিণাম কি হয় তা তুমি দেখে নিয়ো এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য ধারণ করো। দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তোমারই হবে। তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ পানি এক দিন তোমাদের এবং এক দিন উষ্ট্রীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ -

অর্থাৎ "সালেহ বললোঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে।" (২৬ঃ ১৫৫)

كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ -এর তাফসীরে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন উষ্ট্রীটি অনুপস্থিত থাকতো তখন তারা পানি পেতো, আর যখন উষ্ট্রীটি হাযির থাকতো তখন তারা ওর দুধ পেতো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে ওকে ধরে হত্যা করলো। তাফসীরকারগণ বলেন যে, হত্যাকারী লোকটির নাম ছিল কিদার ইবনে সালিফ। সে ছিল তার কওমের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا - অর্থাৎ "তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো।" (৯১ ঃ ১২)

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 'কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।' অর্থাৎ যেভাবে জমির কর্তিত শুষ্ক পাতা উড়ে গিয়ে হারিয়ে যায় সেই ভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। শুষ্ক চারা ভুষি যেমনভাবে জঙ্গলে উড়ে উড়ে ফিরে, ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়। অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ আরবের প্রথা ছিল যে, উটগুলোকে শুষ্ক কাঁটাযুক্ত বেড়ার মধ্যে রেখে দেয়া হতো। যখন ঐ বেড়াকে পদদলিত করা হতো তখন উটগুলোর যে অবস্থা হতো ঐ অবস্থা তাদেরও হয়ে যায়। তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। দেয়াল হতে যেমন মাটি ঝরে পড়ে তেমনই তাদেরও মূলোৎপাটন ঘটে। এসব উক্তি হলো তাফসীরকারদের এই বাক্যটির তাফসীর। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই প্রবলতম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৩। লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে,

٣٣- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ○

৩৪। আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে;

٣٤- اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ○

৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

٣٥- نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○

৩৬। লূত (আঃ) তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করলো।

٣٦- وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○

৩৭। তারা লূত (আঃ)-এর নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী

٣٧- وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ○

করলো, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললামঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

٣٨- وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ○

৩৮। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করলো।

٣٩- فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ○

৩৯। এবং আমি বললামঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

٤٠- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ○

৪০। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের খবর দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তারা তাদের রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যে কাজ তাদের পূর্বে কেউ কখনো করেনি, অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেড়ে ছেলেদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হওয়া! তাদের ধ্বংসের অবস্থাটাও ছিল তাদের কাজের মতই অসাধারণ ও অদ্ভুত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের বস্তীটিকে আকাশের কাছে উঠিয়ে নেন এবং সেখান হতে উল্টোভাবে নীচে নিক্ষেপ করেন। আর আকাশ হতে তাদের নামে নামে পাথর বর্ষাতে থাকেন। কিন্তু হযরত লূত (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে বাঁচিয়ে নেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন ঐ বস্তী ছেড়ে চলে যান। হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের কেউই ঈমান আনেনি। এমন কি স্বয়ং হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীও বে-ঈমান ছিল। তাঁর কওমের একটি লোকও ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ করেনি। সুতরাং আল্লাহর আযাব হতেও কেউই রক্ষা পায়নি। তাঁর কওমের সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনি ও তাঁর কন্যাগণ এই ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পান। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিপদের সময় রক্ষা করে থাকেন এবং তাঁদেরকে তাঁদের কৃতজ্ঞতার সুফল প্রদান করেন।

শাস্তি আসার পূর্বেই হযরত লূত (আঃ) স্বীয় কওমকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি। বরং তারা সন্দেহ পোষণ করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল। আর তাঁর মেহমানদেরকে তাঁর নিকট হতে ছিনতাই করতে চেয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ), হযরত ইসরাফীল (আঃ) প্রমুখ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাগণ মানুষের রূপ ধরে হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে মেহমান হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর চেহারা ও সুঠাম দেহ বিশিষ্ট তরুণ যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন। এদিকে রাত্রিকালে তাঁরা হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে অবতরণ করেছেন, আর ওদিকে তাঁর বে-ঈমান স্ত্রী কওমকে খবর দিয়ে দেয় যে, হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে সুদৃশ্য যুবকদের দল মেহমান রূপে আগমন করেছেন। এ খবর পেয়েই ঐ দুশ্চরিত্র লোকগুলো দৌড়িয়ে আসে এবং হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ী ঘিরে ফেলে। হযরত লূত (আঃ) তখন দরযা বন্ধ করে দেন। কিভাবে এই মেহমানদেরকে হাতে পাওয়া যায় এই সুযোগের অপেক্ষায় ঐ লোকগুলো ওঁৎ পেতে থাকে। যখন এসব কাণ্ড চলছিল তখন ছিল সন্ধ্যাকাল। হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি তাদেরকে বলছিলেনঃ "আমার এই কন্যাগুলো অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগুলো বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা এই দুষ্কার্য পরিত্যাগ করে তোমাদের হালাল স্ত্রীদের দ্বারা তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ কর।" কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তের দল জবাবে বলেছিলঃ "আপনি তো জানেন যে, স্ত্রীদের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ নেই। আমরা যে কি চাই তা তো আপনার অজানা নয়। আপনি আপনার মেহমানদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন!" যখন এই তর্ক-বিতর্কে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং ঐ লোকগুলো আক্রমণোদ্যত হয় এবং হযরত লূত (আঃ) তাদের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর পাখা তাদের চোখের উপর দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ফলে তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারা তখন দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এবং হযরত লূত (আঃ)-কে গালমন্দ দিতে দিতে সকালের ওয়াদা দিয়ে পশ্চাদপদে ফিরে যায়। কিন্তু সকালেই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, যা হতে না তারা পালাতে পারলো, না শাস্তি দূর করতে সক্ষম হলো। তাই তো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।' হযরত লূত (আঃ)-এর উপদেশবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করার শাস্তি তারা আস্বাদন করলো।

এই কুরআন কারীম খুবই সহজ, যে কেউই ইচ্ছা করলে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٤١- وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ○

৪১। ফিরাউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী,

٤٢- كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ○

৪২। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করলো, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

٤٣- اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ○

৪৩। তোমাদের মধ্যকার কাফিরগণ কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

٤٤- اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ○

৪৪। এরা কি বলেঃ আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?

٤٥- سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ○

৪৫। এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে,

٤٦- بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ○

৪৬। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।

আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করছেন। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) এই খবর শুনাতে আসলেন যে, তারা ঈমান আনলে তাদের জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদ রয়েছে এবং কুফরী করলে (জাহান্নামের) ভয় রয়েছে। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয়। ওগুলো ছিল তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতার পুরোপুরি দলীল। কিন্তু তারা সবকিছুই অবিশ্বাস

করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

এরপর বলা হচ্ছেঃ হে কুরায়েশ মুশরিকের দল! তোমরা কি ঐ ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, বরং তারাই তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। তাদের দলবলও ছিল তোমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশী। তারাও যখন আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পায়নি, তখন তোমরা আবার কি? তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাঁর কাছে অতি সহজ। তোমরা কি ধারণা করছো যে, আল্লাহর কিতাবসমূহে তোমাদের মুক্তিদানের কথা লিখিত রয়েছে? কিতাবে কি এটা লিখা আছে যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তোমরা কুফরী করতে থাকবে, আর তোমাদেরকে কোনই শাস্তি দেয়া হবে না? তোমরা কি মনে করছো যে, তোমরা দলের দল রয়েছো, সুতরাং তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না?

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) দু'আ করছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! হে আল্লাহ! যদি আপনার ইচ্ছা এটাই থাকে যে, আজকের দিনের পর ভূ-পৃষ্ঠে আপনার ইবাদত আর কখনো করা হবে না।" তিনি এটুকুই বলেছিলেন এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর হাতখানা ধরে ফেলেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁবু হতে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর মুখে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ - بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ - এ দু'টি আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল। হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "এ আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় এর দ্বারা কোন্ জামাআতকে বুঝানো হয়েছে তা আমি চিন্তা করছিলাম। বদরের যুদ্ধের দিন যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বর্ম পরিহিত হয়ে স্বীয় শিবির হতে বের হতে দেখলাম তখন ঐ আয়াতের তাফসীর আমার বোধগম্য হয়।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যে সময় আমি অতি অল্প বয়সের বালিকা ছিলাম এবং আমার সঙ্গীনিদের সাথে খেলা করতাম ঐ সময় بَلِ السَّاعَةُ ... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।"[১]

৪৭। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত,

٤٧- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

৪৮। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেই দিন বলা হবেঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

٤٨- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ○

৪৯। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।

٤٩- اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

৫০। আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।

٥٠- وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ ○

৫১। আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٥١- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৫২। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমল নামায়,

٥٢- وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ ○

৫৩। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ;

٥٣- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ○

৫৪। মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,

٥٤- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ○

৫৫। যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।

٥٥- فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ○ ع

১. ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা সহীহ বুখারীতে ফাযায়েলুল কুরআনের অধ্যায়ে দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেননি।

পাপী ও অপরাধী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পথ হতে সরে গেছে। তারা সন্দেহ ও দুর্ভাবনার মধ্যে পতিত হয়েছে। এই দুষ্ট ও দুরাচার লোকগুলো কাফিরই হোক অথবা অন্য কোন দলের অপরাধী ও পাপী লোকই হোক, তাদের এই দুষ্কর্ম তাদেরকে উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখানে যেমন তারা উদাসীন রয়েছে, তেমনই ওখানেও তারা বে-খবর থাকবে যে, না জানি তাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবেঃ তোমরা এখন জাহান্নামের অগ্নির স্বাদ গ্রহণ কর।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।' যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ـ

অর্থাৎ "তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর ওর পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।" (২৫ ঃ ২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ـ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ـ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ـ

অর্থাৎ "তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন। আর যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন।" (৮৭ ঃ ১-৩)

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়ে গেছে। কাদরিয়া সম্প্রদায় এটা অস্বীকার করে। এ লোকগুলো সাহাবীদের (রাঃ) আখেরী যুগেই বেরিয়ে পড়েছিল। আহলে সুন্নাত ঐ লোকদের মাযহাবের বিপক্ষে এই প্রকারের আয়াতগুলোকে পেশ করে থাকেন। আর এই বিষয়ের হাদীসগুলোকেও আমরা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে শুধু ঐ হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করা হলো যেগুলো আয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুশরিক কুরায়েশরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করে। তখন يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ ... -এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতগুলো তকদীর অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়।"[১]

হযরত যারারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) এ আয়াতগুলো পাঠ করে বলেনঃ "এই আয়াতগুলো আমার উম্মতের ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা শেষ যামানায় জন্মলাভ করবে এবং তকদীরকে অবিশ্বাস করবে।"[২]

হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি যম্‌যম্ কূপ হতে পানি উঠাচ্ছিলেন। তাঁর কাপড়ের অঞ্চল ভিজা ছিল। আমি বললামঃ তকদীরের ব্যাপারে সমালোচনা করা হচ্ছে। কেউ এই মাসআলার পক্ষে রয়েছে এবং কেউ বিপক্ষে রয়েছে। তিনি তখন বললেনঃ "জনগণ এরূপ করছে।" আমি বললামঃ হ্যাঁ, এরূপই হচ্ছে। তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহর শপথ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ـ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ـ -এ আয়াতগুলো তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। জেনে রেখো যে, এ লোকগুলো হলো এই উম্মতের নিকৃষ্টতম লোক। তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেয়ো না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় হাযির হয়ো না। তাদের কাউকেও যদি আমি আমার সামনে দেখতে পাই তবে আমার অঙ্গুলি দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে নিবো।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হলো, এমন একজন লোক এসেছে যে তকদীরকে বিশ্বাস করে না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমরা আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। জনগণ বললো, আপনি তো অন্ধ, সুতরাং আপনি তার কাছে গিয়ে কি করবেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি আমি তাকে হাতে পাই তবে তার নাক কেটে নিবো এবং যদি তার গর্দান ধরতে পারি তবে তা উড়িয়ে দিবো। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, বানু কাহরের নারীরা খাযরাজের চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে আছে। তাদের দেহ নড়াচড়া করছে। তারা মুশরিকা নারী। এই উম্মতের প্রথম শিরক এটাই। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তাদের নির্বুদ্ধিতা এতো চরমে পৌঁছে যাবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে কল্যাণ নির্ধারণকারী বলেও স্বীকার করবে না। যেমন তাঁকে অকল্যাণ নির্ধারণকারী বলে স্বীকার করেনি।"[৩]

---

১. এটা বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত নাফে' (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সিরিয়াবাসী একজন বন্ধু ছিল, যার সাথে তাঁর পত্র আদান প্রদান চলতো। তিনি শুনতে পেলেন যে, তাঁর ঐ বন্ধুটি তকদীর সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করে থাকে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে পত্র লিখেন– আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি নাকি তকদীরের ব্যাপারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে থাকো। যদি একথা সত্য হয় তবে আজ হতে তুমি আমার নিকট থেকে কোন পত্র প্রাপ্তির আশা করো না। আজ হতে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "আমার উম্মতের মধ্যে তকদীরকে অবিশ্বাসকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে মাজুস (প্রাচীন পারসিক যাজক মণ্ডলী) থাকে। আমার উম্মতের মাজুসী হলো ঐ লোকগুলো যারা তকদীরে বিশ্বাস করে না। তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যেয়ো না এবং তারা মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযায় হাযির হয়ো না।"[২]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "শীঘ্রই এই উম্মতের মধ্যে 'মাসখ্' হবে (অর্থাৎ লোকদের আকৃতি পরিবর্তিত হবে), জেনে রেখো যে, এ অবস্থা ঐ লোকদের হবে যারা তকদীরে বিশ্বাস করে না এবং যারা যিনদীক (অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাসী)।"[৩]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপে রয়েছে, এমনকি অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাও।"[৪]

সহীহ্ হাদীসে রয়েছেঃ "আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ ও নির্বোধ হয়ো না। অতঃপর যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায় তবে বলো যে, এটা আল্লাহ কর্তৃকই নির্ধারিত ছিল এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর এরূপ কথা বলো নাঃ যদি এরূপ করতাম তবে এরূপ হতো। কেননা, এই ভাবে 'যদি' বলাতে শয়তানী আমলের দরযা খুলে যায়।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।
৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামেউত তিরমিযীতেও এ হাদীসটি রয়েছে।
৪. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "জেনে রেখো যে, যদি সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়ে তোমার ঐ উপকার করার ইচ্ছা করে যা আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি তবে তারা তোমার ঐ উপকার কখনো করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করে যা তোমার তকদীরে লিখা নেই তবে কখনো তারা তোমার ঐ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। কলম শুকিয়ে গেছে এবং দফতর জড়িয়ে নিয়ে ভাঁজ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত ওয়ালীদ ইবনে উবাদাহ (রঃ)-এর পিতা হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) যখন রোগ শয্যায় শায়িত হন এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় তখন হযরত ওয়ালীদ (রঃ) তাঁর পিতাকে বলেনঃ "হে পিতঃ! আমাদেরকে কিছু অন্তিম উপদেশ দিন!" তখন তিনি বলেনঃ "আচ্ছা, আমাকে বসিয়ে দাও।" তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলে তিনি বলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! ঈমানের স্বাদ তুমি গ্রহণ করতে পার না এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান রয়েছে তার শেষ সীমায় তুমি পৌঁছতে পার না যে পর্যন্ত না তকদীরের ভাল মন্দের উপর তোমার বিশ্বাস হয়।" হযরত ওয়ালীদ (রঃ) তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ "আব্বা! কি করে আমি জানতে পারবো যে, তকদীরের ভাল মন্দের উপর আমার ঈমান রয়েছে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "এই ভাবে তুমি জানতে পারবে যে, তুমি যা পেয়েছো তা পাওয়ারই ছিল এবং যা পাওনি তা পাওয়ারই ছিল না এই বিশ্বাস যখন তোমার থাকবে। হে আমার প্রিয় বৎস! জেনে রেখো যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছিঃ "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেনঃ 'লিখো।' তখনই কলম উঠে গেল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যতো কিছু হবার আছে সবই লিখে ফেললো।" হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি তুমি তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বাসের উপর না থাকো তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১]

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে চারটির উপর ঈমান আনে। (এক) সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, (দুই) আর সাক্ষ্য দেবে যে, আমি (মুহাম্মাদ সঃ) আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, (তিন) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস রাখে এবং (চার) তকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনে।"[২]

১. এ হাদীসটি জামেউত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং দাঊদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ্তেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলূকের তকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐ সময় তাঁর আরশ পানির উপর ছিল।"[1]

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছা ও আহকাম বিনা বাধায় জারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ আমি যা নির্ধারণ করেছি তা যেমন হবেই, ঠিক তেমনি যে কাজের আমি ইচ্ছা করি তার জন্যে শুধু একবার 'হও' বলাই যথেষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার গুরুত্বের জন্যে হুকুম দেয়ার কোনই প্রয়োজন হয় না। চোখের পলক ফেলা মাত্রই ঐ কাজ আমার চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায়। আরব কবি কি সুন্দরই না বলেছেনঃ

إِذَا مَا أَرَادَ اللّٰهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا * يَقُولُ لَهُ كُنْ قَوْلَهُ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ "আল্লাহ যখনই কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হয়ে যাও' আর তখনই তা হয়ে যায়।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? আমার তাদেরকে শাস্তিদান ও লাঞ্ছিতকরণের মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ নেই কি? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ -

অর্থাৎ "তাদের এবং তাদের কামনা-বাসনার মধ্যে পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে করা হয়েছিল।" (৩৪ ঃ ৫৪)

তারা যা কিছু করেছে সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত ফেরেশতাগণের হাতে রক্ষিত আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই আছে লিপিবদ্ধ। এমন কিছুই নেই যা লিখতে ছুটে গেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! গুনাহকে তুচ্ছ মনে করো না, জেনে রেখো যে, আল্লাহর কাছে এরও জবাবদিহি করতে হবে।"[2]

১. ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুলাইমান ইবনে মুগীরা (রঃ) বলেনঃ “একদা আমি একটা গুনাহ করে ফেলি যেটাকে আমি অতি নগণ্য মনে করি। রাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, একজন আগন্তুক এসে আমাকে বলছেনঃ হে সুলাইমান (রঃ)!

لَاتَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ صَغِيْرًا * اِنَّ الصَّغِيْرَ غَدًا يَعُوْدُ كَبِيْرًا

اِنَّ الصَّغِيْرَ وَلَوْ تَقَادَمَ عَهْدُهٗ * عِنْدَ الْاِلٰهِ مُسَطَّرٌ تَسْطِيْرًا

فَازْجُرْ هَوَاكَ عِنْدَ الْبِطَالَةِ لَا تَكُنْ * صَعْبَ الْقِيَادِ وَشَمِّرَنْ تَشْمِيْرًا

اِنَّ الْمُحِبَّ اِذَا اَحَبَّ اِلٰهَهٗ * طَارَ الْفُؤَادُ وَاُلْهِمَ التَّفْكِيْرَا

فَاسْئَلْ هِدَايَتَكَ الْاِلٰهَ بِنِيَّةٍ * فَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّ نَصِيْرًا

অর্থাৎ “ছোট গুনাহগুলোকেও ছোট ও তুচ্ছ মনে করো না, এই ছোট গুনাহগুলোই বড় গুনাহ হয়ে যাবে। পাপ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও হয় এবং ওগুলো করার পর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েও যায় তথাপি ওগুলো আল্লাহ তা'আলার কাছে স্পষ্টভাবে লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পাপ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং এরূপ হয়ো না যে, অত্যন্ত ভারী হয়ে পুণ্যকার্যের দিকে এগিয়ে যাবে, বরং অঞ্চল উঁচু করে পুণ্য কাজের দিকে অগ্রসর হও। যখন কেউ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে মহব্বত করে তখন তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে চিন্তা-গবেষণার অভ্যাসের ইলহাম করা হয়। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হিদায়াত যাচ্ঞা কর এবং নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ কর। হিদায়াত ও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।”

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সৎ এবং আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা হবে এই পাপী ও অপরাধী লোকদের অবস্থার বিপরীত। এরা তো থাকবে বিপদ ও কষ্টের মধ্যে এবং অধঃমুখে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আর এদের উপর হবে কঠিন ধমক ও শাসন গর্জন। পক্ষান্তরে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরু থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে। তারা মর্যাদা ও সম্মান, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, দান ও ইহসান, সুখ ও শান্তি, নিয়ামত ও রহমত এবং সুন্দর ও মনোরম বাসভবনে অবস্থান করবে। অধিপতি ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা গৌরবান্বিত হবে। যে

আল্লাহ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী। যিনি সবকিছুরই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি ঐ আল্লাহভীরু লোকদের সব চাহিদাই পূর্ণ করবেন। তাদের মনোবাসনা মিটাতে মোটেই কার্পণ্য করবেন না তিনি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আদল ও ইনসাফকারী সৎলোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আলোর মিম্বরের উপর রহমানের (করুণাময় আল্লাহর) ডান দিকে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দুই হাতই ডানই বটে। এই ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোক ওরাই যারা তাদের আদেশসমূহে, নিজেদের পরিবার পরিজনের মধ্যে এবং যা কিছু তাদের অধিকারে রয়েছে সবগুলোর মধ্যেই আল্লাহর ফরমানের ব্যতিক্রম করে না, বরং আদল ও ইনসাফের সাথেই কাজ করে থাকে।"[১]

সূরা ঃ কামার এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ রহমান মাদানী

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৭৮, রুকূ' ঃ ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٧٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

হযরত যার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ " مِنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ -এর মধ্যে اٰسِنٍ শব্দটি اٰسِنٍ হবে, না أَسِنٍ হবে?" তখন তাকে জবাবে বলেনঃ "তুমি কি কুরআন পূর্ণটাই পড়েছো?" সে উত্তর দেয়ঃ "আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাকআতে পড়ে থাকি।" তিনি তখন বলেনঃ "কবিতা যেমন তাড়াতাড়ি পড়া হয়, তুমি হয় তো এই ভাবেই কুরআনও পড়ে থাকো? এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপারই বটে। আল্লাহর নবী (সঃ) মুফাসসালের প্রাথমিক সূরাগুলোর কোন দুটি সূরা মিলিয়ে পড়তেন তা আমার খুব ভাল স্মরণ আছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে মুফাসসালের সর্বপ্রথম সূরা হলো এই সূরায়ে রহমান।"[১]

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের (রাঃ) সমাবেশে আগমন করেন এবং সূরায়ে রহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নীরবে শুনতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "আমি জ্বিনের রাত্রে এ সূরাটি পাঠ করেছিলাম, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছিল। যখনই আমি فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -এই আয়াতে এসেছি তখনই তারা জবাবে বলেছেঃ

لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার অনুগ্রহ সমূহের কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করি না। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্যে।"

এই রিওয়াইয়াতটিই তাফসীরে ইবনে জারীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন অথবা তাঁর সামনে এটা পাঠ করা হয়েছিল। ঐ সময় সাহাবীদেরকে নীরব থাকতে দেখে তিনি একথা বলেছিলেন। আর জ্বিনদের উত্তরের শব্দগুলো নিম্নরূপ ছিলঃ

لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ

অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিয়ামত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।"

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- اَلرَّحْمٰنُ ○

১। দয়াময় আল্লাহ্,

٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○

২। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,

٣- خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○

৩। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ,

٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

৪। তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে,

٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○

৫। সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে,

٦- وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

৬। তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান,

٧- وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○

৭। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড,

٨- اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○

৮। যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।

٩- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

৯। ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিয়ো না।

١٠- وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○

১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে;

١١- فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○

১১। এতে রয়েছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যার ফল আবরণযুক্ত,

١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○

১২। এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।

১৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

١٣- فَبِاَيِّ الَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় ফযল ও করমে ওর মুখস্থকরণ খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। এটা হযরত হাসান (রঃ)-এর উক্তি। আর যহ্হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, بَيَان দ্বারা ভাল ও মন্দ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কথা বলা শিখানো অর্থ নেয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত। কারণ এর সাথে সাথেই কুরআন শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা তিলাওয়াতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। আর তিলাওয়াতে কুরআন কথা বলা সহজ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক অক্ষরকে ওর মাখরাজ হতে জিহ্বা বিনা কষ্টে আদায় করে থাকে। তা কণ্ঠ হতে বের হোক অথবা ওষ্ঠাধরকে মিলানোর মাধ্যমেই হোক। বিভিন্ন মাখরাজ এবং বিভিন্ন প্রকারের অক্ষরের উচ্চারণের পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিখিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এতদুভয়ের আবর্তনের মধ্যে না আছে টক্কর এবং না আছে কোন অস্থিরতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে চন্দ্রের নাগাল পায় এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" (৩৬ঃ ৪০) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

অর্থাৎ "তিনি (আল্লাহ) সকালকে বেরকারী, রাত্রিকে তিনি আরাম ও বিশ্রামের সময় বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের উপর রেখেছেন, এটা হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।" (৬ ঃ ৯৬)

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যদি সমস্ত মানুষের, জ্বিনের, চতুষ্পদ জন্তুসমূহের এবং পক্ষীকূলের চক্ষুগুলোর দৃষ্টিশক্তি একটি মাত্র মানুষের চোখে দিয়ে দেয়া হয়, অতঃপর সূর্যের সামনে যে সত্তরটি পর্দা রয়েছে ওগুলোর মধ্যে একটিকে সরিয়ে ফেলা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, এই লোকটিও সূর্যের দিকে তাকাতে পারে। অথচ সূর্যের আলো কুরসীর আলোর সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। সুতরাং এটা চিন্তা করার বিষয় যে, আল্লাহ স্বীয় জান্নাতী বান্দাদের চোখে কি পরিমাণ নূর দিবেন যে, তারা তাদের মহান প্রতিপালকের চেহারাকেও খোলাখুলিভাবে তাদের চক্ষু দ্বারা বিনা বাধায় দেখতে পাবে।[১]

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান। মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, شَجَر বলা হয় ঐ গাছকে যে গাছের গুঁড়ি আছে। কিন্তু نَجْم -এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, গুঁড়ি বিহীন লতা গাছকে نَجْم বলা হয়, যে গাছ মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, نَجْم হলো ঐ তারকা যা আকাশে রয়েছে। এ উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান, যদিও প্রথম উক্তিটিকেই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) পছন্দ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটিও দ্বিতীয় উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে।" (২২ঃ ১৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড অর্থাৎ আদল ও ইনসাফ। যেমন তিনি বলেছেনঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রতিষ্ঠিত থাকে।” (৫৭ঃ ২৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন যাতে সমস্ত জিনিস সত্য ও ন্যায়ের সাথে থাকে। তাই তিনি বলেনঃ ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিয়ো না। অর্থাৎ যখন ওযন করবে তখন সঠিকভাবে ওযন করবে। কম-বেশী করবে না। অর্থাৎ নেয়ার সময় বেশী নিবে এবং দেয়ার সময় কম দিবে এরূপ করো না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ অর্থাৎ “তোমরা ন্যায়ের দণ্ড সোজা রেখে ওযন করো।” (১৭ঃ ৩৫)

আল্লাহ তা'আলা আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর পৃথিবীকে নীচু করে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে মযবূত পাহাড় পর্বতকে পেরেকের মত করে গেড়ে দিয়েছেন যাতে এটা হেলা-দোলা ও নড়াচড়া না করে। আর তাতে যেসব সৃষ্টজীব বসবাস করছে তারা যেন শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। হে মানুষ! তোমরা যমীনের সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য করো, ওগুলোর বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার পরিমাপ করে নাও। সাথে সাথে যমীনের উৎপাদিত জিনিসের দিকে চেয়ে দেখো। এতে রঙ বেরঙ এর টক-মিষ্ট ফল, নানা প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট ফল। বিশেষ করে খেজুর বৃক্ষ যা একটি উপকারী বৃক্ষ এবং যা রোপিত হওয়ার পর হতে নিয়ে শুকনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং এর পরেও খাওয়ার কাজ দেয়। খেজুর একটি সাধারণ ফল। ওর উপর খোসা থাকে যাকে ভেদ করে এটা বের হয়ে আসে। অতঃপর ওটা হয় কাদার মত, এরপর হয় রসাল এবং এরপর পেকে গিয়ে ঠিক হয়ে যায়। এটা খুবই উপকারী। আর এর গাছও হয় খুব সোজা ও সুন্দর।

হযরত শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রোমক সম্রাট হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখেনঃ “আমার দূত আপনার নিকট হতে ফিরে এসে বলেছে যে, আপনার ওখানে নাকি একটি বৃক্ষ রয়েছে যার মত স্বভাব বা প্রকৃতি অন্য কোন গাছের মধ্যে নেই। ওটা গর্দভের কানের মত যমীন হতে বের হয়। তারপর রক্তিম বর্ণ ধারণ করে মুক্তার মত হয়, এরপর সবুজ বর্ণ ধারণ করে পান্নার (মূল্যবান সবুজ পাথর বিশেষ) মত হয়ে যায়, তারপর লাল বর্ণ ধারণ করে লাল ইয়াকূত বা পদ্মরাগের মত হয়। এরপর পেকে গিয়ে অতি উত্তম

ও সুস্বাদু ফলে পরিণত হয়। তারপর শুকিয়ে গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের রক্ষণ এবং মুসাফিরদের পাথেয় হয়। সুতরাং যদি আমার দূতের বর্ণনা সত্য হয় তবে আমার ধারণায় এটা জান্নাতী গাছ।" তাঁর এই পত্রের জবাবে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁকে লিখেনঃ "এই পত্র আল্লাহর দাস এবং মুসলমানদের নেতা উমার (রাঃ)-এর পক্ষ হতে রোমক সম্রাট কায়সারের নিকট। আপনার দূত আপনাকে যে খবর দিয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। এ ধরনের গাছ আরবে প্রচুর রয়েছে। এটা ঐ গাছ যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর পার্শ্বে জন্মিয়েছিলেন, যখন তাঁর পুত্র ঈসা (আঃ) তাঁর গর্ভ হতে ভূমিষ্ট হন। অতএব, হে বাদশাহ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে মা'বূদ মনে করবেন না। আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে তিনি মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেনঃ 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (৩ঃ ৫৯-৬০)

اَكْمَام - এর অর্থ لِيْف ও করা হয়েছে যা খেজুর বৃক্ষের গর্দানের উপর বাকল বা আবরণের মত থাকে।

এই যমীনে রয়েছে খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। عَصْف -এর অর্থ হলো ক্ষেত্রের ঐ সবুজ পাতা যাকে উপর হতে কেটে দেয়া হয় এবং শুকিয়ে নেয়া হয়।

رَيْحَان -এর অর্থ হলো সুগন্ধ গুল্ম অথবা ক্ষেতের সবুজ পাতা। ভাবার্থ এই যে, গম, যব ইত্যাদির ঐ দানা যা ওর মাথার উপর ভূষিসহ থাকে এবং যে পাতা ওগুলোর গাছের উপর জড়িয়ে থাকে। আর এটাও বলা হয়েছে যে, ক্ষেতের প্রথমেই উৎপাদিত পাতাকে তো عَصْف বলা হয়, আর যখন তাতে দানা ধরে তখন ওকে رَيْحَان বলা হয়। যেমন কবি যায়েদ ইবনে আমর স্বীয় প্রসিদ্ধ কাসীদায় বলেছেনঃ

وَقُولَا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبَّ فِي الثَّرَى * فَيُصْبِحُ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهْتَزُّ رَابِيًا

وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُءُوسِهِ * فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ رَاعِيًا

অর্থাৎ "তোমরা দু'জন (হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারূন আঃ) তাকে (ফিরাউনকে) বলোঃ কে মৃত্তিকায় শস্য উৎপাদন করেন? অতঃপর ওটা হতে চারা গাছ হয় যা আন্দোলিত হয় এবং তা হতে ওর মাথায় দানা বের করেন (কে তিনি? অর্থাৎ আল্লাহই এসব করে থাকেন)। সুতরাং এগুলোর মধ্যে সংরক্ষণকারীর জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"

তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতএব তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ দানব ও মানব) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? অর্থাৎ হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের আপাদমস্তক আল্লাহর নিয়ামত রাজির মধ্যে ডুবে রয়েছো। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করতে পার না। দু' একটি নিয়ামত হলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু এখানে তো তোমাদের পা হতে মাথা পর্যন্ত আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এ জন্যেই তো মুমিন জ্বিনগুলো একথা শোনা মাত্রই উত্তরে বলেছিলঃ

اَللّٰهُمَّ وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ اٰلَاۤئِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার এমন কোন নিয়ামত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর জবাবে বলতেনঃ لَا بِاَيِّهَا يَا رَبِّ অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমরা আপনার নিয়ামতরাজির কোন একটিও অস্বীকার করতে পারি না।"

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রিসালাতের প্রাথমিক অবস্থায় যখন ইসলাম পুরোপুরিভাবে ঘোষিত হয়নি তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বায়তুল্লাহর রুকনের দিকে নামায পড়তে দেখেছি। ঐ সময় তিনি فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ পাঠ করেছেন এবং মুশরিকরাও তা শ্রবণ করেছে।

১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হতে,

١٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

১৫। আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হতে,

١٥- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ○

১৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

١٦- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৭। তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।

١٧- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ○

১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

١٨- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৯। তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়,

١٩- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ○

২০। কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না।

٢٠- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ○

২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٢١- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২২। উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

٢٢- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ○

২৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٢٣- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২৪। সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণবপোত সমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন;

٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○

২৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٢٥- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন, তিনি মানুষকে বেজে ওঠা খোলার মত শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (জ্যোতি) হতে, জ্বিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদম (আঃ)-কে ঐ মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যার বর্ণনা তোমাদের সামনে করা হয়েছে।"[১]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নিয়ামতকে অস্বীকার না করার হিদায়াত দান করেন। এরপর তিনি বলেনঃ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই অস্তাচল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ

অর্থাৎ "আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির।" (৭০ঃ ৪০) গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দুটি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত হওয়ারও দুটি পৃথক জায়গা। ওখান হতে সূর্য উপরে উঠে ও নীচে নেমে আসে। ঋতুর পরিবর্তনে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ـ

অর্থাৎ "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তাঁকেই কর্মবিধায়ক বানিয়ে নাও।" (৭৩ঃ ৯) তাহলে এখানে মাশরিক ও মাগরিব দ্বারা এর জাতকে বুঝানো হয়েছে, আর দুটি মাশরিক ও দুটি মাগরিব দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূর্যোদয়ের দুটি স্থানকে এবং সূর্যাস্তের দুটি স্থানকে। উদয় ও অস্তের দুটি করে পৃথক পৃথক স্থান থাকার মধ্যে মানবীয় উপকার ও কল্যাণ রয়েছে বলে আবারও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেনঃ "হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? তাঁর ক্ষমতার দৃশ্য অবলোকন কর যে, দুটি সমুদ্র সমানভাবে চলতে রয়েছে। একটির পানি লবণাক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্ট। কিন্তু না ওর পানি এর পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এর পানিকে লবণাক্ত করতে পারে, না এর পানি ওর সাথে মিশ্রিত হয়ে ওর পানিকে মিশ্র করতে পারে! বরং দুটোই নিজ নিজ গতিতে চলছে! উভয়ের মধ্যে এক অন্তরায় রয়েছে। সুতরাং না এটা ওটার সাথে এবং

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ওটা এটার সাথে মিশ্রিত বা মিলিত হতে পারে। এটা নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে এবং ওটাও নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে। আর কুদরতী ব্যবধান দুটোর মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। অথচ দুটোরই পানি মিলিতভাবে রয়েছে। সূরায়ে ফুরকানের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ

অর্থাৎ “তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।” (২৫ঃ ৫৩)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসমানের সমুদ্র ও যমীনের সমুদ্রকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আসমানে যে পানির ফোঁটা রয়েছে এবং যমীনের সমুদ্রে যে ঝিনুক রয়েছে, এ দুটোর মিলনে মুক্তা জন্ম লাভ করে। এ ঘটনাটি তো সত্য বটে, কিন্তু এই আয়াতের তাফসীর এভাবে করা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, এ আয়াতে এ দুটি সমুদ্রের মাঝে বারযাখ বা অন্তরায় থাকার বর্ণনা রয়েছে যা এটাকে ওটা হতে এবং ওটাকে এটা হতে বাধা দিয়ে রেখেছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ দুটো সমুদ্র যমীনেই রয়েছে। এমনকি দুটো মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে দুটোর পানি পৃথক থাকছে। আসমান ও যমীনের মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে ওটাকে بَرْزَخ ও حِجْرًا مَّحْجُوْرًا বলা হয় না। এ জন্যে সঠিক উক্তি এটাই যে, এ দুটো যমীনেরই সমুদ্র যে দুটোর বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে, একটি যে আসমানের এবং অপরটি যমীনের তা নয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল, অথচ এগুলো পাওয়া যায় আসলে একটি সমুদ্র হতে, কিন্তু দুটোর উপর এর প্রয়োগ হয়েছে এবং এরূপ প্রয়োগ বৈধ ও সঠিক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ـ

অর্থাৎ “হে দানব ও মানবের দল! তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলগণ আসেনি?” (৬ঃ ১৩০)

আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, রাসূল শুধু মানুষের মধ্য হতেই হয়েছেন, জ্বিনদের মধ্য হতে কোন জ্বিন রাসূল রূপে আসেনি। তাহলে এখানে যেমন মানব ও

দানবের মধ্য হতে রাসূল আগমনের প্রয়োগ শুদ্ধ হয়েছে, অনুরূপভাবে এই আয়াতেও দুটো সমুদ্রের উপরই মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হওয়ার প্রয়োগ সঠিক হয়েছে। অথচ এগুলো উৎপন্ন হয় শুধু একটিতে।

لُؤْ لُؤْ অর্থাৎ মুক্তা তো একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত জিনিস। আর مَرْجَان সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ছোট মুক্তাকে মারজান বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মারজান বলা হয় বড় মুক্তাকে। এও বলা হয়েছে যে, উত্তম ও উচ্চমানের মুক্তাকে মারজান বলে। কারো কারো মতে লাল রঙ এর জওহর বা মূল্যবান পাথরকে মারজান বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মারজান বলা হয় লাল মোহরকে। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ـ

অর্থাৎ "তোমরা প্রত্যেকটা হতে বহির্গত গোশত খেয়ে থাকো যা টাটকা হয় এবং পরিধানের অলংকার বের করে থাকো।" (৩৫ঃ ১২) মাছ তো লোনা ও মিষ্ট উভয় পানি হতেই বের হয়ে থাকে, কিন্তু মণি-মুক্তা শুধু লোনা পানির সমুদ্রে পাওয়া যায়, মিষ্ট পানির সমুদ্রে নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আসমানের পানির যে বিন্দু সমুদ্রের ঝিনুকের মুখে সোজাভাবে পড়ে তাতেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। আর যখন ঝিনুকের মধ্যে পড়ে না তখন আম্বর (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ) জন্ম লাভ করে। মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণের সময় ঝিনুকও মুখ খুলে দেয়। তাই এই নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার পর আবার বলেনঃ তোমাদের যে প্রতিপালকের এসব অসংখ্য নিয়ামত তোমাদের উপর রয়েছে তাঁর কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণবপোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, যেগুলো হাজার হাজার মণ মাল এবং শত শত মানুষকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিরাট নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় বলেনঃ এখন বল তো, তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে?

হযরত উমরাহ ইবনে সুওয়ায়েদ (রঃ) বলেনঃ "আমি একদা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর সাথে ফুরাত নদীর তীরে ছিলাম। নদীতে একটি বিরাট জাহাজ চলে আসছিল। জাহাজটিকে আসতে দেখে হযরত আলী (রাঃ) ঐ

জাহাজটির দিকে হাতের ইশারা করে وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ -এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "যিনি এই পর্বত প্রমাণ জাহাজকে নদীতে চালিত করেছেন ঐ আল্লাহর কসম! আমি হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যাও করিনি, হত্যা করার ইচ্ছাও করিনি এবং হত্যাকারীদের সাথে শরীকও ছিলাম না।"[১]

২৬। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,

٢٦- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

২৭। অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব;

٢٧- وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

২৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٢٨- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

২৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

٢٩- يَسْـَٔلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۝

৩০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٣٠- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীনের সমস্ত মাখলূকই ধ্বংসশীল। এমন একদিন আসবে যে, এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবে না। প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ যাকে চাইবেন সেটা অন্য কথা। শুধু আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রথমে তো আল্লাহ তা'আলা জগত সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন, অতঃপর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত দু'আগুলোর মধ্যে একটি দু'আ নিম্নরূপও রয়েছেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ ـ

অর্থাৎ "হে চিরঞ্জীব, হে স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আমরা আপনার করুণার মাধ্যমেই ফরিয়াদ করছি। আমাদের সমস্ত কাজ আপনি ঠিক করে দিন! চোখের পলক বরাবর সময়ও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছে সমর্পণ করবেন না এবং আপনার সৃষ্টির কারো কাছেও নয়।"

হযরত শা'বী (রঃ) বলেনঃ "যখন তুমি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ করবে তখন সাথে সাথে وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এটাও পড়ে নিয়ো।" এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতইঃ

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

অর্থাৎ "তাঁর (আল্লাহর) চেহারা বা সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।" (২৮ঃ ৮৮)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তার প্রশংসায় বলেনঃ 'তিনি মহিমময় ও মহানুভব।' অর্থাৎ তিনি সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। তিনি এই অধিকার রাখেন যে, তাঁর উচ্চপদ সুলভ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেয়া হবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া হবে এবং তাঁর ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ـ

অর্থাৎ "যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডেকে থাকে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি চায় তাদের সাথে তুমি নিজের নফসকে আটক রেখো।" (১৮ঃ ২৮) আর যেমন তিনি দান-খায়রাতকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ অর্থাৎ "শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করে থাকি।" (৭৬ঃ ৯)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ- এর অর্থ হলো ذُو الْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও আড়ম্বরপূর্ণ।

সমস্ত জগতবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবর দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, এরপরে তাদেরকে পরকালে মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। এরপরে আল্লাহ্ পাক পুনরায় বলেনঃ হে দানব ও মানব! সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত, বরং সমস্ত মাখলূক তাঁরই মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর কাছে ভিক্ষুক। তিনি ধনী, আর সবাই দরিদ্র। তিনি সবারই অভাব পূরণকারী। প্রত্যেক সৃষ্টজীব তাঁর দরবারে স্বীয় অভাব ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে এবং ওগুলো পূরণের জন্যে তাঁর কাছে আবেদন জানায়। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন, প্রত্যেক প্রার্থীকেই তিনি দান করেন। যাদের অবস্থা সংকীর্ণ তাদেরকে প্রশস্ততা প্রদান করেন। বিপদগ্রস্তদেরকে পরিত্রাণ দেন, রোগীদেরকে দান করেন সুস্থতা, দুঃখীদের দুঃখ দূর করেন, অসহায়ের প্রার্থনা কবূল করেন ও তাকে প্রশান্তি দান করেন, পাপীরা যখন তাদের পাপের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। জীবন তিনিই দান করেন এবং মৃত্যুও তিনিই ঘটিয়ে থাকেন। সমস্ত আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী তাঁর সামনে তাদের হস্ত প্রসারিত করে রয়েছে এবং অঞ্চল পেতে আছে। ছোটদেরকে তিনিই বড় করেন, তিনিই বন্দীদেরকে মুক্তি দেন। সৎলোকদের প্রয়োজন পৌঁছানোর শেষ সীমা, তাদের প্রার্থনার লক্ষ্যস্থল এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রত্যাবর্তন স্থল তিনিই। গোলামদের মুক্তিদান তিনিই করেন এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহীদেরকে তিনিই পুরস্কার দান করে থাকেন। এটাই তাঁর মাহাত্ম্য।

হযরত মুনীব ইযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ -এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ শান কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "ওটা হলো পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া, দুঃখ করা এবং লোকদের উত্থান ও পতন ঘটানো।"[১]

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ একথা বলেছেন।" অতঃপর তিনি

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বলেনঃ ঐ শান হলো এই যে, তিনি গুনাহ্ মাফ করেন, দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, কোন সম্প্রদায়ের উত্থান দেন এবং কোন সম্প্রদায়ের পতন ঘটান।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফূযকে সাদা মুক্তা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যার দাফ্না দুটি লাল পদ্মরাগের তৈরী। ওর কলম জ্যোতি, ওর কিতাব জ্যোতি, ওর প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। তিনি প্রত্যহ ওটাকে তিনশত বার দেখে থাকেন। প্রত্যেক দর্শনে তিনি জীবনদান করেন, মৃত্যু ঘটান, ইয্যত দেন, লাঞ্ছিত করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা-ই করে থাকেন।

৩১- سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝

৩১। হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো,

৩২- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৩- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

৩৩। হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতীরেকে।

৩৪- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৪। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৫- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

৩৫। তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

১. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আসাকির (রঃ)-ও প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারীতেও এ রিওয়াইয়াতটি মুআল্লাক রূপে হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর উক্তিতে বর্ণিত আছে। মুসনাদে বায্যারেও কিছু কম বেশীর সাথে মারফূ'রূপে এটা বর্ণিত আছে।

৩৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٣٦- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

ফারেগ বা মুক্ত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, এ সময় কোন ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন, বরং এটা ধমক হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এখন সঠিকভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। এখন আল্লাহ তা'আলাকে আর কোন কিছুই মশগুল করবে না, বরং তিনি শুধু তোমাদেরই হিসাব গ্রহণ করবেন। আরবদের বাক পদ্ধতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। যেমন ক্রোধের সময় কেউ কাউকেও বলে থাকেঃ "আচ্ছা, অবসর সময়ে আমি তোমাকে দেখে নেবো।" এখানে এ অর্থ নয় যে, এখন সে ব্যস্ত রয়েছে। বরং ভাবার্থ হচ্ছেঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে দেখে নিবো এবং তোমার অসাবধানতায় ও উদাসীনতায় তোমাকে পাকড়াও করবো।

ثَقَلَيْن দ্বারা মানব ও দাবনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছেঃ يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ "(কবরে শায়িত ব্যক্তির চীৎকারের শব্দ) প্রত্যেক জিনিসই শুনতে পায় মানব ও দানব ব্যতীত।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছেঃ اِلَّا الْاِنْسُ وَالْجِنُّ অর্থাৎ "মানুষ ও জ্বিন ছাড়া।" আর সূর বা শিঙ্গার হাদীসে পরিষ্কারভাবে রয়েছেঃ اَلثَّقَلَانِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ অর্থাৎ সাকালান হলো মানুষ ও জ্বিন। মহান আল্লাহ আবারও বলেনঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে দানব ও মানব! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং তাঁর নির্ধারণকৃত তকদীর হতে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না, বরং তিনি তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। তাঁর হুকুম তোমাদের উপর বিনা বাধায় জারী রয়েছে। তোমরা যেখানেই যাবে সেখানেও তাঁরই রাজত্ব। এটা প্রকৃতভাবে ঘটবে হাশরের মাঠে। সেখানে সমস্ত মাখলূককে ফেরেশতামণ্ডলী চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করবেন। চতুষ্পার্শ্বে তাদের সাতটি করে সারি হবে। কোন লোকই আল্লাহর দলীল ছাড়া এদিক ওদিক যেতে পারবে না। আর দলীল আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেনঃ

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ - كَلَّا لَا وَزَرَ - اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ -

অর্থাৎ "সেদিন মানুষ বলবেঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয় স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।" (৭৫ঃ ১০-১২) আল্লাহ পাক আরেক জায়গায় বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যারা মন্দ কাজ করে তাদের মন্দ কাজের তুল্য শাস্তি দেয়া হবে, তাদের উপর লাঞ্ছনা সওয়ার হবে, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, তাদের চেহারা অন্ধকার রাত্রির টুকরার মত হবে, তারা জাহান্নামবাসী, ওর মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থানকারী।" (১০ ঃ ২৭)

شُوَاظٌ শব্দের অর্থ হলো অগ্নিশিখা যা ধূম্র মিশ্রিত সবুজ রঙ এর, যা পুড়িয়ে বা ঝলসিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেন যে, এটা হলো ধূম্রবিহীন অগ্নির উপরের শিখা যা এমনভাবে ধাবিত হয় যে, যেন ওটা পানির তরঙ্গ।

نُحَاسٌ বলা হয় ধূম্রকে। এ শব্দটি নূনে যবর সহও এসে থাকে। এখানে কিন্তু কিরআত নূনে পেশসহই রয়েছে। কবি নাবেগার কবিতাতেও এ শব্দটি ধূম্রের অর্থে এসেছে। কবিতাংশটি হলোঃ

يَضِيْءُ كَضَوْءِ سِرَاجِ السَّلِيْطِ * لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ فِيْهِ نُحَاسًا

অর্থাৎ "ওটা আলোকিত হয় সলিতা বিশিষ্ট প্রদীপের আলোকের মত, যাতে আল্লাহ্ ধূম্র রাখেননি।" তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, شُوَاظ দ্বারা ঐ অগ্নিশিখাকে বুঝানো হয়েছে যাতে ধূম্র থাকে না এবং তিনি তাঁর এ মতের প্রমাণ হিসেবে উমাইয়া ইবনে আবি সালাতের কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে দেন। আর তিনি نُحَاس -এর অর্থ করেছেন শুধু ধূম্র যাতে শিখা থাকে না। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কবি নাবেগার উপরোক্ত কবিতাংশটি পেশ করেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, نُحَاس দ্বারা ঐ পাতিল বা কড়াইকে বুঝানো হয়েছে যাকে গলানো হবে এবং জাহান্নামীদের মস্তকের উপর ঢেলে দেয়া হবে। মোটকথা, ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি তোমরা কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দান হতে পালাবার ইচ্ছা কর তবে ফেরেশতামণ্ডলী ও জাহান্নামের দারোগারা তোমাদের উপর আগুন বর্ষিয়ে, ধূম্র ছেড়ে দিয়ে এবং তোমাদের মাথায় গলিত পাতিল বহিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। না তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে পারবে, না প্রতিরোধ করতে পারবে এবং না পারবে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করা তোমাদের মোটেই উচিত নয়।

٣٧- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

৩৭। যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেই দিন ওটা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে;

٣٨- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ○

৩৯। সেই দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে?

٤٠- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ○

৪১। অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে; তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে।

٤٢- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٤٣- هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ○

৪৩। এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো,

٤٤- يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ○

৪৪। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।

٤٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এটা অন্যান্য আয়াতগুলোতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ـ

অর্থাৎ “আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।” (৬৯ঃ ১৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيلًا ـ

অর্থাৎ “যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে।” (২৫ঃ ২৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ

অর্থাৎ “যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।” (৮৪ঃ ১-২) চাঁদি ইত্যাদিকে যেমন গলিয়ে দেয়া হয় তেমনই আকাশের অবস্থা হবে। সেই দিন আকাশ লাল, হলদে, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ ধারণ করবে। এটা হবে কিয়ামতের দিনের কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন লোকদেরকে উঠানো হবে এবং ঐ অবস্থায় তাদের উপর আকাশ হতে হালকা বৃষ্টি বর্ষিত হবে।”[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ -এর তাফসীরে বলেছেন যে, সেদিন আকাশ লাল চামড়ার মত হয়ে যাবে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, গোলাপী রঙ এর ঘোড়ার মত আকাশের রঙ হবে। আবূ সালেহ (রঃ) বলেন যে, প্রথমে গোলাপী রঙ এর হবে, তারপর লাল হয়ে যাবে। গোলাপী রঙ এর ঘোড়ার রঙ বসন্তকালে হলদে বর্ণের দেখা যায় এবং শীতকালে ঐ রঙ পরিবর্তিত হয়ে লাল বর্ণ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তার রঙ পরিবর্তিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে আকাশের রঙও বিভিন্ন রঙএ পরিবর্তিত হতে থাকবে। ওর রঙ গলিত তামার মত হয়ে যাবে, যেমন গোলাপী রাওগানের (তেলের) রঙ হয়ে থাকে। আসমান এই রঙ এর হয়ে যাবে। আজ এটা সবুজ রঙ এর আছে, কিন্তু ঐদিন এর রঙ লাল হয়ে যাবে। এটা যয়তূন তেলের তলানি বা গাদের মত হয়ে যাবে। জাহান্নামের আগুনের তাপ ওকে গলিয়ে দিয়ে তেলের মত করে দিবে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ـ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ـ

অর্থাৎ "এটা ঐ দিন যে, কেউ কথা বলতে পারবে না এবং তাদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।" (৭৭ঃ ৩৫-৩৬) আবার অন্য আয়াতে তাদের কথা বলা, ওযর পেশ করা, তাদের হিসাব গ্রহণ করা ইত্যাদিরও বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছেঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকেই প্রশ্ন করবো।" (১৫ঃ ৯২) তাহলে ভাবার্থ এই যে, এক অবস্থা বা পরিস্থিতিতে এরূপ হবে এবং অন্য অবস্থা বা পরিস্থিতিতে ঐরূপ হবে। প্রশ্ন করা হবে, হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং ওযর-আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং হাত, পাও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। এরপরে আর জিজ্ঞাসাবাদের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। ওযর-আপত্তিরও কোন সুযোগ থাকবে না। অথবা সমাধান এভাবে হতে পারে যে, অমুক অমুক কাজ করেছে কি করেনি এ প্রশ্ন কাউকে করা হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ওটা খুব ভালরূপেই জানা আছে। হ্যাঁ, তবে প্রশ্ন যা করা হবে তা হলোঃ 'তুমি এ কাজ কেন করেছিলে?' তৃতীয় উক্তি এই যে, ফেরেশতারা তাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না। কেননা, তাঁরা তো তাদের চেহারা দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলবেন এবং জাহান্নামের জিঞ্জীরে বেঁধে উল্টো মুখে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কেননা, এরপরেই রয়েছেঃ 'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে।' মুখ হবে কালো ও মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট। অপরপক্ষে মুমিনদের চেহারা হবে মর্যাদা মণ্ডিত। তাদের অযূর অঙ্গগুলো চন্দ্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। জাহান্নামীদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেমনভাবে বড় জ্বালানী কাষ্ঠকে দুই দিকে ধরে চুল্লীতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের পিঠের দিক হতে জিঞ্জীর লাগিয়ে গর্দান ও পা-কে এক করে বেঁধে ফেলা হবে, কোমর ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং পা ও কপালকে মিলিয়ে দেয়া হবে এবং এই ভাবে শৃংখলিত করা হবে।

কিন্দা গোত্রের একটি লোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। পর্দার পিছনে বসে তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন তিনি কারো জন্যে কোন

সুপারিশ করার অধিকার রাখবেন না?” উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, একদা একই কাপড়ে আমরা দুই জন ছিলাম, ঐ সময় আমি তাঁকে এই প্রশ্নই করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ “হ্যাঁ, যখন পুলসিরাত রাখা হবে ঐ সময় আমাকে কারো জন্যে শাফাআত করার অধিকার দেয়া হবে না। যে পর্যন্ত না আমি জানবো যে, স্বয়ং আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর যেই দিন কারো চেহারা হবে উজ্জ্বল এবং কারো চেহারা হবে মলিন, শেষ পর্যন্ত আমি চিন্তা করবো যে, আমার ব্যাপারে কি করা হবে বা আমার প্রতি কি অহী করা হবে! আর পুলসিরাতের নিকট, যখন ওটাকে তীক্ষ্ণ ও গরম করা হবে! তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতার সীমা যে কি?” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওর তীক্ষ্ণতা ও গরমের সীমা কি? তিনি উত্তর দিলেনঃ “তরবারীর ধারের মত তীক্ষ্ণ হবে এবং আগুনের অঙ্গারের মত গরম হবে। মুমিন তো সহজেই পার হয়ে যাবে, তার কোনই ক্ষতি হবে না। আর মুনাফিক লটকে যাবে। যখন সে মধ্যভাগে পৌঁছবে তখন তার পা জড়িয়ে যাবে। সে তার হাত তার পায়ের কাছে নিয়ে যাবে। যেমন যখন কেউ নগ্ন পদে চলে, তখন যদি তার পায়ে কাঁটা ফুটে যায় এবং এতো জোরে ফুটে যে, যেন পা-কে ছিদ্র করে দিয়েছে, তখন সে যেভাবে অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি মাথা ও হাত ঝুঁকিয়ে দিয়ে পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, অনুরূপভাবে সেও ঝুঁকে পড়বে। এদিকে সে এভাবে ঝুঁকে পড়বে আর ওদিকে জাহান্নামের দারোগা তার পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামের জিঞ্জীর দ্বারা বেঁধে ফেলবেন। অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। ওর মধ্যে সে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি কি পরিমাণ ভারী হবে? তিনি জবাবে বললেনঃ “দশটি গর্ভবতী উষ্ট্রীর মত।” অতঃপর তিনি يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ - (অর্থাৎ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে)।[১]

ঐ পাপী ও অপরাধীদেরকে বলা হবেঃ এটা সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ওটা স্বচক্ষে দেখছো। একথা তাদেরকে বলা হবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করার জন্যে এবং তাদেরকে খাটো

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল। এর কতকগুলো শব্দ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা হওয়া অস্বীকৃত। এতে এমন একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাঁর নাম নীচের বর্ণনাকারী নেননি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

করে দেখাবার জন্যে। অতঃপর তাদের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, কখনো তাদের আগুনের শাস্তি হচ্ছে, কখনো গরম পানি পান করানো হচ্ছে যা গলিত তাম্রের মত শুধু অগ্নি, যা নাড়ী-ভূঁড়ি কেটে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ یُسْحَبُوْنَ فِی الْحَمِیْمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ -

অর্থাৎ "যখন তাদের গলায় গলাবন্ধ থাকবে এবং পায়ে বেড়ী থাকবে। তাদেরকে গরম পানি হতে জাহান্নামে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বারবার জ্বালানো হবে।" (৪০ঃ ৭১-৭২) হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির প্রাথমিক সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওটা গরম করা হচ্ছে। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তির মাথার ঝুঁটি ধরে তাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে। ফলে দেহের সমস্ত গোশত খসে যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং দুই চক্ষু ও অস্থির কাঠামো বা ঠাট শুধু রয়ে যাবে। এটাকেই فِی الْحَمِیْمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ বলা হয়েছে। اٰنٍ -এর অর্থ বর্তমানও করা হয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اٰنِیَةٍ

অর্থাৎ "বিদ্যমান কঠিন গরম পানির নহর হতে তাদেরকে পান করানো হবে।" (৮৮ঃ ৫) যা কখনো পান করা যাবে না। কেননা, ওটা আগুনের মত সীমাহীন গরম। কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ غَیْرَ نٰظِرِیْنَ اِنٰىهُ (৩৩ঃ ৫৩) এখানে এর দ্বারা খাদ্যের প্রস্তুতি ও রান্না হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পাপীদের শাস্তি এবং পুণ্যবানদের পুরস্কারও আল্লাহর ফযল, রহমত, ইনসাফ ও স্নেহ, নিজের এই শাস্তির বর্ণনা পূর্বে দিয়ে দেয়া যাতে শিরক ও অবাধ্যাচরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, এটাও তাঁর নিয়ামত, সেই হেতু আবারও তিনি প্রশ্ন করেনঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪৬। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান;

٤٦- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ

৪৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٧- فَبِاَيِّ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
৪৮। উভয়টিই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ;	٤٨- ذَوَاتَا اَفْنَانٍ ○
৪৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٩- فَبِاَيِّ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
৫০। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ;	٥٠- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ○
৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥١- فَبِاَيِّ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
৫২। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার;	٥٢- فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ○
৫৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٣- فَبِاَيِّ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

ইবনে শাওযিব (রঃ) ও আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ -এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত আতিয়্যা ইবনে কায়েস (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ লোকটির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে বলেছিলঃ "তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে, তাহলে সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে খুঁজে পাবেন না।" একথাটি বলার পর লোকটি একদিন ও এক রাত ধরে তাওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করেন ও তাকে জান্নাতে নিয়ে যান। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি সাধারণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এটাই। ভাবার্থ এই যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বাঁচিয়ে রাখে, হঠকারিতা করে না, পার্থিব জীবনের পিছনে পড়ে আখিরাত হতে উদাসীন থাকে না, বরং আখিরাতের চিন্তাই বেশী করে এবং ওটাকে উত্তম ও চিরস্থায়ী মনে করে, ফরয কাজগুলো সম্পাদন করে

এবং হারাম কাজগুলো হতে দূরে থাকে, কিয়ামতের দিন তাকে একটি নয়, বরং দু'টি জান্নাত দান করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'টি জান্নাত চাঁদির হবে এবং ওর সমস্ত আসবাবপত্রও চাঁদিরই হবে। আর দুটো জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত। ওর বরতন এবং ওতে যা কিছু রয়েছে সবই হবে সোনার। ঐ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, থাকবে শুধু তাঁর কিবরিয়ার চাদর যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে। এটা থাকবে জান্নাতে আদনে।"[১]

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হাম্মাদ (রঃ) বলেনঃ আমার ধারণায় তো এ হাদীসটি মারফূ'। এটা ... وَلِمَنْ خَافَ এবং وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ-এর তাফসীর।

স্বর্ণ নির্মিত জান্নাত দুটি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভকারী লোকদের জন্যে এবং চাঁদি বা রৌপ্য নির্মিত জান্নাত দুটি আসহাবে ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের জন্যে।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ... وَلِمَنْ خَافَ-এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি বললামঃ যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? আবার তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং আমিও আবার ঐ প্রশ্নটি করলাম। পুনরায় তিনি আয়াতটি পাঠ করলেন এবং আমিও পুনরায় ঐ প্রশ্নই করলাম। তখন তিনি বললেনঃ "যদি আবূ দারদা (রাঃ)-এর নাক ধুলায় ধূসরিত হয়।"[২]

কোন কোন সনদে এ রিওয়াইয়াতটি মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে এবং আবূ দারদা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, যার অন্তরে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রয়েছে তার দ্বারা ব্যভিচার ও চুরি অসম্ভব।

এ আয়াতটি সাধারণ, দানব ও মানব উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, জ্বিনদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর ভীতি অন্তরে রাখবে তারাও জান্নাতে যাবে। এ জন্যেই এরপরে দানব ও মানবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবি দাউদ ছাড়া অন্যান্য সব গ্রন্থেই এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দুটির গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, উভয় জান্নাতই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। নানা প্রকারের সুস্বাদু ফল তথায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দানব ও মানবের উচিত নয় যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। أَفْنَانٌ বলা হয় শাখা বা ডালকে। এগুলো বহু সংখ্যক রয়েছে এবং একটি অপরটির সাথে মিলিতভাবে আছে। এগুলো ছায়াদার হবে, যেগুলোর ছায়া দেয়ালগুলোর উপরও উঠে থাকবে। এই শাখাগুলো সোজা হবে ও ছড়িয়ে থাকবে। ওগুলো রঙ বেরঙ এর হবে। ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওগুলো বিভিন্ন প্রকারের ফল থাকবে।

হযরত আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ "ওর শাখাগুলোর ছায়া এতো দীর্ঘ হবে যে, একজন অশ্বারোহীর এক শত বছর পর্যন্ত ঐ ছায়ায় চলে যাবে।" অথবা বলেছেনঃ "একশ জন অশ্বারোহী ওর নীচে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে।" সোনার ফড়িংগুলো তাতে ছেয়েছিল। ওর ফলগুলো ছিল বড় বড় মট্‌কার মত অত্যন্ত বড় ও গোল।"[১]

ঐ জান্নাতদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দুটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে যাতে ঐ উদ্যানগুলোর গাছ ও শাখা সজীব ও সতেজ থাকে এবং অধিক ও উন্নত মানের ফল দান করে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ অতএব হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

প্রস্রবণ দুটির একটির নাম তাসনীম এবং অপরটির নাম সালসাবীল। এ দুটি প্রস্রবণ পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হলো স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং অপরটি হলো সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবে না।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। আরো বহু ফল রয়েছে যেগুলোর আকৃতি তোমাদের নিকট পরিচিত কিন্তু স্বাদ মোটেই পরিচিত নয়। কেননা, তথাকার নিয়ামত না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে, না মানুষের অন্তরে ওর কল্পনা জেগেছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যত প্রকারের তিক্ত ও মিষ্ট ফল আছে এগুলোর সবই জান্নাতে থাকবে, এমনকি হানযাল ফলও থাকবে। হ্যাঁ,

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তবে দুনিয়ার এই জিনিসগুলো এবং জান্নাতের ঐ জিনিসগুলোর নামে তো মিল থাকবে বটে, কিন্তু স্বাদ হবে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে তো শুধু নাম রয়েছে, মূলতত্ত্ব তো রয়েছে জান্নাতে। এই মর্যাদার পার্থক্য ওখানে যাবার পরেই জানা যেতে পারে, পূর্বে জানা সম্ভব নয়।

৫৪। সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।

٥٤- مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَّجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○

৫৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٥٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৫৬। সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।

٥٦- فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ○

৫৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٥٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৫৮। তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ;

٥٨- كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ○

৫৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٥٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬০। উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?

٦٠- هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ○

৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٦١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ জান্নাতী লোকেরা বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে, শুয়েই থাকুক বা আরামে বসেই থাকুক। তাদের বিছানাও এমন উন্নত মানের হবে যে, ওর ভিতরের আস্তরও হবে খাঁটি মোটা রেশমের তৈরী। তাহলে উপরটা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মালিক ইবনে দীনার (রঃ) এবং সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, আস্তর যদি এরূপ হয় তাহলে বাইরের অংশ তো অবশ্যই নূরানী বা জ্যোতির্ময় হবে যা সরাসরি রহমতের বহিঃপ্রকাশ ও নূর হবে। তারপর তাতে কত যে সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য করা থাকবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এই জান্নাতের ফলগুলো জান্নাতীদের খুবই নিকটে থাকবে। যখন চাইবে এবং যে অবস্থায় চাইবে সেখান হতেই নিয়ে নিবে। শুয়ে থাকলে বসার এবং বসে থাকলে দাঁড়াবার প্রয়োজন হবে না। ডালগুলো নিজে নিজেই ঝুঁকে পড়বে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ অর্থাৎ "যার ফলগুলো অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।" (৬৯ঃ ২৩) আরো বলেনঃ "ফল অত্যন্ত নিকটে থাকবে, নিতে মোটেই কষ্ট করতে হবে না। স্বয়ং শাখাগুলো ঝুঁকে পড়বে ও তাকে ফল প্রদান করবে। সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।"

ফরাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহ তা'আলা এরপর বলছেন যে, ঐ জান্নাতীদের সাথে ফরাশের উপর আয়তনয়না হূরীরা থাকবে যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর কারো দিকে তাকাবে না এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে আসক্ত থাকবে। এই জান্নাতী হূরীরাও তাদের এই মুমিন স্বামীদের অপেক্ষা উত্তম আর কাউকেও পাবে না। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হূরীরা তাদের জান্নাতী স্বামীদেরকে বলবেঃ 'আল্লাহর শপথ! সারা জান্নাতের মধ্যে আপনাদের চেয়ে আমাদের জন্যে উত্তম আর কিছুই নেই। আল্লাহ জানেন যে, আমাদের অন্তরে জান্নাতের কোন জিনিসের প্রতি চাহিদা ও ভালবাসা তেমন নেই যেমন আপনাদের প্রতি রয়েছে।' তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জান্নাতী স্বামীকে বলবেঃ 'আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার অংশে ফেলেছেন এবং আমাকে আপনার খিদমত করার সুযোগ দিয়ে গৌরবের অধিকারিণী করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, এই হূরীদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। এ আয়াতটিও মুমিন জ্বিনদের জান্নাতে যাওয়ার দলীল।

হযরত যমরাহ্ ইবনে হাবীব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "মুমিন জ্বিনও কি জান্নাতে যাবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, মহিলা জ্বিনদের সাথে তাদের বিয়ে হবে যেমন মানুষ নারীর সাথে মানুষের বিয়ে হবে।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

এরপর ঐ হূরদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে এমন যেমন ইয়াকূত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ)। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ইয়াকূতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতীদের স্ত্রীদের প্রত্যেকে এমনই যে, তার পদনালীর শুভ্রতা সত্তরটি রেশমের হুল্লার (পোশাক বিশেষ) মধ্য হতেও দেখা যাবে, এমন কি ভিতরের মজ্জাও দৃষ্টিগোচর হবে।" অতঃপর তিনি كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ-এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "দেখো, ইয়াকূত একটি পাথর বটে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ওতে স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য এতই দান করেছেন যে, যদি ওর মধ্যে সূতা পরিয়ে দেয়া হয় তবে বাহির হতে তা দেখা যাবে।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক জান্নাতবাসীর দুটি করে স্ত্রী এই গুণ বিশিষ্ট হবে যে, তারা সত্তরটি করে হুল্লা পরিধান করে থাকা সত্ত্বেও তাদের পদনালীর ঝলক বা ঔজ্জ্বল্য বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং অধিক স্বচ্ছতার কারণে ওর ভিতরের মজ্জাও দেখতে পাওয়া যাবে।"[২]

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেনঃ গৌরব হিসেবে অথবা আলোচনা হিসেবে এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, না নারীর সংখ্যা বেশী হবে? তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আবুল কাসেম (সঃ) কি এ উক্তি করেননি? তিনি বলেছেনঃ "প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াইয়াতটি জামে তিরমিযীতেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকেই সঠিকতর বলেন।

২. ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট। তাদের প্রত্যেকেরই এমন দুটি করে স্ত্রী হবে যাদের পদনালীর মজ্জা গোশ্‌ত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেউই স্ত্রীবিহীন থাকবে না।"[১]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। জান্নাতে যে জায়গা তোমরা লাভ করবে ওর মধ্যে একটি কামান বা একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। যদি জান্নাতের স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোন একজন স্ত্রীলোক দুনিয়ায় উঁকি মারে তবে যমীন ও আসমান আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় হয়ে উঠবে। তাদের হালকা ও ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম।"[২]

মহান আল্লাহ বলেনঃ উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে? অর্থাৎ ভাল কাজের জন্যে ভাল পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

অর্থাৎ "যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে এবং আরো অতিরিক্ত রয়েছে।" (১০ঃ ২৬) অর্থাৎ জান্নাতে দীদারে বারী তা'আলা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর স্বীয় সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি করেছেন তা তোমরা জান কি?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।" তিনি উত্তরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি যাকে তাওহীদের অনুগ্রহ (দুনিয়ায়) দান করেছি তার প্রতিদান জান্নাত।"যেহেতু এটা একটা খুব বড় নিয়ামত এবং যা প্রকৃতপক্ষে কোন আমলের বিনিময় নয়, সেই হেতু এর পর পরই বলেনঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার শুভ সংবাদ সম্পর্কে জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসটিও লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ভয় করলো সে রাত্রির অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লো এবং যে অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়লো সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। সাবধান! আল্লাহর পণ্যদ্রব্য খুবই মূল্যবান। জেনে রেখো যে, ঐ পণ্যদ্রব্য হলো জান্নাত।"[৩]

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এর আসল সহীহ বুখারীতেও রয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে গারীব বলেছেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেনঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান।' তখন তিনি বলেনঃ "যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে?" হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরে বর্ণিত হয়েছে।

٦٢- وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ○

৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে;

٦٣- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٦٤- مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ○

৬৪। ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি;

٦٥- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ○

৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٦٦- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ○

৬৬। উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ;

٦٧- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٦٨- فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ○

৬৮। সেথায় রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার;

٦٩- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٧٠- فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ○

৭০। সেই সকলের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ;

٧١- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٧٢- حُورٌ مَّقْصُورٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۝

৭২। তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর;

٧٣- فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٧٤- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ۝

৭৪। তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।

٧٥- فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٧٦- مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ۝

৭৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।

٧٧- فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٧٨- تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝ (ع ٣ ٣٣ ١٣)

৭৮। কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

এ আয়াতগুলোতে যে দুটি জান্নাতের বর্ণনা রয়েছে এ দুটো জান্নাত ঐ দুটো জান্নাত অপেক্ষা নিম্ন মানের যে দুটোর বর্ণনা পূর্বে গত হলো। ঐ হাদীসের বর্ণনাও গত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, দুটো জান্নাত স্বর্ণের ও দুটো জান্নাত রৌপ্যের। প্রথমটি বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের স্থান এবং দ্বিতীয়টি আসহাবে ইয়ামীনের স্থান। মোটকথা, এ দুটোর মান ঐ দুটোর তুলনায় কম। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রমাণ এই যে, ঐ দুটির গুণাবলীর বর্ণনা এ দুটির পূর্বে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বে বর্ণনা দেয়াই ঐ দুটির ফযীলতের বড় প্রমাণ। তারপর এখানে وَمِنْ دُوْنِهِمَا বলা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এ দুটি ঐ দুটি অপেক্ষা নিম্নমানের। ওখানে ঐ দুটির প্রশংসায় ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ বলা হয়েছে অর্থাৎ বহু

শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। আর এখানে বলা হয়েছে مُدْهَامَّتَانِ অর্থাৎ ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবুজ অর্থ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো সজীবতে পরিপূর্ণ। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ এতো বেশী পাকা পাকা ফল ধরে রয়েছে যে, সম্পূর্ণ বাগান সবুজ-শ্যামল মনে হচ্ছে। মোটকথা, ওখানে শাখাগুলোর প্রাচুর্যের বর্ণনা রয়েছে এবং এখানে গাছগুলোর আধিক্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঐগুলো ও এগুলোর মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে।

ঐ দুটি উদ্যানের দুটি প্রস্রবণের ব্যাপারে تَجْرِيَانِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবহমান দুটি প্রস্রবণ। আর এই দুটি উদ্যানের দুটি প্রস্রবণ সম্পর্কে نَضَّاخَتَانِ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উচ্ছলিত দুটি প্রস্রবণ। আর এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, উচ্ছলিত হওয়ার চেয়ে প্রবহমান হওয়া উচ্চতর।

ঐখানে বলা হয়েছে যে, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। আর এখানে বলা হয়েছে যে, উদ্যান দুটিতে রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বের উদ্যান দুটির শব্দগুলো সাধারণত্বের জন্যে। ওটা প্রকারের দিক দিয়ে এবং পরিমাণ বা সংখ্যার দিক দিয়েও এটার উপর ফযীলত রাখে। কেননা, এখানে فَاكِهَةٌ শব্দটি নাকেরাহ বটে, কিন্তু হিসাবে اِثْبَات-এর জন্যে। সুতরাং এটা عَام বা সাধারণ হতে পারে না। এজন্যেই তাফসীর হিসেবে পরে نَخْل ও رُمَّان বলে দিয়েছেন। যেমন خَاص-এর عَطْف বা সংযোগ عَام-এর উপর হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ মনীষীদের تَحْقِيق বা শব্দ বিশ্লেষণও এটাই।

খেজুর ও আনারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য ফলের উপর এ দুটোর মর্যাদা রয়েছে।

মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদীতে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীদের কতক লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! জান্নাতে ফল আছে কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, তথায় রয়েছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার।" তারা আবার প্রশ্ন করেঃ "তারা (অর্থাৎ জান্নাতীরা) কি তথায় দুনিয়ার মত পানাহার করবে?" জবাবে তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, বরং বহুগুণে বেশী করবে।" তারা পুনরায় প্রশ্ন করেঃ "তারা কি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করবে (অর্থাৎ তাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে কি?" তিনি উত্তর দেনঃ "না, বরং ঘর্ম আসার ফলে সবই হযম হয়ে যাবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের খেজুর গাছের পাতা হবে জান্নাতীদের পোশাক। এটা লাল রঙ এর হবে, এর কাণ্ড হবে সবুজ পান্না। এর ফল হবে মধুর চেয়েও মিষ্ট এবং মাখনের চেয়েও নরম। এতে বিচি মোটেই থাকবে না।"[১]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি যে, ওর একটি আনার যেন শিবিকাসহ উট (অর্থাৎ এরূপ উটের মত বিরাট বিরাট)।"[২]

خَيْرَاتٌ -এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যায় অধিক, অত্যন্ত সুন্দরী এবং খুবই চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হূরগুলো যে গান গাইবে তাতে এও থাকবেঃ "আমরা সুন্দরী, চরিত্রবতী ও সতী-সাধ্বী। আমাদেরকে সম্মানিত স্বামীদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।" এই পূর্ণ হাদীসটি সূরায়ে ওয়াকিয়াহতে সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ।

خَيِّرَاتٌ শব্দটিকে তাশদীদ সহও পড়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করছেনঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর। এখানেও ঐ পার্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ওখানে বলা হয়েছিল হূরগুলো নিজেরাই তাদের চক্ষু নীচু করে রাখে, আর এখানে বলা হচ্ছে তাদের চক্ষু নীচু করানো হয়েছে। সুতরাং নিজেই কোন কাজ করা এবং অপরের দ্বারা করানো এই দুয়ের মধ্যে কত বড় পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, যদিও সবাই তাঁবুতে সুরক্ষিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে খায়রাহ অর্থাৎ সতী-সাধ্বী, চরিত্রবতী ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্টা হূর রয়েছে। প্রত্যেক খায়রাহ বা হূরের জন্যে তাঁবু রয়েছে। প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দরযা আছে, যেগুলো দিয়ে প্রত্যহ উপহার, উপঢৌকন, হাদিয়া এবং ইনআম আসতেই আছে। সেখানে না আছে কোন ঝগড়া-বিবাদ, না আছে কড়াকড়ি, না আছে ময়লা আবর্জনা এবং না আছে দুর্গন্ধ। বরং হূরদের সাহচর্য, যারা শুভ্র ও উজ্জ্বল মুক্তার মত, যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে যা খাঁটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত। ওর প্রস্থ ষাট মাইল। ওর প্রত্যেক কোণায় জান্নাতীরা রয়েছে যারা অন্য কোণার লোকদেরকে দেখতে পায় না। মুমিনরা তাদের কাছে আসা যাওয়া করতে থাকবে।"[১] অন্য বর্ণনায় তাঁবুটির প্রস্থ তিন মাইলের কথাও রয়েছে।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি তাঁবু রয়েছে। যার মোতির তৈরী সত্তরটি দরযা আছে।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি তাঁবু থাকবে যা মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে। ওর চার হাজারটি দরযা হবে এবং সমস্ত চৌকাঠ হবে সোনার তৈরী।

একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীর আশি হাজার খাদেম থাকবে এবং বাহাত্তরটি স্ত্রী হবে। আর মণি-মুক্তা ও যবরজদের প্রাসাদ হবে যা জাভিয়াহ হতে সানআ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (অর্থাৎ জাভিয়াহ হতে সানআ পর্যন্ত জায়গাদ্বয়ের মধ্যে যতটা ব্যবধান রয়েছে ততদূর পর্যন্ত ঐ প্রাসাদ পৌঁছে যাবে)।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এদেরকে (অর্থাৎ এই হূরদেরকে) ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। এই প্রকারের আয়াতের তাফসীর পূর্বে গত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জান্নাতীদের হূরদের গুণাবলী বর্ণনায় এ বাক্যটুকু বেশী আছে যে, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। এখানে এই হূরদের ব্যাপারে এটা বলা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আবারও বলেনঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে। এই তাকিয়া হবে খুবই উন্নতমানের ও নকশাকৃত। এই তখ্ত, বিছানা ও বালিশগুলো জান্নাতী বাগীচা ও পুষ্প বীথির উপর থাকবে। এগুলো হবে উচ্চমানের রেখাযুক্ত নকশীদার রেশমের এবং এটাই হবে তাদের বিছানা। কোনটা হবে লাল রঙ এর, কোনটা হবে হলদে রঙ এর এবং কোনটা হবে সবুজ রঙ এর। জান্নাতীদের কাপড় ও পোশাকও এরূপ মূল্যবান। দুনিয়ায় এমন কোন জিনিস নেই যার এগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমেও হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।
২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা হবে মখমলের বিছানা ও গদি যা হবে অত্যন্ত নরম ও খাঁটি। তাতে কয়েকটি রঙ মিলিতভাবে থাকবে এবং নকশাকৃত হবে।

আবূ উবাইদা (রঃ) বলেন যে, আবকারী একটি জায়গার নাম যেখানে উন্নত মানের নকশীদার কাপড় বুনানো হয়। খলীল ইবনে আহমাদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক সুন্দর ও উত্তম জিনিসকে আরবরা আবকারী বলে থাকে। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে বলেনঃ "আমি কোন আবকারীকে দেখিনি যে উমার (রাঃ)-এর মত বড় বড় বালতি টেনে থাকে।"

এখানেও এটা খেয়াল রাখার বিষয় যে, পূর্ববর্ণিত জান্নাতদ্বয়ের বিছানা, গদি ও বালিশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা এগুলো হতে উন্নততর। ওখানে বর্ণিত হয়েছিল যে, ওর আস্তর অর্থাৎ ভিতরের কাপড় হবে খাঁটি ও পুরু রেশমের এবং উপরের কাপড়ের বর্ণনা দেয়া হয়নি। কারণ যার ভিতরের কাপড় এরূপ উচ্চমানের তার উপরের কাপড় কত উন্নতমানের হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। তারপর পূর্বের জান্নাতদ্বয়ের গুণাবলীর সমাপ্তিতে বলেছিলেনঃ উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? তাহলে দেখা যায় যে, ঐ জান্নাতবাসীদের গুণাবলীর বর্ণনায় ইহসানের বর্ণনা দিয়েছেন যা মর্যাদার শেষ সীমা। যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) যুক্ত হাদীসে রয়েছে, তিনি প্রথমে প্রশ্ন করেন ইসলাম সম্পর্কে, তারপর ঈমান সম্পর্কে এবং এরপর ইহসান সম্পর্কে।

সুতরাং বেশ কয়েকটি যুক্তি রয়েছে যেগুলো দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী দু'টি জান্নাতের বড় ফযীলত রয়েছে পরবর্তী দুটি জান্নাতের উপর। পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন যা ঐ জান্নাতদ্বয়ের মধ্যে হবে যেগুলোর গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আমীন!

'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।' তিনি যুল-জালাল বা মহিমান্বিত। অর্থাৎ তিনি এই যোগ্যতা রাখেন যে, তাঁর মহিমাকে মেনে নেয়া হবে এবং তাঁর মহিমা ও গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর অবাধ্যাচরণ করা হবে না, বরং তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করা হবে। তিনি এই যোগ্যতাও রাখেন যে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা হবে অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদত করা হবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবে না। তাঁকে স্মরণ করা

হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবে না। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মর্যাদা প্রদান কর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাও।"[১]

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ "পাকা চুল বিশিষ্ট মুসলমানকে, ন্যায় বিচারক বাদশাহকে এবং কুরআন পাঠকারীকে, যে কুরআন পাঠকারী ওর মধ্যে সীমালংঘন করে না (যথা হরফের মদ, গুন্নাহ ইত্যাদি সীমার অতিরিক্ত করে না বা মাখরাজ পরিবর্তন করে না ইত্যাদি) এবং সীমা হতে ঘটিয়ে অন্যায় করে না (অর্থাৎ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে বা অজ্ঞতা বশতঃ ভুল অর্থ করে না), এই লোকদেরকে সম্মান করা, আল্লাহকে সম্মান করার শামিল।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -এর সাথে ঝুলে পড়।"[২]

হযরত রাবীআহ ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "তোমরা ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -এর সাথে লটকে যাও।"[৩]

জাওহারী (রাঃ) বলেন যে, যখন কেউ কোন কিছুকে শক্ত করে ধরে নেয় তখন الظ শব্দ আরবরা ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটিই এ হাদীসে এসেছে। তাহলে অর্থ হবেঃ অনুনয় বিনয়, আন্তরিকতা, অপারগতা এবং দারিদ্রের ভাব দেখিয়ে সদা-সর্বদা আল্লাহর অঞ্চলের সাথে ঝুলে পড়।

সহীহ মুসলিমে ও সুনানে আরবাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায হতে সালাম ফিরানোর পর শুধু নিম্নের কালেমাগুলো পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনা হতেই শান্তি, হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি কল্যাণময়।"

সূরা ঃ রহমান এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে তিরমিযীতেও এ হাদীসটি আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে অরক্ষিত ও গারীব বলেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ ওয়াকি'আহ্ মাক্কী

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৯৬ রুকূ' ঃ ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٩٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, আমাকে সূরায়ে হূদ, সূরায়ে ওয়াকিআহ, সূরায়ে মুরসালাত, সূরায়ে আম্মা ইয়াতাসাআলুন এবং সূরায়ে ইযাশ্ শামসু কুওভিরাত বৃদ্ধ করে ফেলেছে।"[১]

হযরত আবূ যাবিরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ রোগাক্রান্ত হন, যে রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর ঐ রোগের সময় হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনার অভিযোগ কি?" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "আমার পাপরাশি।" হযরত উসমান আবার প্রশ্ন করেনঃ "আপনার আকাঙ্ক্ষা কি?" তিনি জবাব দেনঃ "আমার প্রতিপালকের রহমত।" হযরত উসমান (রাঃ) প্রশ্ন করেনঃ "কোন ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেবো কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "ডাক্তারই তো আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন?" হযরত উসমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "আপনার জন্যে কিছু মাল পাঠাবার নির্দেশ দিবো কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "আমার মালের কোন প্রয়োজন নেই।" হযরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ "আপনার পরে আপনার সন্তানদের কাজে লাগবে?" তিনি বললেনঃ "আমার সন্তানরা দরিদ্র হয়ে পড়বে আপনি এ আশংকা করেন? তাহলে জেনে রাখুন যে, আমি আমার সন্তানদেরকে প্রতি রাত্রে সূরায়ে ওয়াকিআহ পাঠের নির্দেশ দিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরায়ে ওয়াকিআহ পাঠ করবে সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না বা না খেয়ে থাকবে না।"[২] এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ যাবিয়াহ (রাঃ) কখনো এ সূরাটি রাত্রে পাঠ ছাড়তেন না।

হযরত সাম্মাক ইবনে হারব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত জাবির ইবনে সামরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "তোমরা আজ যেভাবে তোমাদের নামায পড়ছো, রাসূলুল্লাহও (সঃ) এভাবেই নামায পড়তেন। তবে তোমাদের

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নামাযের চেয়ে তাঁর নামায তিনি হালকা করতেন। তিনি ফজরের নামাযে সূরায়ে ওয়াকিআহ্ এবং এ ধরনের সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন।"[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

১। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে,

٢- لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

২। তখন এর সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না।

٣- خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○

৩। এটা কাউকেও করবে নীচ, কাউকেও করবে সমুন্নত;

٤- اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ○

৪। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী

٥- وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○

৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে,

٦- فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ○

৬। ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;

٧- وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○

৭। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে –

٨- فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○

৮। ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

٩- وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○

৯। এবং বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○

১০। আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,

١١- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

১১। তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত

١٢- فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

১২। সুখদ উদ্যানে;

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াকিআহ কিয়ামতের নাম। কেননা, এটা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

অর্থাৎ "সেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।" (৬৯ ঃ ১৫) এটার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। না এটাকে কেউ টলাতে পারে, না কেউ হটাতে পারে। এটা নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবেই। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও ঐ দিন আসার পূর্বে যাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।" (৪২ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ـ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ـ

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের জন্যে, এটা প্রতিরোধ করার কেউ নেই।" (৭০ঃ ১-২) অন্য আয়াতে আছেঃ

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থাৎ 'যেই দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ হয়ে যাও, তখন হয়ে যাবে। তাঁরই কথা সত্য, রাজত্ব তাঁরই, যেই দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি বিজ্ঞানময়, সম্যক অবগত।" (৬ঃ ৭৩)

কিয়ামত সংঘটনে কোন সন্দেহ নেই, বরং এটা চরম সত্য, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

كَاذِبَة শব্দটি مَصْدَر, যেমন عَاقِبَة ও عَافِيَة শব্দ দু'টি মাসদার।

এটা কাউকেও করবে নীচ, কাউকেও করবে সমুন্নত। ঐদিন বহু লোক নীচতম ও হীনতম হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে যারা দুনিয়ায় সম্মানিত ও মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী ছিল না। সেই দিন আল্লাহর শত্রুরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় জাহান্নামে চলে যাবে। আর তাঁর বন্ধু ও ভক্তরা সম্মানিত অবস্থায় জান্নাতে চলে যাবে। ঐদিন

অহংকারীরা হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং বিনয়ীরা হবে সম্মানিত। এই কিয়ামত নিকটের ও দূরের লোকদেরকে সতর্ক করে দিবে। এটা নীচু হবে এবং নিকটের লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে। তারপর উঁচু হবে এবং দূরের লোকদেরকে শুনাবে। পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং হেলা দোলা শুরু করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ـ

অর্থাৎ "পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।" (৯৯ঃ ১) আর এক জায়গায় আছেঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।"(২২ঃ ১)

এরপর বলেনঃ পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। অন্য জায়গায় রয়েছে كَثِيْبًا مَّهِيْلًا অর্থাৎ "পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।" (৭৩ঃ ১৪) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায়।

هَبَاءً ঐ অগ্নিস্ফূলিঙ্গকেও বলা হয় যেগুলো আগুন জ্বালাবার সময় পতঙ্গের মত উড়তে থাকে এবং উড়তে উড়তে নীচে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যায়, কিছুই থাকে না।

مُنْبَثٌّ ঐ জিনিসকে বলা হয় যাকে বাতাস উপরে তোলে নেয় এবং ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন শুষ্ক পাতার গুঁড়াকে বাতাস এদিক-ওদিক করে দেয়। এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, পাহাড় স্বীয় জায়গা হতে সরে পড়বে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।' একটি দল আর্শের ডান দিকে হবে। তারা হবে ঐসব লোক যারা হযরত আদম (আঃ)-এর ডান পার্শ্বদেশ হতে বের হয়েছিল এবং যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটা হবে জান্নাতীদের সাধারণ দল। দ্বিতীয় দলটি আরশের বাম দিকে হবে। এরা হবে ঐসব লোক যাদেরকে হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পার্শ্বদেশ হতে বের করা হয়েছিল। এদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং এদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরা সব জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন!

তৃতীয় দলটি মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে হবেন। তাঁরা হবেন বিশিষ্ট দল। তাঁরা আসহাবুল ইয়ামীনের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী। তাঁরা হবেন জান্নাতবাসীদের নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। ডান দিকের লোকদের চেয়ে তাঁরা সংখ্যায় কম হবেন। সুতরাং হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ এই তিন শ্রেণীরই থাকবে, যেমন এই সূরার শেষে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের এই তিনটি ভাগই করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী।" (৩৫ঃ ৩২) সুতরাং এখানেও তিন শ্রেণী রয়েছে। এটা ঐ সময়, যখন ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ -এর ঐ তাফসীর নেয়া হবে যা এটা অনুযায়ী হয়, অন্যথায় অন্য একটি উক্তি রয়েছে যা এই আয়াতের তাফসীরের স্থলে গত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনও এটাই বলেছেন। দু'টি দল তো জান্নাতী এবং একটি দল জাহান্নামী।

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ

অর্থাৎ "দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে" (৮১ঃ ৭) বিভিন্ন প্রকারের অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের আমলকারীর একটি দল হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তোমরা বিভক্ত হবে তিন শ্রেণীতে। ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত।"[১]

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ..... وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا اَصْحٰبُ الشِّمَالِ - এ

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আয়াতগুলো পাঠ করেন, অতঃপর তাঁর হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বন্ধ করেন এবং বলেনঃ এগুলো জান্নাতী এবং আমি কোন পরোয়া করি না, আর এগুলো জাহান্নামী এবং আমার কোন পরোয়া নেই।"[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে সর্বপ্রথম কোন্ লোকগুলো যাবে তা তোমরা জান কি?" সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তর দেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তিনি তখন বললেনঃ "তারা হলো ঐ লোক যে, যখন তাদেরকে তাদের হক প্রদান করা হয় তখন তারা তা কবূল করে, তাদের উপর অন্যের হক থাকলে তা চাওয়া মাত্রই দিয়ে দেয় এবং তারা লোকদেরকে ঐ হুকুম করে যে হুকুম তাদের নিজেদেরকে করে।"[২]

সাবেকুন বা অগ্রবর্তী লোক কারা এ ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে। যেমন নবীগণ, ইল্লীঈনবাসীগণ, হযরত ইউশা ইবনে নূন যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন, ঐ মুমিনরা যাদের বর্ণনা সূরায়ে ইয়াসীনে রয়েছে, যাঁরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর প্রথমে ঈমান এনেছিলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি অগ্রগামী ছিলেন, ঐ লোকগুলো, যাঁরা দুই কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছেন, প্রত্যেক উম্মতের ঐ লোকগুলো যাঁরা নিজ নিজ নবীর উপর পূর্বে ঈমান এনেছিলেন, ঐ লোকগুলো, যাঁরা সর্বাগ্রে জিহাদে গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিগুলো সবই সঠিক অর্থাৎ এই লোকগুলোই অগ্রবর্তী। যাঁরা আগে বেড়ে গিয়ে অন্যদের উপর অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফরমান কবূল করে থাকেন তাঁরা সবাই সাবেকুনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ـ

অর্থাৎ "তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়।" (৩ঃ ১৩৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে অগ্রগামী হও এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রস্থ বা বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

মত।" (৫৭ঃ ২১) সুতরাং এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি পুণ্যের কাজে অগ্রগামী হবে, সে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের দিকেও অগ্রবর্তীই থাকবে। প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ শ্রেণীরই হয়ে থাকে। যেমন সে আমল করে তেমনই সে ফল পায়। এ জন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত, তারাই থাকবে সুখদ উদ্যানে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আদম সন্তানের জন্যে আপনি দুনিয়া বানিয়েছেন, সেখানে তারা পানাহার করে থাকে এবং বিয়ে-শাদী করে থাকে। সুতরাং আখিরাত আপনি আমাদের জন্যেই করুন।" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "আমি এরূপ করবো না।" ফেরেশতারা তিনবার প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "যাকে আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে কখনো তাদের মত করবো না যাদেরকে আমি শুধু كُن শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"[১]

১৩। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে;

১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে,

১৫। স্বর্ণখচিত আসনে

১৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে

১৭। তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা

১৮। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে,

١٣- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○

١٤- وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○

١٥- عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ○

١٦- مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ○

١٧- يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ○

١٨- بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ○

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম রাযীও (রঃ) তাঁর 'কিতাবুর রাদ্দে আলাল জাহমিয়্যাহ' নামক কিতাবে এই আসারটি আনয়ন করেছেন। এর শব্দগুলো হলোঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "যাকে আমি আমার নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি তার সৎ সন্তানদেরকে ওর মত করবো না যাকে আমি বলেছিঃ 'হয়ে যাও' তখন হয়ে গেছে।"

١٩- لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ○

১৯। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে না–

٢٠- وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ○

২০। এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল,

٢١- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ○

২১। আর তাদের ইপ্সিত পাখীর গোশত নিয়ে,

٢٢- وَحُورٌ عِينٌ ○

২২। আর তাদের জন্যে থাকবে আয়তলোচনা হূর,

٢٣- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ○

২৩। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ,

٢٤- جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

২৪। তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

٢٥- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ○

২৫। তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,

٢٦- إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ○

২৬। 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।

আল্লাহ তা'আলা ঐ বিশিষ্ট নৈকট্যলাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যেমন একটি উক্তি হলো এই যে, পূর্ববর্তী দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ এবং পরবর্তী দ্বারা এই উম্মত অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন এবং এই উক্তির সবলতার পক্ষে ঐ হাদীসটি পেশ করেছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমরা হলাম পরবর্তী, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই হবো পূর্ববর্তী।" এই উক্তির সহায়ক মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হাদীসটিও হতে পারে। তা হলোঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরআন কারীমের আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অবতীর্ণ হয় তখন এটা নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। ঐ সময় ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ

الْاٰخِرِيْنَ -এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহুসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।" তখন নবী (সঃ) বলেনঃ "আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ। তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ। আর বাকী অর্ধাংশ সমস্ত উম্মতের মধ্যে বন্টিত হবে যাদের মধ্যে তোমরাও থাকবে।" এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও রয়েছে।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে বর্ণিত হয় যে, বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে, তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং আমাদের মধ্য হতে হবে কম সংখ্যক?" এটা অবতীর্ণ হওয়ার এক বছর পর ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে বহুসংখ্যক হবে এবং পরবর্তীদের মধ্য হতেও বহুসংখ্যক হবে।" তখন রাসূলুল্লাহ হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ "হে উমার (রাঃ) শোন, হযরত আদম (আঃ) হতে আমি পর্যন্ত (অর্থাৎ হযরত আদম আঃ-এর যুগ হতে নিয়ে আমার যুগ পর্যন্ত) হলো ثُلَّةٌ বহুসংখ্যক। আর শুধু আমার উম্মতই হলো ثُلَّةٌ বা বহুসংখ্যক। আমরা আমাদের এই বহুসংখ্যককে পূর্ণ করার জন্যে ঐ হাবশীদেরকেও নিবো যারা উটের রাখাল, কিন্তু তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই।"

এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই রিওয়াইয়াতের সনদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। হ্যাঁ, তবে বহু সনদসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উক্তিটিও প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেনঃ "আমি আশা করি যে, তোমরা আহলে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে ...... শেষ পর্যন্ত।" সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, এটা আমাদের জন্যে বড় সুসংবাদই বটে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) যে উক্তিটিকে পছন্দ করেছেন তাতে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি খুবই দুর্বল। কেননা, কুরআনের ভাষা দ্বারা এই উম্মতের অন্যান্য সমস্ত উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হতে বেশী এবং এই উম্মতের মধ্য হতে কম কি করে হতে পারে? হ্যাঁ, তবে এ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সমস্ত উম্মতের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ মিলে শুধু এই উম্মতের নৈকট্যপ্রাপ্তদের

সংখ্যা হতে অধিক হবেন। কিন্তু বাহ্যতঃ তো এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত উম্মতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে শুধু এই উম্মতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই বাক্যের তাফসীরে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের মধ্য হতে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য হতে কম হবে। এ উক্তিটি রীতি সম্মত।

হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ "নৈকট্য প্রাপ্তগণ তো গত হয়ে গেছেন। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করুন।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেনঃ "এই উম্মতের মধ্যে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অনেক ছিলেন।" ইমাম ইবনে সীরীনও (রঃ) একথাই বলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এই প্রথম যুগীয় লোকদের অনেকেই নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের খুব কম সংখ্যকই এই মর্যাদা লাভ করেছেন। এ নিয়ম ধারাবাহিকভাবেই চলে আসছে। তাহলে ভাবার্থ এরূপ হওয়াও সম্ভব যে, প্রত্যেক উম্মতেরই প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে এ সংখ্যা কম। কারণ সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বযুগের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর এর পরবর্তী যুগ, এরপর এর পরবর্তী যুগ, (শেষ পর্যন্ত)।" হ্যাঁ, তবে একটি হাদীসে এও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত। সুতরাং প্রথম যুগের বৃষ্টি উত্তম কি শেষ যুগের বৃষ্টি উত্তম তা আমার জানা নেই।" হাদীসটির ইসনাদ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে এটাকে এই বিষয়ের উপর স্থাপন করা হবে যে, দ্বীনের জন্যে যেমন প্রথম যুগীয় লোকদের প্রয়োজন ছিল যাঁরা পরবর্তী লোকদের জন্যে এর তাবলীগ করেছেন, অনুরূপভাবে শেষ যুগে এটাকে কায়েম রাখার জন্যে শেষ যুগীয় লোকদের প্রয়োজন রয়েছে যাঁরা লোকদেরকে সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর উপর একত্রিত করবেন, এর রিওয়াইয়াত করবেন এবং জনগণের উপর এটা প্রকাশ করবেন। কিন্তু পূর্বযুগীয় লোকদেরই ফযীলত বেশী হবে। এটা ঠিক এরূপ যে, জমিতে প্রাথমিক বৃষ্টিরও প্রয়োজন হয় এবং শেষের বৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু জমি প্রাথমিক বৃষ্টি দ্বারাই বেশী উপকার লাভ করে থাকে। কেননা, প্রথম প্রথম যদি বৃষ্টি না হয় তবে

শস্যের বীজ অংকুরিতই হবে না এবং জড় বা মূলও বসবে না। এ জন্যেই তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের একটি দল সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজয়ী থাকবে। তাদের শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং তারা ঐরূপই থাকবে।" মোটকথা, এই উম্মত বাকী সমস্ত উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই উম্মতের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতদের তুলনায় বহুগুণে বেশী হবে। তারা হবে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা, দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নবী (সঃ) সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এরাই সর্বোত্তম। ধারাবাহিকতার সাথে এ হাদীসটি প্রামাণ্যে পৌঁছে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে এবং প্রতি সত্তর হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার করে লোক থাকবে।

হযরত আবূ মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কিয়ামতের দিন একটি বৃহৎ দলকে দাঁড় করানো হবে। তারা সংখ্যায় এতো অধিক হবে যে, অন্ধকার রাত্রির মত তারা যমীনের সমস্ত প্রান্তকে ঘিরে ফেলবে। ফেরেশতারা বলবেনঃ "সমস্ত নবী (আঃ)-এর সঙ্গে যত লোক এসেছে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে তাদের সকলের সমষ্টির চেয়ে বহুগুণে বেশী এসেছে।"[১]

"বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।" এই আয়াতের তাফসীরের স্থলে এই হাদীসটিকে আনয়ন করা যুক্তিযুক্ত হবে যে হাদীসটিকে হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) তাঁর 'দালাইলুন নবুওয়াহ' নামক গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। হাদীসটি হলোঃ হযরত আবূ জামাল জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ফজরের নামায পড়তেন তখন তিনি পা দুটি মোড়ানো অবস্থাতেই সত্তর বার পাঠ করতেনঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا -

অর্থাৎ "আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবূলকারী।" তারপর বলতেনঃ "সত্তরের বদলে সাতশ'। একদিনে যার পাপ সাত শতেরও বেশী হয় তার জন্যে কল্যাণ নেই।" একথা তিনি দু'বার বলতেন। তারপর তিনি জনগণের দিকে মুখ

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করে বসতেন। স্বপ্ন তাঁর নিকট প্রিয় ছিল বলে তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি?" আবূ জামাল (রাঃ) বলেন, একদা অভ্যাসমত রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যাঁ, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ কল্যাণের সাথে সাক্ষাৎ দান করুন, অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখুন, আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক করুন, শত্রুদের জন্যে করুন ক্ষতিকর, ঐ আল্লাহ সর্বপ্রকারের প্রশংসার অধিকারী যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তুমি এখন তোমার স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা কর।" আমি তখন বলতে শুরু করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি দেখি যে, একটি রাস্তা রয়েছে যা প্রশস্ত, সহজ, নরম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অসংখ্য লোক ঐ পথ ধরে চলছে। তারা চলতে চলতে একটি সবুজ-শ্যামল বাগান পেলো যার মত শস্য-শ্যামল ও চমৎকার বাগান আমি কখনো চোখে দেখিনি। ভিতর দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে। নানা প্রকারের গাছ ফুলে ফলে ভরপুর রয়েছে। এখন আমি দেখি যে, প্রথম যে দলটি আসলো এবং ঐ বাগানের নিকট পৌঁছলো, তখন তারা তাদের সওয়ারীর গতি বেশ দ্রুত করলো এবং ডানে বামে না গিয়ে দ্রুত গতিতে ঐ স্থান অতিক্রম করলো। তারপর দ্বিতীয় দল আসলো যাদের সংখ্যা বেশী ছিল, যখন তারা এখানে পৌঁছলো তখন কতকগুলো লোক তাদের বাহনের পশুগুলোকে সেখানে চরাতে শুরু করলো, আর কতকগুলো লোক কিছু গ্রহণ করলো, অতঃপর সেখান হতে প্রস্থান করলো। তারপর আরো বহু লোকের একটি দল আসলো। যখন তারা এই সবুজ-শ্যামল বাগানের নিকট আসলো তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং বলতে লাগলোঃ "এটা সবচেয়ে উত্তম জায়গা।" আমি যেন তাদেরকে এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, তারা ডানে বামে ঝুঁকে পড়েছে। আমি এসব দেখলাম। কিন্তু আমি তো চলতেই থাকলাম। যখন বহু দূরে চলে গেলাম তখন দেখলাম যে, সাতটি সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি মিম্বর বিছানো রয়েছে এবং আপনি সর্বোচ্চ সোপানে উপবেশন করেছেন। আর আপনার ডানদিকে এক ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁর চেহারা গোধূম বর্ণের, অঙ্গুলিগুলো মোটামোটা এবং দেহ লম্বা। যখন তিনি কথা বলছেন তখন সবাই নীরবে শুনছেন এবং জনগণ উঁচু হয়ে হয়ে মনোযোগের সাথে তাঁর কথায় কান লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনার বাম দিকে একটি লোক রয়েছেন, যাঁর দেহের গঠন মধ্যম, শরীর মোটা এবং চেহারায় বহু তিল রয়েছে। তাঁর চুল যেন পানিতে সিক্ত। যখন তিনি কথা বলছেন তখন তাঁর সম্মানার্থে সবাই ঝুঁকে পড়ছেন। আর সামনে একজন লোক রয়েছেন, তিনি স্বভাব-চরিত্রে এবং চেহারা ও আকৃতিতে আপনার সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত।

আপনারা সবাই তাঁর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন। তাঁর সামনে একটি ক্ষীণ, পাতলা ও বৃদ্ধা উষ্ট্রী রয়েছে। আমি দেখলাম যে, আপনি যেন ওকে উঠাচ্ছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর এ অবস্থা দূরীভূত হলো। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেনঃ "সরল, সোজা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা হলো ঐ দ্বীন যা নিয়ে আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছি এবং যে হিদায়াতের উপর তোমরা রয়েছো। তুমি যে সবুজ শ্যামল বাগানটি দেখেছো ওটা হলো দুনিয়া এবং ওর মন মাতানো সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র। আমার সাহাবীবর্গ তো ওটা অতিক্রম করে চলে যাবে। না আমরা তাতে লিপ্ত হবো, না ওটা আমাদেরকে জড়িয়ে ধরবে। না ওর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে, না আমরা ওর প্রতি আকৃষ্ট হবো। অতঃপর আমাদের পর দ্বিতীয় দল আসবে যারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী হবে। তাদের মধ্যে কতক লোক তো দুনিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ তা হতে প্রয়োজন মত গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা চলে যাবে এবং পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। তারপর তাদের পরে একটি বিরাট দল আসবে যারা এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে পড়বে। তারা ডানে বামে ঢুকে পড়বে। সুতরাং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী)। এখন থাকলো তোমার কথা। তাহলে জেনে রেখো যে, তুমি তোমার সোজা সরল পথে চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

সাতটি সিঁড়ি বিশিষ্ট মিম্বরের সর্বোচ্চ সোপানে যে তুমি আমাকে দেখেছো তার ব্যাখ্যা এই যে, দুনিয়ার আয়ু হচ্ছে সাত হাজার বছর। আমি শেষ বা সপ্তম হাজারে রয়েছি। আমার ডান দিকে গোধূম বর্ণের মোটা অঙ্গুলি বিশিষ্ট যে লোকটিকে তুমি দেখেছো তিনি হলেন হযরত মূসা (আঃ)। যখন তিনি কথা বলেন তখন লোকেরা উঁচু হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলে তাঁকে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। আর যে লোকটিকে তুমি আমার বাম দিকে দেখেছো, যিনি মোটা দেহ বিশিষ্ট এবং যাঁর দেহের গঠন মধ্যম ধরনের আর যাঁর চেহারায় বহু তিল রয়েছে এবং যার চুল পানিতে সিক্ত মনে হচ্ছে, তিনি হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মান করেছেন সেই হেতু আমরাও সবাই তাঁকে সম্মান করি। যে বৃদ্ধ লোকটিকে তুমি আমার সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত দেখেছো তিনি হলেন আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আমরা সবাই তাঁকে চাই, তাঁর অনুসরণ করি এবং তাঁর

আনুগত্য করে থাকি। আর যে বৃদ্ধা উষ্ট্রীটিকে তুমি দেখেছো যে, আমি ওকে দাঁড় করাচ্ছি ওর দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য যা আমার উম্মতের উপর সংঘটিত হবে। না আমার পরে কোন নবী আছে এবং না আমার উম্মতের পরে কোন উম্মত আছে।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না এ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, তবে যখন কেউ নিজেই কোন স্বপ্নের কথা বলতো তখন তিনি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিতেন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ নৈকট্যপ্রাপ্তদের বিশ্রামের পালঙ্গটি সোনার তার দ্বারা বুননকৃত হবে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এটা فَعِيل ওযনে مَفْعُوْل -এর অর্থে হবে। যেমন উষ্ট্রীর পেটের নীচে যেটা থাকে ওটাকে وَضِيْنُ النَّاقَةِ বলা হয়।

তারা ঐ আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। কেউ কারো দিকে পিঠ করে বসবে না।

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা। অর্থাৎ ঐ সেবকরা বয়সে একই অবস্থায় থাকবে। তারা বড়ও হবে না, বুড়োও হবে না এবং তাদের বয়সে কোন পরিবর্তনও হবে না, বরং তারা সদা কিশোরই থাকবে।

اَكْوَاب বলা হয় ঐ কুঁজাকে যাতে নালী বা চুঙ্গি এবং ধরবার জিনিস থাকে না। আর اَبَارِيْق বলা হয় ঐ পানপাত্রকে যাতে চুঙ্গি এবং ধরবার জিনিস আছে। এগুলো সুরার প্রবহমান প্রস্রবণ হতে পূর্ণ করা থাকবে, যে সুরা কখনো শেষ হবার নয়! কেননা, ওর প্রস্রবণ সদা জারী থাকবে। এই সদা-কিশোররা সুরাপূর্ণ এই পানপাত্রগুলো তাদের নরম হাতে নিয়ে ঐ জান্নাতীদের সেবায় এদিক ওদিক ঘোরাফিরা করতে থাকবে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়াও হবে না এবং তারা জ্ঞানহারাও হবে না। সুতরাং পূর্ণমাত্রায় তারা ঐ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। মদের মধ্যে চারটি বিশেষণ রয়েছে। (এক) নেশা, (দুই) মাথাব্যথা, (তিন) বমি এবং (চার) প্রস্রাব। মহান প্রতিপালক আল্লাহ জান্নাতের সুরা বা মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি দোষ হতে মুক্ত বলে ব্যক্ত করলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঐ চির কিশোররা তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে তাদের পছন্দমত নানা প্রকারের ফলমূল নিয়ে এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে। যে ফল খাওয়ার তাদের ইচ্ছা হবে এবং যে গোশ্ত খেতে তাদের মন চাইবে, সাথে সাথে তারা তা পাবে। এসব রকমারী খাবার নিয়ে তাদের এই চির কিশোর সেবকরা সদা তাদের চারদিকে ঘোরাফিরা করবে। সুতরাং তাদের

যখনই যা খেতে ইচ্ছা করবে তখনই তা তাদের নিকট থেকে নিয়ে নিবে। এই আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষ ফল বেছে বেছে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারে।

হযরত ইকরাশ ইবনে যুআয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমার কওম মুররা আমাকে তাদের সাদকার মাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে। আমি ঐ মাল নিয়ে মদীনায় পৌঁছি। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। আমার সাথে যাকাতের বহু উট ছিল, উটগুলো যেন বালুকার উপর লেগে থাকা গাছগুলোতে চরানো যুবক উট। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কে?" আমি বললামঃ আমি ইকরাশ ইবনে যুআয়েব (রাঃ)। তিনি বললেনঃ "তুমি দূর পর্যন্ত তোমার বংশ তালিকা বর্ণনা কর।" আমি তখন মুররা ইবনে উবায়েদ পর্যন্ত বলে শুনালাম। আর সাথে সাথে আমি বললাম যে, এগুলো মুররা ইবনে উবায়েদের যাকাতের উট। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ "এগুলো আমার কওমেরই উট, এগুলো আমার কওমের সাদকার মাল। এগুলোতে সাদকার উটগুলোর চিহ্ন দিয়ে দাও এবং ওগুলোর সাথে এগুলোকে মিলিয়ে দাও।" অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "খাবার কিছু আছে কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ আছে।" অতঃপর আমাদের কাছে চূর্ণ করা রুটির একটা বড় গামলা পাঠানো হলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আমি খেতে শুরু করলাম। আমি এদিক ওদিক হতে খাবার উঠাতে লাগলাম। তখন তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমার হাত ধরে নিলেন এবং বললেনঃ "হে ইকরাশ (রাঃ)! এটা তো একই প্রকারের খাদ্য, সুতরাং একই জায়গা হতে খেতে থাকো। এরপর রসাল খেজুর অথবা শুষ্ক খেজুরের একটি থালা আসলো। আমি ওটা হতে শুধু আমার সামনের দিক হতে খেতে লাগলাম। তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পছন্দ মত থালার এদিক ওদিক হতে নিয়ে খাচ্ছিলেন এবং আমাকেও বললেনঃ "হে ইকরাশ (রাঃ)! এখানে নানা প্রকারের খেজুর আছে। সুতরাং যেখান হতে ইচ্ছা খাও।" তারপর পানি আসলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাত ধৌত করলেন এবং ঐ ভিজা হাত স্বীয় চেহারার উপর, দুই বাহুর উপর এবং মাথার উপর তিনবার ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ "হে ইকরাশ (রাঃ)! এটা অযু হলো ঐ জিনিস হতে যাকে আগুনে পরিবর্তিত করে ফেলেছে।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্ন খুব পছন্দ করতেন। কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না তা তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন। কেউ কোন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে এবং তাতে তিনি আনন্দিত হলে ওটা খুব ভাল স্বপ্ন বলে জানা যেতো। একদা একটি স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার কাছে যেন কেউ আসলো এবং আমাকে মদীনা হতে নিয়ে গিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলো। তারপর আমি এক ধমক শুনলাম, যার ফলে জান্নাতে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমি চক্ষু উঠিয়ে তাকালে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখতে পাই।" এভাবে স্ত্রীলোকটি বারোটি লোকের নাম করেন। এই বারোজন লোকেরই একটি বাহিনীকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। মহিলাটি বলতে থাকেনঃ "এ লোকগুলো আতলাস (সাটিন) কাপড় পরিহিত ছিলেন। তাঁদের শিরাগুলো ফুটতে ছিল। নির্দেশ দেয়া হয়ঃ 'তাদেরকে নহরে বায়দাখ বা নহরে বায়যাখে নিয়ে যাও।' যখন তাঁরা ঐ নদীতে ডুব দিলেন তখন তাঁদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত চমকাতে থাকলো। অতঃপর তাঁদের জন্যে সোনার থালায় খেজুর আনয়ন করা হয় যা তাঁরা ইচ্ছামত খেলেন। তারপর নানা প্রকারের ফল-মূল তাঁদের কাছে হাযির করা হলো যেগুলো চারদিক হতে বাছাই করে রাখা হয়েছিল। এগুলো হতেও তাঁরা তাঁদের মনের চাহিদা মত খেলেন। আমিও তাঁদের সাথে শরীক হলাম ও খেলাম।"

কিছুদিন পর একজন দূত আসলো এবং বললোঃ "অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন যাঁদেরকে আপনি রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন।" দূতটি ঐ বারোজনেরই নাম করলো যে বারোজনকে ঐ মহিলাটি স্বপ্নে দেখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সতী মহিলাটিকে আবার ডাকিয়ে নেন এবং তাঁকে বলেনঃ "পুনরায় তুমি তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।" মহিলাটি এবারও ঐ লোকগুলোরই নাম করলেন যাঁদের নাম ঐ দূতটি করেছিলেন।[১]

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতী ব্যক্তি যেই ফল জান্নাতের গাছ হতে ভেঙ্গে আনবে, সাথে সাথে ঠিক ঐরূপই আর একটি ফল গাছে এসে লেগে যাবে।"[২]

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল ইয়ালা মুসিলী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের পাখী বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে চরে ও খেয়ে বেড়াবে।" এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে ঐ পাখী তো বড় নিয়ামত উপভোগ করবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "যারা এই পাখীর গোশত খাবে তারাই হবে বেশী নিয়ামতের অধিকারী।" তিনবার তিনি একথাই বলেন। তারপর বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! আমি আশা করি যে, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা এই পাখীগুলোর গোশত খাবে।"[১]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ)-এর সামনে 'তূবা' বৃক্ষের আলোচনা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! তূবা বৃক্ষ কি তা তুমি জান কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন তিনি বললেনঃ "এটা হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ যার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি যে কত তা একমাত্র আল্লাহই জানেন! এর এক একটি শাখার ছায়ায় একজন অশ্বারোহী সত্তর বছর ধরে চলবে তবুও ওর ছায়া শেষ হবে না। ওর পাতাগুলো খুবই চওড়া ও বড় বড় হবে। ওর উপর বড় বড় উটের সমান সমান পাখী এসে বসবে।" তাঁর একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে তো এই পাখী বড় রকমের নিয়ামতের অধিকারী হবে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "এই পাখীগুলো অপেক্ষা বেশী নিয়ামতের অধিকারী হবে এগুলোকে ভক্ষণকারীরা। আমি আশা করি যে, তুমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।"[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'কাওসার' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ "এটা হলো জান্নাতী নহর, যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর ধারে বড় বড় উটের সমান পাখী রয়েছে।" তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তাহলে তো এ পাখীগুলো বড়ই নিয়ামত উপভোগ করছে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এগুলোকে ভক্ষণকারীরা এগুলো অপেক্ষাও বেশী নিয়ামতের অধিকারী হবে।"[৩]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ আবদিল্লাহ আল মুকাদ্দাসী (রঃ) তাঁর 'সিফাতুল জান্নাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। শেষের অংশটি হযরত কাতাদা (রঃ) হতেও বর্ণিত আছে।
৩. এটা আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে একটি পাখী রয়েছে যার সত্তর হাজার পাখা আছে। পাখীটি জান্নাতীর দস্তরখানে আসবে। প্রত্যেক পাখা হতে একপ্রকার রঙ বের হবে। যা দুধের চেয়েও সাদা, মাখনের চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। তারপর দ্বিতীয় পাখা হতে দ্বিতীয় প্রকারের রঙ বের হবে। এভাবে প্রত্যেক পাখা হতে পৃথক পৃথক রঙ বের হয়ে আসবে। তারপর ঐ পাখীটি উড়ে যাবে।"[১]

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতী পাখী বড় বড় উটের মত, যেগুলো জান্নাতের ফল খায় এবং জান্নাতের নহরের পানি পান করে। জান্নাতী যে পাখীর গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করবে ঐ পাখী তার সামনে চলে আসবে। সে যত চাইবে যে বাহুর গোশত পছন্দ করবে, খাবে। তারপর ঐ পাখী উড়ে যাবে এবং যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "জান্নাতের যেই পাখীর গোশত তোমার খাওয়ার ইচ্ছা হবে ঐ পাখীর গোশত রান্নাকৃত অবস্থায় তোমার সামনে এসে যাবে।"

حُورٌ শব্দটি অন্য কিরআতে যেরের সাথেও রয়েছে। পেশের সঙ্গে হলে তো অর্থ হবেঃ জান্নাতীদের জন্যে হূরসমূহ রয়েছে। আর যেরের সাথে হলে ভাবার্থ এই হবে যে, এটা যেন পূর্ব ই'রাবেরই অনুসারী। যেমনঃ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ -এই কিরআত এবং যেমন عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ -এই কিরআতে রয়েছে। আর এই অর্থও হতে পারে যে, কিশোরেরা নিজেদের সঙ্গে হূরদেরকেও নিয়ে নিবে। কিন্তু তারা থাকবে তাদের মহলে ও তাঁবুতে, সাধারণভাবে নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই হূরগুলো এমন হবে যেমন সতেজ, সাদা ও পরিষ্কার মুক্তা হয়ে থাকে। যেমন সূরায়ে সাফফাতে রয়েছেঃ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ -

অর্থাৎ "তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।" সূরায়ে রহমানেও এই বিশেষণ তাফসীরসহ গত হয়েছে। এটা তাদের সৎ কার্যের প্রতিদান। অর্থাৎ এই উপঢৌকন তাদের সৎকর্মেরই ফল।

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি খুবই গারীব। এর বর্ণনাকারী অসাফী এবং তাঁর উস্তাদ দু'জনই দুর্বল।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য। ঘৃণ্য ও মন্দ কথার একটি শব্দও তাদের কানে আসবে না। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً

অর্থাৎ "সেথায় তারা অসার বাক্য শুনবে না।" (৮৮ঃ ১১) হ্যাঁ, তবে তারা শুনবে শুধু 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ

অর্থাৎ "তাদের উপঢৌকন হবে তাদের একে অপরকে সালাম করা।" (১০ঃ ১০) তাদের কথাবার্তা বাজে ও পাপ হতে পবিত্র হবে।

২৭। আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

٢٧- وَأَصْحَٰبُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَٰبُ الْيَمِينِ ۝

২৮। তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কুলবৃক্ষ,

٢٨- فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝

২৯। কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,

٢٩- وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۝

৩০। সম্প্রসারিত ছায়া,

٣٠- وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۝

৩১। সদা প্রবহমান পানি,

٣١- وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝

৩২। ও প্রচুর ফলমূল,

٣٢- وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝

৩৩। যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।

٣٣- لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝

৩৪। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ;

٣٤- وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝

৩৫। তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে

٣٥- إِنَّا أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَاءً ۝

৩৬। তাদেরকে করেছি কুমারী

٣٦- فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ۝

৩৭। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,

٣٧- عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

৩৮। ডানদিকের লোকদের জন্যে।

৩৯। তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে,

৪০। এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

٣٨- لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

٣٩- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○

٤٠- وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○

অগ্রবর্তীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যাদের মর্যাদা অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম। এদের অবস্থা যে কত সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ এরা ঐ জান্নাতে অবস্থান করবে যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে, কিন্তু এই কুলবৃক্ষগুলো কন্টকহীন হবে এবং ফল হবে অধিক ও উন্নতমানের। দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলো হয় কাঁটাযুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে, জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলো হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে কন্টকহীন। ফলের ভারে শাখাগুলো নুয়ে পড়বে। হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে সালমান নাজ্জার (রঃ) একটি রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন যে, আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) বলতেন, বেদুঈনদের নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করা এবং তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা আমাদের জন্যে খুবই উপকারী হতো। একদা এক বেদুঈন এসে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কুরআনে এমন একটি গাছের কথাও রয়েছে যা কষ্টদায়ক!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "ওটা কোন গাছ?" সে জবাবে বললোঃ "কুলগাছ।" তখন তিনি বললেনঃ "তুমি ওর সাথেই مَخْضُوْدٍ শব্দটি পড়নি?" আল্লাহ তা'আলা ঐ গাছের কাঁটা দূর করে দিয়েছেন এবং এর পরিবর্তে দিয়েছেন অধিক ফল। প্রত্যেক কুলের বাহাত্তর প্রকারের স্বাদ থাকবে, যেগুলোর রঙ ও স্বাদ হবে পৃথক পৃথক।" এই রিওয়াইয়াতটি অন্যান্য কিতাবেও বিদ্যমান আছে। সেখানে طَلْحٌ শব্দ রয়েছে এবং সত্তর প্রকার স্বাদের বর্ণনা আছে।

طَلْحٌ হলো একটা বিরাট গাছ, যা হিজাযের ভূ-খণ্ডে জন্মে থাকে। এটা কন্টকময় বৃক্ষ। এতে কাঁটা খুব বেশী থাকে।

مَنْضُوْدٍ-এর অর্থ হলো কাঁদি কাঁদি ফলযুক্ত গাছ। এ দুটি গাছের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা এই গাছগুলোর গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই পছন্দ করতো। এই গাছ বাহ্যতঃ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্তু কাঁটার স্থলে মিষ্ট ফল হবে।

জাওহারী (রঃ) বলেন, এই গাছকে طَلْحٌ-ও বলে এবং طَلْعٌ-ও বলে। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তাহলে সম্ভবতঃ এটা কুলেরই গুণবিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ গাছগুলো কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অন্যান্য গুরুজন طَلْحٌ দ্বারা কলার গাছকে বুঝিয়েছেন। ইয়ামনবাসী কলাকে طَلْحٌ বলে এবং হিজাযবাসী مَوْزٌ বলে। লম্বা ও সম্প্রসারিত ছায়া তথায় থাকবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতী গাছের ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তথাপি ছায়া শেষ হবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ-এ আয়াতটি পাঠ কর।" ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমেও এ রিওয়াইয়াতটি বিদ্যমান আছে। আরো আছে মুসনাদে আহমাদে ও মুসনাদে আবি ইয়ালাতে। মুসনাদের অন্য রিওয়াইয়াতে সন্দেহের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ সত্তর বছর অথবা একশ বছর এবং এও আছে যে, এটা হলো شَجَرَةُ الْخُلْدِ বা চিরবিদ্যমান গাছ। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক এবং এটা অকাট্য রূপে বিশুদ্ধ। এর ইসনাদ অনেক আছে এবং এর বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিম প্রভৃতিতেও এ হাদীসটি রয়েছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তা হযরত কা'ব (রাঃ)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছে তখন তিনি বলেনঃ "যে আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! কেউ যদি নবযুবতী উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে উষ্ট্রীটি বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে তবুও ঐ ছায়ার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ওটাকে স্বহস্তে রোপণ করেছেন এবং ওতে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। ওর শাখাগুলো জান্নাতের দেয়ালগুলো হতে বাইরে বের হয়ে গেছে। জান্নাতের সমস্ত নহর এই গাছেরই মূল হতে বের হয়।

আবূ হুসাইন (রঃ) বলেনঃ "এক জায়গায় একটি দরযার উপর আমরা অবস্থান করছিলাম। আমাদের সাথে আবূ সালেহ (রঃ) এবং শাকীক জুহ্নীও (রঃ) ছিলেন। আবূ সালেহ (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, তুমি কি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলছো?"

তিনি উত্তরে বলেনঃ "না, তাঁকে তো নয়, বরং তোমাকে।" তখন এটা কারীদের কাছে খুব কঠিন ঠেকলো।[১] আমি বলি যে, এই প্রমাণিত বিশুদ্ধ এবং মারফূ' হাদীসকে যে মিথ্যা বলে সে ভুলের উপর রয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের প্রতিটি গাছের গুঁড়ি সোনার।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে যা প্রত্যেক দিকে শত শত বছরের রাস্তা পর্যন্ত ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতী লোকেরা ওর নীচে এসে বসে এবং পরস্পর আলাপ আলোচনা করে। কারো কারো দুনিয়ার খেল-তামাশা ও চিত্তাকর্ষক জিনিসের কথা স্মরণ হয়। তৎক্ষণাৎ এক জান্নাতী বাতাস প্রবাহিত হয় এবং ঐ গাছের মধ্য হতে গান-বাজনা ও খেল-তামাশার শব্দ আসতে শুরু করে।[৩]

হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রঃ) বলেন, এই ছায়া সত্তর হাজার সালের বিস্তৃতির মধ্যে হবে। হযরত আমর (রঃ) হতেই পাঁচশ' বছরও বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (রঃ) এক হাজার বছর বলেছেন।

হযরত হাসান (রঃ)-এর কাছে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই ছায়া কর্তিতই হয় না। তথায় না আছে সূর্য এবং না আছে গরম। ফজর হওয়ার পূর্বের সময়টা সব সময় ওর নীচে বিরাজ করে (অর্থাৎ সদা ঐরূপ সময়ই থাকে)।" হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতে সদা-সর্বদা ঐ সময় থাকবে যা সুবহে সাদিকের পর হতে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মাঝামাঝিতে থাকে। ছায়া বিষয়ক রিওয়াইয়াতগুলোও ইতিপূর্বে গত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا -

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে সম্প্রসারিত ছায়ায় প্রবিষ্ট করবো।" (৪ঃ ৫৭)

اُكُلُهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا

অর্থাৎ "ওর খাদ্য ও ছায়া সার্বক্ষণিক।" (১৩ঃ ৩৫) فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ অর্থাৎ "(মুত্তাকীরা থাকবে) ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।
৩. এ আসারটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা দুর্বল আসার এবং এর সনদ সবল।

আর আছে প্রবহমান পানি। কিন্তু ওটা গর্ত এবং খননকৃত যমীন হবে না। এর পূর্ণ তাফসীর فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ-এই আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে।

আর তাদের কাছে থাকবে প্রচুর ফলমূল। ওগুলো হবে খুবই সুস্বাদু। এগুলো না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে, না মানুষের অন্তরে খেয়াল জেগেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا ـ

অর্থাৎ "যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে– আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেয়া হতো এটা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে।" (২ঃ ২৫) জান্নাতের ফলগুলো দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই লাগবে, কিন্তু যখন খাবে তখন স্বাদ অন্য রকম পাবে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনায় রয়েছে যে, ওর পাতাগুলো হবে হাতীর কানের মত এবং ফলগুলো বড় বড় মটকার মত হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসে তিনি সূর্যে গ্রহণ লাগা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এও রয়েছে যে, নামায শেষে তাঁর পেছনে নামায আদায়কারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমরা এই জায়গায় আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে এবং পিছনে সরে আসতে দেখলাম, ব্যাপার কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি জান্নাত দেখেছি। জান্নাতের ফলের গুচ্ছ আমি নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তবে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত তা থাকতো এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।"

আবূ ইয়া'লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুহরের নামায পড়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আগে বেড়ে যান এবং তাঁর দেখাদেখি সাহাবীগণও সামনের দিকে এগিয়ে যান। তিনি যেন কিছু নিতে চাচ্ছিলেন। তারপর তিনি পিছনে সরে আসেন। নামায শেষে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ তো আপনি এমন এক কাজ করেন যা ইতিপূর্বে কখনো করেননি।" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমার সামনে জান্নাত আনয়ন করা হয়েছিল

এবং তাতে যে সজীবতা ও শ্যামলতা ছিল সবই আমার সামনে আনা হয়েছিল। আমি ওগুলোর মধ্য হতে আঙ্গুরের একটি গুচ্ছ নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, তা এনে তোমাদেরকে দেবো। কিন্তু আমারও ঐ গুলোর মাঝে পর্দা ফেলে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। যদি আমি তোমাদের মধ্যে ওটা নিয়ে আসতাম তবে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সমস্ত মাখলূক ওটা খেতে থাকতো, তবুও তা হতে কিছুই হ্রাস পেতো না।

মুসনাদে আহমাদে আছে যে, একজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হাওযে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং জান্নাতের কথাও উল্লেখ করে। সে প্রশ্ন করেঃ "সেখানে কি ফলও আছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ সেখানে তূবা নামক একটি গাছও আছে।" বর্ণনাকারী বলেনঃ এর পরে আরো বর্ণনা করেন যা আমার স্মরণ নেই। তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করেঃ "ঐ গাছটি আমাদের ভূ-খণ্ডের কোন গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "তোমাদের অঞ্চলে ওর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত গাছ নেই। তুমি কোন দিন সিরিয়ায় গেছো কি?" উত্তরে সে বললোঃ "না।" তখন নবী (সঃ) বললেনঃ "সিরিয়ায় এক প্রকারের গাছ জন্মে যাকে জাওযাহ্ বলা হয়। ওর একটি মাত্র গুঁড়ি হয় এবং ওর উপরের অংশ হয় ছড়ানো। এ গাছটি ঐ তূবা গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।" লোকটি প্রশ্ন করলোঃ "ওর গুচ্ছ কত বড় হয়?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "কালো কাক এক মাস পর্যন্ত উড়ে যত দূর যাবে ততো বড়ো।" লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ "ঐ গাছের গুঁড়ি কত মোটা?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "তুমি যদি তোমার উষ্ট্রীর বাচ্চাকে ছেড়ে দাও এবং সে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে যায় তবুও সে ঐ গাছের গুঁড়ি ঘুরে শেষ করতে পারবে না।" লোকটি প্রশ্ন করলোঃ "সেখানে কি আঙ্গুর ধরবে?" তিনি জবাব দেনঃ "হ্যাঁ।" সে জিজ্ঞেস করলোঃ "কত বড়?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তুমি কি তোমার পিতাকে তার যুথ হতে কোন মোটা-তাজা ছাগ নিয়ে যবেহ করে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার মাকে দিয়ে 'এর দ্বারা বালতি বানিয়ে নাও' একথা বলতে শুনেছো?" সে জবাবে বলে ঃ "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেনঃ "বেশ, এরূপই বড় বড় আঙ্গুরের দানা হবে।" সে বললোঃ "তাহলে তো একটি আঙ্গুর দানাই আমার এবং আমার পরিবারের লোকদের জন্যে যথেষ্ট হবে?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "শুধু তোমার ও তোমার পরিবারের জন্যেই নয়, বরং তোমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও যথেষ্ট হবে।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না। এ নয় যে, শীতকালে থাকবে এবং গ্রীষ্মকালে থাকবে না অথবা গ্রীষ্মকালে থাকবে এবং শীতকালে থাকবে না। বরং এটা হবে চিরস্থায়ী ফল। চাইলেই পাওয়া যাবে। আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে। এমন কি কোন কাঁটা শাখারও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং দূরেও হবে না। ফল পাড়তে কোন কষ্টই হবে না। এদিকে একটি ফল ভাঙ্গবে আর ওদিকে আর একটি ফল এসে ঐ স্থান পূরণ করে দিবে। যেমন এ ধরনের হাদীস ইতিপূর্বে গত হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'আর তাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ শয্যাসমূহ।' এই বিছানা হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "এর উচ্চতা হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান অর্থাৎ পাঁচশ বছরের পথ।"[১] কোন কোন আহলুল ইল্‌ম বলেন যে, এই হাদীসের ভাবার্থ হলোঃ বিছানার উচ্চতার স্তর আসমান ও যমীনের স্তরের সমান অর্থাৎ এক স্তর অন্য স্তর হতে এই পরিমাণ উচ্চ যে, দুই স্তরের মধ্যে পাঁচশ বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে।

হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওর উচ্চতা আশি বছরের পথ।

এরপর ضَمِيْر বা সর্বনাম এনেছেন যার مَرْجَع বা প্রত্যাবর্তন স্থল পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি, কেননা সম্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। বিছানার বর্ণনা এসেছে যার উপর জান্নাতীদের স্ত্রীরা (হূরীরা) থাকবে। সুতরাং ঐ দিকেই ضَمِيْر বা সর্বনামকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর تَوَارَتْ শব্দ এসেছে এবং شَمْس শব্দ এর পূর্বে নেই। সুতরাং সম্বন্ধই যথেষ্ট। কিন্তু হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) বলেন যে, مَرْجَع পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ حُوْرٌ عِيْنٌ ই হলো এর مَرْجَع বা প্রত্যাবর্তন স্থল।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী।' ইতিপূর্বে তারা ছিল একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী। তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিষ্টিত্বের কারণে তাদের স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয়পাত্রী হবে। কেউ কেউ বলেন যে, عُرُبًا বলা হয়

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এ রিওয়াইয়াত শুধু রুশদ ইবনে সা'দ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং তিনি দুর্বল। এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে হাতিমও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রেমের ছলনাকারিণী এবং মনোহর ভঙ্গি প্রদর্শনকারিণীকে। হাদীসে আছে যে, এরা ঐ সব মহিলা যারা দুনিয়ায় বৃদ্ধা ছিল, এখন জান্নাতে গিয়ে নব যুবতীর রূপ ধারণ করেছে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, দুনিয়ায় তারা কুমারী অবস্থায় থাকুক অথবা বৃদ্ধা অবস্থায়ই থাকুক, জান্নাতে কিন্তু সবাই কুমারীর রূপ ধারণ করবে।

একটি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক নবী (সঃ)-এর নিকট এসে আরয করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না।" বৃদ্ধা মহিলাটি তখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ (হে আমার সাহাবীবর্গ!) তোমরা তাকে খবর দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী।"[১]

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে حُوْرٌ عِيْنٌ সম্পর্কে খবর দিন!" তিনি বলেনঃ حُوْرٌ عِيْنٌ হলো গৌরবর্ণের বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা, অত্যন্ত কালো ও বড় বড় চুল বিশিষ্টা, চুলগুলো যেন গৃধিনীর পালক (জান্নাতের এই ধরনের মহিলা)।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বললেনঃ "لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এই জান্নাতী নারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ঔজ্জ্বল্য ঐ মুক্তার মত যা ঝিনুক হতে সবেমাত্র বের হয়েছে, যাতে কারো হাত পড়েনি।" তিনি বললেনঃ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ-এর তাফসীর কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "চরিত্রবতী ও সুন্দরী সুশ্রী মহিলা।" তিনি প্রশ্ন করলেনঃ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?" জবাবে নবী (সঃ) বললেনঃ "তাদের সৌন্দর্য ও নমনীয়তা ডিমের ঐ ঝিল্লীর মত যা ডিমের ভিতরে থাকে।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) عُرُبًا اَتْرَابًا-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "এর দ্বারা দুনিয়ার ঐ মুসলিম জান্নাতী নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা থুড়থুড়ে বুড়ী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং করেছেন সম্পূর্ণরূপে কুমারী ও নব যুবতী, যাদের প্রতি তাদের স্বামীরা পূর্ণমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুনিয়ার নারীদের মর্যাদা বেশী, না হূরদের মর্যাদা বেশী?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ

১. এ হাদীসটি শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে।

"হূরদের উপর দুনিয়ার নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। যেমন (ফরাশের) আস্তর অপেক্ষা বাহিরের অংশ উত্তম হয়ে থাকে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "এই ফযীলতের কারণ কি?" নবী (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "নামায, রোযা এবং আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা তাদের চেহারাকে নূর বা জ্যোতি দ্বারা এবং তাদের দেহকে রেশম দ্বারা সজ্জিত করেছেন। তাদের পরিধানে থাকবে সাদা, সবুজ, হলদে ও সোনালী বর্ণের পোশাক এবং মণি-মুক্তার অলংকার। তারা বলতে থাকবেঃ

نَحنُ الخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ اَبَدًا * وَنَحنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبأَسُ اَبَدًا

وَنَحنُ المُقِيمَاتُ فَلَا نَظعَنُ اَبَدًا * وَنَحنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسخَطُ اَبَدًا

طُوبىٰ لِمَن كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا

অর্থাৎ "আমরা সদা বিদ্যমান থাকবো, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা নায ও নিয়ামত এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারিণী, কখনো আমরা দরিদ্র ও নিয়ামত শূন্য হবো না। আমরা নিজেদের বাসস্থানে সদা অবস্থানকারিণী, কখনো আমরা সফরে গমন করবো না। আমরা সর্বদা আমাদের স্বামীদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না, ভাগ্যবান তারাই যাদের জন্যে আমরা হবো এবং আমাদের জন্যে তারা হবে।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন কোন স্ত্রীলোকের দুটি, তিনটি এবং চারটিও স্বামী হয়ে যায়, এরপর তার মৃত্যু এসে যায়। মৃত্যুর পর যদি এই স্ত্রী লোকটি জান্নাতে যায় এবং তার সব স্বামীও জান্নাতী হয় তবে কার সাথে মিলিত হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "তাকে অধিকার দেয়া হবে, সে যার সাথে ইচ্ছা মিলিত হতে পারে। সুতরাং সে তার ঐ স্বামীগুলোর মধ্যে তার সাথে মিলিত হওয়া পছন্দ করবে যে দুনিয়ায় তার সাথে ভাল ব্যবহার করতো। সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই এই (আমার এই স্বামী) আমার সাথে উত্তমরূপে জীবন যাপন করতো। সুতরাং এরই সাথে (আজ) আমার বিয়ে দিন!" হে উম্মে সালমা (রাঃ)! উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে রয়েছে।"[১]

সূরের (শিঙ্গার) বিখ্যাত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত মুসলমানকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা

১. এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বলবেনঃ "আমি তোমার সুপারিশ কবূল করলাম এবং তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিলাম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি তখন তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আল্লাহর শপথ! যেমন তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ী ও স্ত্রী-পরিজনকে চিনো, আহলে জান্নাত তাদের বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে এর চেয়েও বেশী চিনবে। একজন জান্নাতীর বাহাত্তরটি করে স্ত্রী হবে, যারা হবে আল্লাহর সৃষ্ট। আর দুটি করে স্ত্রী হবে আদম সন্তানের মধ্য হতে। এদেরকে এদের ইবাদতের কারণে সমস্ত স্ত্রীর উপর ফযীলত দান করা হবে। জান্নাতী ব্যক্তি তাদের এক একজনের কাছে যাবে। প্রত্যেকে এমন প্রাসাদে অবস্থান করবে যা হবে পদ্মরাগ নির্মিত। আর ঐ পালঙ্গের উপর থাকবে যা সোনার তার দিয়ে বানানো থাকবে এবং তাতে মণি-মুক্তা বসানো থাকবে। প্রত্যেকে মিহিন রেশম ও পুরু রেশমের সত্তর জোড়া কাপড় পরিধান করে থাকবে। এই স্ত্রী এমন নমনীয়া ও উজ্জ্বল হবে যে, স্বামী তার কোমরে হাত রেখে বক্ষের দিকে তাকালে সবই দেখতে পাবে। কাপড়, গোশত, অস্থি ইত্যাদি কোন জিনিসই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তার পদনালীর মজ্জা পর্যন্ত সে দেখতে পাবে। অনুরূপভাবে জান্নাতীর দেহও হবে জ্যোতির্ময়। মোটকথা, এ তার দর্পণ হবে এবং সে এর দর্পণ হবে। জান্নাতী স্বামী তার স্ত্রীর সাথে শান্তিময় মিলনে মশগুল হয়ে পড়বে। স্বামী-স্ত্রী কেউই ক্লান্ত হবে না। কেউই কারো প্রতি বিরক্ত হবে না। স্বামী যখনই স্ত্রীকে কাছে করবে তখনই তাকে কুমারী পাবে। তার অঙ্গ অবসন্ন হবে না এবং তার কাছে কিছুই কঠিনও ঠেকবে না। সেখানে বিশেষ পানি (শুক্র) থাকবে না যাতে ঘৃণা আসে। তারা দু'জন এভাবে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায় জান্নাতী ব্যক্তির কানে শব্দ আসবেঃ "এটা তো আমাদের খুব ভালই জানা আছে যে, আপনাদের কারো মনের আকাঙ্ক্ষা মিটবে না, কিন্তু আপনার অন্যান্য স্ত্রীরাও তো আছে?" তখন ঐ জান্নাতী ব্যক্তি বের হয়ে আসবে এবং এক একজনের কাছে যাবে। যার কাছে যাবে সেই তাকে দেখে বলে উঠবেঃ "আল্লাহর কসম! জান্নাতে আমার জন্যে আপনার চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। আপনার চেয়ে অধিক ভালবাসা আমার কারো প্রতি নেই।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জান্নাতে জান্নাতী লোক স্ত্রী সঙ্গমও করবে কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই আল্লাহর শপথ! সত্যি জান্নাতবাসী জান্নাতে স্ত্রী সঙ্গম করবে এবং খুব ভালভাবে উত্তম পন্থাতেই করবে। যখন তারা পৃথক হবে তখনই স্ত্রী এমনই পাক সাফ কুমারী হয়ে যাবে যে, তাকে যেন কেউ স্পর্শই করেনি।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জান্নাতে মুমিনকে এতো এতো স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করা হবে।" হযরত আনাস (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতো ক্ষমতা সে রাখবে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "একশজন লোকের সমান শক্তি তাকে দান করা হবে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবো?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "প্রতিদিন একজন লোক একশজন কুমারীর সাথে মিলিত হবে।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) عُرُبًا -এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আসক্তা হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে।

ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলোঃ মনোহর ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিকারিণী। এক সনদে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলোঃ কমনীয় ভাব প্রদর্শনকারিণী। তামীম ইবনে হাযলাম (রঃ) বলেন যে, عُرُبًا ঐ স্ত্রীলোককে বলা হয় যে তার স্বামীর মন তার মুঠোর মধ্যে রাখে। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হলো উত্তম ও মধুর বচন। স্ত্রী তার স্বামীর অন্তর মোহিত করে দেয়। যখন কিছু বলে তখন মনে হয় যেন ফুল ঝরে পড়ছে এবং নূর বা জ্যোতি বর্ষিত হচ্ছে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছেঃ তাদেরকে عُرُب বলার কারণ এই যে, তাদের কথাবার্তা আরবী ভাষায় হবে।

اَتْرَاب -এর অর্থ হলো সমবয়স্কা অর্থাৎ সবাই তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ হয় যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে। স্বামী যা পছন্দ করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ করে।

এ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে, যাতে অকৃত্রিমভাবে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং খেলা-ধুলা ও লাফালাফি করতে পারে।

১. এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবদুল্লাহ্ মুকাদ্দাসী (রঃ) বলেনঃ "আমার মতে এ হাদীসটি শর্তে সহীহ এর উপর রয়েছে।" এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হূরেরা একটা চমৎকার বাগানে একত্রিত হয়ে এমন মধুর সুরে গান গায় যে, এরূপ মিষ্টি সুরের গান সৃষ্টজীব কখনো শুনেনি। তাদের গান ওটাই হবে যা উপরে বর্ণিত হলো।"[১]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হূরেরা জান্নাতে গান গাইবে। তারা বলবেঃ

نَحْنُ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * خُبِئْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ

অর্থাৎ "আমরা পাক-পবিত্র, চরিত্রবতী ও সুশ্রী মহিলা, আমাদেরকে সম্মানিত স্বামীদের জন্যে লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।" অন্য রিওয়াইয়াতে خيرات -এর স্থলে خَوَّار শব্দ এসেছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এদেরকে ডান দিকের লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরই জন্যে রক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশী প্রকাশমান এটাই যে, এটা ... اِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ -এর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি।

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের পর দু'আ করতে শুরু করি। ঠাণ্ডা খুব কঠিন ছিল এবং খুব কুয়াশা পড়েছিল বলে আমি দু'হাত উঠাতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি এক হাতেই দু'আ করতে থাকি। দু'আর অবস্থাতেই আমাকে নিদ্রায় চেপে ধরে। স্বপ্নে আমি একটি হূরকে দেখতে পাই, যার মত সুন্দরী ও নূরানী চেহারার মহিলা ইতিপূর্বে কখনো আমার চোখে পড়েনি। সে আমাকে বলেঃ "হে আবূ সুলাইমান! আপনি এক হাতে দু'আ করছেন? অথচ আপনার এটা ধারণা নেই যে, পাঁচশ বছর হতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্যে তাঁর খাস নিয়ামতের দ্বারা লালন পালন করছেন"।

এও হতে পারে যে, এই لَام সম্পর্কযুক্ত اَتْرَابًا -এর সাথে। অর্থাৎ তাদেরই সমবয়স্কা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে গারীব বলেছেন।

দলের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু এবং নাকের শ্লেষ্মা হতে পবিত্র হবে। তাদের কংকন হবে স্বর্ণনির্মিত। তাদের দেহের ঘর্ম মৃগনাভীর মত সুগন্ধময় হবে। তাদের আংটিগুলো হবে মুক্তা নির্মিত। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হূরেরা হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সবারই চরিত্র হবে একই ব্যক্তির মত। তারা সবাই তাদের পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতবাসী চুল বিহীন, শ্মশ্রুবিহীন, গৌরবর্ণের উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট, সুন্দর, কাজল কালো চক্ষু বিশিষ্ট, তেত্রিশ বছর বয়স্ক, ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত চওড়া, মযবূত দেহ বিশিষ্ট হবে।"[১]

অন্য এক হাদীসে আছে যে, যে কোন বয়সে মারা যাক না কেন, জান্নাতে প্রবেশের সময় সে তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে এবং ঐ বয়সেই সদা-সর্বদা থাকবে। জাহান্নামীদের অবস্থাও অনুরূপ হবে।"[২]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের দেহ ফেরেশতাদের হাতে ষাট হাত হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আহলুল জান্নাত জান্নাতে যাবে এমন অবস্থায় যে, তাদের দেহ হবে হযরত আদম (আঃ)-এর মত, সৌন্দর্য হবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মত, বয়স হবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত অর্থাৎ তেত্রিশ বছর এবং ভাষা হবে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মত অর্থাৎ আরবী। তারা হবে চুলবিহীন এবং কাজল কালো চক্ষুবিশিষ্ট।"[৩]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, জান্নাতে প্রবেশের পরেই তাদেরকে জান্নাতের একটি গাছের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে কাপড় পরানো হবে। তাদের কাপড় না পচবে, না পুরানো হবে এবং না ময়লাযুক্ত হবে। তাদের যৌবনে কখনো ভাটা পড়বে না।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর কিছু অংশ জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোক অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা বলেনঃ "আজ আমার সামনে নবীদেরকে তাঁদের উম্মতসহ পেশ করা হয়। কোন কোন নবী (আঃ)-এর একটি দল ছিল, কারো সাথে মাত্র তিনজন লোক ছিল এবং কারো সাথে একজনও ছিল না।" হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত কাতাদা (রঃ) এটুকু বর্ণনা করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কি একজনও বিবেকবান ব্যক্তি নেই?" (১১ঃ ৭৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) আগমন করেন। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমার প্রতিপালক! এটা কে? উত্তর হলোঃ "এটা তোমার ভাই হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) এবং তার সাথে রয়েছে তার অনুসারী উম্মত। আমি প্রশ্ন করলামঃ হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমার উম্মত কোথায়? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেনঃ "তোমার ডানে নীচের দিকে তাকাও।" আমি তাকালে এক বিরাট জামাআত আমার দৃষ্টিগোচর হলো। বহু লোকের চেহারা দেখা গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো কি?" আমি উত্তরে বললামঃ হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তারপর তিনি আমাকে বললেনঃ "এখন তুমি তোমার বাম প্রান্তের দিকে তাকাও।" আমি তখন তাকিয়ে দেখলাম যে, অসংখ্য লোক রয়েছে। আবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এখন তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো তো?" আমি উত্তর দিলামঃ হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর তিনি বললেনঃ "জেনে রেখো যে, এদের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে।" একথা শুনে হযরত উক্কাশা (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি বানু আসাদ গোত্রীয় মুহসিনের পুত্র ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁর জন্যে দু'আ করেন। এ দেখে আর একটি লোক দাঁড়িয়ে যান এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন।" তিনি বলেনঃ "উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়েছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ

"হে লোক সকল! তোমাদের উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, তোমাদের দ্বারা সম্ভব হলে তোমরা ঐ সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আমি অধিকাংশ লোককেই দেখি যে, তারা নিজেদের অবস্থার সাথেই ঝুলে পড়ে।" তারপর তিনি বলেনঃ "আমি আশা রাখি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে।" (বর্ণনাকারী বলেনঃ) তাঁর একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেনঃ "আমি আশা করি যে, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।" আমরা তাঁর একথা শুনে পুনরায় তাকবীর পাঠ করলাম। আবার তিনি বললেনঃ "তোমরাই হবে সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক।" এ কথা শুনে আমরা আবারও তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেনঃ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ "তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।" এখন আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, এই সত্তর হাজার লোক কারা হবে? তারপর আমরা মন্তব্য করলাম যে, এরা হবে ঐ সব লোক যারা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনোই শির্‌ক করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "বরং এরা হবে ঐসব লোক যারা দাগ দিয়ে নেয় না, ঝাড় ফুঁক করায় না এবং পূর্ব লক্ষণ দেখে ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ধারণ করে না, বরং সদা প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল থাকে।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ -এ আয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এই আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দ্বারা আমার উম্মতেরই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।"[২]

৪১। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল!

৪২। তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

٤١- وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ۬ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝

٤٢- فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা বহু সনদে সাহাবীদের (রাঃ) রিওয়াইয়াতে বহু কিতাবে বিশুদ্ধতার সাথে বর্ণিত আছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪৩। কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়,	٤٣- وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۙ
৪৪। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।	٤٤- لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ
৪৫। ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে	٤٥- اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۚ
৪৬। এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে	٤٦- وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۚ
৪৭। তারা বলতোঃ মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হবো আমরা?	٤٧- وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ
৪৮। এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণও?	٤٨- اَوَ اٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ
৪৯। বলঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ-	٤٩- قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۙ
৫০। সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে;	٥٠- لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ
৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যারোপকারীরা!	٥١- ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّاۤلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ
৫২। তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম বৃক্ষ হতে,	٥٢- لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ
৫৩। এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে,	٥٣- فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ
৫৪। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি-	٥٤- فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ

৫৫। পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

৫৬। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

৫৫- فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ○

৫৬- هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ○

আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বাম দিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা কতই না কঠিন শাস্তি ভোগ করবে! অতঃপর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ـ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ـ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ـ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ـ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ـ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে। এটা উৎক্ষেপণ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য, ওটা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।" (৭৭ঃ ২৯-৩৪) এজন্যেই এখানে বলেছেনঃ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ অর্থাৎ তারা থাকবে কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্র ছায়ায়। যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। এটা আরবদের বাক পদ্ধতি যে, তারা যখন কোন জিনিসের মন্দ গুণ অধিক রূপে বর্ণনা করে তখন ওর সর্বপ্রকারের খারাপ গুণ বর্ণনা করার পর وَلَا كَرِيْمٍ বলে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে শাস্তির যোগ্য বলার কারণ বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ায় তাদেরকে যে নিয়ামতের অধিকারী করা হয়েছিল তার মধ্যে তারা মত্ত ছিল। রাসূলদের (আঃ) কথায় তারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারা ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল এবং অবিরাম ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, حِنْثٍ عَظِيْمٍ দ্বারা কুফরী ও শিরক উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা কসম।

এরপর তাদের আর একটি দোষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকেও অসম্ভব মনে করে। তারা এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং জ্ঞান সম্পর্কীয় দলীল পেশ করে যে, মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে গিয়ে পুনরায় জীবিত হওয়া কি কখনো সম্ভব হতে পারে? তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং সবাই এক মাঠে একত্রিত হবে। একজন লোকও এমন থাকবে না যে দুনিয়ায় এসেছে এবং সেখানে থাকবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ـ وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ـ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "এটা সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, এটা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে। আর আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্যে ওটা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।" (১১ঃ ১০৩-১০৫) এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ "সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।" কিয়ামতের দিন এবং সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রয়েছে। কম বেশী এবং আগে পরে হবে না।

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। কেননা, ওটা জোরপূর্বক তোমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি এবং ঐ পানি তোমরা পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

هِيْم শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো اَهْيَمُ এবং স্ত্রীলিঙ্গ هَيْمَاءُ হবে। এটাকে هَائِم এবং هَائِمَةٌ ও বলা হয়। কঠিন তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রকে هَائِم বলা হয়, যার পিপাসাযুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয় না। এই রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি পান করাবো, যা নিজেই একটা জঘন্যতম শাস্তি হবে। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা কিরূপে নিবারণ হতে পারে?

হযরত খালিদ ইবনে মাদান (রাঃ) বলেন যে, একই নিঃশ্বাসে পানি পান করাও পিপাসার্ত উষ্ট্রের পানের সাথে তুলনীয়। এ জন্যে এভাবে পানি পান করা মাকরূহ!

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।' যেমন মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্যে আছে ফিরদাউসের উদ্যান।" (১৮ঃ ১০৭) অর্থাৎ সম্মানিত আপ্যায়ন।

৫৭। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছো না?

৫৭- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○

৫৮। তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

৫৮- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○

৫৯। ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

৫৯- ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

৬০। আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই--

٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না।

٦١- عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬২। তোমরা তো অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

٦٢- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেনঃ প্রথমবার যখন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি যখন তোমরা কিছুই ছিলে না, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার পক্ষে

মোটেই কঠিন নয়। কারণ তোমাদের তখন তো কিছু না কিছু থাকবে?" যখন তোমরা তোমাদের প্রথম সৃষ্টিকে বিশ্বাস ও স্বীকার করছো তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্ট হওয়াকে কেন অস্বীকার করছো? দেখো, মানুষের বিশেষ পানির বিন্দু তো স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে থাকে। এটুকু কাজ তো তোমাদের। কিন্তু ঐ বিন্দুকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত করা কার কাজ? এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এতে তোমাদের কোনই দখল নেই, কোন হাত নেই, কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন চেষ্টা-তদবীর নেই। এ কাজ তো শুধুমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল ইয্যত আল্লাহর। ঠিক তদ্রূপ মৃত্যু ঘটাতেও তিনিই সক্ষম। আকাশ ও পৃথিবীবাসী সকলেরই মৃত্যুর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তাহলে যিনি এতো বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি এ ক্ষমতা রাখেন না যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের মৃত্যুকে সৃষ্টিতে পরিবর্তিত করে যে বিশেষণে ও যে অবস্থায় ইচ্ছা তোমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন? প্রথম সৃষ্টি তিনিই করেছেন, আর এটা বিবেক সম্মত ব্যাপার যে, প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হতে কঠিনতর। সুতরাং কি করে তোমরা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পার? এটাকেই অন্য জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِى يَبدَؤُا الْخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهوَنُ عَلَيهِ ـ

অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দ্বিতীয় বার ওকে ফিরাবেন (পুনর্বার সৃষ্টি করবেন) এবং এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।" (৩০ঃ ২৭) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

اَوَلَا يَذكُرُ الْاِنسَانُ اَنَّا خَلَقنٰهُ مِن قَبلُ وَلَم يَكُ شَيئًا ـ

অর্থাৎ "মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?" (১৯ঃ ৬৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَوَلَم يَرَالْاِنسَانُ اَنَّا خَلَقنٰهُ مِن نُّطفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ـ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلقَهٗ قَالَ مَن يُّحىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ ـ قُل يُحيِيهَا الَّذِى اَنشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلقٍ عَلِيمٌ ـ

অর্থাৎ "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা

রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (৩৬ঃ ৭৭-৭৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى - فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى -

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?" অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?" (৭৫ঃ ৩৬-৪০)

৬৩। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি?

٦٣- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○

৬৪। তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?

٦٤- ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

৬৫। আমি ইচ্ছা করলে একে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা,

٦٥- لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○

৬৬। বলবেঃ আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে!

٦٦- اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○

৬৭। আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।

٦٧- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

৬৮। তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছো?

٦٨- اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ○

٦٩- ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○

৬৯। তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি?

٧٠- لَوْ نَشَاۤءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

৭০। আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

٧١- اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ○

৭১। তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছো কি?

٧٢- ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ○

৭২। তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

٧٣- نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○

৭৩। আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।

٧٤- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○ ع

৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা জমি চাষাবাদ করে থাকো, জমি চাষ করে বীজ বপন কর। আচ্ছা, এখন বলতো, তোমরা যে বীজ বপন করে থাকো তা অংকুরিত করার ক্ষমতা কি তোমাদের, না আমার? না, না, বরং ওকে অংকুরিত করা, তাতে ফুল-ফল দেয়ার কাজ একমাত্র আমার।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা زَرَعْتُ বলো না, বরং حَرَثْتُ বলো।" অর্থাৎ তোমরা বলোঃ 'আমি বীজ বপন করেছি,' 'আমি অংকুরিত করেছি' একথা বলো না। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি শুনবার পর বলি, তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের উক্তি শুননিঃ "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি বীজ অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাজর মাদরী (রঃ) এই আয়াত বা অনুরূপ আয়াত পাঠের সময় বলতেনঃ بَلْ اَنْتَ يَا رَبِّ অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! বরং আপনি (অংকুরিত করেন)।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে ওকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। অর্থাৎ অংকুরিত করার পরেও আমার মেহেরবানী রয়েছে যে, আমি ওকে বড় করি ও পাকিয়ে তুলি। কিন্তু আমার এ ক্ষমতা আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে ওকে শুকিয়ে দিয়ে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। এভাবে ওকে বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। তখন তোমরা বলতে শুরু করবেঃ আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের তো আসলটাও চলে গেল। লাভ তো দূরের কথা, আমাদের মূলধনও মারা গেল। তখন তোমরা বিভিন্ন কথা মুখ দিয়ে বের করে থাকো। কখনো কখনো বলে থাকোঃ হায়! যদি আমরা এবার বীজই বপন না করতাম তবে কতই না ভাল হতো! যদি এরূপ করতাম বা ঐরূপ করতাম! ভাবার্থ এও হতে পারেঃ ঐ সময় তোমরা নিজেদের পাপের উপর লজ্জিত হয়ে থাকো।

تَفَكُّه শব্দটির দু'টি অর্থই হতে পারে। একটি হলো লাভ বা উপকার এবং অপরটি দুঃখ বা চিন্তা। مُزْن বলা হয় মেঘকে।

মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেনঃ দেখো, এটা বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাভুক্ত। কেউ কি মেঘ হতে পানি বর্ষাবার ক্ষমতা রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে মিষ্ট ও তিক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই তোমরা পেয়ে থাকো। এই পানিতে তোমরা গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, বাগানে সেচন করে থাকো এবং জীব-জন্তুকে পান করিয়ে থাকো। তবে তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ওটাই কি তোমাদের জন্যে উচিত? রাসূলুল্লাহ (সঃ) পানি পান করার পর বলতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

অর্থাৎ "ঐ আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা যিনি স্বীয় রহমতের গুণে আমাদেরকে সুমিষ্ট ও উত্তম পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের পাপের কারণে এই পানিকে লবণাক্ত এবং তিক্ত করেননি।"

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আরবে মুরখ ও ইফার নামক দুটি গাছ জন্মে যেগুলোর সবুজ শাখাগুলো পরস্পর ঘর্ষিত হলে আগুন বের হয়ে থাকে। এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ এই যে আগুন, যদ্দ্বারা তোমরা রান্না-বান্না করে থাকো এবং আরো বহুবিধ উপকার লাভ করে থাকো, বলতো, এর মূল অর্থাৎ এই গাছ সৃষ্টিকারী তোমরা, না আমি? এই আগুনকে আমি উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। অর্থাৎ এই আগুন দেখে তোমরা জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করবে এবং তা হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।" সাহাবীগণ (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটাই তো (জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে) যথেষ্ট।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, এ আগুনকেও দু'বার পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। এখন এটা এই যোগ্যতা রেখেছে যে, তোমরা এর দ্বারা উপকার লাভ করতে পার এবং ওর নিকটে যেতে পার।"[১]

مُقْوِيْن দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে জঙ্গলে বসবাসকারীদের مُقْوِيْن বলে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যেক ক্ষুধার্তকেই مُقْوِيْن বলা হয়। মোটকথা, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যারই আগুনের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আগুন দ্বারা উপকার লাভের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক আমীর, ফকীর, শহুরে, গ্রাম্য, মুসাফির এবং মুকীম সবারই আগুনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। রান্না-বান্নার কাজে, তাপ গ্রহণ করার কাজে, আগুন জ্বালাবার কাজে ইত্যাদিতে আগুনের একান্ত দরকার। এটা আল্লাহ তা'আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি গাছের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে মুসাফির ব্যক্তি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে পারে।

সুনানে আবূ দাউদ প্রভৃতিতে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিনটি জিনিসের মধ্যে মুসলমানদের সমান অংশ রয়েছে। তাহলো আগুন, ঘাস ও পানি।" সুনানে ইবনে মাজাহ্তে রয়েছে যে, এ তিনটি জিনিস হতে বাধা দেয়ার কারো অধিকার নেই। একটি রিওয়াইয়াতে মূল্যেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর সনদ দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১. এ হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হাদীস।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যিনি এই বিরাট ক্ষমতার অধিকারী তাঁর সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। যে আল্লাহ আগুন জ্বালাবার মত জিনিস তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, যিনি পানিকে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি, যাতে তোমরা পিপাসায় কষ্ট না পাও, এই পানি তিনি করেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণ। তোমরা দুনিয়ায় এসব নিয়ামত ভোগ করতে থাকো এবং মহান প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মোটেই কার্পণ্য করো না। তাহলে আখিরাতেও তোমরা চিরস্থায়ী সুখ লাভ করবে। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা এই আগুন তোমাদের উপকারের জন্যে বানিয়েছেন এবং সাথে সাথে এজন্যেও যে, যাতে তোমরা এর দ্বারা আখিরাতের আগুন সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পার এবং তা হতে বাঁচার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাও।

৭৫। আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের,

٧٥- فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ○

৭৬। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে–

٧٦- وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○

৭৭। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন,

٧٧- اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○

৭৮। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,

٧٨- فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○

৭৯। যারা পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।

٧٩- لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

৮০। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতারিত।

٨٠- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮১। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে?

٨١- اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ○

৮২। এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো!

٨٢- وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ○

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই কসমগুলো কালাম শুরু করার জন্যে হয়ে থাকে। কিন্তু এই উক্তিটি দুর্বল। জমহূর বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার কসম, তিনি তাঁর মাখলূকের মধ্যে যার ইচ্ছা কসম খেতে পারেন এবং এর দ্বারা ঐ জিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কোন কোন মুফাসসিরের উক্তি এই যে, এখানে لَا অতিরিক্ত এবং اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ .... হলো কসমের জবাব। এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অন্যেরা বলেন যে, এখানে لَا -কে অতিরিক্ত বলার কোন প্রয়োজনই নেই। কালামে আরবের প্রথা হিসেবে এটা কসমের শুরুতে এসে থাকে। যখন কোন জিনিসের উপর কসম খাওয়া হয় এবং ওটাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তখন কসমের শুরুতে এই لَا এসে থাকে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিম্নের উক্তিতে রয়েছেঃ

لَا وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত কখনো কোন স্ত্রীলোকের হাতকে স্পর্শ করেনি।" অর্থাৎ বায়আত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কোন নিঃসম্পর্ক স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করেননি। অনুরূপভাবে এখানেও لَا কসমের শুরুতে নিয়ম অনুযায়ী এসেছে, অতিরিক্ত হিসেবে নয়। তাহলে কালামের ভাবার্থ হবেঃ কুরআন কারীম সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা আছে যে, এটা যাদু, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং এ পবিত্র কিতাবটি আল্লাহর কালাম। কোন কোন আরব বলেন যে, لَا দ্বারা তাদের কালামকে অস্বীকার করা হয়েছে। অতঃপর আসল বিষয়ের স্বীকৃতি শব্দে রয়েছে।

مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন কারীম ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হওয়া। লাওহে মাহফূয হতে তো কদরের রাত্রিতে কুরআন কারীম একই সাথে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়। তারপর প্রয়োজন মত অল্প অল্প করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হতে থাকে। এই ভাবে কয়েক বছরে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আসমানের সূর্যোদয়ের জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। مَوَاقِعُ দ্বারা مَنَازِل উদ্দেশ্য। হাসান (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন ঐগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ তারকাগুলোকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা বা বিশ্বাস ছিল যে, অমুক অমুক তারকার কারণে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ অবশ্যই এটা এক মহাশপথ! কেননা, যে বিষয়ের উপর শপথ করা হচ্ছে তা খুবই বড় বিষয়। অর্থাৎ এই কুরআন বড়ই সম্মানিত কিতাব। এটা বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় কিতাবে রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা পূতঃপবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। অর্থাৎ শুধু ফেরেশতারাই এটা স্পর্শ করে থাকেন। হ্যাঁ, তবে দুনিয়ায় এটাকে সবাই স্পর্শ করে সেটা অন্য কথা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে مَا يَمَسُّهُ রয়েছে। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এখানে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ নয়, মানুষ তো পাপী। এটা কাফিরদের জবাবে বলা হয়েছে। তারা বলতো যে, এই কুরআন নিয়ে শয়তান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলেনঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ـ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ـ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "এটা নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয় না, না তাদের এই যোগ্যতা বা শক্তি আছে, এমনকি তাদেরকে তো এটা শ্রবণ হতেও দূর করে দেয়া হয়।" (২৬ঃ ২১০-২১২) এ আয়াতের তাফসীরে এ উক্তিটিই মনে বেশী ধরছে। তবে অন্যান্য উক্তিগুলোও এর অনুরূপ হতে পারে। ফারা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর স্বাদ ও মজা শুধুমাত্র ঈমানদার লোকেরাই পেতে পারে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া। যদিও এটা খবর, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো ইনশা। কুরআন দ্বারা এখানে মাসহাফ উদ্দেশ্য। ভাবার্থ হলো এই যে, মুসলমান অপবিত্র অবস্থায় কুরআন কারীমে হাত লাগাবে না। একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীমকে সাথে নিয়ে হারবী কাফিরদের দেশে যেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, হতে পারে যে, শত্রুরা এর কোন ক্ষতি সাধন করবে।"[১]

হযরত আমর ইবনে হাযাম (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন তাতে এও ছিলঃ "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া যেন কেউ কুরআন স্পর্শ না করে।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) স্বীয় মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

মারাসীলে আবি দাঊদে রয়েছে যে, যুহরী (রঃ) বলেনঃ "আমি স্বয়ং পত্রটি দেখেছি এবং তাতে এই বাক্যটি পাঠ করেছি।" যদিও এ রিওয়াইয়াতটির বহু সনদ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটির বিষয়েই চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এই কুরআন কবিতা, যাদু অথবা অন্য কোন বিষয়ের গ্রন্থ নয়, বরং এটা সরাসরি সত্য। কারণ এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটাই সঠিক ও সত্য কিতাব। এটা ছাড়া এর বিরোধী সবই মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি এটাই হবে যে, তোমরা একে অবিশ্বাস করবে?

ইয্দ গোত্রের ভাষায় رِزْق -এর অর্থ شُكْر বা কৃতজ্ঞতা এসে থাকে। মুসনাদের একটি হাদীসেও رِزْق -এর অর্থ شُكْر করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা বলে থাকো যে, অমুক তারকার কারণে তোমরা পানি পেয়েছো বা অমুক তারকার কারণে অমুক জিনিস পেয়েছো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বৃষ্টির সময় কোন কোন লোক কুফরী কালেমা বলে ফেলে। তারা বলে থাকে যে, বৃষ্টির কারণ হলো অমুক তারকা।

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলাম, রাত্রে খুব বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের দিকে মুখ করে বলেনঃ "আজ রাত্রে তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?" জনগণ বললেনঃ "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "আজ আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে কাফির হয়েছে এবং অনেকে মুমিন হয়েছে। যে বলেছে যে, আল্লাহর ফযল ও করমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে যে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আকাশ হতে যে বরকত নাযিল হয় তা কারো ঈমানের এবং কারো কুফরীর

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) স্বীয় মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিমও (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন।

কারণ হয়ে থাকে (শেষ পর্যন্ত)।"[১] হ্যাঁ, তবে এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, একবার হযরত উমার (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "সুরাইয়া তারকা উদিত হতে কত দিন বাকী আছে?" তারপর তিনি বলেনঃ "জ্যোতির্বিদদের ধারণা এই যে, এই তারকা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর আবার দিগন্তে প্রকাশিত হয়ে থাকে।" বাস্তবে এটাই হয় যে, এই প্রশ্নোত্তর ও ইসতিসকার (পানির জন্যে প্রার্থনার) সাত দিন অতিক্রান্ত হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তবে এ ঘটনাটি স্বভাব এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা নয় যে, ঐ তারকাকেই তিনি বৃষ্টি বর্ষণের কারণ মনে করতেন। কেননা, এ ধরনের আকীদা তো কুফরী! হ্যাঁ, তবে অভিজ্ঞতাবলে কোন কিছু জেনে নেয়া বা কোন কথা বলে দেয়া অন্য জিনিস। এই ব্যাপারে বহু হাদীস مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্যে যে রহমত খুলে দেন তা কেউ বন্ধ রাখতে পারে না। (৩৫ঃ ২) এই আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে বলতে শুনেনঃ 'অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।' তখন তিনি বলেনঃ "তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। এ বৃষ্টি তো আল্লাহ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন! এটা আল্লাহর রিয্ক।"[২]

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখনই রাত্রে কোন কওমের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তখনই সকালে ঐ কওম ওর সাথে কুফরীকারী হয়েছে।" তারপর আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেনঃ

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, তাদের মধ্যে কোন উক্তিকারী উক্তি করেঃ "অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।"[৩]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছেঃ "সাত বছর পর্যন্ত যদি মানুষ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত থাকে, তারপর যদি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়, তবে তখনো তারা বলে বসবে যে, অমুক তারকা বৃষ্টি বর্ষণ করেছে।"

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

'তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো।' আল্লাহ পাকের এ উক্তি সম্পর্কে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তোমরা এ কথা বলো না যে, অমুক প্রাচুর্যের কারণ হলো অমুক জিনিস, বরং বলোঃ 'সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসে থাকে।' সুতরাং ভাবার্থ এটাও। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, কুরআনে তাদের কোনই অংশ নেই, বরং তাদের অংশ এটাই যে, তারা এই কুরআনের উপর মিথ্যারোপ করে থাকে। এই ভাবার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে নিম্নের আয়াতদ্বয়ঃ

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ - وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ -

---

৮৩। পরন্তু কেন নয়– প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়।	٨٣- فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ○
৮৪। এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো।	٨٤- وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ○
৮৫। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।	٨٥- وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○
৮৬। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও,	٨٦- فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ○
৮৭। তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٨٧- تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যখন রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ - وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ - وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ - اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ -

অর্থাৎ "যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে এবং বলা হবেঃ কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ। আর পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে।

সেই দিন আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে।" (৭৫ঃ ২৬-৩০) এ জন্যেই এখানে বলেনঃ তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। অর্থাৎ একটি লোক বিদায়ক্ষণে উপস্থিত। সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, রূহ বিদায় হতে চলেছে। তোমরা সবাই তার পার্শ্বে বসে তার দিকে তাকাতে থাকো। কিন্তু তোমাদের কেউ কিছু করতে পারে কি? না, কেউই কিছু করতে সক্ষম নয়। আমার ফেরেশতারা ঐ মৃত্যুমুখী ব্যক্তির তোমাদের চেয়েও বেশী নিকটে রয়েছে যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ - ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ -

অর্থাৎ "এবং তিনি তাঁর বান্দাদের উপর জয়যুক্ত, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণা বেক্ষণকারী প্রেরণ করেন। যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় এসে পড়ে তখন আমার প্রেরিতরা সঠিকভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। তারপর তারা সবাই তাদের সত্য মাওলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি ন্যায় বিচারক এবং সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" (৬ঃ ৬১-৬২)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তবে তোমরা ওটা অর্থাৎ প্রাণ ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ যদি এটা সত্য হয় যে, তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে না এবং তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে হাযির করা হবে না, যদি তোমরা হাশর-নশরে বিশ্বাসী না হও এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না ইত্যাদি, তবে আমি বলি যে, তোমরা তাহলে ঐ রূহকে যেতে দিচ্ছ কেন? আটকিয়ে রাখো! যদি রূহ তোমাদের আয়ত্তাধীন হয়ে থাকে তবে কণ্ঠাগত প্রাণ বা রূহকে ওর আসল জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও না? কিন্তু তোমরা তা কখনো পারবে না। সুতরাং জেনে রেখো যে, যেমন এই রূহকে আমি দেহে নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলাম এবং তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছো, তেমনই বিশ্বাস রেখো যে, দ্বিতীয়বার ঐ রূহকে দেহে নিক্ষেপ করে নতুনভাবে জীবন দানেও আমি সক্ষম হবো। না তোমাদের নিজেদের জীবন সৃষ্টিতে কোন দখল আছে, না মৃত্যুতে কোন কর্তৃত্ব আছে, তাহলে পুনরুত্থানে তোমাদের দখল কোথা হতে আসলো? যেমন তোমরা বলছো যে, তোমরা মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হবে না? তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক।

৮৮। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়,

٨٨- فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৮৯। তার জন্যে রয়েছে আরাম, উত্তম বীজনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান;

٨٩- فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝

৯০। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

٩٠- وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝

৯১। তাকে বলা হবেঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী। তোমার প্রতি শান্তি।

٩١- فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝

৯২। কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়,

٩٢- وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

৯৩। তবে রয়েছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা

٩٣- فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝

৯৪। এবং দহন জাহান্নামের;

٩٤- وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ۝

৯৫। এটা তো ধ্রুব সত্য।

٩٥- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۝

৯৬। অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

٩٦- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝ ع

এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মৃত্যুর সময়, মৃত্যু যন্ত্রণার সময় এবং দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে মানুষের হয়ে থাকে। হয়তো সে উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবে বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, কিংবা হয়তো সে হতভাগ্য হবে, যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে এবং সত্য পথ হতে গাফেল থেকেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, যারা তাঁর আহকামের উপর আমলকারী ছিল এবং অবাধ্যাচরণের কাজ পরিত্যাগকারী ছিল তাদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা নানা প্রকারের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন। যেমন ইতিপূর্বে হযরত বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে যে, রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে

বলেনঃ "হে পবিত্র রূহ এবং হে পবিত্র দেহধারী রূহ! বিশ্রাম ও আরামের দিকে চল, পরম করুণাময় আল্লাহর দিকে চল যিনি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

رَوْحٌ -এর অর্থ হলো বিশ্রাম এবং رَيْحَانٌ -এর অর্থ হলো আরাম। মোটকথা, তারা দুনিয়ার বিপদাপদ হতে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করে থাকে। চিরস্থায়ী শান্তি ও প্রকৃত আনন্দ আল্লাহর গোলাম তখনই লাভ করে থাকে। তারা একটা প্রশস্ততা দেখতে পায়। তাদের সামনে রিযক ও রহমত থাকে। তারা জান্নাতে আদনের দিকে ধাবিত হয়। জান্নাতের একটি সবুজ সজীব শাখা প্রকাশিত হয় এবং তখনই আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দার রূহ কবয করা হয়। এটা হযরত আবুল আলিয়া (রঃ)-এর উক্তি। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই মরণমুখী প্রত্যেক ব্যক্তিই সে জান্নাতী কি জাহান্নামী তা জানতে পারে।

মৃত্যু-যন্ত্রণার সময়ের হাদীসগুলো যদিও আমরা সূরায়ে ইবরাহীমের يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ... এ আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি, কিন্তু এটা এর সর্বোত্তম স্থান বলে এখানেও একটা অংশ বর্ণনা করছি।

হযরত তামীমুদ্দারী (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মালাকুল মাউত (আঃ)-কে বলেনঃ "তুমি আমার অমুক বান্দার নিকট যাও এবং তাকে আমার দরবারে নিয়ে এসো। আমি তাকে দুঃখ-সুখ, কষ্ট-আরাম, আনন্দ-নিরানন্দ ইত্যাদি সব কিছুরই মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি এবং তাকে আমার চাহিদা মোতাবিক পেয়েছি। এখন আমি তাকে চিরস্থায়ী সুখ প্রদান করতে চাই। তাকে আমার খাস দরবারে পেশ কর।" মালাকুল মাউত পাঁচশ জন রহমতের ফেরেশতা এবং জান্নাতের কাফন ও জান্নাতী খোশবু সাথে নিয়ে তার নিকট আগমন করেন। যদিও রাইহান (খোশবু) একই হয়, কিন্তু এর মাথায় বিশ প্রকারের রঙ থাকে। প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক সুগন্ধি রয়েছে। আর তাঁদের সাথে থাকে সাদা রেশম এবং তাতে থাকে মেশক বা মৃগনাভী (শেষ পর্যন্ত)।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে فَرُوْحٌ وَّرَيْحَانٌ অর্থাৎ رَوْحٌ -এর رَاء অক্ষরকে পেশ দিয়ে পড়তে শুনেছেন। কিন্তু সমস্ত কারী فَرَوْحٌ অর্থাৎ رَاء কে যবর দিয়ে পড়েছেন।

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "মৃত্যুর পর কি আমরা পরস্পর মিলিত হবো এবং আমাদের একে অপরকে দেখবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "রূহ পাখী হয়ে যাবে যা

গাছের ফল খাবে, শেষ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঐ সময় রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে।"[১] এ হাদীসে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে বড়ই সুসংবাদ রয়েছে।

অন্য এক সহীহ রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, শহীদদের রূহগুলো সবুজ রঙ এর পাখীর অন্তরে অবস্থান করে, যে পাখী জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামত বিচরণ করে ও পানাহার করে এবং আরশের নীচে লটকানো লণ্ঠনে আশ্রয় নেয়।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা (রঃ) গাধায় সওয়ার হয়ে একটি জানাযার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর চুল দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় তিনি বলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" একথা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা কাঁদছো কেন?" উত্তরে তাঁরা বলেনঃ "আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি (তাহলে তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে আমাদের পছন্দ করা হলো না)?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "আরে, তা নয়, তা নয়। বরং এটা হলো মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা। ঐ সময় আল্লাহর নৈটক্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও আরামদায়ক জান্নাতের সুংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা লাফিয়ে উঠে এবং চায় যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, যাতে তারা ঐ সব নিয়ামত লাভ করতে পারে। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাও তাদের সাক্ষাৎ কামনা করেন। আর যদি সে সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় তবে তাদেরকে অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের সুসংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং রূহ লুকাতে থাকে এবং তাদের মন চায় যে, কোনক্রমেই তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট হাযির হবে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয় তবে মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে সালাম দেয় এবং বলেঃ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদেই এ হাদীসের সহায়ক রূপে আর একটি হাদীস রয়েছে, যার ইসনাদ খুবই উত্তম এবং মতনও খুব সবল।

হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। তাকে বলা হবেঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি সালাম বা শান্তি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَـٰؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ -

অর্থাৎ "যারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলেঃ তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেথায় তোমাদের জন্যে রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হলো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।" (৪১ঃ ৩০-৩২)

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তোমার জন্যে স্বীকৃত যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। এটাও হতে পারে যে, সালাম এখানে দু'আর অর্থে এসেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার জন্যে আপ্যায়ন রয়েছে অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা এবং জাহান্নামের দহন রয়েছে যা নাড়ী-ভূড়ি ঝলসিয়ে দিবে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ এটা তো ধ্রুব সত্য। অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

হযরত উকবা ইবনে আমির জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ অবতীর্ণ হয় তখন তিনি বলেনঃ "এটা তোমরা তোমাদের রুকূতে রাখো।" আর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى (৮৭ঃ ১) অবতীর্ণ হয় তখন বলেনঃ "এটাকে তোমরা তোমাদের সিজদায় রাখো।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ বলে তার জন্যে জান্নাতে একটি গাছ রোপণ করা হয়।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "দুটি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে খুবই সহজ, ওযন দণ্ডের পরিমাণে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, বাক্য দুটি হলোঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ "মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্যে সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম।"[২]

সূরা ঃ ওয়াকি'আহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর কিতাবের শেষে আনয়ন করেছেন।

সূরা ঃ হাদীদ মাদানী

(আয়াত ঃ ২৯, রুকূ' ঃ ৪)

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا: ٢٩، رُكُوْعَاتُهَا: ٤)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শয়নের পূর্বে ঐ সূরাগুলো পাঠ করতেন যেগুলোর শুরুতে سَبَّحَ বা يُسَبِّحُ রয়েছে এবং বলতেনঃ "এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম।"[১]

এ হাদীসে যে আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন, আয়াতটি হলোঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" এর বিস্তারিত বর্ণনা সত্বরই আসছে ইনশা-আল্লাহ।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক ও প্রত্যেক জিনিস তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ্ পাঠ বুঝতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

অর্থাৎ "সপ্ত আকাশ ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যারা রয়েছে, সবাই তাঁর (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে। আর যত কিছু রয়েছে সবই তাঁর সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করে থাকে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝতে পার না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাকারী।" (১৭ঃ ৪৪) সবাই তাঁর সামনে নীচু, অক্ষম এবং শক্তিহীন। তাঁর নির্ধারিত শরীয়ত এবং তাঁর আহকাম হিকমতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাদশাহ তিনিই যাঁর কর্তৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই অধিকারভুক্ত। তিনিই ধ্বংস করেন এবং তিনিই সৃষ্টি করেন। যাকে তিনি যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারে না।

এরপরে .... هُوَ الْاَوَّلُ-এ আয়াতটি রয়েছে যার ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা এক হাজার আয়াত হতেও উত্তম।

হযরত আবূ যামীল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমার মনে এক সন্দেহ বা খট্‌কা আছে, কিন্তু মুখে তা আনতে ইচ্ছা হচ্ছে না।" তাঁর একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবতঃ এটা এমন সন্দেহ হবে যা থেকে কেউই বাঁচতে পারেনি। এমন কি কুরআন কারীমেও রয়েছেঃ

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ـ

অর্থাৎ "তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে যদি তোমার সন্দেহ হয়, তাহলে তোমার পূর্বে যারা কুরআন পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। অবশ্যই

তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এসেছে।" (১০ঃ ৯৪) তারপর তিনি বলেনঃ "যখন তোমার মনে কোন সন্দেহ আসবে তখন هُوَ الْاَوَّلُ ..... وَالْاٰخِرُ-এ আয়াতটি পড়ে নিয়ো।"[১]

এ আয়াতের তাফসীরে দশেরও অধিক উক্তি রয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া বলেনঃ ظَاهِر ও بَاطِن দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলমের দিক দিয়ে ব্যক্ত ও গুপ্ত হওয়া। এই ইয়াহ্ইয়া হলেন যিয়াদ ফারার পুত্র। তাঁর রচিত একটি পুস্তক রয়েছে যার নাম মাআনিল কুরআন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শয়নের সময় নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ ـ اَنْتَ الْاَوَّلُ وَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশ এবং বড় আরশের রব! হে আমাদের এবং সমস্ত জিনিসের প্রতিপালক! হে তাওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদ্গীরণকারী! আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ঠ হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবে না। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আমাদের ঋণ আপনি আদায় করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্রমুক্ত করে দিন।"[২]

---

১. এটা ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সুহায়েল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সালেহ (রঃ) স্বীয় পরিবারের লোককে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন যে, যখন তারা শয়ন করবে তখন যেন ডান পাশে শুয়ে এ দু'আটি পড়ে নেয়।"[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর জন্যে কিবলামুখী করে বিছানা বিছিয়ে দেয়া হতো। তিনি তাঁর ডান হস্ত-তালুর উপর মাথা রেখে আরাম করতেন। তারপর আস্তে আস্তে কিছু পাঠ করতেন। কিন্তু শেষ রাত্রে উপরোক্ত দু'আটি উচ্চস্বরে পড়তেন। তবে শব্দগুলোতে কিছু হেরফের রয়েছে।"[২]

এ আয়াতের তাফসীরে জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা স্বীয় সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় তাঁদের উপর এক খণ্ড মেঘ দেখা দেয়। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কি তা তোমরা জান কি?" তাঁরা জবাবে বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তিনি তখন বললেনঃ "এটাকে 'ইনাল; বলা হয়। এটা যমীনকে সায়রাব বা পানিসিক্ত করে থাকে। জনগণের উপর এটা বর্ষিত হয় যারা না আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না তাঁকে ডাকে।" আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের উপর এটা কি তা জান কি?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই বেশী অবহিত।" "এটা হলো উঁচু সুরক্ষিত ছাদ ও জড়িয়ে ধরা তরঙ্গ।" বললেন তিনি। এরপর তিনি বললেনঃ "তোমাদের এবং এর মধ্যে কতটা ব্যবধান আছে তা কি তোমরা জান?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী।" তিনি বললেনঃ "তোমাদের ও এর মধ্যে পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধান।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) বেশী খবর রাখেন।" তিনি বললেনঃ "এর উপরে দ্বিতীয় আকাশ রয়েছে। আর এই দুই আকাশের মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো পাঁচশ' বছরের পথ।" অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাতটি আকাশের কথা বললেন এবং প্রত্যেকটির মাঝে এই পরিমাণ দূরত্বেরই বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "সপ্তম আকাশের উপর কি আছে তা কি তোমাদের জানা আছে?" সাহাবীগণ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বেশী অবগত।” তিনি বললেনঃ “সপ্তম আকাশের উপর এই পরিমাণ দূরত্বে আরশ রয়েছে অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমাদের নীচে কি আছে তা কি তোমরা জান?” তাঁরা জবাব দিলেনঃ “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই সবচেয়ে ভাল জানেন।” তিনি বললেনঃ “তাহলো যমীন।” তারপর বললেনঃ “এর নীচে কি আছে তা কি জান?” তাঁরা উত্তর দিলেনঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী।” তিনি বললেনঃ “এর নীচে আর একটি যমীন আছে। এই দুই যমীনের মধ্যেও পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধান।” এই ভাবে তিনি সাতটি যমীনের কথা সমপরিমাণ দূরত্ব সহ বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ “যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা যদি সর্বাপেক্ষা নিম্নতম যমীনে একটি রশি লটকিয়ে দাও তবে ওটাও আল্লাহ তা'আলারই নিকট পৌঁছবে।” অতঃপর তিনি هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ ......-এ আয়াতটি পাঠ করেন।”[১]

কোন কোন আহলুল ইলম এই হাদীসের শরাহ্‌তে বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রশির আল্লাহ তা'আলারই ইলমে কুদরত পর্যন্ত পৌঁছা, তাঁর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ইল্‌ম ও তাঁর প্রভাব এবং তাঁর রাজত্ব নিঃসন্দেহে সব জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর জাত বা সত্তারূপে আরশের উপর রয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর এই বিশেষণ স্বীয় কিতাবের মধ্যে স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং তাতে দুই যমীনের মাঝে দূরত্ব সাত শ' বছরের পথ বলে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিম এবং মুসনাদে বাযযারেও এ হাদীসটি আছে, কিন্তু মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রশি লটকিয়ে দেয়ার বাক্যটি নেই এবং প্রত্যেক দুই যমীনের মাঝের দূরত্ব তাতেও পাঁচশ বছরের পথের কথা রয়েছে। ইমাম বায্‌যার (রঃ) বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এটা নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেননি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ “আমাদের নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে।” অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। সম্ভবতঃ এটাই সঠিক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

১. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটা গারীব, কেননা এর বর্ণনাকারী হাসানের তাঁর উস্তাদ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে শোনা প্রমাণিত নয়। যেমন এটা আইয়ূব (রঃ), ইউনুস (রঃ), আলী ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসের উক্তি।

মুসনাদে বাযযার কিতাবুল আসমা এবং ওয়াস সিফাতুল বায়হাকীতে এ হাদীসটি হযরত আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর ইসনাদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে এবং মতনে গারাবাত ও নাকারাত রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ (৬৫ঃ ১২)-এর তাফসীরে হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি আনয়ন করেছেন যে, আসমান ও যমীনের মাঝে চারজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কোথা হতে আসলে?" তখন একজন উত্তর দেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে সপ্তম আকাশ হতে প্রেরণ করেছেন এবং আমি সেখানে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এলাম।" দ্বিতীয়জন বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে সপ্তম যমীন হতে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি সেখানে ছিলেন।" তৃতীয়জন বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাশারিক (পূর্ব দিক) হতে প্রেরণ করেছেন এবং সেখানে আল্লাহ তা'আলা ছিলেন।" চতুর্থ জন বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাগরিব (পশ্চিম দিক) হতে পাঠিয়েছেন এবং তথায় আমি তাঁকে ছেড়ে আসলাম।"[১]

৪। তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।

٤- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۤءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

---

১. এ হাদীসটিও গারীব, বরং মনে হচ্ছে যে, হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণিত হাদীসটি যা উপরে মুরসালরূপে উল্লিখিত হলো, সম্ভবতঃ ওটাও হযরত কাতাদারই (রঃ) নিজের উক্তি হবে, যেমন এটা স্বয়ং তাঁরই উক্তি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

٥- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৬। তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।

٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা এবং তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার কথা সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

কি পরিমাণ বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হতে যমীনে পড়ে, কতটি শস্যবীজ মাটিতে পতিত হয়, কতটি চারা জন্মে, কি পরিমাণ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এসব খবর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ "অদৃশ্যের চাবি-কাঠি তাঁরই হাতে রয়েছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না, স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন, কোন পাতার পতিত হওয়ার খবরও তাঁর অজানা নয়, যমীনের অন্ধকারের গুপ্ত শস্যবীজ এবং কোন সিক্ত ও শুষ্ক জিনিস এমন নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে বিদ্যমান নেই।" (৬ঃ ৫৯) সূরায়ে বাকারার তাফসীরে এটা গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ফেরেশতা বৃষ্টির এক একটি বিন্দু তাঁর নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছিয়ে দেন। আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় অর্থাৎ ফেরেশতা এবং আমলসমূহ, এ সব কিছুই তিনি জানেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছেঃ "রাত্রির আমল দিবসের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাত্রির পূর্বে তাঁর নিকট উঠিয়ে দেয়া হয়।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন তা যেমনই হোক যা-ই হোক।

আর তোমরাও স্থলে থাকো বা পানিতে থাকো, রাত্রি হোক বা দিন হোক, তোমরা বাড়ীতে থাকো বা জঙ্গলে থাকো, সবই তাঁর অবগতির পক্ষে সমান। সদা-সর্বদা তাঁর দর্শন ও তাঁর শ্রবণ তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমাদের সমস্ত কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের অবস্থা তিনি দেখছেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ঘোষণা করা হয়েছেঃ "তাঁর থেকে যে কিছু গোপন করতে চায় তার এ চেষ্টা বৃথা, যিনি প্রকাশ্য এবং গোপনীয়, এমন কি অন্তরের খবরও জানেন। তাঁর থেকে কোন কিছু কি করে গোপন করা যেতে পারে?" অন্য আয়াতে আছেঃ "গোপনীয় কথা এবং প্রকাশ্য কথা, রাত্রে হোক বা দিনে হোক, সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান।" সত্যকথা এটাই যে, তিনিই প্রতিপালক এবং প্রকৃত ও সত্য মা'বূদ তিনিই।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ইহসানের অর্থ হলোঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছো আর তুমি যদি তাঁকে না দেখো তবে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।"

একটি লোক এসে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন হিকমতের খোরাক দান করুন যাতে আমার জীবন উজ্জ্বলময় হয়।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি আল্লাহ হতে এমনই লজ্জা করবে যেমন লজ্জা কর তোমার নিকটতম সৎ আত্মীয় হতে যে তোমার নিকট হতে কখনো পৃথক হয় না।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করলো সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করলো। (এক) এক আল্লাহর ইবাদত করলো, (দুই) সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের মালের যাকাত আদায় করলো। যাকাতে পশু দিলে বৃদ্ধ, অক্ষম, পাতলা, দুর্বল এবং রোগা পশু দেয় না এবং (তিন) নিজের নফসকে পবিত্র করলো।" তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নফসকে পবিত্র করার অর্থ কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এ কথাকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা যে, সর্ব জায়গাতেই আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে রয়েছেন।"[২]

১. এ হাদীসটি আবূ বকর ইসমাঈলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

২. এ হাদীসটি আবূ নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রায়ই নিম্নের ছন্দটি পাঠ করতেনঃ

إِذَا مَاخَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ * خَلَوْتُ وَلٰكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيْبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ يَغْفُلُ سَاعَةً * وَلَا أَنَّ مَا يَخْفٰى عَلَيْهِ يَغِيْبُ

অর্থাৎ “যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে একাকী ও নির্জনে থাকবে তখনো তুমি বলো না যে, তুমি একাকী রয়েছো। বরং বল যে, তোমার উপর একজন রক্ষক রয়েছেন। কোন সময়েই তুমি আল্লাহকে উদাসীন মনে করো না এবং জেনে রেখো যে, গোপন হতে গোপনতম কাজও তাঁর কাছে গোপন নয়।”

মহান আল্লাহ বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেনঃ

وَإِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى

অর্থাৎ “আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।” (৯২ঃ ১৩) তাঁর এই মালিকানার উপর আমাদের তাঁর প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য। যেমন তিনি বলেনঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ “তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই।” (২৮ঃ ৭০) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যাঁর মালিকানাধীন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই এবং আখিরাতেও প্রশংসা তারই। তিনি বিজ্ঞানময় ও (সব কিছু) সম্যক অবগত।” (৩৪ঃ ১) সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তাঁরই। সারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তাঁরই খাদেম এবং তাঁর সামনে অবনত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ـ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ـ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ـ

অর্থাৎ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন, আর কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।" (১৯ঃ ৯৩-৯৫)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ 'আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।' তিনি তাঁর মাখলূকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুলুম করেন না। বরং এক একটি পুণ্যকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ -

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করবো, তখন কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না, কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় তবুও তা আমি হাযির করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।" (২১ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ বলেনঃ "তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, আর তিনি অন্তর্যামী।" অর্থাৎ মাখলূকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনো দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন এবং কখনো রাত্রি বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনো দুটোকেই সমান করে দেন। কখনো করেন শীতকাল, কখনো করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনো করেন বর্ষাকাল, কখনো বসন্তকাল, আর কখনো শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা

٧- اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

فَالَّذِينَ اٰمَنُوا مِنكُم وَانفَقُوا لَهُم اَجرٌ كَبِيرٌ ○

কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে আছে মহা পুরস্কার।

٨- وَمَا لَكُم لَا تُؤمِنُونَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدعُوكُم لِتُؤمِنُوا بِرَبِّكُم وَقَد اَخَذَ مِيثَاقَكُم اِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ ○

৮। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন না? অথচ রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।

٩- هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلٰى عَبدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

৯। তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্যে; আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

١٠- وَمَا لَكُم اَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرضِ ۗ لَا يَستَوِي مِنكُم مَّن اَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقٰتَلَ ۗ اُولٰئِكَ اَعظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنفَقُوا مِن بَعدُ وَقٰتَلُوا ۗ

১০। তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

١١- مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১১। কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজের উপর এবং নিজের রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন ও ওর উপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার হিদায়াত করছেন এবং তাঁর পথে খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে মাল হস্তান্তর রূপে দিয়েছেন, তোমরা তাঁর আনুগত্য হিসেবে তা ব্যয় কর এবং বুঝে নাও যে, এই মাল যেমন অন্যের হাত হতে তোমার হাতে এসেছে, তেমনিভাবে তোমার হাত হতে সত্বরই এটা অন্যের হাতে চলে যাবে। আর তোমার জন্যে রয়ে যাবে হিসাব ও শাস্তি। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হয়তো তোমার উত্তরাধিকারী সৎ হবে এবং তোমার সম্পদকে আমার পথে খরচ করে আমার নৈকট্য লাভ করবে, আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে অসৎ হবে এবং মন্দ কাজে ও অন্যায় পথে তোমার সম্পদ উড়িয়ে দিবে এবং এই অন্যায় কাজের উৎস তুমিই হবে। কারণ তুমি যদি এ সম্পদ ছেড়ে না যেতে তবে তোমার ওয়ারিস এটা অন্যায় কাজে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পেতো না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাখীর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দেনঃ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থাৎ "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।" (১০২ঃ ১) অতঃপর তিনি বলেনঃ "ইবনে আদম বলেঃ আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল তো ওটাই যা সে খেয়েছে, পরেছে এবং দান খায়রাত করেছে। যা সে খেয়েছে তা নিঃশেষ হয়েছে, যা সে পরিধান করেছে তা পুরনো হয়ে গেছে, আর যা সে আল্লাহর পথে দান করেছে তা তাঁর কাছে সঞ্চিত রয়েছে। আর যা সে ছেড়ে গেল তা অন্যদের মাল। সে তা লোকদের জন্যে ছেড়ে গেল।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে এবং এতে শেষের অংশটুকু অতিরিক্ত রয়েছে।

এ দু'টি কাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ প্রদান করছেন এবং খুব বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন না? অথচ রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান করছে।' তিনি মানুষের নিকট দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করছেন। সহীহ বুখারীর শরাহর প্রাথমিক অংশ কিতাবুল ঈমানে আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের নিকট উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি কে?" উত্তরে তাঁরা বলেনঃ "ফেরেশতাগণ।" তিনি বলেনঃ "তারা তো আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে, সুতরাং তারা ঈমানদার হয়েছে এতে বিস্ময়ের কি আছে?" তখন তাঁরা বললেনঃ "তাহলে নবীগণ।" তিনি বলেনঃ "তাঁদের উপর তো অহী ও আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তাঁরা তো ঈমান আনবেনই।" তাঁরা তখন বলেনঃ "তাহলে আমরা।" তিনি বলেনঃ "কেন তোমরা ঈমানদার হবে না? আমি তো তোমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছি। জেনে রেখো যে, উত্তম বিস্ময়পূর্ণ ঈমানদার হলো ঐ লোকেরা যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা সহীফা ও গ্রন্থসমূহে সবকিছুই লিপিবদ্ধ দেখে ঈমান আনয়ন করবে।"

সূরায়ে বাকারার শুরুতে اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (২ঃ ৩) এর তাফসীরেও আমরা এরূপ হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ 'আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।' যেমন তিনি বলেনঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর ঐ নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং স্মরণ কর তাঁর সাথে কৃত ঐ অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলেঃ আমরা শুনলাম ও মানলাম।" (৫ঃ৭)

এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এই 'মীসাক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

ঐ মীসাক বা অঙ্গীকার যা হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এরও এটাই মাযহাব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই তাঁর বান্দার প্রতি (হযরত মুহাম্মাদ সঃ-এর প্রতি) সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যুলুম, অবিচার ও অন্যায়ের অন্ধকার হতে বের করে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হিদায়াত ও সত্যের পথে আনয়ন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

এটা আল্লাহ তা'আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্যে কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সংশয়-সন্দেহ দূর করেছেন এবং হিদায়াত সুস্পষ্ট করেছেন।

আল্লাহ পাক ঈমান আনয়ন ও দান-খায়রাতের হুকুম করে, তারপর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করে এবং এটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঈমান না আনার এখন কোন ওযরের সুযোগ নেই, দান-খায়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং বলেনঃ আমার পথে খরচ করতে থাকো এবং দারিদ্রকে ভয় করো না। কারণ যাঁর পথে তোমরা খরচ করছো তিনি যমীন ও আসমানের ধন-ভাণ্ডারের একাই মালিক। আরশ ও কুরসী তাঁরই এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের এ দান-খায়রাতের প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করেছেনঃ যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা (আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করেছো, তিনি তোমাদেরকে ওর উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন এবং তিনি উত্তম রিযকদাতা।" (৩৪ঃ ৩৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের কাছে যা রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা চিরস্থায়ী (তা কখনো শেষ হবার নয়)।" (১৬ঃ ৯৬)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে খরচ করতে থাকে এবং আরশের মালিক হতে কমে যাওয়ার ভয় করে না, সত্বরই তিনি তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তারা নির্ভরশীল যে, আল্লাহর পথে যা খরচ করছে তার প্রতিদান তারা ইহকালে ও পরকালে অবশ্যই পাবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ধন-সম্পদ খরচ করেছে এবং যারা তা করেনি, তারা কখনো সমান নয়, যদিও তারা মক্কা বিজয়ের পর খরচ করে থাকে। কারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় এবং শক্তি ছিল খুবই কম। আর এজন্যেও যে, ঐ সময় ঈমান শুধু ঐ লোকেরাই কবূল করতো যাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে কালিমামুক্ত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং বহু অঞ্চল বিজিত হয়। এর সাথে সাথে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাও ভাল হয়। সুতরাং ঐ সময় ও এই সময়ের মধ্যে যেই পার্থক্য, ঐ সময়ের মুসলমান ও এই সময়ের মুসলমানদের মধ্যেও সেই পার্থক্য। ঐ সময়ের মুসলমানরা বড় রকমের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে, যদিও উভয় যুগের মুসলমানরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভে অংশীদার।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। মুসনাদে আহমাদের নিম্নের রিওয়াইয়াতটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হযরত খালিদ (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে বলেনঃ "আপনি আমার কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেই আমার উপর গর্ব প্রকাশ করছেন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেনঃ "আমার সাহাবীদেরকে (রাঃ) আমার জন্যে ছেড়ে দাও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমরা উহুদ বা অন্য কোন পাহাড়ের সমান সোনা খরচ কর তবুও তাদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না।"[১]

প্রকাশ থাকে যে, এটা হযরত খালিদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা এবং তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আর যে মতানৈক্যের বর্ণনা এই হাদীসে রয়েছে তা বানু জুযাইমা গোত্রের ব্যাপারে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য এই গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ লোকগুলো বলতে শুরু করেঃ "আমরা মুসলমান হয়েছি।" কিন্তু অজানার কারণে 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি' একথা না বলে 'আমরা সা'বী বা বেদ্বীন হয়েছি' একথা বলেন। কেননা, 'কাফিররা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুসলমানদেরকে একথাই বলতো। হযরত খালিদ (রাঃ) এই কালিমার ভাবার্থ বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন কি তাদের যারা বন্দী হয় তাদেরকেও হত্যা করার আদেশ করেন। এই ঘটনায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেন। এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার সাহাবীদেরকে (রাঃ) মন্দ বলো না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা (আল্লাহর পথে) খরচ করে তবুও তাদের তিন পাই শস্যের পুণ্যেও পৌঁছতে পারবে না। এমন কি দেড় পাই পুণ্যেও পৌঁছতে সক্ষম হবে না।"

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গাসফান নামক স্থানে পৌঁছি তখন তিনি বলেনঃ "এমন লোকও আসবে যাদের আমলের তুলনায় তোমরা তোমাদের আমলকে নগণ্য মনে করবে।" সাহাবীগণ প্রশ্ন করেনঃ "তারা কি কুরায়েশ হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না, বরং ইয়ামনী। তাদের অন্তর হবে কোমল এবং চরিত্র হবে অত্যন্ত মধুর।" আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কি আমাদের চেয়ে উত্তম হবে? উত্তর দিলেন তিনিঃ "তাদের কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা থাকে এবং সে তা আল্লাহর পথে খরচও করে ফেলে তবুও তোমাদের কারো তিন পাই, এমনকি দেড় পাই শস্য দান করার পুণ্যও সে লাভ করতে পারবে না। জেনে রেখো যে, আমাদের মধ্যে এবং সারা দুনিয়ার লোকদের মধ্যে এটাই পার্থক্য।" অতঃপর তিনি لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ ... আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে খারেজীদের সম্পর্কে রয়েছেঃ "তোমরা তাদের নামায ও রোযার তুলনায় তোমাদের নামায ও রোযাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা দুনিয়া হতে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে তীর কামান হতে বের হয়।"

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি গারীব বা দুর্বল।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ "সত্বরই এমন এক কওমের আবির্ভাব হবে যে, যখন তোমরা তাদের আমলের সঙ্গে তোমাদের আমলের তুলনা করবে তখন তোমাদেরকে খুবই কম মনে করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কি কুরায়েশ হবে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "না, তারা হবে সরল চিত্ত ও কোমল হৃদয়ের লোক এবং ওখানকার অধিবাসী।" অতঃপর তিনি ইয়ামনের দিকে স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ইশারা করেন। তারপর বলেনঃ "তারা হবে ইয়ামনী লোক। ইয়ামনবাসীদের ঈমানই তো প্রকৃত ঈমান এবং ইয়ামনবাসীদের হিকমতই তো প্রকৃত হিকমত।" সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "তারা কি আমাদের চেয়েও উত্তম হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তাদের মধ্যে কারো নিকট সোনার পাহাড়ও থাকে এবং ওটাকে সে আল্লাহর পথে দানও করে ফেলে তবুও সে তোমাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ এরও পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না।" অতঃপর তিনি তাঁর অঙ্গুলিগুলো বন্ধ করেন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি বাড়িয়ে দিয়ে বলেনঃ "জেনে রেখো যে, এটাই পার্থক্য হলো আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে।" অতঃপর তিনি لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ ... -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

এ হাদীসে হুদায়বিয়ার উল্লেখ নেই। সুতরাং এও হতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে ওটা বিজয়ের পরবর্তী খবর দিয়েছিলেন। যেমন মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম সূরা, সূরায়ে মুয্যামমিলে রয়েছেঃ

وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।" (৭৩ঃ ২০) সুতরাং যেমন এই আয়াতে আগামীতে সংঘটিতব্য একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, তেমনই এই আয়াত এবং হাদীসকেও বুঝে নিতে হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও যে কেউ যা কিছু আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করেছে তার প্রতিদান তিনি তাকে অবশ্যই প্রদান করবেন। কাউকেও বেশী দেয়া হবে এবং কাউকেও কম দেয়া হবে। সেটা স্বতন্ত্র কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا -

অর্থাৎ “মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সবকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।” (৪ঃ ৯৫)

অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রয়েছেঃ “সবল মুমিন ভাল ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিন হতে, তবে কল্যাণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে।”

যদি এই আয়াতের এই বাক্যটি না থাকতো তবে সম্ভবতঃ মানুষ এই পরবর্তীদেরকে তুচ্ছ মনে করতো। এ জন্যেই পূর্ববর্তীদের ফযীলত বর্ণনা করার পর সংযোগ স্থাপন করে মূল প্রতিদানে উভয়কে শরীক করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। তিনি মর্যাদায় যে পার্থক্য রেখেছেন তা অনুমানে নয়, বরং সঠিক জ্ঞান দ্বারা। হাদীসে এসেছেঃ “এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম হতে বেড়ে যায়।” এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই আয়াতের বড় অংশের অংশীদার হলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)। কেননা, এর উপর আমলকারী সমস্ত নবীর উম্মতবর্গের ইনি নেতা। তিনি প্রাথমিক সংকীর্ণতার সময় নিজের সমুদয় মাল আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছিলেন। এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে চাননি।

হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমি একদা দরবারে নববীতে (সঃ) বসেছিলাম। হযরত আবূ বকরও (রাঃ) ছিলেন। তাঁর গায়ে একটি মাত্র পোশাক ছিল যার খোলা অংশ তিনি কাঁটা দ্বারা আটকিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ “ব্যাপার কি? হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর গায়ে একটি মাত্র পোশাক, তাও আবার কাঁটা দিয়ে

আটকানো রয়েছে, কারণ কি?” উত্তরে নবী (সঃ) বললেনঃ “সে তার সমুদয় সম্পদ আমার কাজে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলেছে। এখন তার কাছে আর কিছুই নেই।” একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-কে বললেনঃ “তাকে বলুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তিনি তাঁর দারিদ্র অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁর কাছে জবাব চান। তিনি তখন আরয করেন ঃ “আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের উপর কি করে অসন্তুষ্ট হতে পারি? আমি আমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট।”

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ?' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করা। কেউ কেউ বলেন যে, উদ্দেশ্য হলো ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়ানো, পরানো ইত্যাদিতে খরচ। হতে পারে যে, এ আয়াতটি উমূম বা সাধারণত্বের দিক দিয়ে দুটো উদ্দেশ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন যে, (যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে) তার জন্যে তিনি ওটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ অর্থাৎ “ওটাকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার।” অর্থাৎ উত্তম পুরস্কার ও পবিত্র রিযক এবং ওটা হলো কিয়ামতের দিনে জান্নাত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবুদ্ দাহদাহ আনসারী (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেনঃ “হ্যাঁ, হে আবুদ্ দাহদাহ!” তখন হযরত আবুদ দাহদাহ (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার হাতটি আমাকে দেখান (আপনার হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিন)।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিলেন। হযরত আবুদ্ দাহদাহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতটি নিজের মধ্যে নিয়ে বললেনঃ “আমি আমার ঐ বাগানটি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ স্বরূপ দিলাম যাতে ছয়শটি খেজুরের গাছ রয়েছে।” তার স্ত্রী

১. এ হাদীসটি আবূ মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসঊদ বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সনদের দিক দিয়ে এ হাদসটি দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এবং ছেলে-মেয়েও ঐ বাগানে ছিলেন। তিনি আসলেন এবং বাগানের দরযার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডাক দিলেন। স্ত্রী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি (ছেলে-মেয়ে নিয়ে) বেরিয়ে এসো। আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে এ বাগানটি ঋণ স্বরূপ দিয়ে দিয়েছি।" স্ত্রী খুশী হয়ে বললেনঃ "আপনি খুবই লাভজনক ব্যবসায় হাত দিয়েছেন।" অতঃপর ছেলে-মেয়ে ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "জান্নাতী গাছ ও তথাকার বাগান যা ফলে পরিপূর্ণ এবং যার শাখাগুলো ইয়াকূত ও মণিমুক্তার তা আল্লাহ তা'আলা আবুদ দাহদাহ (রাঃ)-কে দান করলেন।"

١٢- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১২। সেদিন তুমি দেখবে মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবেঃ আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।

١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ

১৩। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্যে একটু থামো, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরযা

بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।

١٤- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

১৪। মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছো; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত; আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।

١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৫। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য স্থান, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

দান-খায়রাতকারী মুমিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন তারা তাদের সৎ আমল অনুযায়ী নূর বা জ্যোতি লাভ করবে। ঐ জ্যোতি তাদের সাথে সাথে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তাদের কারো কারো জ্যোতি হবে পাহাড়ের সমান, কারো হবে খেজুরের গাছের সমান এবং কারো

হবে দণ্ডায়মান মানুষের দেহের সমান। যে পাপী মুমিনদের জ্যোতি সবচেয়ে কম হবে তার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে, যা কখনো জ্বলবে এবং কখনো নিভে যাবে।[১]

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন কোন মুমিন এমন হবে যার নূর এই পরিমাণ হবে যে পরিমাণ দূরত্ব মদীনা ও আদনের মাঝে রয়েছে। কারো এর চেয়ে কম হবে, কারো এর চেয়ে আরো কম হবে। কারো নূর এতো কম হবে যে, তার পদদ্বয়ের পার্শ্বই শুধু আলোকিত হবে।"

হযরত হুব্বাদ ইবনে উমাইয়া (রঃ) বলেনঃ হে লোক সকল! তোমাদের নাম পিতাসহ এবং বিশেষ নিদর্শনসহ আল্লাহ তা'আলার নিকট লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমলও লিখিত আছে। কিয়ামতের দিন নাম নিয়ে নিয়ে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ হে অমুক! এটা তোমার জ্যোতি। হে অমুক! তোমার কোন নূর আমার কাছে নেই। অতঃপর তিনি يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেনঃ প্রথমে তো প্রত্যেক লোককেই নূর দেয়া হবে। কিন্তু যখন পুলসিরাতের উপর যাবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। এ দেখে মুমিনরাও ভীত হয়ে পড়বে যে, না জানি হয়তো তাদেরও জ্যোতি নিভে যাবে। তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আমাদের নূর পুরো করে দিন!"

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে বর্ণিত নূর বা জ্যোতি দ্বারা পুলসিরাতের উপর নূর লাভ করাকে বুঝানো হয়েছে। যাতে ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান সহজেই অতিক্রম করা যায়। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) ও হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকেই সিজদার অনুমতি দেয়া হবে এবং অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম আমাকেই সিজদা হতে মাথা উঠাবারও হুকুম দেয়া হবে। আমি সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো এবং নিজের উম্মতকে চিনে নিবো।" তখন একজন লোক প্রশ্ন করলেনঃ "হযরত নূহ্ (আঃ) থেকে নিয়ে আপনি পর্যন্ত সবারই উম্মত হাশরের মদয়ানে একত্রিত হবে। সুতরাং এতোগুলো উম্মতের মধ্য হতে আপনার উম্মতকে আপনি কি করে চিনতে পারবেন?" জবাবে তিনি বললেনঃ "আমার

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

উম্মতের অযুর অঙ্গগুলো অযুর কারণে চমকাতে থাকবে, এই বিশেষণ অন্য কোন উম্মতের মধ্যে থাকবে না। আর আমার উম্মতকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। আর তাদের নূর বা জ্যোতি তাদের অগ্রে অগ্রে চলতে থাকবে এবং তাদের সন্তানরা তাদের সঙ্গে থাকবে।” যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, তাদের আমল নামা তাদের ডান হাতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَمَنْ اُوتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ অর্থাৎ “যাকে তার ডান হাতে কিতাব (আমলনামা) দেয়া হবে (শেষ পর্যন্ত)।”

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।'

এর পরবর্তী আয়াতে কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ ও কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, তথায় খাঁটি ঈমানদার সৎকর্মশীল লোক ছাড়া আর কেউই পরিত্রাণ পাবে না।

হযরত সুলায়েম ইবনে আমির (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাবে দামেশকে আমরা একটি জানাযায় ছিলাম। যখন জানাযার নামায শেষ হয় এবং মৃতদেহ দাফন করার কাজ শুরু হয় তখন হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমরা এই দুনিয়ার মনযিলে সকাল-সন্ধ্যা করছো। তোমরা এখানে পুণ্য কার্যও করতে পার এবং পাপ কার্যও করতে পার। এরপরে অন্য মনযিলের দিকে তোমাদেরকে যাত্রা শুরু করতে হবে। এই কবরই হচ্ছে ঐ মনযিল যা নির্জনতা, অন্ধকার, পোকা-মাকড় এবং সংকীর্ণতার ঘর। কিন্তু যাকে আল্লাহ প্রশস্ততা দান করেন সেটা অন্য কথা। এরপর তোমরা কিয়ামত মাঠের বিভিন্ন স্থানে গমন করবে। এক জায়গায় বহু লোকের চেহারা সাদা-উজ্জ্বল হবে এবং বহু লোকের চেহারা হবে কালো কুৎসিত। তারপর এক ময়দানে যাবে যেখানে হবে কঠিন অন্ধকার। সেখানে ঈমানদারদেরকে নূর বা জ্যোতি বন্টন করা হবে। সেখানে কাফির ও মুনাফিকদের জন্যে কোন জ্যোতি থাকবে না। এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

অর্থাৎ "অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যার ঊর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই।" (২৪ঃ ৪০) সুতরাং যেমন চক্ষুষ্মানদের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা অন্ধ ব্যক্তি কোন উপকার লাভ করতে পারে না, তেমনই মুনাফিক ও কাফিররা ঈমানদারদের নূর বা জ্যোতি দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে সক্ষম হবে না। মুনাফিক ঈমানদারের কাছে আবেদন জানাবেঃ "তোমরা এতো বেশী সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ো না, একটু থামো, যাতে আমরাও তোমাদের জ্যোতিকে আশ্রয় করে চলতে পারি।" দুনিয়ায় এই মুনাফিকরা যেমন মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করতো, তেমনই সেদিন মুসলমানরা মুনাফিকদেরকে বলবেঃ "তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর।" এরা তখন ফিরে গিয়ে নূর বন্টনের জায়গায় হাযির হবে। কিন্তু সেখানে কিছুই পাবে না। এটাই আল্লাহ তা'আলার প্রতারণা, যার বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ -

অর্থাৎ "তারা আল্লাহকে প্রতারিত করছে এবং আল্লাহও তাদেরকে প্রতারিতকারী।" (৪ঃ ১৪২) অতঃপর তারা যখন সেখানে ফিরে যাবে তখন দেখবে যে, মুমিন ও তাদের মাঝে স্থাপিত হয়েছে একটি প্রাচীর যার একটি দরজা রয়েছে, ওর অভ্যন্তরে আছে রহমত এবং বহির্ভাগে রয়েছে শাস্তি। সুতরাং মুনাফিকরা নূর বন্টন হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রতারণার মধ্যেই থাকবে। অতঃপর যখন মুমিনরা নূর পাবে এবং তারা পাবে না তখন রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন অন্ধকার পূর্ণভাবে ছেয়ে যাবে এবং মানুষ তার হাতটিও দেখতে পাবে না তখন আল্লাহ তা'আলা একটা নূর প্রকাশ করবেন। মুসলমান ঐ দিকে যাবে, তখন মুনাফিকরাও তাদের পিছনে পিছনে যেতে শুরু করবে। মুমিনরা যখন সামনের দিকে অনেক বেশী এগিয়ে যাবে তখন মুনাফিকরা তাদেরকে ডাক দিয়ে থামতে বলবে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে, দুনিয়ায় তারা সবাই তো এক সাথেই ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের গোপনীয়তা

রক্ষার্থে তাদের নাম ধরে ধরে ডাক দিবেন। মুমিনরাও নূর পাবে এবং মুনফিকরাও পাবে। কিন্তু পুলসিরাতের উপর তাদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হবে। যখন তারা পুলসিরাতের মাঝপথে পৌঁছবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। তারা তখন সন্ত্রস্ত থাকবে। সবারই অবস্থা অত্যন্ত করুণ হবে। সবাই নিজ নিজ জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

যে প্রাচীরের কথা এখানে বলা হয়েছে তা হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে পার্থক্যসীমা। এরই বর্ণনা وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ -এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং জান্নাতে বিরাজ করবে রহমত ও শান্তি এবং জাহান্নামে থাকবে অশান্তি ও শাস্তি। সঠিক কথা এটাই। কিন্তু কারো কারো উক্তি এই যে, এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাচীরকে বুঝানো হয়েছে যা জাহান্নামের উপত্যকার নিকট থাকবে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকস্থ প্রাচীর, যার অভ্যন্তরে রয়েছে মসজিদ ইত্যাদি এবং বহির্ভাগে রয়েছে জাহান্নামের উপত্যকা। আরো কতক লোকও একথাই বলেছেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতে নির্দিষ্টভাবে এই প্রাচীরই যে তাঁদের উদ্দেশ্য, তা নয়, বরং কাছাকাছি অর্থ হিসেবে এ আয়াতের তাফসীরে তাঁরা এটা উল্লেখ করেছেন। কেননা, জান্নাত আকাশে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে এবং জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে।

হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে যে দরজার বর্ণনা আছে এর দ্বারা মসজিদের বাবুর রহমত উদ্দেশ্য, এটা বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত, যা আমাদের জন্যে সনদ হতে পারে না। সঠিক তত্ত্ব এই যে, প্রাচীরটি কিয়ামতের দিন মুমিন ও কাফিরদের মাঝে প্রভেদ সৃষ্টি করার জন্যে দাঁড় করানো হবে। মুমিন তো এর দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর মুনাফিকরা হতবুদ্ধি হয়ে অন্ধকার ও শাস্তির মধ্যে থাকবে, যেমন তারা দুনিয়াতে কুফরী, অজ্ঞতা, সন্দেহ ও হতবুদ্ধিতার অন্ধকারে ছিল। এখন এই মুনাফিকরা মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেঃ "দেখো, দুনিয়ায় আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম, জুমআর নামায জামাআতের সাথে আদায় করতাম, আরাফাতে ও যুদ্ধের মাঠে এক সাথে থাকতাম এবং এক সাথে অবশ্যপালনীয় কাজগুলো পালন করতাম (সুতরাং আজ আমাদেরকে তোমাদের সাথেই থাকতে দাও, পৃথক করে দিয়ো না)।" তখন মুমিনরা বলবেঃ "দেখো, কথা তোমরা ঠিকই বলছো বটে, কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি একটু

লক্ষ্য কর তো! সারা জীবন তোমরা কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ডুবে থেকেছো। 'আজ তাওবা করবো, কাল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করবো' এ করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছো এবং মুসলমানদের পরিনাম কি হয় তার দিকেই চেয়ে থেকেছো। কিয়ামত যে সংঘটিত হবেই এ বিশ্বাসও তোমাদের ছিল না, কিংবা তোমরা এই আশা পোষণ করতে যে, যদি কিয়ামত সংঘটিত হয়েও যায় তবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর মৃত্যু পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ার তোমরা তাওফীক লাভ করনি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে প্রতারক শয়তান তোমাদেরকে প্রতারণার মধ্যেই ফেলে রেখেছে। অবশেষে আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছো।" ভাবার্থ হলোঃ হে মুনাফিকের দল! দৈহিকরূপে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে বটে, কিন্তু অন্তর ও নিয়তের সাথে আমাদের সঙ্গে ছিলে না। বরং সন্দেহ ও রিয়াকারীর মধ্যেই পড়েছিলে এবং মন লাগিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করারও সৌভাগ্য তোমরা লাভ করনি।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে বিয়ে-শাদী, মজলিস-সমাবেশ এবং জীবন-মরণ ইত্যাদিতে শরীক থাকতো। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ـ اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ـ فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَآءَلُوْنَ ـ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ـ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ـ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ـ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ـ حَتّٰۤى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ـ

অর্থাৎ "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা নয়। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে– তোমাদেরকে কি সে সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবেঃ আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।" (৭৪ঃ ৩৮-৪৭) প্রকাশ থাকে যে, এ প্রশ্ন করা হবে শুধু তাদেরকে ধমক, শাসন গর্জন

এবং লজ্জিত করার জন্যে। আসলে তো প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানরা পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল থাকবে।

অতঃপর ওখানে যেমন বলা হয়েছিল যে, কারো সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না, অনুরূপভাবে এখানে বলেনঃ আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও না, যদি তারা যমীন ভর্তি সোনাও প্রদান করে। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। এটাই তাদের যোগ্য স্থান, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

১৬। যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি বিগলিত হবার সময় কি আসেনি, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

١٦- اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

১৭। জেনে রেখো যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্যে বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

١٧- اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ মুমিনদের জন্যে কি এখন পর্যন্ত ঐ সময় আসেনি যে, তারা আল্লাহর যিকির, নসীহত, কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নবী (সঃ)-এর হাদীসসমূহ শুনে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়? তারা শুনে ও মানে, আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষিদ্ধ জিনিস হতে বিরত থাকে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম অবতীর্ণ হতে হতে তেরো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এরপরেও মুসলমানদের অন্তর ইসলামের প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়নি, এখানে এরই অভিযোগ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ "চার বছর অতিক্রান্ত হতেই আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিন্দে করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।"

সাহাবীগণ (রাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন।" তখন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।" (১২-৩) কিছুদিন পর আবার তাঁরা এই আরজই করলে আল্লাহ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ "আল্লাহ উত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন।" (৩৯ঃ ২৩) আরো কিছুদিন পর পুনরায় তাঁরা একথাই বললে আল্লাহ তা'আলা ... اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষের মধ্য হতে প্রথম (ভাল বিষয়) যা উঠে যাবে তা হবে এই বিনয়-নম্রতা।"

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন এরা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল।' আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ইয়াহূদী নাসারার মত হতে নিষেধ করছেন। তারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে নিজেদের মনগড়া মত ও কিয়াসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। নিজেদের আবিষ্কৃত উক্তিগুলো তারা মানতে থাকে। আল্লাহর দ্বীনে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। নিজেদের আলেম ও দরবেশদের সনদ বিহীন কথাগুলো তারা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই দুষ্কার্যের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় কঠোর করে দেন। আল্লাহ তা'আলার হাজারো কথা শুনালেও তাদের অন্তর নরম হয় না। কোন ওয়াজ নসীহত তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কোন প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন তাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরাতে সক্ষম হয় না। তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও প্রকাশ্য দুষ্কৃতিকারী

হয়ে যায়। তাদের অন্তর অপবিত্র এবং আমল অপরিপক্ক হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ـ

অর্থাৎ "তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের উপর অভিসম্পাত নাযিল করেছি ও তাদের অন্তর কঠোর করে দিয়েছি, তারা কথাগুলো স্বস্থান হতে ফিরিয়ে দেয় এবং আমার উপদেশাবলী তারা ভুলে যায়।"(৫ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহর কথাগুলোর পরিবর্তন ঘটায়, সৎকার্যাবলী পরিত্যাগ করে এবং অসৎকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যেই রাব্বুল আ'লামীন এই উম্মতকে সতর্ক করছেনঃ সাবধান! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত হয়ো না। সর্বদিক দিয়েই তাদের হতে পৃথক থাকো।

হযরত রাবী ইবনে আবি উমাইলা (রাঃ) বলেন, কুরআন হাদীসের মিষ্টত্ব তো অনস্বীকার্য বটেই, কিন্তু আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে একটি খুবই প্রিয় ও মধুর কথা শুনেছি যা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেছেনঃ "যখন বানী ইসরাঈলের আসমানী কিতাবের উপর কয়েক যুগ অতিবাহিত হলো তখন তারা কিছু কিতাব নিজেরাই রচনা করে নিলো এবং তাতে ঐ মাসআলাগুলো লিপিবদ্ধ করলো যেগুলো তাদের নিকট পছন্দনীয় ছিল। ওগুলো ছিল তাদের নিজেদেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। এখন তারা সানন্দে জিহ্বা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওগুলো পড়তে লাগলো। ওগুলোর অধিকাংশ মাসআলা আল্লাহর কিতাবের বিপরীত ছিল। যেসব হুকুম মানতে তাদের মন চাইতো না তা তারা পরিবর্তন করে দিতো এবং নিজেদের রচিত কিতাবে নিজেদের চাহিদা মত মাসআলা জমা করে নিতো। ঐগুলোর উপরই তারা আমল করতো। এখন তারা জনগণকেও মানতে উদ্বুদ্ধ করলো। তাদেরকে তারা এরই দাওয়াত দিলো এবং জোরপূর্বক মানাতে শুরু করলো। এমনকি যারা মানতে অস্বীকার করতো তাদেরকে তারা শাস্তি দিতো, কষ্ট দিতো, মারপিঠ করতো এবং হত্যা করে ফেলতেও কুণ্ঠিত হতো না। তাদের মধ্যে একজন আল্লাহওয়ালা, আলেম ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। তিনি তাদের শক্তি ও বাড়াবাড়িতে ভীত হয়ে আল্লাহর কিতাবকে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিসে লিখে একটি শিঙ্গায় ভরে দেন এবং ঐ শিঙ্গাটিকে স্বীয় স্কন্ধে লটকিয়ে দেন। তাদের দুষ্কার্য ও হত্যাকাণ্ড দিন দিন বেড়েই

চললো। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ লোকদেরকে হত্যা করে ফেললো যাঁরা আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী ছিলেন। অতঃপর তারা পরস্পর পরামর্শ করলোঃ "দেখো, এভাবে এক এক করে কতজনকে আর হত্যা করতে থাকবে? এদের বড় আলেম, আমাদের এই কিতাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী এবং সমস্ত বানী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী অমুক আলেম রয়েছেন, তাঁকে ধরে নিয়ে এসো এবং তাঁর সামনে তোমাদের এই কিতাব পেশ কর। যদি তিনি মেনে নেন তবে তো আমাদের জন্যে সোনায় সোহাগা হবে। আর যদি না মানেন তবে তাঁকে হত্যা করে ফেলো। তাহলে তোমাদের এই কিতাবের বিরোধী আর কেউ থাকবে না। আর অন্যেরা সবাই আমাদের এই কিতাবকে কবূল করে নিবে এবং মানতে শুরু করবে।" এই পরামর্শ অনুযায়ী ঐ লোকগুলো আল্লাহর কিতাবের আলেম ও আমেল ঐ বুযুর্গ ব্যক্তিকে ধরে আনলো এবং বললোঃ "দেখুন, আমাদের এই কিতাবের সব কিছুই আপনি মানেন তো? না, মানেন না? এর উপর আপনার ঈমান আছে, না নেই?" উত্তরে ঐ আল্লাহওয়ালা আলেম লোকটি বললেনঃ "তোমরা এতে যা লিখেছো তা আমাকে শুনিয়ে দাও।" তারা শুনিয়ে দেয়ার পর বললোঃ "এটা আপনি মানেন তো?" ঐ ব্যক্তির জীবনের ভয় ছিল, এ কারণে সাহসিকতার সাথে 'মানি না' এ কথা সরাসরি বলতে পারলেন না, বরং তাঁর ঐ শিঙ্গার দিকে ইশারা করে বললেনঃ "আমার এর উপর ঈমান রয়েছে।" তারা বুঝলো যে, তাঁর ঈমান তাদের কিতাবের উপরই রয়েছে। তাই তারা তাঁকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকলো। তথাপিও তারা তাঁর কাজ কারবার দেখে সন্দেহের মধ্যেই ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর মৃত্যু হলো তখন তারা তদন্ত শুরু করলো যে, না জানি হয় তো তাঁর কাছে আল্লাহর কিতাবের ও সত্য মাসআলার কোন গ্রন্থ রয়েছে। অবশেষে তারা তাঁর ঐ শিঙ্গাটি উদ্ধার করলো। পড়ে দেখলো যে, ওর মধ্যে আল্লাহর কিতাবের আসল মাসআলাগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এখন তারা কথা বানিয়ে নিয়ে বললোঃ "আমরা তো কখনো এই মাসআলাগুলো শুনিনি। এরূপ কথা আমাদের ধর্মে নেই।" ফলে ভীষণ হাঙ্গামার সৃষ্টি হলো। তারা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এই বাহাত্তরটি দলের মধ্যে যে দলটি সত্যের উপর ছিল সেটা হলো ঐ দল, যারা ঐ শিঙ্গাযুক্ত মাসআলাগুলোর উপর আমলকারী ছিল।" হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে যারা বাকী থাকবে তারা অনুরূপ সমস্যারই সম্মুখীন হবে এবং হবে সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন ও নিরুপায়। সুতরাং এই অক্ষমতা, অসহায়তা ও

শক্তিহীনতার সময়েও তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে আল্লাহর দ্বীনের উপর স্থির ও অটল থাকা এবং আল্লাহদ্রোহীদেরকে ঘৃণার চক্ষে দেখা।”[১]

ইবরাহীম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইত্রীস ইবনে উরকূব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে আবদুল্লাহ (রাঃ)! যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে না সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।” একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “ধ্বংস হবে ঐ ব্যক্তি যে অন্তরে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলে জানে না।” অতঃপর তিনি বানী ইসরাঈলের উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।”[২]

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘জেনে রেখো যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন।’ এতে ইঙ্গিত রয়েছে ঐ বিষয়ের দিকে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর হৃদয়কে কঠোরতার পরেও নরম করে দিতে সক্ষম। পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার পরেও তিনি সরল সঠিক পথে আনয়নের ক্ষমতা রাখেন। বৃষ্টি যেমন শুষ্ক ভূমিকে সিক্ত করে থাকে, তেমনই আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতে পারেন। অন্তর যখন গুমরাহীর অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন আল্লাহর কিতাবের আলো আকস্মিকভাবে ঐ অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে। আল্লাহর অহী অন্তরের তালা চাবি স্বরূপ। সত্য ও সঠিক হিদায়াতকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনিই পথভ্রষ্টতার পর সরল সঠিক পথে আনয়নকারী। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তিনি বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার অধিকারী। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

১৮। দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৮- اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১৯। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে (সঃ) ঈমান আনে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট

১৯- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖق

---

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।	وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○ ١٩

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি অভাবগ্রস্তদেরকে যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় হালাল ধন-সম্পদ থেকে সৎ নিয়তে দান করে, আল্লাহ বিনিময় হিসেবে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে তাদেরকে প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে ঐ দান দশ গুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং তারও বেশী বৃদ্ধি করবেন। তাদের জন্যে রয়েছে বেহিসাব সওয়াব ও মহাপুরস্কার।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই সিদ্দীক ও শহীদ। এই দুই গুণের অধিকারী শুধুমাত্র এই ঈমানদার লোকেরাই। কোন কোন গুরুজন اَلشُّهَدَاءُ কে পৃথক বাক্য বলেছেন। মোটকথা, তিন শ্রেণী হলো। (এক) مُصَّدِّقِيْنَ (দানশীল), (দুই) صِدِّيْقِيْنَ (সত্যনিষ্ঠ) এবং (তিন) شُهَدَاءَ -(শহীদগণ)। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ “আর যে আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করবে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে।” (৪ঃ ৬৯) এখানেও সিদ্দীক ও শহীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করা হয়েছে, যার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এঁরা দুই শ্রেণীর লোক। সিদ্দীকের মর্যাদা নিঃসন্দেহে শহীদ অপেক্ষা বেশী।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের প্রাসাদের জান্নাতীদেরকে এভাবেই দেখবে, যেমন তোমরা পূর্ব দিকের ও পশ্চিম দিকের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আকাশ প্রান্তে দেখে থাকো।” সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর

রাসূল (সঃ)! এ মর্যাদা তো শুধু নবীদের, তাঁরা ছাড়া তো এ মর্যাদায় অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না?" জবাবে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এরা হলো ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছে।"[১]

একটি গারীব হাদীস দ্বারা এটাও জানা যায় যে, এই আয়াতে শহীদ ও সিদ্দীক এ দুটো এই মুমিনেরই বিশেষণ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমার উম্মতের মুমিন ব্যক্তি শহীদ।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।

হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রঃ) বলেনঃ "এ দু'জন কিয়ামতের দিন দুটি অঙ্গুলীর মত হয়ে আসবে।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, শহীদদের রূহ সবুজ রঙ এর পাখীর দেহের মধ্যে থাকবে। জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা পানাহার করে ঘুরে বেড়াবে। রাত্রে লণ্ঠনের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তাদের প্রতিপালক তাদের উপর প্রকাশিত হয়ে বলবেনঃ "তোমরা কি চাও?" উত্তরে তারা বলবেঃ "আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।" আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেনঃ "আমি তো এই ফায়সালা করেই দিয়েছি যে, দুনিয়ায় কেউ পুনরায় ফিরে যাবে না।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি।' ঐ নূর বা জ্যোতি তাদের সামনে থাকবে এবং তা তাদের আমল অনুযায়ী হবে।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "শহীদগণ চার প্রকার। (এক) ঐ পাকা ঈমানদার যে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, অবশেষে শহীদ হয়েছে। সে এমনই ব্যক্তি যে, (তার মর্যাদা দেখে) লোকেরা তার দিকে এই ভাবে তাকাবে।" ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মস্তক এমনভাবে উঠান যে, তাঁর টুপিটি মাথা হতে নীচে পড়ে যায়। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হযরত উমার (রাঃ)-এরও মাথার টুপি নীচে পড়ে যায়। (দুই) ঐ ব্যক্তি যে ঈমানদার বটে এবং জিহাদের জন্যে বেরও হয়েছে। কিন্তু অন্তরে সাহস কম আছে। হঠাৎ একটি তীর এসে তার

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দেহে বিদ্ধ হয় এবং দেহ হতে রূহ বেরিয়ে যায়। এ ব্যক্তি হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (তিন) ঐ ব্যক্তি যার ভাল মন্দ আমল রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে পছন্দ করেছেন। সে জিহাদের মাঠে নেমেছে এবং কাফিরদের হাতে নিহত হয়েছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (চার) ঐ ব্যক্তি যার গুনাহ খুব বেশী আছে। সে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে। এ হলো চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।"[১]

এই সৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা অসৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

২০। তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে ওটা খড় কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিবজীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

٢٠- اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২১। তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্যে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

٢١- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও নগণ্য। এখানে দুনিয়াবাসীর জন্যে রয়েছে শুধুমাত্র ক্রীড়া-কৌতুক, শান-শওকত, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ـ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থাৎ "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এই সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।"(৩ঃ ১৪)

এরপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নিয়ামতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। غَيْث বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি মানুষের নৈরাশ্যের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, ক্ষেতের শস্য আন্দোলিত হতে থাকে এবং কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অনুরূপভাবে দুনিয়াবাসী দুনিয়ার মাল-ধন, পণ্যদ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ

করে অহংকারে ফুলে ওঠে। কিন্তু পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, ক্ষেতের ঐ সবুজ-শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত হয়। ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্তু সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। দুনিয়ার জীবনও তাই। প্রথমে আসে যৌবন, এর পরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়। স্বয়ং মানুষের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। তার শৈশব, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরমী এবং শক্তির দাপট, আর কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্রতা ও অস্থির শক্তিহীনতা! যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদেরকে দুর্বলতার অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তারপর ঐ দুর্বলতার পরে শক্তি দান করেছেন, আবার ঐ শক্তির পরে দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য, তিনি যা চান সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাবান।"(৩০ঃ ৫৪)

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেনঃ সত্বরই কিয়ামত সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। সুতরাং তোমরা এমন কাজ কর যদ্দারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে বাঁচতে পার এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পার, রক্ষা পেতে পার তাঁর শাস্তি হতে এবং হকদার হতে পার তাঁর ক্ষমার! দুনিয়া তো শুধু প্রতারণার বেড়া। যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই হয় যে, এই দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করে না। দিনরাত্রি ওরই চিন্তাতেই সে ডুবে থাকে। এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাও তাঁর দাঁড়িয়ে যায় যে, সে আখিরাতকে অস্বীকার করে বসে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। তোমরা পাঠ করঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থাৎ "পার্থিব জীবন ছলনার ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে জান্নাত জুতার তাসমার (চামড়ার লম্বা অংশের) চেয়েও বেশী নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ।"[২] সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও মন্দ মানুষের খুবই নিকটে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত মঙ্গলের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং মন্দ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় মাফ হয়ে যায় এবং পুণ্য ও মর্যাদা উঁচু হয়। এ জন্যেই এর পরপরই আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা দৌড়িয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আকাশ ও পৃথিবী (তুল্য) যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে।"(৩ ঃ ১৩৩)

এ লোকগুলো আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিল। এ জন্যেই পরম করুণাময় আল্লাহ এদের প্রতি তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহ দান করেছেন।

পূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য হতে দরিদ্র লোকেরা আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সম্পদশালী লোকেরা তো জান্নাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নিয়ামত রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করলেনঃ "এটা কিরূপে?" উত্তরে তাঁরা বললেনঃ "নামায, রোযা তো তাঁরা ও আমরা সবাই করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তাঁরা দান খায়রাত ও গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ করতে পারি না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা কর তবে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আয়াতটির উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি সহীহ গ্রন্থেও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২. ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তোমরা সবারই আগে বেড়ে যাবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করে দিবে। তাহলো এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে।" কিছুদিন পর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছেন এবং তাঁরাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন।"

২২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।

২২- مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

২৩। এটা এই জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছো তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্যে হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে।

২৩- لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝ ۙ

২৪। যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

২৪- الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূকাতকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে কোন বিপর্যয় আসে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারো উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটার হওয়া নিশ্চিতই ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, প্রাণসমূহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সঠিকতম কথা এটাই যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল।

ইমাম হাসান (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! প্রত্যেক বিপদ বিপর্যয় যা আসমান ও যমীনে আপতিত হয় তা প্রাণসমূহের সৃষ্টির পূর্বেই মহান প্রতিপালকের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এতে সন্দেহের কি আছে?" যমীনের মসীবত হলো অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিপদ হলো দুঃখ, কষ্ট, রোগ ইত্যাদি।

যে কাউকেও কোন আঁচড় লাগে বা পা পিছলিয়ে পড়ে কোন আঘাত লাগে কিংবা কোন কঠিন পরিশ্রমের কারণে ঘর্ম নির্গত হয়, এসবই তার গুনাহর কারণেই হয়ে থাকে। আরো তো বহু গুনাহ রয়েছে যেগুলো গাফুরুর রাহীম আল্লাহ ক্ষমা করেই দেন। কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনে এই আয়াত একটি বড় দলীল। তাদের ধারণা এই যে, পূর্ব অবগতি কোন জিনিসই নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন!

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার পূর্বে তকদীর নির্ধারণ করেন। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাঁর আরশ পানির উপর ছিল।[১]

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ কার্য অস্তিত্বে আসার পূর্বে ওটা জেনে নেয়া, ওটা হওয়ার জ্ঞান লাভ করা এবং ওটাকে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট মোটেই কঠিন নয়। তিনিই তো ওগুলোর সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে, তাঁর সীমাহীন জ্ঞান সবই অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এ খবর এজন্যেই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে বিপদ আপদ আপতিত হয় তা কখনো টলবার ছিল না এ বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিপদের

১. এটা ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সময় যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে। তোমরা যেন হায়, হায়, হা-হুতাশ না কর এবং অধৈর্য না হয়ে পড়। তোমরা যেন নিশ্চিন্ত থাকো যে, এ বিপদ আসারই ছিল। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদের বিজয় ইত্যাদি অযাচিতভাবে লাভ কর তবে যেন অহংকারে ফেটে না পড়। এমন যেন না হও যে, ধন-মাল পেয়ে আল্লাহকে ভুলে বস। এই সময়েও তোমাদের সামনে আমার শিক্ষা থাকবে যে, তোমাদেরকে ধন-মালের মালিক করে দেয়া আমারই হাতে, এতে তোমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই।

একটি কিরআতে اَتَاكُمْ আছে এবং আর একটি কিরআতে اٰتٰكُمْ আছে। দুটোই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যের উপর গর্ব প্রকাশ করে সে আল্লাহর শত্রু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "অশান্তি ও শান্তি এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সব মানুষের উপরই আসে। আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে ধৈর্যধারণে কাটিয়ে দাও।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এ লোকগুলো নিজেরাও কৃপণ ও শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য ও শরীয়ত বিরোধী কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তাঁর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কেননা তিনি সমস্ত মাখলূক হতে অভাবমুক্ত ও বেপরোয়া। তিনি তো প্রশংসার্হ। যেমন হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ

اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "যদি তোমরা কুফরী কর এবং সারা বিশ্বের মানুষও কাফির হয়ে যার (তবুও আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না), সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।"(১৪ঃ ৮)

২৫। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি

٢٥- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ; এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি আমার রাসূলদেরকে (আঃ) মু'জিযা দিয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা খাঁটি, পরিষ্কার ও সত্য। আর দিয়েছি আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কথাকে কবূল করে নিতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। হ্যাঁ, তবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও বুঝতে চায় না তারা এর থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আয়াত বা দলীল-প্রমাণের উপর রয়েছে এবং যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী।"(১১ঃ ১৭) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ "এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"(৩০ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ـ

অর্থাৎ "তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড।"(৫৫ঃ৭) সুতরাং এখানে তিনি বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, যেন মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে। তারা যেন রাসূল (সঃ)-এরই সমস্ত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেননা, তাঁর কথার মত অন্য কারো কথা সরাসরি সত্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের কথা

পূর্ণ হয়েছে যিনি স্বীয় খবর প্রদানে সত্যবাদী এবং স্বীয় আহকামে ন্যায়পরায়ণ।"(৬ঃ ১১৫) কারণ এটাই যে, যখন মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পুরোপুরিভাবে আল্লাহর নিয়ামতের অধিকারী হবে তখন তারা বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ـ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে এর জন্যে পথ প্রদর্শন করেছেন, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন তবে আমরা পথ পেতাম না, আমাদের নিকট রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন।" (৭ঃ ৪৩)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে দমন করার লক্ষ্যে লোহা তৈরী করেছি। অর্থাৎ প্রথমে কিতাব, রাসূল এবং হকের মাধ্যমে হুজ্জত কায়েম করেছি। অতঃপর বক্র অন্তর বিশিষ্ট লোকদের বক্রতা দূর করার জন্য আমি লোহা সৃষ্টি করেছি যে, যেন এর দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ ভক্ত বান্দারা তাঁরা শত্রুদের অন্তরের কাঁটা বের করে আনে। এই নমুনাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। মক্কা শরীফে তিনি সুদীর্ঘ তেরো বছর মুশরিকদেরকে বুঝাতে, তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত প্রদানে এবং তাদের বদ আকীদা সংশোধনকরণে কাটিয়ে দেন। তারা স্বয়ং তাঁর উপর যেসব বিপদ আপদ চাপিয়ে দেয় তা তিনি সহ্য করেন। কিন্তু যখন এই হুজ্জত শেষ হয়ে গেল তখন শরীয়ত মুসলমানদেরকে হিজরত করার অনুমতি দিলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, এখন ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। তাদের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে যমীনকে আল্লাহর অহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের হতে পবিত্র করা হোক।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কিয়ামতের পূর্বেই আমি তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছি যে পর্যন্ত না শরীক বিহীন এক আল্লাহরই ইবাদত করা হয়। আর আমার রিয্ক আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননা ঐ লোকদের, যারা আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে। যে ব্যক্তি কোন কওমের সহিত সাদৃশ্য যুক্ত হয় সে তাদেরই একজন।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং লৌহ দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা হয়। যেমন তরবারী, বর্শা, ছুরি, তীর, বর্ম ইত্যাদি। এছাড়া এর দ্বারা জনগণ আরো বহু উপকার লাভ করে থাকে। যেমন এই লৌহ দ্বারা তারা কুড়াল, কোদাল, দা, আরী, চাষের যন্ত্রপাতি, বয়নের যন্ত্রপাতি, রান্নার পাত্র, রুটির তাওয়া ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) তিনটি জিনিসসহ জান্নাত হতে এসেছিলেন। (এক) নেহাই, (দুই) বাঁশী এবং (তিন) হাতুড়ী।[১]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই অস্ত্র-শস্ত্রগুলো উঠিয়ে নেক নিয়তে কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য করতে চায় তা আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহ তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তাঁর দ্বীনের যে সাহায্য করবে সে নিজেরই সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের দ্বীনকে শক্তিশালী করেন। তিনি তো জিহাদের ব্যবস্থা দিয়েছেন বান্দাদেরকে শুধু পরীক্ষা করার জন্যে। বান্দার সাহায্যের তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই। বিজয় ও সাহায্য তো তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে।

٢٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَّكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৬। আমি নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্যে স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ

২৭। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার

---

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)-কে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ– এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূল হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত যত নবী এসেছেন সবাই হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর রূপে এসেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ

অর্থাৎ "আমি তার বংশধরের মধ্যেই নবুওয়াত ও কিতাব রেখেছি।" (২৯ঃ ২৭) শেষ পর্যন্ত বানী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। সুতরাং হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে বরাবরই রাসূলদের ক্রম জারী থেকেছে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, যাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করা হয় এবং যাঁর অনুসারী উম্মত কোমল হৃদয় ও নরম মিজাযরূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ ভীতি এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া, এই পবিত্র গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

এরপর খৃষ্টানদের একটি বিদআতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তাদের শরীয়তে ছিল না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে ওটা আবিষ্কার করে

নিয়েছিল। ওটা হলো সন্ন্যাসবাদ। এর পরবর্তী বাক্যের দু'টি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা এটা প্রবর্তন করেছিল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের এটাই উক্তি। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ আমি তাদের উপর এটা ওয়াজিব করিনি, বরং আমি তাদের উপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ওয়াজিব করেছিলাম।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। যেমনভাবে এর উপর স্থির থাকা তাদের উচিত ছিল তেমনভাবে তারা স্থির থাকেনি। সুতরাং তারা দুটি মন্দ কাজ করলো। (এক) তারা নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহর দ্বীনে নতুন পন্থা আবিষ্কার করলো। (দুই) তারা ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলো না। অর্থাৎ যেটাকে তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে নিয়েছিল, শেষে ওর উপরও তারা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলো না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ডাক দেনঃ "হে ইবনে মাসউদ (রাঃ)!" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই তো আমি হাযির আছি।" তিনি বললেনঃ "জেনে রেখো যে, বানী ইসরাঈলের বাহাত্তরটি দল হয়ে গেছে যাদের মধ্যে তিন দল পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রথম দলটি বানী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতা দেখে তাদের হিদায়াতের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের বড়দের মধ্যে তাবলীগ শুরু করে দিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ লোকগুলো এই তাবলীগকারী দলটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং বাদশাহ ও আমীরগণ যারা এই তাবলীগের কারণে বড়ই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, এই তাবলীগী দলটির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলো এবং এভাবে তাদেরকে হত্যাও করলো এবং বন্দীও করলো। এই দলটিতো মুক্তি লাভ করলো। তারপর দ্বিতীয় দলটি দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তো এদের ছিল না, তথাপি নিজেদের দ্বীনী শক্তির বলে ঐ উদ্ধত লোকদের দরবারে সত্যের বক্তৃতা শুরু করে দিলো এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূল মাযহাবের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিতে লাগলো। ঐ হতভাগ্যের দল এদেরকেও হত্যা করে দিলো, তাদেরকে আরী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করলো এবং আগুনেও জ্বালিয়ে দিলো। এর সবই এই দলটি ধৈর্যের সাথে বরদাশত করলো। এভাবে এ দলটিও নাজাত পেয়ে গেল। এরপর উঠলো তৃতীয় দলটি। এরা এদের পূর্ববর্তী দলটির চেয়েও দুর্বল ছিল। এদের এ শক্তি ছিল না যে, ঐ যালিমদের মধ্যে প্রকৃত দ্বীনের

আহকামের তাবলীগ করে। এজন্যে তারা নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা করার উপায় এটাই মনে করলো যে, তারা জঙ্গলে চলে যাবে এবং পাহাড়ে পর্বতে আরোহণ করবে ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাবে। আর দুনিয়াকে পরিত্যাগ করবে। তাদেরই বর্ণনা وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ -এই আয়াতে রয়েছে।[১]

এই হাদীসটিই অন্য সনদেও বর্ণিত আছে। তাতে তেহাত্তর দলের বর্ণনা রয়েছে। তাতে এও আছেঃ তারাই পুরস্কার লাভ করবে যারা আমার উপর ঈমান আনবে এবং আমার সত্যতা স্বীকার করবে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই যারা ফাসেক তারা হলো ঐ সব লোক যারা আমাকে অবিশ্বাস করবে এবং আমার বিরোধী হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে বানী ইসরাঈলের বাদশাহরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু কতকগুলো লোক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আসল তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের হাতে থাকে যা তারা তিলাওয়াত করতো। একবার আল্লাহর কিতাবে রদবদলকারী লোকেরা তাদের বাদশাহর কাছে এই খাঁটি মুমিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেঃ "এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব বলে যে কিতাব পাঠ করে তাতে তো আমাদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। তাতে লিখিত আছে যে, যে কেউই আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির এবং এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। এ লোকগুলো আমাদের কাজের উপর দোষারোপ করে থাকে। সুতরাং আপনি এদেরকে আপনার দরবারে ডাকিয়ে নিন এবং এদেরকে বাধ্য করুন যে, হয় এরা কিতাব এভাবে পাঠ করুক যেভাবে আমরা পাঠ করি এবং ঐরূপই আকীদা ও বিশ্বাস রাখে যেরূপ বিশ্বাস আমরা রাখি, না হয় তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন।"

তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই খাঁটি মুমিনদেরকে বাদশাহর দরবারে আহ্বান করা হলো। তাদেরকে বলা হলোঃ "হয় তোমরা আমাদের সংশোধনকৃত কিতাব পাঠ কর এবং তোমাদের হাতে যে আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, না হয় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও।" তখন ঐ পবিত্র দলগুলোর একটি দল বললোঃ "তোমরা আমাদের জন্যে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরী কর এবং আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে দাও। আমাদের জন্যে দড়ি ও ছড়ির ব্যবস্থা কর। অতঃপর আমাদের খাদ্য ও

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পানীয় দ্রব্য তাতে রেখে দেবে। আমরা উপর থেকে তা টেনে উঠিয়ে নিবো। আমরা নীচে কখনো নামবো না এবং তোমাদের লোকালয়ে আসবো না।" আর একটি দল বললোঃ "আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এখান হতে হিজরত করে চলে যাচ্ছি। আমরা পাহাড়ে জঙ্গলে চলে যাবো। ঝরণা, নদী-নালা এবং পুকুর-পুষ্করিণী হতে আমরা জানোয়ারের মত পানি পান করবো। এরপরে যদি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ে দেখতে পাও তবে নির্ধিদায় আমাদেরকে হত্যা করে ফেলো।" তৃতীয় দলটি বললোঃ "তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ের এক প্রান্তে কিছু ভূখণ্ড দিয়ে দাও এবং সেখানে সীমারেখা টেনে দাও। আমরা সেখানেই কূপ খনন করবো এবং চাষাবাদ করবো। তোমাদের লোকালয়ে আমরা কখনো আসবই না।" এই আল্লাহভীরু লোকদের সাথে ঐ লোকগুলোর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলে তারা এদের আবেদন মঞ্জুর করলো এবং এ লোকগুলো নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। কিন্তু তাদের সাথে এমন কতগুলো লোকও গেল যাদের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে ঈমান ছিল না। তারা শুধু অনুকরণ হিসেবে এদের সঙ্গী হয়েছিল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ ...-এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করলেন তখন তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই বাকী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাতের খবর শোনা মাত্রই খানকাহবাসীরা তাদের খানকাহ হতে, জঙ্গলবাসীরা জঙ্গল হতে এবং ঘেরাও আঙ্গিনায় বসবাসকারীরা তাদের ঐ আঙ্গিনা হতে বেরিয়ে আসলো এবং তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর সত্যতা স্বীকার করে। এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে।" (৫৭ঃ২৮) অর্থাৎ তাদের হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন এবং পরে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন, এ কারণেই তাদের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। আর নূর বা আলো হলো কুরআন ও সুন্নাহ্। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থাৎ "এটা এই জন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই। অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" পরবর্তী এ দুটি আয়াতের তাফসীর এই আয়াতের পরেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

হযরত সাহল ইবনে আবি উমামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ)-এর খিলাফতের যুগে তিনি এবং তাঁর পিতা মদীনায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। ঐ সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। যখন তাঁরা হযরত আনাস (রাঃ)-এর নিকট আসেন তখন তিনি নামায পড়ছিলেন এবং নামায পড়ছিলেন প্রায় মুসাফিরের নামাযের মত হালকাভাবে। তিনি সালাম ফিরালে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি ফরয নামায পড়লেন, না নফল নামায?" উত্তরে তিনি বললেন, ফরয নামায। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায এরূপই ছিল। আমি আমার ধারণা ও জানামতে এতে কোন ভুল করিনি। হ্যাঁ, তবে যদি ভুল বশতঃ কিছু হয়ে থাকে তবে আমি তা বলতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের জীবনের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো না। অন্যথায় তোমাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। এক সম্প্রদায় নিজেদের জীবনের উপর কঠোরতা অবলম্বন করেছিল বলে তাদের উপরও কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল। তাদের অবশিষ্টাংশ তাদের খানকাতে ও তাদের ঘরসমূহে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এটাই ছিল ঐ কঠোরতা অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগ, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ওয়াজিব করেননি।" দ্বিতীয়বার তাঁরা পিতা-পুত্র হযরত আনাস (রাঃ)-কে বললেনঃ "আসুন, আমরা সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে চলি এবং দেখি ও শিক্ষা গ্রহণ করি।" হযরত আনাস (রাঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, বেশ!" অতঃপর সবাই সওয়ার হয়ে চললেন। কয়েকটি বস্তী তাঁরা দেখলেন যেগুলো একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল এবং ঘরগুলো উল্টোমুখে পড়েছিল। এ দেখে তাঁরা হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এ শহরগুলোর অবস্থা কি আপনার জানা আছে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, খুব ভাল জানা আছে। এমন কি এগুলোর অধিবাসীদের সম্পর্কেও আমি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাদেরকে ঔদ্ধত্য ও

হিংসা-বিদ্বেষ ধ্বংস করে দিয়েছে। হিংসা পুণ্যের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয়, আর ঔদ্ধত্য বা হঠকারিতা ওটাকে সত্যতায় রূপ দান করে বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। চক্ষুরও যেনা হয়, হাত, পা এবং জিহ্বারও যেনা হয়, আর লজ্জাস্থান ওটাকে বাস্তবে রূপায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[১]

হযরত আইয়াস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর জন্যেই সন্ন্যাসবাদ ছিল এবং আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হলো মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[২]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে একজন লোক এসে বলেঃ "আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।" তিনি তাকে বলেনঃ "তুমি আমার কাছে যে আবেদন করলে এই আবেদনই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে করেছিলাম। আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। এটাই সমস্ত পুণ্য কার্যের মূল। তুমি জিহাদকে নিজের জন্যে অবশ্যকর্তব্য করে নাও। এটাই হলো ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর আল্লাহর যিক্র এবং কুরআন পাঠকে তুমি নিজের উপর অবশ্যপালনীয় করে ফেলো। এটাই আকাশে তোমার রূহ এবং পৃথিবীতে তোমার যিক্র।"[৩]

২৮। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

---

১. এটা হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবুল ইয়ালাও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় প্রত্যেক নবীর স্থলে প্রত্যেক উম্মত রয়েছে।

৩. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৯। এটা এই জন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই, অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

২৯- لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

এর পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যে মুমিনদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তারা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। যেমন সূরায়ে কাসাসের আয়াতে রয়েছে। আর যেমন একটি হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করবেন। (এক) ঐ আহলে কিতাব, যে তার নবী (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, তারপর আমার উপরও ঈমান আনয়ন করেছে। সে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে। (দুই) ঐ গোলাম, যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং তার মনিবের হক আদায় করে। তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। (তিন) ঐ ব্যক্তি, যে তার ক্রীতদাসীকে আদব শিক্ষা দিয়েছে এবং খুব ভাল আদব অর্থাৎ শরয়ী আদব শিখিয়েছে। অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্যেও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।"[১]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব যখন দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্তির কারণে গর্ব ও ফখর করতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ ... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এই উম্মতকে দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদানের পর হিদায়াতের নূর দেয়ারও ওয়াদা দেয়া হলো এবং সাথে সাথে ক্ষমা করে দেয়ারও ওয়াদা আল্লাহ পাক করলেন। সুতরাং এই উম্মতকে নূর ও মাগফিরাত এ দু'টি অতিরিক্ত দেয়া হলো।[২] যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্যে ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) করবেন, তোমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।" (৮ঃ ২৯)

হযরত সাঈদ ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহূদীদের একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদেরকে একটি পুণ্যের বিনিময়ে সর্বাধিক কতগুণ প্রদান করা হয়?" সে উত্তরে বলেনঃ "সাড়ে তিনশগুণ পর্যন্ত।" তখন হযরত উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ দিয়েছেন।" হযরত সাঈদ (রঃ) এটা বর্ণনা করার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহর يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ-এই উক্তিটিই তিলাওয়াত করেন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার কোন একটি কাজে কতকগুলো মজুর নিয়োগ করার ইচ্ছা করলো। অতঃপর সে ঘোষণা করলোঃ "এমন কেউ আছে কি যে আমার নিকট হতে এক কীরাত (এক আউন্সের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ওজন) গ্রহণ করবে এবং এর বিনিময়ে ফজরের নামায হতে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করবে?" তার এ ঘোষণা শুনে ইয়াহূদরা প্রস্তুত হয়ে গেল। সে আবার ঘোষণা করলোঃ "যে যোহর হতে আসর পর্যন্ত কাজ করবে তাকে আমি এক কীরাত প্রদান করবো।" এতে নাসারাগণ প্রস্তুত হলো এবং কাজ করলো (ও মজুরী নিলো)। পুনরায় লোকটি ঘোষণা করলোঃ "আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত যে কাজ করবে তাকে আমি দুই কীরাত প্রদান করবো।" তখন তোমরা (মুসলমানরা) কাজ করলে। এই ইয়াহূদী ও নাসারারা খুবই অসন্তুষ্ট হলো। তারা বলতে লাগলোঃ "আমরা কাজ করলাম বেশী এবং পারিশ্রমিক পেলাম কম, তারা কাজ করলো কম এবং পারিশ্রমিক পেলো বেশী।" তখন তাদেরকে বলা হলোঃ তোমাদের হক কি নষ্ট করা হয়েছে?" তারা উত্তরে বললোঃ "না, আমাদের হক নষ্ট করা হয়নি বটে।" তখন তাদেরকে বলা হলোঃ "তাহলে এটা হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা এটা প্রদান করে থাকি।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, মুসলমান এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মত যে তার কোন কাজে কতকগুলো লোককে নিয়োগ করলো এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলো। আর বললোঃ "তোমরা সারা দিন কাজ করবে।" তারা কাজে লেগে গেল। কিন্তু অর্ধদিন কাজ করার পর তারা বললোঃ "আমরা আর কাজ করবো না এবং যেটুকু কাজ করেছি পারিশ্রমিকও নিবো না।" লোকটি তাদেরকে বুঝিয়ে বললোঃ "এরূপ করো না, বরং কাজ পূর্ণ কর এবং মজুরীও নিয়ে নাও।" কিন্তু তারা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলো এবং আধা কাজ ফেলে দিয়ে মজুরী না নিয়ে চলে গেল। সে তখন অন্য লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিলো এবং বললোঃ "তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে এবং পুরো এক দিনেরই মজুরী পাবে।" এ লোকগুলো কাজে লেগে গেল। কিন্তু আসরের সময়েই তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে বললোঃ "আমরা আজ কাজ করতে পারবো না এবং মজুরীও নিবো না।" লোকটি খুব বুঝালো এবং বললোঃ "দেখো, এখন দিনের তো আর বেশী অংশ বাকী নেই। তোমরা কাজ কর এবং পারিশ্রমিক নিয়ে নাও।" কিন্তু তারা মানলো না এবং মজুরী না নিয়েই চলে গেল। লোকটি আবার অন্যদেরকে কাজে নিয়োগ করলো এবং বললোঃ "তোমরা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে এবং পুরো দিনের মজুরী পাবে।" অতঃপর তারা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করলো এবং পূর্বের দুটি দলের মজুরীও নিয়ে নিলো। সুতরাং এটা হলো তাদের দৃষ্টান্ত এবং ঐ নূরের দৃষ্টান্ত যা তারা কবূল করলো।"[১]

এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও তাদের কোন অধিকার নেই এবং এটাও যেন তারা জানতে পারে যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তাঁর অনুগ্রহের হিসাব কেউই লাগাতে পারে না। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, لِئَلَّا يَعْلَمَ এখানে لِيَعْلَمَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে لِكَيْ يَعْلَمَ রয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) এবং হযরত আতা ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) হতেও এই কিরআতই বর্ণিত আছে। উদ্দেশ্য এটাই যে, আরবের কালামে لَا শব্দটি صِلَه -এর জন্যে এসে থাকে, যা কালামের শুরুতে ও শেষে আসে এবং তখন অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হয় না। যেমন আল্লাহ পাকের وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَمَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ এবং وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ -এই উক্তিগুলোতে রয়েছে।

সূরা ঃ হাদীদ ও সপ্তবিংশতিতম পারা -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরাঃ মুজাদালাহ্ মাদানী

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২২, রুকূ' ঃ ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٢٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

১। (হে রাসূল সঃ)! আল্লাহ্ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্যে যাঁর শ্রবণশক্তি সমস্ত শব্দকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এই বাদানুবাদকারিণী মহিলাটি এসে নবী (সঃ)-এর সাথে এতো চুপে চুপে কথা বলতে শুরু করে যে, আমি ঐ ঘরেই থাকা সত্ত্বেও মোটেই শুনতে পাইনি যে, সে কি বলছে! কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঐ গুপ্ত কথাও শুনে নেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।”[১]

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছেঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ্ কল্যাণময় যিনি উঁচু-নীচু সব শব্দই শুনেন। এই অভিযোগকারিণী মহিলাটি ছিল হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবাহ্ (রাঃ)। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয় তখন এতো ফিস্ফিস করে কথা বলে যে, তার কোন কোন শব্দ আমার কানে আসছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ কথাই আমার কানেও পৌঁছেনি। অথচ আমি ঐ ঘরেই বিদ্যমান ছিলাম। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ), ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(সঃ)! আমার যৌবন তো তার সাথেই কেটেছে। এখন আমি বুড়ি হয়ে গেছি এবং আমার সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লোপ পেয়েছে, এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমার সাথে যিহার[১] করেছে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার সামনে দুঃখের কান্না কাঁদছি।” তখনো মহিলাটি ঘর হতে বের হয়নি ইতিমধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। তার স্বামীর নাম ছিল হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ)।

কখনো কখনো তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যেতো, ঐ সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে যিহার করে ফেলতেন। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে আসতো তখন এমন হতেন যে, যেন কিছুই হয়নি। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট ফতওয়া নিতে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাতে আসলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) তাঁর খিলাফতের আমলে লোকদের সাথে পথ চলছিলেন, পথে একটি মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। মহিলাটি তাঁকে ডেকে থামতে বলে। হযরত উমার (রাঃ) তৎক্ষণাৎ থেমে যান এবং মহিলাটির কাছে গিয়ে আদব ও মনোযোগের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে তার কথা শুনতে থাকেন। নিজের ফরমায়েশ মুতাবেক কাজ করিয়ে নিয়ে মহিলাটি ফিরে যায় এবং হযরত উমারও (রাঃ) তাঁর লোকদের কাছে ফিরে আসেন। তখন একটি লোক বলে ওঠেঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! একটি বৃদ্ধা মহিলার কথায় আপনি থেমে গেলেন এবং আপনার কারণে এতোগুলো লোককে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হলো।” একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আফ্সোস! এই মহিলাটি কে তা কি তুমি জান?” উত্তরে লোকটি বলেঃ “জ্বী, না।” তখন তিনি বলেনঃ “ইনি ঐ মহিলা যাঁর আবেদন আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর হতে শুনেন। ইনি হলেন হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবাহ্ (রাঃ)। যদি তিনি আজ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এমনকি কিছু রাত্রি পর্যন্তও কথা বলতে থাকতেন তবুও আমি তাঁর খিদমত হতে সরতাম না। হ্যাঁ, তবে নামাযের সময় নামায আদায় করতাম এবং তারপর আজ্ঞাবহ রূপে তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে যেতাম।”[২]

---

১. যাহেলী যুগে আরব সমাজে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ (তুমি আমার জন্যে আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ) এ কথা বলতো তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে।

২. এ হাদীসটির সনদ ছেদকাটা। তবে অন্য ধারাতেও এটা বর্ণিত আছে।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি ছিলেন খাওলা বিনতে সামিত (রাঃ) এবং তাঁর মাতার নাম ছিল মুআযাহ্ (রাঃ), যাঁর ব্যাপারে وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا (২৪ঃ ৩৩) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, মহিলাটি ছিলেন আউস ইবনে সা'মিত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলা (রাঃ)।

٢- اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

২। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা; তারা তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

٣- وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৩। যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হলো। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

٤- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ

৪। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযাব্রত পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এই জন্যে যে,

তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান, কাফিরদের জন্যে বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَرَسُولِهٖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ ○

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খুওয়াইলাহ্ বিনতে সা'লাবাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার এবং (আমার স্বামী) হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে মুজাদালার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। আমি তাঁর ঘরে ছিলাম। তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর চরিত্রও ভাল ছিল না। একদা তিনি আমার কাছে আসেন, আমি তাঁকে এমন এক কথা বলে ফেলি যে, তিনি রাগান্বিত হন এবং আমাকে বলে ফেলেনঃ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّي অর্থাৎ "তুমি আমার জন্যে আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ।" তারপর তিনি ঘর হতে বেরিয়ে যান এবং কওমী মজলিসে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি আমার সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইলে আমি বলিঃ কখনো না, যাঁর হাতে খুওয়াইলাহ্‌র প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আপনার একথা (যিহারের কথা) বলার পর আপনি আপনার এ মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ফায়সালা হয়। কিন্তু তিনি মানলেন না, বরং জোর পূর্বক তাঁর কাম বাসনা চরিতার্থ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি দুর্বল ছিলেন বলে আমি তাঁর উপর বিজয় লাভ করলাম এবং তিনি পরাজিত হলেন। আমি আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে একটা কাপড় চেয়ে নিলাম এবং তা গায়ে দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট গমন করলাম। আমার স্বামীর সাথে আমার যা কিছু ঘটেছিল তা আমি তাঁর সামনে নিঃসংকোচে বর্ণনা করলাম এবং তাঁর দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বলতে থাকলেনঃ "হে খুওয়াইলাহ্ (রঃ)! তোমার স্বামীর ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সে তো অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে।" আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের মধ্যে এসব কথাবার্তা চলতে আছে ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। শেষ হলে তিনি বলেনঃ "হে খুওয়াইলাহ (রাঃ)! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।" অতঃপর তিনি قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ

الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ হতে وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। তারপর তিনি আমাকে বলেনঃ "তোমার স্বামীকে বলো যে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে।" আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! গোলাম আযাদ করার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। তিনি বললেনঃ "তাহলে সে যেন একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখে।" আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! তিনি তো অতি বৃদ্ধ। দুই মাস রোযা রাখার শক্তি তাঁর নেই। "তাহলে সে যেন এক অসাক (প্রায় পাকি চার মণ) খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খেতে দেয়।" বললেন তিনি। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! এ পরিমাণ খেজুরও তাঁর কাছে নেই। তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, আমি অর্ধ অসাক খেজুর তাকে দিচ্ছি।" আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! ঠিক আছে, বাকী অর্ধেক আমি দিচ্ছি। তিনি বললেনঃ "বাঃ, বাঃ! খুবই ভাল কাজ করলে তুমি। যাও, এটা আদায় করগে। আর তোমার স্বামীর সাথে প্রেম-প্রীতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও আনুগত্য সহ জীবন কাটিয়ে দাও।" আমি বললামঃ আমি তাই করবো।[১]

কোন কোন রিওয়াইয়াতে মহিলাটির নাম খুওয়াইলাহ্ এর স্থলে খাওলাহ্ রয়েছে এবং বিনতু সা'লাবাহ্ এর স্থলে বিনতে মালিক ইবনে সা'লাবাহ্ আছে। এসব উক্তিতে এমন কোন মতপার্থক্য নেই যে, একে অপরের রিরোধ হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই সূরার প্রাথমিক এই আয়াতগুলোর সঠিক শানে নুযূল এটাই। হযরত সালমা ইবনে সাখ্র্ আনসারীর (রাঃ) ঘটনাটি যা এখনই আসছে, এ আয়াতগুলোতে আছে, এই হুকুমই সেখানেও দেয়া হয়েছে অর্থাৎ গোলাম আযাদ করা বা দুই মাস একাদিক্রমে রোযা রাখা অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খেতে দেয়া।

ঘটনাটি হযরত সালমা ইবনে সাখ্র্ আনসারী (রাঃ) নিজেই নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ

"অন্যদের তুলনায় আমার স্ত্রী-সহবাসের ক্ষমতা অধিক ছিল। রমযান মাসে দিনের বেলায় আমি নিজেকে হয় তো সহবাস হতে বিরত রাখতে পারবো না এই ভয়ে সারা রমযান মাসের জন্যে আমার স্ত্রীর সাথে আমি যিহার করে ফেলি।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

একদা রাত্রে আমার স্ত্রী আমার সেবায় লিপ্ত ছিল এমতাবস্থায় তার দেহের কোন এক অংশ হতে কাপড় সরে যায়। তখন আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়ি। সকাল হলে আমি আমার কওমের কাছে ফিরে আমার রাত্রির ঘটনাটি বর্ণনা করি এবং তাদেরকে বলিঃ তোমরা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট চল এবং তাঁকে আমার ঘটনাটি অবহিত কর।

তারা সবাই আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলো এবং বললোঃ "আমরা তোমার সাথে যাবো না। হতে পারে যে, এ ব্যাপারে কুরআন কারীমে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যাবে অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এমন কথা বলে দিবেন যার ফলে আমরা চিরদিনের জন্যে কলংকিত হবো। তুমি নিজেই যাও এবং দেখো, তোমার ব্যাপারে কি ঘটে।" আমি তখন বেরিয়ে পড়লাম এবং নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে গেলাম। অতঃপর তাঁকে আমি আমার খবর অবহিত করলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ "তুমি এ কাজ করেছো?" আমি উত্তরে বললামঃ জ্বী, হ্যাঁ, আমি এ কাজ করেছি। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি এ কাজ করেছো?" আমি জবাব দিলামঃ হ্যাঁ, জনাব! আমার দ্বারা এ কাজ হয়ে গেছে। আবার তিনি বললেনঃ "এ কাজ করেছো তুমি?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, হুযূর! সত্যিই আমি এ কাজ করে ফেলেছি। সুতরাং আমার উপর আপনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র হুকুম জারী করুন! আমি ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করবো। তখন তিনি বললেনঃ "তুমি একটি গোলাম আযাদ কর।" আমি তখন আমার গর্দানে হাত রেখে বললামঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি শুধু এরই (অর্থাৎ আমার গর্দানেরই) মালিক। এ ছাড়া আমি আর কিছুরই মালিক নই (অর্থাৎ আমার গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা নেই)। তিনি বললেনঃ "তাহলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখো।" আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! রোযার কারণেই তো আমার দ্বারা এ কাজ হয়ে গেছে (সুতরাং এটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। তিনি বললেনঃ "যাও, তাহলে সাদকা কর।" আমি বললামঃ আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে সাদকা করার মত কিছুই নেই। এমন কি আজ রাত্রে আমার পরিবারের সবাই ক্ষুধার্ত রয়েছে। তাদের রাত্রির খাবার পর্যন্ত নেই!

তিনি তখন আমাকে বললেনঃ "তুমি বানু রুযায়েক গোত্রের সাদকার মালিকদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বল যে, তারা যেন তাদের সাদকার মাল তোমাকেই দেয়। তুমি ওর মধ্য হতে এক অসাক খেজুর ষাটজন মিসকীনকে প্রদান করবে এবং বাকীগুলো তোমার নিজের ও পরিবারের কাজে ব্যয় করবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর একথা শুনে আমি খুশী মনে ফিরে আসলাম এবং আমার কওমের কাছে গিয়ে বললামঃ "তোমাদের কাছে আমি পেয়েছিলাম সংকীর্ণতা ও মন্দ অভিমত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে পেয়েছি আমি প্রশস্ততা ও বরকত। তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যেন তোমাদের সাদকার মাল আমাকেই প্রদান কর। তারা তখন আমাকে তা দিয়ে দিলো।"[১]

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, এটা হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত খুওয়াইলাহ্ বিনতে সা'লাবাহ্ (রাঃ)-এর ঘটনার পরবর্তী ঘটনা। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যিহারের প্রথম ঘটনা হচ্ছে হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ)-এর ঘটনাটি, যিনি হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিতের (রাঃ) ভাই ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল খাওলা বিনতে সা'লাবাহ্ ইবনে মালিক। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রাঃ)-এর এই ভয় ছিল হয়তো তালাক হয়ে গেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এসে বলেনঃ আমার স্বামী আমার সাথে যিহার করেছে। যদি আমরা পৃথক পৃথক হয়ে যাই তবে আমরা দু'জনই ধ্বংস হয়ে যাবো। আর কোন সন্তানের জন্মদান করার মত ক্ষমতা আমার নেই। দীর্ঘদিন ধরে আমি তাঁর সাথে সংসার করে আসছি।" এভাবে তিনি কথা বলছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন। এ পর্যন্ত ইসলামে যিহারের কোন হুকুম ছিল না। ঐ সময় قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ হতে لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ "গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা তোমার আছে কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্র কসম! এ ক্ষমতা আমার নেই।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তাঁর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তা দিয়ে তিনি গোলাম আযাদ করেন। আর এভাবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাড়াও আরো বহু গুরুজনও একথাই বলেছেন যে, এ আয়াতগুলো তাঁদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) সংক্ষিপ্তভাবে এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ظِهَارٌ শব্দটি ظَهْرٌ শব্দ হতে এসেছে। অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করার সময় বলতোঃ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ অর্থাৎ "তুমি আমার জন্যে আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ।" শরীয়তের হুকুম এই যে, এরূপভাবে যে কোন অঙ্গের নাম নিবে, তাতে যিহার হয়ে যাবে। জাহেলিয়াতের যুগে যিহারকে তালাক মনে করা হতো। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্যে এতে কাফ্ফারা নির্ধারণ করেছেন এবং এটাকে তালাক রূপে গণ্য করেননি, যেমন জাহেলিয়াতের যুগে এই প্রথা ছিল। পূর্বযুগীয় অধিকাংশ গুরুজন একথাই বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অজ্ঞতার যুগের এই প্রথার উল্লেখ করে বলেনঃ ইসলামে যখন হযরত খুওয়াইলাহ্ সম্পর্কীয় ঘটনাটি সংঘটিত হলো এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো তখন হযরত আউস (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) চিরুণী করছিলেন। তিনি ঘটনাটি শুনে বললেনঃ "আমাদের কাছে এর কোন নির্দেশ নেই।" ইতিমধ্যে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং তিনি হযরত খুওয়াইলাহ (রাঃ)-কে সুসংবাদ প্রদান করেন। যখন গোলাম আযাদ করার কথা উল্লেখ করা হয় তখন তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্র কসম! আমাদের কাছে কোন গোলাম নেই। আমার স্বামী গোলাম আযাদ করতে সক্ষম নন।" তারপর একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্র কসম! আমার স্বামী যদি দিনে তিনবার করে পানি পান না করেন তবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।" এরপর যখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'এতেও যে অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে।' তখন হযরত খুওয়াইলাহ (রাঃ) বলেনঃ "কয়েক গ্রাস খাদ্য খেয়েই তো আমাদেরকে সারা দিন কাটিয়ে দিতে হয়, অন্যদেরকে খাওয়ানো তো বহু দূরের কথা!" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) অর্ধ অসাক ত্রিশ সা' (খাদ্য) আনিয়ে নিয়ে তাঁকে দিলেন এবং তাঁর স্বামীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন।[১]

আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, খাওলা বিনতে দালীজ (রাঃ) একজন আনসারীর স্ত্রী ছিলেন, যিনি চোখে কম দেখতেন। তিনি ছিলেন খুব দরিদ্র এবং তাঁর চরিত্রও খুব ভাল ছিল না। একদিন কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায় এবং জাহেলিয়াত যুগের প্রথা ও রীতি অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীর সাথে যিহার

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ খুবই সবল ও উত্তম। কিন্তু বর্ণনার ধারা গারাবত মুক্ত নয়।

করে নেন। অজ্ঞতা যুগের এটাই ছিল তালাক। স্ত্রী হযরত খাওলা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হন। ঐ সময় তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর মস্তক ধৌত করছিলেন। হযরত খাওলা (রাঃ) তাঁর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "এখন আর কি হতে পারে? আমার জানা মতে তুমি তার উপর হারাম হয়ে গেছো।" তাঁর একথা শুনে হযরত খাওলা (রাঃ) বললেনঃ "আমি আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছি।" হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মস্তক মুবারকের এক দিক ধুয়ে দিয়ে ঘুরে অন্য দিকে গেলেন এবং ওদিকের অংশ ধুতে লাগলেন। তখন হযরত খাওলাও (রাঃ) ঘুরে গিয়ে ওদিকে বসে পড়েন এবং স্বীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) পুনরায় ঐ জবাবই দেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেহারা মুবারকের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন তিনি হযরত খাওলা (রাঃ)-কে বললেনঃ "তুমি একটু সরে বসো।" তিনি সরে গেলেন। ইতিমধ্যে অহী নাযিল হতে শুরু হয়। অহী নাযিল হওয়া শেষ হলে তিনি প্রশ্ন করেনঃ "মহিলাটি কোথায়?" হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে ডাকিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো।" তিনি কাঁদতে কাঁদতে গেলেন এবং স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলেন। স্বামী সম্পর্কে যে মন্তব্য তিনি করেছিলেন যে, তিনি কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, দরিদ্র এবং দুশ্চরিত্র, নবী (সঃ) তাঁকে সেরূপই পেলেন। তখন তিনি পাঠ করলেনঃ

أَسْتَعِيذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا .... وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ـ

অতঃপর মহিলাটির স্বামীকে বললেনঃ "তুমি স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে গোলাম আযাদ করতে পার কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "না।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "তাহলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখতে কি তুমি সক্ষম হবে?" জবাবে তিনি বললেনঃ "যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি দিনে দুইবার বা তিনবার না খেলে আমার চক্ষু নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হবে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রশ্ন করলেনঃ "তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি?"

তিনি জবাব দিলেনঃ "না, তবে যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন (তাহলে পারবো)।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে সাহায্য করলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ায়ে দাও।" আল্লাহ্ তা'আলা জাহেলিয়াত যুগের প্রথা, তালাককে উঠিয়ে দিয়ে এটাকে যিহাররূপে নির্ধারণ করলেন।[১]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, 'ঈলা' ও যিহার জাহেলিয়াতের যুগের তালাক ছিল। আল্লাহ তা'আলা ঈলায় তো চার মাস সময় নির্ধারণ করেন এবং যিহারে নির্ধারণ করেন কাফ্ফারা।

হযরত ইমাম মালিক (রঃ) مِنْكُمْ শব্দ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেন যে, এখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং কাফিররা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। জমহূরের মাযহাব এর বিপরীত। তাঁরা مِنْكُمْ শব্দের এই জবাব দেন যে, প্রাধান্য হিসাবে এটা বলা হয়েছে। সুতরাং قَيْد হিসেবে مَفْهُوْم مُخَالِف উদ্দেশ্য হতে পারে না। জমহূর مِنْ نِّسَآئِهِمْ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দাসীর সাথে যিহার হয় না এবং দাসী এই خِطَاب বা সম্বোধনের মধ্যে দাখিলও নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ

مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ -

(তাদের পত্নীগণ তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَيَّ كَاُمِّيْ বা مِثْلُ اُمِّيْ অথবা كَظَهْرِ اُمِّيْ কিংবা এগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত কথা বলার দ্বারা স্ত্রী কখনো তার মা হতে পারে না। বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা। তারা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। তিনি জাহেলিয়াত যুগের এই সংকীর্ণতাকে তোমাদের হতে দূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ কথা যা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটাও তিনি ক্ষমা করে দেন। যেমন সুনানে আবি দাঊদে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) শুনতে পান যে, একটি লোক তার স্ত্রীকে বলছেঃ "হে আমার বোন!" তখন তিনি লোকটিকে বলেনঃ "এটা কি তোমার বোন?" অর্থাৎ তার এ উক্তিকে তিনি অপছন্দ করেন এবং তাকে বাধা দেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীকে তিনি তার জন্যে হারাম করে দিলেন না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তার এটা উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল মাত্র।

---

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্যথায় অবশ্যই ঐ স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যেতো। কেননা, সঠিক উক্তি এটাই যে, নিজের স্ত্রীকে যে ব্যক্তি তাদের নামে স্মরণ করে যারা চিরস্থায়ীভাবে মুহার্‌রামাত (যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে অবৈধ) যেমন ভগ্নী, ফুফু, খালা ইত্যাদি, তবে এরাও মাতার হুকুমের পর্যায়ে পড়ে যাবে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে নিজেদের উক্তি হতে ফিরে আসে।" এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যিহার করলো, অতঃপর এই শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করলো। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর উক্তি মতে এর ভাবার্থ হলোঃ যিহার করলো, তারপর ঐ স্ত্রীকে আটক করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত এমন এক যামানা অতিবাহিত হলো যে, ইচ্ছা করলে নিয়মিতভাবে তাকে তালাক দিতে পারতো, কিন্তু তালাক দিলো না।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ আবার ফিরে আসলো সহবাসের দিকে অথবা সহবাসের ইচ্ছা করলো। এটা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায় করে।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ সহবাস করার ইচ্ছা করলো বা তার সাথে জীবন যাপন করার দৃঢ় সংকল্প করলো।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, উদ্দেশ্য হলো যিহারের দিকে ফিরে আসা, এর হুরমত ও জাহেলিয়াত যুগের হুকুম উঠে যাওয়ার পর। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি যিহার করবে তার উপর তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে যে পর্যন্ত না সে কাফ্ফারা আদায় করে।

হযরত সাঈদ (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ যে বিষয়কে সে নিজের জীবনের উপর হারাম করে নিয়েছিল সেটা আবার সে বৈধ করতে চায় সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে তবে কোন দোষ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এখানে مَسٌّ দ্বারা সহবাস করাকে বুঝানো হয়েছে।

যুহ্রী (রঃ) বলেন যে, কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে হাত লাগানো, ভালবাসা দেখানো ইত্যাদিও জায়েয নয়।

আহ্‌লুস সুনান হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক বলেঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাসও করে ফেলেছি (এখন উপায় কি?)।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি এটা কেন করেছো?" উত্তরে সে বলেঃ "চাঁদনী রাতে তার পাঁয়জোর (পায়ের অলংকার) আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।" তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বলেনঃ "এখন হতে আর তার নিকটবর্তী হয়ো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্‌ফারা আদায় কর।"[১]

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ যিহারের কাফ্‌ফারার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, একটি দাস মুক্ত করতে হবে। দাসকে যে মুমিন হতে হবে এ শর্ত এখানে আরোপ করা হয়নি, যেমন হত্যার কাফ্‌ফারায় দাসের মুমিন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তো বলেন যে, এই অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর স্থাপন করা হবে। অর্থাৎ হত্যার কাফ্‌ফারার ব্যাপারে যেমন মুমিন গোলাম আযাদ করার হুকুম রয়েছে, তেমনই এই যিহারের কাফ্‌ফারার ব্যাপারেও ঐ হুকুমই থাকবে। এর দলীল এই হাদীসটিও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি কালো রঙ এর দাসী সম্পর্কে বলেনঃ "একেই আযাদ বা মুক্ত করে দাও, কেননা, এটা মুমিনা দাসী।"

উপরে বর্ণিত ঘটনায় জানা গেছে যে, যিহার করে কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বেই স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) দ্বিগুণ কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশ দেননি।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হলো, অর্থাৎ তোমাদের ধমকানো হচ্ছে। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমাদের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ গোলাম আযাদ করার যার সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। যে এতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে।

১. ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটাকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) এটা মুরসাল হওয়াকেই সঠিক বলেছেন।

পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে জানা যাচ্ছে যে, আদিষ্ট প্রথম সুরতটি (গোলাম আযাদ করা) হলো অগ্রগণ্য, তারপর দ্বিতীয়টি (একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখা) এবং এরপর তৃতীয়টি (ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো)। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের এ হাদীসটিতেও রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) রমযান মাসে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন, এই আহ্কাম আমি এ জন্যেই নির্ধারণ করেছি যে, যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে (সঃ) বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। সাবধান! তোমরা তাঁর বিধানের উল্টো কাজ করো না, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না ।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ যারা কাফির হবে অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করবে না, আমার আদেশ মান্য করবে না, শরীয়তের আহকামের অমর্যাদা ও অসম্মান করবে এবং ওর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাবে, তারা আমার শাস্তি হতে বেঁচে যাবে এ ধারণা তোমরা কখনো পোষণ করো না। জেনে রেখো যে, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫-إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

৫। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; কাফিরদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৬- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○ ع

৬। সেই দিন, যেদিন তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তারা করতো; আল্লাহ্ ওর হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَا
يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ
وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا
كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيْمٌ ○

৭। তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন; তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক; তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন। তারা যা করে; তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শরীয়তের আহকাম হতে বিমুখ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে যেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এভাবেই সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছি, যাদের অন্তরে ঔদ্ধত্যপনা রয়েছে তারা ছাড়া কেউই এগুলো অস্বীকার করতে পারে না। আর যারা এগুলো অস্বীকার করে তারা কাফির এবং এসব কাফিরের জন্যে এখানে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং এরপর পরকালেও তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। এখানে তাদেরকে তাদের অহংকার আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়া হতে বিরত রাখছে, এর প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে পরকালে সীমাহীনভাবে অপদস্থ করা হবে। যেদিন তারা হবে চরমভাবে পদদলিত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন এবং তারা দুনিয়ায় ভালমন্দ যা করতো তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। যদিও তারা বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ ওর হিসাব রেখেছেন। তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলী ওগুলো লিখে রেখেছেন। না আল্লাহ্ হতে কোন কিছু গোপন থাকে এবং না তিনি কোন কিছু ভুলে যান।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা যেখানেই থাকো এবং যে অবস্থাতেই থকো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কথাই শুনেন এবং তোমাদের সব অবস্থাই দেখেন। তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকে না। তাঁর জ্ঞান সারা দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রত্যেক কাল ও স্থানের খবর তাঁর কাছে সব সময়ই রয়েছে। আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টির খবর তিনি রাখেন। তিনজন লোক মিলিত হয়ে পরস্পর অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরামর্শ করলেও তিনি চতুর্থজন হিসাবে তা শুনে থাকেন। সুতরাং তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, তারা তিনজন আছে, বরং আল্লাহ্ তা'আলাকে চতুর্থজন হিসেবে গণ্য করা উচিত। অনুরূপভাবে পাঁচজন লোক পরস্পর গোপন পরামর্শ করলে ষষ্ঠজন আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন। তাদের এ ঈমান থাকতে হবে যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের সাথে আল্লাহ্ রয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং তাদের কথা শুনছেন। আবার এর সাথে সাথে তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলীও লিখতে রয়েছেন যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ

অর্থাৎ "তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপনীয় কথা ও গোপন পরামর্শের খবর অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ অদৃশ্যের খবর খুব ভাল জানেন?"(৯ঃ ৭৮)

আর এক জায়গায় আছেঃ

أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনি না? অথচ আমার প্রেরিত (ফেরেশ্তা) গণ তাদের নিকট লিখতে রয়েছে!"(৪৩ঃ ৮০)

অধিকাংশ গুরুজন এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَعِيَّتِ عِلْمِي অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা সব জায়গাতেই

বিদ্যমান থাকা নয়, বরং তাঁর ইল্ম সব জায়গায়ই বিদ্যমান রয়েছে, এটাই উদ্দেশ্য। তিনজনের সমাবেশে চতুর্থটি হবে তাঁর ইল্ম। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সত্তা সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর ইল্ম সব জায়গায় বিদ্যমান থাকাই উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, তাঁর শোনা এবং দেখাও এভাবেই তাঁর ইল্মের সাথে রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত মাখলূকের কার্যাবলী সম্যক অবগত। তাদের কোন কাজই তাঁর নিকট গোপনীয় নয়। সুতরাং তারা যা কিছু করছে, তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতকে ইল্ম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইল্ম দ্বারাই শেষ করেছেন।

٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ○

৮। তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্যে কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি তার জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, যেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

৯- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰىؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۞

৯। হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো, এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট সমবেত হবে তোমরা।

১০- اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞

১০। শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সমান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মুমিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা ছিল ইয়াহূদী। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) ও ইয়াহূদীদের মাঝে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন ইয়াহূদীরা এই কাজ করতে শুরু করে যে, যেখানেই তারা কোন মুসলমানকে দেখতো এবং যেখানেই কোন মুসলমান তাদের কাছে যেতো তখন তারা এদিকে-ওদিকে একত্রিত হয়ে চুপে-চুপে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে কানাকানি করতো যে, যে মুসলমান একাকী তাদের কাছে থাকতো সে ধারণা করতো যে, তারা তাকে হত্যা করারই চক্রান্ত করছে। তার আরো ধারণা হতো যে, তারা তার বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন সড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং সে তাদের কাছে যেতেও ভয় করতো। যখন সাধারণভাবে এসব অভিযোগ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কানে পৌঁছতে লাগলো তখন তিনি তাদেরকে এই ঘৃণ্য কাজে বাধা দিলেন এবং চরমভাবে নিষেধ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা আবার এ কাজে লেগে পড়লো।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর দাদা) বলেনঃ "আমরা রাত্রে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিতমতে হাযির হতাম, উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রে তাঁর কোন কাজের প্রয়োজন হলে আমরা তা করে দিবো। একদা রাত্রে যাদের পালা ছিল তারা এসে গেল এবং আরো কিছু লোক সওয়াবের নিয়তে এসে পড়লো। লোক খুব বেশী একত্রিত হওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে বসে পড়লাম। প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এসে পড়লেন। তিনি বললেনঃ "তোমরা কি গোপন পরামর্শ করছো? আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে নিষেধ করিনি?" উত্তরে আমরা বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করছি। আমরা মাসীহ্ দাজ্জালের আলোচনা করছিলাম। কেননা, তার ব্যাপারে আমাদের মনে খট্কা লাগছে। তিনি একথা শুনে বললেনঃ "আমি তোমাদের উপর তার চেয়েও যে বিষয়ে বেশী ভয় করি তার খবর কি তোমাদেরকে দিবো না?" আমরা বললামঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে আপনি ঐ খবর দিন! তিনি বললেনঃ "তা হলো গোপন শির্ক। তা এই ভাবে যে, একটি লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং লোকদেরকে দেখাবার জন্যে কোন (ইবাদতের) কাজ করলো।"[১]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্যে কানাকানি করে। অর্থাৎ তারা হয়তো পাপের কাজের উপর কানাকানি করে যাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়, কিংবা হয়তো যুলুমের কাজে কানাকানি করে যাতে তারা অন্যদের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে, অথবা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের উপর কানাকানি করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে একে অপরকে পাকিয়ে তোলে।

আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পাপী ও বদ লোকদের আর একটি জঘন্য আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সালামের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। তারা রাসূল (সঃ)-কে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তাঁকে অভিবাদন করেননি।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ গারীব এবং এতে কোন কোন বর্ণনাকারী দুর্বল রয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কয়েকজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ অর্থাৎ "হে আবুল কাসেম (সঃ)! তোমার মৃত্যু হোক (তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক!)" তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রতি উত্তরে বলেনঃ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ অর্থাৎ "তোমাদের মৃত্যু হোক।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ বচন ও কঠোর উক্তিকে অপছন্দ করেন।" হযরত আয়েশা (রাঃ)! তখন বলেনঃ "আপনি কি শুনেননি যে, তারা আপনাকে اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলেছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তুমি কি শুননি যে, আমি তাদেরকে وَعَلَيْكُمْ বলেছি?" তখন আল্লাহ্ তা'আলা ... وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[১]

সহীহ্ এর মধ্যে অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেনঃ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّعْنَةُ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছিলেনঃ "তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবূল হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ কবূল হয়নি।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াহূদী এসে তাঁদেরকে সালাম করলো। তাঁরা তার সালামের উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "সে কি বললো তা কি তোমরা জান?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! সে তো সালাম করলো।" তিনি বললেনঃ "বরং সে سَامٌ عَلَيْكُمْ বলেছে। অর্থাৎ 'তোমাদের ধর্ম মিটে যাক' বা 'তোমাদের ধর্মের পরাজয় ঘটুক।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "তাকে ডেকে আনো।" তখন সহাবীগণ (রাঃ) তাকে ডেকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "তুমি কি سَامٌ عَلَيْكُمْ বলেছো?" সে উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদেরকে বললেনঃ "যদি আহ্লে কিতাবদের কেউ তোমাদেরকে সালাম দেয় তবে তোমরা বলবেঃ عَلَيْكَ অর্থাৎ 'তোমার উপরও ওটাই যা তুমি বললে'।"[২]

---

১. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ গ্রন্থেও এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ঐ লোকগুলো নিজেদের কৃতকর্মের উপর খুশী হয়ে মনে মনে বলতোঃ 'যদি ইনি সত্যি আল্লাহ্র নবী হতেন তবে আমাদের এই চক্রান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দুনিয়াতেই আমাদেরকে শাস্তি দিতেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।'

তাই আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের জন্যে পরকালের শাস্তিই যথেষ্ট, যেখানে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের শানে নুযূল হলো ইয়াহূদের এই ভাবে সালাম দেয়ার পদ্ধতি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকরা এভাবেই সালাম দিতো।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেনঃ হে মুমিনগণ ! তোমরা এই মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের মত কাজ করো না। তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করবে। তোমাদের সদা-সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে চলা উচিত যাঁর কাছে তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে হবে, যিনি ঐ সময় তোমাদেরকে প্রত্যেক পুণ্য ও পাপের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আর তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। তোমরা যদিও ভুলে গেছো, কিন্তু তাঁর কাছে সবই রক্ষিত ও বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত সাফওয়ান (রঃ) বলেনঃ "আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর হাত ধারণ করেছিলাম এমন সময় একটি লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ "কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুমিনদের কানাকানি হবে এ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হতে কি শুনেছেন?" হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনকে নিজের কাছে ডেকে নিবেন এবং তাকে তাঁর এমনই কাছে করবেন যে, স্বীয় হস্ত তার উপর রেখে দিবেন এবং লোকদের হতে তাকে পর্দা করবেন। অতঃপর তাঁকে গুনাহ্সমূহ স্বীকার করিয়ে নিবেন। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ "তোমার অমুক অমুক পাপ কর্মের কথা মনে আছে কি?" এভাবে তিনি তাকে প্রশ্ন করতে থাকবেন এবং সে স্বীকার করতে থাকবে। আর সে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে মহান আল্লাহ্

তাকে বলবেনঃ "দেখো, দুনিয়ায় আমি তোমার এসব গুনাহ্ ঢেকে রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।" অতঃপর তাকে তার পুণ্যসমূহের আমলনামা প্রদান করা হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ ঘোষণা করবেঃ 'এরা হলো ঐ সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যা আরোপ করতো, জেনে রেখো যে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত'।"[১]

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান বা অন্য কেউ তাদের সমান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মুমিনরা যদি এরূপ কোন কার্যকলাপের আভাস পায় তবে তারা যেন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করে ও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ্ শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

যে কানাকানির কারণে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট হয় এবং সে তা অপছন্দ করে এরূপ কানাকানি হতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন একজনকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে, কেননা এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হয়।"[২]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন তৃতীয় জনের অনুমতি ছাড়া তাকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে। কেননা, এতে সে মনে দুঃখ ও ব্যথা পায়।"[৩]

১১। হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে

١١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থে কাতাদাহ্ (রঃ)-এর হাদীস হতে এটা তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) আ'মাশ (রঃ)-এর হাদীস হতে এটা তাখরীজ করেছেন।

৩. এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে মজলিসে বসার আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ যখন তোমরা কোন মজলিসে একত্রিত হবে এবং তোমরা বসে যাওয়ার পর কেউ এসে পড়বে তখন তাঁর বসার জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা একটু একটু করে সরে সরে বসবে এবং এই ভাবে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে দিবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। কেননা প্রত্যেক আমলের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। যেমন সহীহ্ হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে মসজিদ বানিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তাঁর জন্যে জান্নাতে ঘর বানিয়ে দিবেন।" অন্য হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি কোন লোকের কাঠিন্য সহজ করবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার (বিপদ-আপদের) কাঠিন্য সহজ করে দিবেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যে পর্যন্ত বান্দা তার (মুসলমান) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।" এই ধরনের আরো বহু হাদীস রয়েছে।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি যিকরের মজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন, ওয়ায্ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কিছু উপদেশ বাণী প্রদান করছেন এবং জনগণ বসে শুনছেন। এমন সময় কেউ একজন এসে পড়লেন। কিন্তু কেউই নিজ জায়গা হতে একটু সরছেন না যে ঐ লোকটি বসতে পারেন। তখন আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করে নির্দেশ দিলেনঃ তোমরা একটু একটু করে সরে গিয়ে স্থান প্রশস্ত করে দাও, যাতে পরে আগমনকারীর বসার জায়গা হয়ে যায়।

হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, জুমআর দিন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি সংকীর্ণ জায়গায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জায়গা কম ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যেসব মুহাজির ও আনসার বদরের যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। ঐ দিন ঘটনাক্রমে কয়েকজন বদরী সাহাবী (রাঃ) কিছু বিলম্বে আগমন করেন। তাঁরা এসে নবী (সঃ)-এর নিকট দাঁড়িয়ে যান। তাঁকে তাঁরা সালাম করেন এবং তিনিও উত্তর দেন। মজলিসের লোকদেরকেও তাঁরা সালাম জানান এবং তাঁরাও জবাব দেন। অতঃপর ঐ বদরী সহাবীগণ (রাঃ) এই আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন যে, মজলিসে তাঁদের জন্যে একটু জায়গা করে দিলে তাঁরা বসে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদের এ অবস্থা লক্ষ্য করে আর থামতে পারলেন না, নাম ধরে ধরে তিনি কতক লোককে দাঁড়াতে বললেন এবং ঐ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সহাবীদেরকে ঐ সব জায়গায় বসার নির্দেশ দিলেন। এতে যাঁদেরকে উঠিয়ে দেয়া হলো তাঁরা মনে কিছু ব্যথা পেলেন এবং তাঁদের কাছে এটা কিছু কঠিন ঠেকলো। মুনাফিকরা এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলো। তাঁরা বলতে শুরু করলোঃ "দেখো, তিনি ন্যায় বিচার করার দাবীদার, অথচ যারা তাঁর উপদেশবাণী শুনবার আগ্রহে পূর্বেই এসে তাঁর পার্শ্বে জায়গা নিয়েছিল তাদেরকে তিনি উঠিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় বসিয়ে দিলেন এমন লোকদেরকে, যারা পরে এসেছে। এর চেয়ে অবিচার মূলক আচরণ আর কি হতে পারে?" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করুন যে তাঁর ভাইয়ের জন্যে মজলিসে জায়গা করে দেয়।" তাঁর এ প্রার্থনা শোনা মাত্রই সাহাবীগণ তাড়াতাড়ি খুশীমনে নিজ নিজ জায়গা হতে সরতে লাগলেন এবং তাঁদের ভাইয়ের জন্যে জায়গা করে দিলেন। অতঃপর জুমআর দিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন মানুষ যেন কোন মানুষকে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় না বসে, বরং তোমরা মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও।"[২]

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) নাফে' (রঃ) হতে এটা সহীহাইনে তাখরীজ করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "জুমআর দিন তোমাদের কেউ যেন তাঁর ভাইকে তাঁর জায়গা হতে উঠিয়ে না দেয়, বরং যেন বলেঃ 'জায়গা করে দাও'।"[১]

কোন আগন্তুকের জন্যে দাঁড়ানো জায়েয কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এতে অনুমতি দেন না এবং দলীল হিসেবে নিম্নের হাদীসটি পেশ করে থাকেনঃ "যে ব্যক্তি চায় যে, লোকেরা তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তাঁর স্থান বানিয়ে নেয়।"

কেউ কেউ আবার এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কেউ সফর হতে আসলে তাঁর জন্যে এবং কোন হাকিমের জন্যে তাঁর হুকুমতের জায়গায় দাঁড়ানো জায়েয। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেছিলেনঃ "তোমরা তোমাদের নেতার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও।" এটা তাঁর তা'যীমের জন্যে ছিল না, বরং তাঁর ফায়সালা জারী করিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। হ্যাঁ, তবে এটাকে অভ্যাস করে নেয়া যে, মজলিসে যখনই কোন বড়লোক এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আসবে তার জন্যেই মানুষ উঠে দাঁড়াবে, এটা আজমীদের রীতি-নীতি। সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, সাহাবীদের (রঃ) নিকট আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত আর কোন লোকই ছিলেন না। তথাপি তাঁকে দেখে তাঁরা দাঁড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। সুনানের অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এসেই মজলিসের শেষ প্রান্তে বসে পড়তেন এবং যেখানেই তিনি বসতেন সেটাই হয়ে যেতো সভাপতির স্থান। আর সাহাবীগণ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী বসে যেতেন। প্রায়ই হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ডান দিকে বসতেন এবং হযরত উমার (রাঃ) বাম দিকে বসতেন। সাধারণতঃ হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সামনের দিকে বসতেন। কেননা, তাঁরা দু'জন ছিলেন অহীর লেখক। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদেরকে যা বলতেন তাঁরা তা লিখে নিতেন।

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি তারা যেন আমার কাছাকাছি বসে। তারপর যেন মর্যাদা অনুযায়ী সবাই ক্রমান্বয়ে বসতে থাকে।" এই ব্যবস্থা রাখার কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যা কিছু বলেন তা যেন এই জ্ঞানী লোকেরা ভালভাবে

১. এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

শুনেন ও বুঝেন। সুফ্ফা যুক্ত মজলিসের বর্ণনা কিছু পূর্বেই গত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) অন্যান্য লোকদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাঁদের স্থানে বদরী সহাবীদেরকে বসিয়ে দেন। যদিও এর সাথে অন্য কারণও ছিল। যেমন ঐ লোকদের নিজেদেরই উচিত ছিল ঐ মর্যাদাবান সহাবীদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং নিজেরা সরে গিয়ে তাঁদের জায়গা করে দেয়া। কিন্তু যখন তাঁরা নিজেরা তা করলেন না তখন হুকুমের মাধ্যমে তাঁদের দ্বারা তা করিয়ে নেয়া হলো। অনুরূপভাবে প্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বহু কথা ও উপদেশ বাণী শুনেছেন। তারপর এই মর্যাদা সম্পন্ন লোকগণ আসলেন। তখন তিনি চাইলেন যে, তাঁরাও যেন আরামের সাথে বসে গিয়ে তাঁর উপদেশপূর্ণ কথা শোনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে এই উম্মতকে এই শিক্ষা দেয়াও উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা যেন তাঁদের বড়দেরকে ইমামের পার্শ্বে বসার সুযোগ দেন এবং তাঁদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নামাযের সফ বা সারি ঠিক করার সময় নিজেই আমাদের কাঁধ ধরে ধরে ঠিক করতেন এবং মুখেও বলতেনঃ 'সোজাভাবে দাঁড়াও, বক্রভাবে দাঁড় হয়ো না। জ্ঞানী ও বিবেকবানরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে। তারপর মর্যাদা অনুপাতে ক্রমান্বয়ে দাঁড়াবে'।" এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই হুকুম সত্ত্বেও তোমরা এখনো লাইন বা সারিকে বক্রই করছো!"[১] এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, নামাযের জন্যে যখন এই হুকুম ছিল তখন নামায ছাড়া অন্য সময়ে তো এই হুকুমের গুরুত্ব আরো বেশী থাকার কথা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা লাইনগুলো ঠিক রেখো, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রেখো, সারিগুলোর মাঝে জায়গা ফাঁকা রেখো না, লাইনে নিজের (মুসল্লী) ভাইদের কাছে কোমল হয়ে যাও, সারিতে শয়তানের জন্যে ছিদ্র ছেড়ে রেখো না। যে ব্যক্তি লাইন বা সারি মিলিয়ে রাখে তাকে আল্লাহ্ মিলিয়ে রাখেন এবং যে ব্যক্তি লাইন কেটে দেয়, আল্লাহ্ও তাকে কেটে দেন।"[২]

১. ইমাম আহমাদ (রঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবি দাঊদ, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইবনে মাজাহ্তেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এজন্যেই সায়্যিদুল কুররা (কারীদের নেতা) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) যখন নামাযে আসতেন তখন তিনি প্রথম সারিতে বা কাতারে যেতেন এবং সেখান হতে দুর্বল জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পিঁছনে সরিয়ে দিতেন এবং নিজে তার স্থানে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর ঐ হাদীসটিকেই তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে জ্ঞান অনুপাতে দাঁড়াবে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-কে দেখে কেউ উঠে দাঁড়ালে তিনি তার জায়গায় বসতেন না এবং ঐ হাদীসটি পেশ করতেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যেন কাউকেও উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় না বসে।

এখানে নমুনা হিসেবে আমরা কতকগুলো মাসআলা এবং অল্প সংখ্যক হাদীস লিখে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জায়গা এখানে নেই এবং সেই সুযোগও নেই।

সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বসেছিলেন, এমন সময় তিনজন লোক আসলো। একজন তো মজলিসের মাঝে শূন্য জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লো এবং দ্বিতীয়জন মজলিসের শেষ প্রান্তে স্থান নিলো। আর তৃতীয়জন ফিরে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে তিন ব্যক্তির খবর দিবো না? এক ব্যক্তি তো আল্লাহ্র দিকে স্থান নিলো এবং আল্লাহ্ তাকে স্থান দিলেন। দ্বিতীয়জন আল্লাহ্ হতে লজ্জা করলো এবং আল্লাহ্ও তার হতে লজ্জা করলেন। আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং আল্লাহ্ও তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "কারো জন্যে বৈধ নয় যে, সে দুইজনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, তবে যদি তাদের দু'জনের অনুমতিক্রমে হয় তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে। অনুরূপভাবে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশও জিহাদের ব্যাপারেই দেয়া হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ যখন তোমাদেরকে কল্যাণ ও ভাল কাজের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ো।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছেঃ যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হয় তখন তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে যাবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আসতেন তখন প্রত্যেকেই চাইতেন যে, তিনিই সব শেষে যাবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কোন প্রয়োজন থাকলে তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু মানবতার খাতিরে তিনি কিছুই বলতেন না। তখন নির্দেশ দেয়া হয় যে, যখন ফিরে যেতে বলা হয় তখন যেন তারা ফিরে যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَاِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ـ

অর্থাৎ "যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে।"(২৪ঃ ২৮)

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ যখন তোমাদেরকে মজলিসে জায়গা করে দেয়ার কথা বলা হয় তখন জায়গা দেয়ায় এবং যখন উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় তখন উঠে যাওয়ায় তোমরা নিজেদের জন্যে মানহানিকর মনে করো না, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমাদের এ পুণ্যময় কাজ তিনি বিনষ্ট করবেন না। বরং এর বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আহ্কামের উপর বিনয়ের সাথে স্বীয় গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়, তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। ঈমানদার ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের অভ্যাস এটাই যে, তারা আল্লাহ্র হুকুমের সামনে তাদের গর্দান ঝুঁকিয়ে থাকে এবং এভাবে তারা উচ্চ মর্যাদা লাভের হকদার হয়ে যায়। মর্যাদার হকদার কারা এবং কারা এর হকদার নয় এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

হযরত আবূ তুফায়েল আমির ইবনে ওয়ায়েলাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসফান নামক স্থানে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত নাফে' ইবনে হারিস (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে মক্কা শরীফের আমেল নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "মক্কায় কাকে তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ইবনে ইবযী (রাঃ)-কে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি।" তখন হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "সে তো আমার আযাদকৃত গোলাম! সুতরাং কি করে তাকে মক্কাবাসীর উপর আমীর নিযুক্ত করে আসলে?" তিনি জবাবে বললেনঃ "হে

আমীরুল মুমিনীন! তিনি আল্লাহ্র কিতাবের পাঠক, ফারায়েযের আলেম এবং একজন ভাল বক্তা।" এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তুমি সত্য বলেছো। নবী (সঃ) বলেছেন– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এই কিতাবের কারণে এক কওমকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করবেন এবং অন্যদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের মর্যাদা কমিয়ে দিবেন'।"[১]

আলেমদের যে ফযীলতের কথা এই আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহে প্রকাশিত হয়েছে, এ সবগুলো আমি সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল ইলমের শারাহ্তে জমা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১২- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২। হে মুমিনগণ! তোমরা রাসূল (সঃ)-এর চুপি-চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদকা প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাতে অক্ষম হও (তবে এ জন্যে তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য করা হবে না, কেননা), আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ (ع ٢ ٢)

১৩। তোমরা কি চুপে-চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন; তখন তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত।

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে চুপি-চুপি কথা বলতে চাইবে তখন যেন কথা বলার পূর্বে তাঁর পথে সাদকা প্রদান করে, যাতে তাদের অন্তর পবিত্র হয় এবং তোমরা তাঁর নবী (সঃ)-এর সাথে পরামর্শ করার যোগ্য হতে পার। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ক্ষমা রয়েছে। অর্থাৎ তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ হুকুম শুধুমাত্র ধনীদের উপর প্রযোজ্য।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তোমরা কি চুপে-চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর এবং ভয় কর যে, এই নির্দেশ কত দিনের জন্যে রয়েছে? যাক, তোমরা যদি এই সাদকা প্রদানকে কষ্টকর ও অসুবিধাজনক মনে করে থাকো তবে তোমাদেরকে এজন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এখন আর তোমাদেরকে এ জন্যে সাদকা প্রদান করতে হবে না। এখন তোমরা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর।

কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে গোপন পরামর্শ করার পূর্বে সাদকা প্রদান করার গৌরব শুধুমাত্র হযরত আলী (রাঃ)-ই লাভ করেন। তারপর এ হুকুম উঠে যায়। এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদকা করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে চুপি-চুপি কথা বলেন। তিনি তাঁকে দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ "এই আয়াতের উপর না কেউ আমার পূর্বে আমল করেছে না পরে কেউ আমল করতে পেরেছে। আমার কাছে একটি মাত্র দীনার ছিল। আমি ওটাকে ভাঙ্গিয়ে দশ দিরহাম পাই। এ দিরহাম আমি আল্লাহ্র নামে কোন একজন মিসকীনকে দান করি। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর সাথে চুপে-চুপে কথা বলি। তারপর এ হুকুম উঠে যায়। সুতরাং আমার পূর্বেও কেউ এ আয়াতের উপর আমল করেনি এবং পরেও কেউ আমল করতে পারেনি।" অতঃপর তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "সাদকার পরিমাণ কি এক দীনার নির্ধারণ করা উচিত?" হযরত আলী (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "এটা তো খুব বেশী হয়ে যাবে।" তিনি বললেনঃ "তাহলে অর্ধ

দীনার?” তিনি জবাব দেনঃ “প্রত্যেকের এটাও আদায় করার ক্ষমতা নেই।” তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, তাহলে কত নির্ধারণ করতে হবে তুমিই বল?” তিনি বললেনঃ “এক যব বরাবর সোনা নির্ধারণ করা হোক।” তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) খুশী হয়ে বললেনঃ “বাঃ বাঃ! তুমি তো একজন সাধক ব্যক্তি।” হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “সুতরাং আমারই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের উপর (কাজ) সহজ ও হালকা করে দেন।”[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলমানরা বরাবরই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে চুপি-চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা করতো। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার পর এ হুকুম উঠে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে খুব বেশী বেশী প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পুনরায় এ হুকুম জারী করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর হালকা হয়ে যায়। কেননা, এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরীরও (রঃ) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) ও হযরত মুকাতিলও (রঃ) এ কথাই বলেন। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, শুধু দিনের কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এ হুকুম বাকী থাকে। হযরত আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের উপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্যেই এটা বাকী থাকে, অতঃপর এটা মানসূখ হয়ে যায়।

১৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্তও নয় এবং তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।

١٤- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে তিরমিযীতেও এটা বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

١٥- أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৫। আল্লাহ্ তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। তারা যা করে তা কত মন্দ!

١٦- إِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

১৬। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা আল্লাহ্র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٧- لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۖ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১৭। আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

١٨- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۖ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৮। যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহ্র নিকট সেই রূপ শপথ করবে যেই রূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী।

١٩- إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۖ أُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۖ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৯। শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা অন্তরে ইয়াহূদীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু প্রকৃত তারা এ ইয়াহূদীদেরও দলভুক্ত নয় এবং মুমিনদেরও দলভুক্ত নয়। তারা এদিকেরও নয়, ওদিকেরও নয়। তারা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা শপথ করে থাকে। মুমিনদের কাছে এসে তারা তাদের পক্ষেই কথা বলে। রাসূল (সঃ)-এর কাছে এসে কসম খেয়ে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং বলে যে, তারা নিশ্চিতরূপে মুসলমান। অথচ অন্তরে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে। তারা যে মিথ্যাবাদী এটা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করতে মোটেই দ্বিধা বোধ করে না। তাদের এই দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। এই প্রতারণার জন্যে তাদেরকে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। তারা তো তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। মুখে তারা ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। কসমের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের দুষ্কৃতিকে গোপন করে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর তারা কসমের দ্বারা নিজেদেরকে সত্যবাদী রূপে পেশ করে এবং তাদেরকে তাদের প্রশংসাকারী বানিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তারা তাদেরকে নিজেদের রঙে রঞ্জিত করে এবং এই ভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই মুনাফিকদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসবে না, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কখনই তাদেরকে সেখান হতে বের করা হবে না।

কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাদের সকলকেই এক ময়দানে একত্রিত করবেন, কাউকেও বাদ রাখবেন না তখন দুনিয়ায় যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যে, নিজেদের মিথ্যা কথাকে তারা শপথ করে সত্যরূপে দেখাতো, অনুরূপভাবে ঐ দিনও তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার উপর বড় বড় কসম খাবে এবং মনে করবে যে, সেখানেও বুঝি তাদের চালাকী ধরা পড়বে না। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে কি তাদের এই ফাঁকিবাজি ধরা না পড়ে থাকতে পারে? তিনি তো তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা এ দুনিয়াতেও মুমিনদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী (সঃ) তাঁর কোন এক কক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন এবং কিছু সাহাবায়ে কিরামও (রাঃ) তাঁর নিকট ছিলেন। ছায়াযুক্ত স্থান কম ছিল। কষ্ট করে তাঁরা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "দেখো, এখানে এখনই এমন একজন লোক আসবে যে শয়তানী দৃষ্টিতে তাকাবে। সে আসলে তোমরা কেউই তার সাথে কথা বলবে না।" অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন কয়বা চক্ষু বিশিষ্ট লোক আসলো। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেনঃ "তুমি এবং অমুক অমুক লোক আমাকে গালি দাও কেন?" একথা শুনেই লোকটি চলে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে কয়েকজনের নাম করেছিলেন তাদের সবাইকে সে ডেকে নিয়ে আসলো এবং সবাই শপথ করে করে বললো যে, তাদের কেউই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বেয়াদবী মূলক কথা বলেনি। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ঃ

فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ -

অর্থাৎ "তারা (আল্লাহ্র নিকট) সেই রূপ শপথ করবে যেই রূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, তাতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী।" এই একই অবস্থা আল্লাহ্র দরবারে মুশরিকদেরও হবে যে, তারা বলবেঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।" (৬ঃ ২৩)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং তাদের অন্তরকে নিজের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, ফলে তাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, তাদের উপর শয়তান প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তুমি জামাআতকে অপরিহার্য রূপে ধরে নাও। বাঘ ঐ বকরীকে খেয়ে ফেলে যে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।"[১]

হযরত সায়েব (রঃ) বলেন যে, এখানে জামাআত দ্বারা নামাযের জামাআতকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'তারা

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

শয়তানেরই দল' অর্থাৎ যাদের উপর শয়তান প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং এর ফলে তাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।'

২০। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

২০- إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ○

২১। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেনঃ আমি এবং আমার রাসূল (সঃ) অবশ্যই বিজয়ী হবো। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২১- كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

২২। তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়। যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তর আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট,

২২- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ

حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, হিদায়াত হতে দূরে সরে পড়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং শরীয়তের বিধানসমূহের আনুগত্য হতে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে চরম লাঞ্ছিত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে ও তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হতে হবে বঞ্চিত। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রাসূল (সঃ) অবশ্যই বিজয়ী হবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ـ يَوْمَ لَايَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ـ

অর্থাৎ "আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। যেদিন যালিমদের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।"(৪০ ঃ ৫১-৫২) আর এখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন— আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবো। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" অর্থাৎ ঐ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তাঁর শত্রুদের উপর জয়যুক্ত থাকবেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল যে, ইহজগতে ও পরজগতে পরিণাম হিসেবে বিজয় ও সাহায্যলাভ মুমিনদের অংশ।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে— হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। অর্থাৎ তারা কখনো এই বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসবে না। যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয় হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেনঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً -

অর্থাৎ "মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর।"(৩ঃ ২৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ -

অর্থাৎ "বল– তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার তোমরা আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"(৯ঃ ২৪)

হযরত সাঈদ ইবনে আবদিল আযীম (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ... এ আয়াতটি হযরত আবূ উবাইদাহ্ আমির ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি তাঁর (কাফির) পিতাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। হযরত উমার (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে যখন খিলাফতের জন্যে একটি দলকে নির্ধারণ করেন যে, তাঁরা মিলিতভাবে যাঁকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন করবেন, ঐ সময় তিনি হযরত আবূ উবাইদাহ্ সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "যদি আজ তিনি বেঁচে থাকতেন তবে তাঁকেই আমি খলীফা বানাতাম।" একথাও বলা হয়েছে যে, এক একজনের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ ছিল। যেমন হযরত আবূ উবাইদাহ্ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেছিলেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন, হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ) তাঁর ভ্রাতা

উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত উমার (রাঃ), হযরত হামযাহ্ (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উবাইদাহ্ ইবনে হারিস (রাঃ) নিজেদের নিকতম আত্মীয় উৎবাহ্, শায়বাহ্ এবং ওয়ালীদ ইবনে উৎবাহ্কে হত্যা করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এতে এঘটনাটি অন্তর্ভুক্ত যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বদরী বন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক যাতে মুসলমানদের অর্থিক সংকট দূর হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যুদ্ধাস্ত্রমমূহ সংগৃহীত হতে পারে। আর এর বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিবেন। তাছাড়া তারা তো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বটে।" কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! যে মুসলমানের যে আত্মীয় মুশরিক তাকে তারই হাতে সমর্পণ করে দিন এবং তাকে নির্দেশ দিন যে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখাতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশ্রিকদের প্রতি কোনই ভালবাসা নেই। আমার হাতে আমার অমুক আত্মীয়কে সমর্পণ করুন। হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে আকীলকে সঁপে দিন এবং অমুক সাহাবীর হাতে অমুক কাফিরকে সমর্পণ করুন!"

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যারা নিজেদের অন্তর আল্লাহ্র শত্রুদের ভালবাসা হতে শূন্য করে এবং নিজেদের মুশ্রিক আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা পরিত্যাগ করে তারা হলো পূর্ণ ঈমানদার। তাদের অন্তরে ঈমানের মূল গেড়ে বসেছে। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ঈমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা আল্লাহ্র জন্যে তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল বলে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাদেরকে এতো বেশী করে দিয়েছেন যে, তারাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তারাই আল্লাহ্র দল এবং আল্লাহ্র দলই হবে সফলকাম। এ দলটি শয়তানী দলটির সম্পূর্ণ বিপরীত।

হযরত আবূ হাযিম আ'রাজ (রঃ) হযরত যুহ্‌রী (রঃ)-এর নিকট লিখেনঃ "জেনে রাখুন যে, মাহাত্ম্য দুই প্রকার। প্রথম হলো ঐ মাহাত্ম্য যা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ওলীদের হাতে জারী করে থাকেন, যাঁরা সাধারণ লোকদের চোখে লাগেন না এবং যাঁদের সাধারণ কোন খ্যাতি থাকে না। যাঁদের বিশেষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এরূপে প্রকাশ করেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালবাসেন ঐ সব লোককে যারা হয় নামধাম শূন্য, আল্লাহ্‌ভীরু ও সৎকর্মশীল। যদি তারা অনুপস্থিত থাকে তবে তাদের সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না এবং উপস্থিত থাকলে তাদের কোন মর্যাদা দেয়া হয় না। তাদের অন্তর হলো হিদায়াতের প্রদীপ, যা প্রত্যেক কালো, অন্ধকার ফিৎনা হতে বের হয়ে থাকে। এরাই হলো আল্লাহ্‌র ঐ আউলিয়া যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'এরাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে'।"[১]

হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) দু'আ করতেনঃ "হে আল্লাহ্! কোন ফাসেক ও ফাজেরের কোন নিয়ামত ও অনুগ্রহ আমার উপর রাখবেন না। কেননা, আমি আমার উপর আপনার নাযিলকৃত অহীতে পাঠ করেছিঃ 'তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে'।"[২]

হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, পূর্বযুগীয় গুরুজনদের মতে এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাদশাহ্‌দের সাথে মেলামেশা করে।[৩]

সূরা ঃ মুজাদালাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২, এটা হযরত নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা আবূ আহমাদ আসকারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরা ঃ হাশ্‌র মাদানী

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২৪, রুকু' ঃ ৩)

اٰيَاتُهَا: ٢٤، رُكُوْعَاتُهَا: ٣

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, এটা হলো সূরায়ে বানিন্‌ নাযীর।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "এটা হলো সূরায়ে হাশ্‌র।" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি বানু নাযীর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সহীহ্ বুখারীর অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "এটা কি সূরায়ে বানী নাযীর।"

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দূর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ হতে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হতে আসলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করলো। তারা ধ্বংস করে ফেললো

٢- هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى

الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِى الْاَبْصَارِ ○

তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٣- وَلَوْلَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۤءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ○

৩। আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

٤- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاۤقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৪। এটা এই জন্যে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

٥- مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۤئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫। তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছো এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

আল্লাহ্ ত'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

অর্থাৎ "সপ্তম আকাশ ও পৃথিবী এবং ওগুলোর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। সব কিছুই তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করে কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ পাঠ বুঝতে পার না। (১৭ঃ ৪৪)

তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর সমুদয় হুকুম ও আদেশ দানের ব্যাপারে বিজ্ঞানময়। তিনি আহ্‌লে কিতাবের কাফিরদেরকে অর্থাৎ বানু নাযীরকে আবাসস্থল হতে বিতাড়িত করেছিলেন। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদীনার এই ইয়াহূদীদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু ঐ লোকগুলো এই চুক্তি ভঙ্গ করে দেয় যার কারণে তাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে তাদের উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান হতে বের করে দেন। তারা যে এখান হতে (মদীনা হতে) বের হবে এটা মুসলমানরা কল্পনাও করেনি। স্বয়ং ইয়াহূদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের সুদৃঢ় দূর্গ বিদ্যমান থাকা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র মার পড়লো তখন তাদের ঐ মযবূত দূর্গগুলো থেকেই গেল, হঠাৎ তাদের উপর এমনভাবে আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়লো যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে মদীনা হতে বের করে দিলেন। তাদের কেউ কেউ সিরিয়ার কৃষিভূমির দিকে চলে গেল এবং কেউ কেউ গেল খায়বারের দিকে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যেতে পারে। এ জন্যে তারা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিলো এবং যত কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলো তা নিয়ে গেল আর যা অবশিষ্ট থাকলো তা মুসলমানদের হাতে আসলো।

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, কিভাবে তাদের উপর অকস্মাৎ আল্লাহ্‌র আযাব এসে পড়লো এবং দুনিয়াতেও তারা ধ্বংস হয়ে গেল এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, কুরায়েশ কাফিররা ইবনে উবাই এবং তার আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক সঙ্গীদেরকে পত্র লিখলো। এ পত্রটি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বদর প্রান্তর হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই তাদের হস্তগত হয়। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ "তোমরা আমাদের সাথীকে (রাসূলুল্লাহ্‌কে সঃ)

তোমাদের ওখানে স্থান দিয়েছো। এখন তোমরা হয় তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে বের করে দাও, না হয় আমরাই তোমাদেরকে বের করে দিবো এবং আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করবো। অতঃপর তোমাদের সকল যোদ্ধা ও বীরপুরুষকে হত্যা করে ফেলবো এবং তোমাদের নারী ও কন্যাদেরকে দাসী বানিয়ে নিবো। আল্লাহ্‌র শপথ! এ কাজ আমরা অবশ্যই করবো। সুতরাং তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো!"

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর পরামর্শ করলো এবং গোপনীয়ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে বলেনঃ "আমি অবগত হয়েছি যে, কুরায়েশদের পত্র তোমাদের হস্তগত হয়েছে এবং পত্রের মর্মানুযায়ী তোমরা তোমাদের মৃত্যুর আসবাব-পত্র নিজেদেরই হাতে তৈরী করতে শুরু করেছো। তোমরা নিজেদের হাতে তোমাদের সন্তানদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছো। আমি আর একবার তোমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখে এই অসৎ সংকল্প হতে বিরত থাকো।"

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ উপদেশ তাদের উপর ক্রিয়াশীল হলো এবং তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। কিন্তু কুরায়েশরা বদরের যুদ্ধ হতে ফারেগ হয়ে আবার পত্র লিখলো এবং পূর্বের মতই হুমকি দিলো ও নিজেদের শক্তি, সংখ্যা ও দুর্ভেদ্য দূর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এর ফলে মদীনার ঐ লোকগুলো আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলো। বানূ নাযীর গোত্র এখন পরিষ্কারভাবে চুক্তি ভঙ্গের কথা ঘোষণা করলো। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলো যে, তিনি যেন ত্রিশজন লোকসহ তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের ত্রিশজন পণ্ডিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় দল এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে। যদি তাদের এ লোকগুলো তাঁকে সত্যবাদী রূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে তবে তারাও তাঁর সাথে রয়েছে।

তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পর দিন সকালে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেনঃ "তোমরা যদি আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের জন্যে কোন নিরাপত্তা নেই।" তারা তাঁর এ প্রস্তাব প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করলো

এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। সুতরাং সারা দিন ধরে যুদ্ধ চললো। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বানু নাযীরকে উক্ত অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়ে বানু কুরাইযার নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করলেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেখান হতে ফারেগ হয়ে পুনরায় বানু নাযীরের নিকট গমন করেন। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের মদীনা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ “তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাব-পত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও।” সুতরাং তারা ঘর-বাড়ীর আসবাব-পত্র এমন কি দরজা ও কাঠগুলোও উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে। তাদের খর্জুর-বৃক্ষগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্যে বিশিষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো তাঁকেই দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ ـ

অর্থাৎ “আল্লাহ্ তাদের (ইয়াহূদীদের) নিকট হতে তাঁর রাসূল (সঃ)-কে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি।” (৫৯ঃ ৬) কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন। আনসারদের মধ্যে শুধু দু'জন অভাবগ্রস্তকে অংশ দেন। এ ছাড়া সবই তিনি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। যা বাকী থাকে ওটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাদকা যা বানু ফাতেমার হাতে এসেছিল।

অবশ্যই আমরা সংক্ষেপে গায্ওয়ায়ে বানী নাযীরের ঘটনা বর্ণনা করবো এবং এজন্যে আল্লাহ্রই নিকট আমরা সহায্য প্রার্থনা করছি।

আসহাবে মাগাযী ওয়াস সিয়ার এ যুদ্ধের কারণ যা বর্ণনা করেছেন তা এই যে, মুশরিকরা প্রতারণা করে বি'রে মাঊনাহ্ নাক স্থানে সাহাবীদেরকে শহীদ করে দেয় যাঁরা সংখ্যায় সত্তরজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামারী (রাঃ) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন এবং মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমির গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আমির (রাঃ)-এর এ খবর জানা ছিল

না। মদীনায় পৌঁছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ "তুমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছো? তাহলে তো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বানু নাযীর ও বানু আমিরের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সন্ধি ছিল। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বানু নাযীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, রক্তপণের তারা কিছু আদায় করবে এবং তিনি কিছু আদায় করবেন আর এভাবে বানু আমীরকে সন্তুষ্ট করবেন। বানু নাযীর গোত্রের বস্তিটি মদীনার পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে বললোঃ "হে আবুল কাসিম (সঃ)! হ্যাঁ, আমরা এ জন্যে প্রস্তুত আছি। এখনই আমরা আমাদের অংশ মুতাবিক সম্পদসহ আপনার খিদমতে হাযির হচ্ছি।" অতঃপর তারা তাঁর নিকট হতে সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করলোঃ "এর চেয়ে বড় সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে? এখন তিনি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছেন। এসো তাঁকে আমরা শেষ করে (হত্যা করে) ফেলি।" তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, যে দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসে আছেন ঐ ঘরের উপর কেউ চড়ে যাবে এবং সেখান হতে সে তাঁর উপর একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। এতেই তাঁর জীবনলীলা শেষ হয়ে যাবে।

আমর ইবনে জাহ্হাশ ইবনে কা'ব এই কাজে নিযুক্ত হলো। অতঃপর কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে সে ছাদের উপর আরোহণ করলো। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে স্বীয় নবী (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন সেখান হতে চলে যান। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হতে উঠে চলে গেলেন, ফলে ঐ নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলো। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ। তিনি সেখান হতে সরাসরি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন না এবং মদীনাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন, তাঁরা তাঁর বিলম্ব দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু একটি লোকের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি মদীনায় পৌঁছে গেছেন। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সহাবীগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান এবং আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়েন। ইয়াহূদীরা মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেখে তাদের দূর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে অবরোধ করেন এবং তাদের আশে-পাশের খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন ইয়াহূদীরা চীৎকার করে বলতে লাগলো যে, এটা হচ্ছে কি? যিনি অন্যদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মন্দ বলেন তিনি এটা কি করতে শুরু করলেন? সুতরাং একদিকে তো তাদের এই খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলার দুঃখ এবং অপরদিকে সাহায্য আসার যে কথা ছিল সেদিক হতে নৈরাশ্য, এ দু'টো বিষয় তাদের কোমর একেবারে ভেঙ্গে দিলো।

সাহায্যের ঘটনাটি এই যে, বানু আউফ ইবনে খাযরাজের গোত্রটি যার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল, ওয়ালীআহ, মালিক ইবনে কূকিল, সুওয়ায়েদ, আ'মাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিল, তারা বানী নাযীর গোত্রকে বলে পাঠিয়েছিলঃ "তোমরা মুকাবিলায় স্থির ও অটল থাকো, দূর্গ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না এবং আত্মসমর্পণ করো না, আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছি। তোমাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তোমরা যুদ্ধের জন্যে বের হলে আমরাও বের হবো।" কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের ঐ ওয়াদা পূর্ণ হয়নি। তারা ইয়াহূদীদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেনি। এদিকে এই বানী নাযীর গোত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলো যে, তিনি যেন তাদের প্রাণ রক্ষা করেন। তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তারা তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু তাদের উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা যেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের ঘরের দরজাগুলো পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এগুলো সাথে নিয়ে যায় এবং ঘরগুলোও ভেঙ্গে ফেলে। এগুলো নিয়ে গিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে। তাদের অবশিষ্ট মালগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্যে খাস হয়ে যায় যে, তিনি ইচ্ছামত ওগুলো খরচ করতে পারেন। ওগুলো তিনি ঐ সব লোকের মধ্যে বন্টন করে দেন যাঁরা প্রথম দিকে হিজরত করেছিলেন। আনসারদের মাত্র দু'জন দরিদ্র লোককে তিনি কিছু অংশ দেন। তাঁরা হলেন হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ)

ও হযরত সাম্মাক ইবনে খারশাহ (রাঃ)। বানু নাযীর গোত্রের মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয় যাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই থেকে যায়। একজন হলো ইয়ামীন ইবনে অমর ইবনে কা'ব (রাঃ), যে আমর ইবনে জাহ্‌হাশের চাচাতো ভাই ছিল। যে ছিল ঐ আমর যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে পাথর দ্বারা হত্যা করার ঘৃণ্য সংকল্প করেছিল। দ্বিতীয়জন হলো সা'দ ইবনে অহাব (রাঃ)।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত ইয়ামীন (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে ইয়ামীন (রাঃ)! তোমার ঐ চাচাতো ভাইটিকে দেখো, সে আমার সাথে কি দুর্ব্যবহারই না করেছিল এবং আমার ক্ষতি সাধনের জন্যে কি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেই না লিপ্ত হয়েছিল!" তাঁর একথা শুনে হযরত ইয়ামীন (রাঃ) একটি লোকের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। সূরায়ে হাশ্‌র বানু নাযীরের এই ঘটনা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "হাশরের ভূমি হলো সিরিয়া দেশ। এ ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ থাকে তবে যেন সে هُوَ الَّذِىٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ -এ আয়াতটি পাঠ করে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন ঐ ইয়াহূদীদেরকে বলেনঃ "তোমরা এখান হতে বেরিয়ে যাও।" তখন তারা বলেঃ "আমরা কোথায় যাবো?" উত্তরে তিনি তাদেরকে বলেনঃ "হাশরের ভূমির দিকে।"

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন বানু নাযীরকে নির্বাসন দেন তখন বলেনঃ "এটা হলো প্রথম হাশ্‌র এবং আমি এর পিছনে পিছনে রয়েছি।"[১]

বানু নাযীরের ঐ দূর্গগুলোর অবরোধ মাত্র ছয়দিন পর্যন্ত ছিল। দূর্গাগুলোর দৃঢ়তা, ইয়াহূদীদের সংখ্যাধিক্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন চক্রান্ত ইত্যাদি দেখে অবরোধকারী মুসলমানদের এটা কল্পনাও ছিল না যে, তারা এতো তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। আর ইয়হূদীরাও গর্বিত ছিল যে, তাদের দূর্গগুলো সবদিক দিয়েই সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। সুতরাং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে অবশ্যই রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হতে আসলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত। আল্লাহ্ তা'আলার নীতি এটাই যে, চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের মধ্যেই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়ে। তাদের অন্তরে ত্রাসের

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সঞ্চার হয়। আর ত্রাসের সঞ্চার হবেই না বা কেন? তাদেরকে অররোধকারী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রভাব দান করা হয়েছিল। তাঁর নাম শুনে শত্রুদের অন্তর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে কেঁপে উঠতো। তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

ইয়াহূদীরা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘর-বাড়ীগুলো ধ্বংস্ করতে শুরু করে। ছাদের কাঠ ও ঘরের দরজাগুলো নিয়ে যাবার জন্যে ভেঙ্গে ফেলতে থাকে। মুমিনদের হাতেও ওগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! তোমরা এটা হতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ যদি ঐ ইয়াহূদীদের ভাগ্যে নির্বাসিন লিপিবদ্ধ না থাক্তো এবং আল্লাহ্ তাদের নির্বাসিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না থাকতেন তবে দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে আরো কঠিন শাস্তি দিতেন। তাদেরকে হত্যা করা হতো ও বন্দী করা হতো। অতঃপর তাদের জন্যে পরকালে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

বানু নাযীরের এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। উট বোঝাই করে যত মাল তারা নিয়ে যেতে পারতো তা নিয়ে যাবার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাবার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হয়নি। তারা ছিল ঐ গোত্রের লোক যাদেরকে ইতিপূর্বে কখনো নির্বাসন্ দেয়া হয়নি। হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ হতে وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ পর্যন্ত আয়াতগুলো বানী নাযীরের এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়।

جَلَاء শব্দের অর্থ 'হত্যা' এবং 'ধ্বংস'ও করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতি তিনজনকে একটি করে উট এবং একটি করে মশক দিয়েছিলেন। এই ফায়সালার পরেও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত মাসলামা (রাঃ)-কে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন যে, তারা যেন তিন দিনের মধ্যে নিজেদের আসবাব-পত্র ঠিকঠাক করে নিয়ে সেখান হতে প্রস্থান করে।

এই পার্থিব শাস্তির পরেই পারলৌকিক শাস্তিরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানেও তাদের জন্যে জাহান্নামের আগুন অবধারিত রয়েছে। তাদের এই দুর্গতির প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ

করেছে এবং একদিক দিয়ে তারা সমস্ত নবীকেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। কেননা, প্রত্যেক নবীই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ঐ লোকগুলো তাঁকে পুরোপুরিভাবে চিনতো ও জানতো। এমনকি পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে তার চেয়েও অধিক তারা শেষ নবী (সঃ)-কে চিনতো। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শুধু হিংসার কারণেই তাঁকে তারা মানতো না। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধাচরণে তারা উঠে পড়ে লেগে যায়। আর প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় বিরুদ্ধাচারীদের উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকেন।

لِيْنَةٌ বলা হয় ভাল খেজুরের গাছকে। কারো কারো উক্তি মতে আজওয়াহ্ ও বিরনী এই প্রকার খেজুরগুলো লীনাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেন যে, শুধু আযওয়াহ্ লীনাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার কারো কারো মতে সর্বপ্রকারের খেজুরই এর অন্তর্ভুক্ত। বুওয়াইরাহ্ও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইয়াহূদীরা যে তিরস্কারের ছলে বলেছিল যে, তাদের খেজুরের গাছগুলো কাটিয়ে দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) নিজের উক্তির বিপরীত কাজ করতঃ ভূ-পৃষ্ঠে কেন বিপর্যয় সৃষ্টি করছেন? এটা তাদের ঐ প্রশ্নেরই জবাব যে, যা কিছু হচ্ছে সবই প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে তাঁর শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য করে দেয়ার লক্ষ্যেই হচ্ছে। যেসব গাছ বাকী রেখে দেয়া হচ্ছে সেটাও তাঁর অনুমতিক্রমেই হচ্ছে এবং যেগুলো কাটিয়ে ফেলা হচ্ছে সেটাও যৌক্তিকতার সাথেই হচ্ছে।

এটাও বর্ণিত আছে যে, মুহাজিরগণ একে অপরকে ঐ গাছগুলো কেটে ফেলতে নিষেধ করছিলেন এই কারণে যে, শেষে তো ওগুলো গানীমাত হিসেবে মুসলমানরাই লাভ করবেন, সুতরাং ওগুলো কেটে ফেলে লাভ কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, বাধাদানকারীরাও একদিকে সত্যের উপর রয়েছে এবং কর্তনকারীরাও সত্যের উপর রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের উপকার সাধন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো কাফিরদেরকে রাগান্বিত করে তোলা এবং তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করানো। এটাও এদের উদ্দেশ্য যে, এর ফলে এই শত্রুরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে এবং এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তাদের মন্দ কার্যের শাস্তি হিসেবে তাদেরকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হবে।

সাহাবীগণ এ কাজ তো করলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় পেলেন যে, না জানি হয়তো ঐ খর্জুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলা অথবা বাকী রেখে দেয়ার কারণে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তাই তাঁরা এ

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আল্লাহ্ তা'আলা مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ ... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ দু'টোতেই প্রতিদান বা সওয়াব রয়েছে, কর্তন করার মধ্যেও এবং বাকী রেখে দেয়ার মধ্যেও।

কোন কোন রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া উভয়েরই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

ঐ সময় বানু কুরাইযা ইয়াহূদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তাদেরকে মদীনাতেই অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারাও যখন মুকাবিলায় নেমে পড়ে তখন তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের নারীরা, শিশুরা ও তাদের সম্পদগুলো মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়। হ্যাঁ, তবে তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ঈমান আনয়ন করে তারা রক্ষা পায়। অতঃপর মদীনা হতে সমস্ত উয়াহূদীকে বের করে দেয়া হয়। বানী কাইনুকাকেও, যাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) ছিলেন এবং বানী হারিসাকেও। সমস্ত ইয়াহূদীকে নির্বাসন দেয়া হয়। এই সমুদয় ঘটনা আরব কবিরা তাঁদের কবিতার মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যা সীরাতে ইবনে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর মতে এটা উহুদ ও বি'রে মাউনার পরবর্তী ঘটনা এবং উরওয়া (রঃ)-এর মতে এ ঘটনাটি বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٦- وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬। আল্লাহ্ তাদের (ইয়াহূদীদের) নিকট হতে যে ফায় তাঁর রাসূল (সঃ)-কে দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧- مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ

৭। আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূল

اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(সঃ)-কে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর, রাসূল (সঃ)-এর স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর।

ফায় কোন মালকে বলে, ওর বিশেষণ কি এবং হুকুম কি এসবের বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। ফায় কাফিরদের ঐ মালকে বলা হয় যা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই মুসলমানদের হস্তগত হয়। যেমন বানী নাযীরের ঐ মাল ছিল যার বর্ণনা উপরে গত হলো যে, মুসলমানরা ওর জন্যে তাদের অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। অর্থাৎ ঐ কাফিরদের সাথে সামনা-সামনি কোন যুদ্ধ হয়নি, বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেন এবং তারা তাদের দূর্গ শূন্য করে দিয়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে আসে। এটাকেই ফায় বলা হয়। তাদের মাল রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দখলে এসে যায়। তিনি ইচ্ছামত ওগুলো ব্যয় করেন। সুতরাং তিনি পুণ্য ও ভাল কাজেই ওগুলো খরচ করেন, যার বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াত এবং অন্য আয়াতে রয়েছে।

তাই এখানে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বানু নাযীরের নিকট হতে তাঁর রাসূল (সঃ)-কে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা (মুসলমানরা) অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্‌ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তাঁর উপর কারো কোন শক্তি নেই এবং কেউ তাঁর কোন কাজে বাধাদান করারও ক্ষমতা রাখে না। বরং তিনিই সবারই উপর বিজয়ী এবং সবাই তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ যে জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম এটাই যে, ওটা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। এটাই হলো ফায়-এর মালের খরচের স্থান এবং এর খরচের হুকুম। যেমন হাদীসে এসেছে যে, বানী নাযীরের মাল ফায় হিসেবে খাস করে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এরই হয়ে যায়। তা হতে তিনি স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে সারা বছরের খরচ দিতেন এবং যা অবশিষ্ট থাকতো তা তিনি যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাব-পত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন।[১]

হযরত মালিক ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা বেলা কিছুটা উঠে যাওয়ার পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একটি চৌকির উপর বসে আছেন যার উপর কাপড়, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই। আমাকে দেখে তিনি বলেনঃ "তোমার কওমের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদেরকে কিছু দিয়েছি। তুমি তা নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও।" আমি বললামঃ জনাব! যদি এ কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করতেন তবে খুবই ভাল হতো। তিনি বললেনঃ "না, তোমাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হলো।" আমি বললামঃ ঠিক আছে। ইতিমধ্যে (তাঁর দ্বাররক্ষী) ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত উসমান উবনে আফ্‌ফান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এসেছেন। তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে বলো।" তাঁরা আসলেন। আবার ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "তাঁদেরকেও আসতে বলো।" তাঁরা দু'জনও আসলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার মধ্যে ও এর (হযরত আলীর রাঃ) মধ্যে মীসাংসা করে দিন।" পূর্বে যে চারজন বুযুর্গ ব্যক্তি এসেছিলেন তাঁদের মধ্য হতেও কোন একজন বললেনঃ "হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন! এ দু'জনের মধ্যে ফায়সালা করে দিন এবং তাঁদের শান্তি দান করুন।" ঐ সময় আমার ধারণা হলো যে, এই দুই বুযুর্গ ব্যক্তিই ঐ চারজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে পূর্বে পাঠিয়েছেন। হযরত উমার (রাঃ) এই দু'জনকে বললেনঃ "আপনারা

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ছাড়া সুনানের অন্যান্য লেখকগণ তাঁদের কিতাবসমূহে এটা বর্ণনা করেছেন।

থামুন।” অতঃপর তিনি ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে আল্লাহ্‌র হুকুমে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর কসম দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) যে বলেছেনঃ ‘আমরা (নবীরা) কোন ওয়ারিশ রেখে যাই না, আমরা যা কিছু (মাল-ধন) ছেড়ে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়।’ এটা কি আপনাদের জানা আছে?” তাঁরা উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ (আমাদের জানা আছে)।” অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, যে আল্লাহ্‌র হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম রয়েছে তাঁর কসম দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, “আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাই না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ উক্তিটি আপনাদের জানা আছে কি?” তাঁরা জাবাবে বললেনঃ “হ্যাঁ, আছে।” তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জন্যে কিছু সম্পদ খাস করেছিলেন যা জনগণের মধ্যে কারো জন্যে খাস করেননি।” অতঃপর তিনি وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ... -এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “আল্লাহ্ তা'আলা বানী নাযীরের মাল স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে ফায় স্বরূপ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! না আমি এতে আপনাদের উপর অন্য কাউকেও প্রাধান্য দিয়েছি, না আমি নিজে সবই নিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এটা হতে তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের এক বছরের খরচ গ্রহণ করতেন এবং বাকীটা বায়তুল মালে জমা দিতেন।” তারপর তিনি ঐ চারজন মহান ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কি আপনাদের জানা আছে?” তাঁরা ‘হ্যাঁ’ বলে উত্তরে দেন। তারপর তিনি ঐ দুই সম্মানিত ব্যক্তিকে ঐ রূপ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁরাও উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বলেন। অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। তারপর আপনারা দু'জন (হযরত আলী রাঃ ও হযরত আব্বাস রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি আত্মীয়তার দাবী জানিয়ে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র (সঃ)-এর মাল হতে আপনার মীরাস যাজ্ঞা করেন। আর ইনি অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) নিজের প্রাপ্যের দাবী জানিয়ে স্বীয় স্ত্রী অর্থাৎ হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর পক্ষ হতে তাঁর পিতা (সঃ)-এর মালের মীরাস চেয়ে বসেন। জবাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আপনাদের দু'জনকে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাই না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়’।” আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) নিশ্চিতরূপে একজন

সত্যবাদী, পুণ্যবান, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যতদিন খলীফা ছিলেন ততদিন তিনি এ মালের জিম্মাদার ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খলীফা নির্বাচিত হয়েছি। তারপর ঐ মাল আমার জিম্মাদারীতে চলে আসে। এরপর এক পর্যায়ে আপনারা দু'জন আমার নিকট আগমন করেন এবং নিজেরা এই মালের জিম্মাদার হওয়ার প্রস্তাব ও দাবী জানান। জবাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেভাবে এ মাল খরচ করতেন আপনারাও ঐ ভাবে খরচ করবেন এই শর্তে যদি আপনারা এই মালের জিম্মাদার হতে চান তবে আমি এটা আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি। আপনারা এটা স্বীকার করে নেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে আপনারা এ মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। অতঃপর এখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, তবে কি আপনারা এছাড়া অন্য কোন ফায়সালা চান? আল্লাহ্‌র কসম! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এছাড়া অন্য কোন ফায়সালা করতে পারি না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, যদি আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ করতে অপারগ হন তবে এর জিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দেন যাতে আমি নিজেই এটাকে ঐ রূপেই খরচ করি যেরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) খরচ করতেন এবং যেভাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে খরচ করা হতো এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে।"[১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "জনগণ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে তাদের গাছ ইত্যাদি প্রদান করতো। অবশেষে যখন বানী কুরাইযা ও বানী নাযীরের ধন-সম্পদ তাঁর অধিকারভুক্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে প্রদত্ত জনগণের মালগুলো তিনি জনগণকে ফিরিয়ে দিতে শুরু করলেন। তখন আমার পরিবারস্থ লোকগুলো আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট এ কথা বলার জন্যে পাঠালো যে, তিনি যেন আমাদেরকেও আমাদের তাঁকে প্রদত্ত সম্পদগুলো ফিরিয়ে দেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একথা বললে তিনি ওগুলো আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি ওগুলো তাঁর পক্ষ হতে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)-কে দিয়ে রেখেছিলেন। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, এগুলো তাঁর নিকট হতে নিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি আমার ঘাড়ের উপর কাপড় রেখে দিয়ে বললেনঃ "যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর কসম! এগুলো আমি আপনাকে কখনই দিবো না।

১. ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

এগুলো তো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে দিয়ে রেখেছেন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "হে উম্মে আইমান (রাঃ)! এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এতো এতো প্রদান করবো (সুতরাং তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই)।" কিন্তু তিনি মানলেন না, বরং ঐ কথাই বলতে থাকলেন। আবার রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "তোমার জন্যে এতো এতো রয়েছে।" এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, বরং একই কথা বলতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) পুনরায় বললেনঃ "তোমাকে এই পরিমাণ, এই পরিমাণ দেয়া হবে।" আমার ধারণা হয় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত বললেনঃ "তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার প্রায় দশগুণ দেয়া হবে," তখন তিনি খুশী হলেন এবং নীরবতা অবলম্বন করলেন। সুতরাং আমাদের মাল আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলো।"[১]

ফায়-এর এই মাল যে পাঁচ জায়গায় খরচ করা হবে, গানীমাতের মাল খরচ করার জায়গাও এই পাঁচটি। সূরায়ে আনফালে এর পূর্ণ তাশ্‌রীহ্ ও তাওযীহ্ সহ পরিপূর্ণ তাফসীর আল্লাহ্ পাকের ফযল ও করমে গত হয়েছে। এ জন্যে এখানে আমরা আর এর পুনরাবৃত্তি করলাম না।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ফায়-এর মালের খরচের জায়গাগুলো আমি এজন্যেই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। শুধু মালদারদের হাতে চলে গেলে তারা তাদের ইচ্ছামত তা খরচ করতো এবং দরিদ্রদের হাতে তা আসতো না।

ইরশাদ হচ্ছেঃ আমার রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলে তা তোমরা কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো। তোমরা এ বিশ্বাস রাখো যে, রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ করে সেটা ভাল কাজই হয় এবং যে কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজ।

হযরত মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন মহিলা হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনি নারীদের উল্কি করা হতে ও চুলে চুল মিলিত করা হতে নিষেধ করে থাকেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনি এটা আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন, অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হতে শুনেছেন?" উত্তরে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, এটা আমি আল্লাহ্‌র কিতাবেও পেয়েছি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হতেও

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

শুনেছি।" একথা শুনে মহিলাটি বলেঃ "আমি গোটা কুরআন মাজীদ পাঠ করেছি, কিন্তু কোথাও তো এটা পাইনি!" তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "তুমি তাতে وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (রাসূল সঃ তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো) এটা কি পাওনি?" মহিলাটি জবাবে বলেঃ "হ্যাঁ, তাতো পেয়েছি।" তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেনঃ "আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উল্কি করা হতে, চুলে চুল মিলানো হতে এবং কপাল ও মুখমণ্ডলের চুল নূচা হতে নিষেধ করেছেন।" মহিলাটি তখন বললোঃ "জনাব! আপনার পরিবারের কোন কোন মহিলাও তো এরূপ করে থাকে?" তিনি তাকে বললেনঃ "তাহলে তুমি আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে দেখে এসো।" সে গেল এবং দেখে এসে বললোঃ "জনাব! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি ভুল বলেছি। উপরোক্ত কোন দোষ আপনার পরিবারের কোন মহিলার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম না।" তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) মহিলাটিকে বললেনঃ "তুমি কি ভুলে গিয়েছো যে, আল্লাহ্‌র সৎ বান্দা (হযরত শুআয়েব আঃ) বলেছিলেনঃ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ অর্থাৎ "আমি এটা চাই না যে, যা হতে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখছি আমি নিজে তার বিপরীত করবো।"(১১ঃ ৮৮)[১]

হযরত আলকামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন ঐ নারীদের উপর যারা উল্কি করায় ও যারা উল্কি করে, যারা তাদের কপালের চুল নূচে এবং যারা নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে তাদের সামনের দাঁতগুলোর প্রশস্ততা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র তৈরীকৃত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়।" তাঁর এ কথা শুনে বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী একটি মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ "আপনি কি এরূপ কথা বলেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) যার উপর লা'নত করেছেন, আমি কেন তার উপর লা'নত করবো না? আর যা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে?" মহিলাটি বললোঃ "আমি কুরআন কারীমের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবই পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাও তো এ হুকুম পাইনি?" তিনি বললেনঃ "তুমি যদি বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করতে তবে অবশ্যই তা পেতে। আল্লাহ্ তা'আলার وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -এই উক্তিটি কি তুমি কুরআন কারীমে পাওনি?" সে জবাবে বললোঃ "হ্যাঁ, এটা তো পেয়েছি!" তারপর তিনি তাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন সে তাঁকে

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বললোঃ "আমার ধারণা যে, আপনার পরিবারের লোকও এই রূপ করে থাকে।" তিনি তাকে বললেনঃ "তুমি (আমার বাড়ীতে) যাও এবং দেখে এসো।" সে গেল, কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তার কিছুই দেখলো না। সুতরাং সে ফিরে এসে বললোঃ "আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।" তিনি তখন বললেনঃ "যদি আমার গৃহিণী এরূপ করতো তবে অবশ্যই আমি তাকে ছেড়ে দিতাম।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।"[২]

হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কদুর খোলের তৈরী পাত্রে, সবুজ রং এর কলসে, আলকাতরার রঙ এ রঞ্জিত পাত্রে এবং কাঠে খোদাইকৃত পাত্রে নবীয তৈরী করতে অর্থাৎ খেজুর, কিস্‌মিস্ ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। অতঃর তাঁরা وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ.... এই আয়াতটিই পাঠ করেন।[৩]

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতঃ তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকো। জেনে রেখো যে, যারা তাঁর নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা করে তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন এবং দুঃখের মার মারেন।

৮। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যে যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।

٨- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে এটা তাখরীজ করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৯। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।

٩- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১০। যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

١٠- وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ (ع ١)

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, ফায় এর মাল অর্থাৎ কাফিরদের যে মাল যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধেই মুসলমানদের অধিকারে আসে তা বিশিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মাল বলে গণ্য হয়। তিনি ঐ মাল কাকে প্রদান করবেন এটাও উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই আয়াতগুলোতেও ওরই আরো হকদারদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মালের হকদার হলো ঐ দরিদ্র মুহাজিরগণ যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিজেদের সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি

তাঁদেরকে তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি ও নিজেদের হাতে অর্জিত সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যে সদা নিমগ্ন থেকেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। তাঁরাই তো সত্যাশ্রয়ী। তাঁরা তাঁদের কাজকে তাঁদের কথা অনুযায়ী সত্য করে দেখিয়েছেন। এই গুণাবলী মহান মুহাজিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এরপর আনসারদের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাঁদের ফযীলত, শরাফত ও বুযুর্গী প্রকাশ করা হচ্ছে। তাঁদের অন্তরের প্রশস্ততা, আন্তরিকতা, ঈসার (নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে বেশী প্রাধান্য দেয়া) এবং দানশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করেছেন ও ঈমান এনেছেন, তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসেন এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এবং তাঁরা তাঁদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।

হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে উপদেশ দিচ্ছি প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের সাথে উত্তম অচরণের, অর্থাৎ তিনি যেন তাঁদের অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁকে আমি আনসারদের সাথেও উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং তাঁদের মধ্যে যাঁরা উত্তম আচরণকারী তাঁদের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণকারী তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছি।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বলেনঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! দুনিয়ায় আমরা আনসারদের মত এমন ভাল মানুষ আর দেখিনি। অল্পের মধ্যে অল্প এবং বেশীর মধ্যে বেশী তাঁরা বরাবরই আমাদের উপর খরচ করছেন। বহুদিন যাবত তাঁরা আমাদের সমুদয় বহন করছেন। তাঁরা এসব করছেন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ও উৎফুল্লভাবে। কখনো তাঁদের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাঁরা এমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের খিদমত করছেন যে, আমাদের ভয় হচ্ছে না জানি হয়তো তাঁরা আমাদের সমস্ত সৎ আমলের প্রতিদান নিয়ে নিবেন!" তাঁদের এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেনঃ "না, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একদা আনসারদেরকে ডাক দিয়ে বলেনঃ "আমি বাহরাইল এলাকাটি তোমাদের নামে লিখে দিচ্ছি।" এ কথা শুনে তাঁরা বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! যে পর্যন্ত আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ না দিবেন সেই পর্যন্ত আমরা এটা গ্রহণ করবো না।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "তাহলে আগামীতেও তোমরা সবর করতে থাকবে। আমার পরে এমন এক সময় আসবে যে, অন্যদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের খেজুরের বাগানগুলো আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন!" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "না, বরং বাগানে কাজকর্ম তোমরাই করবে এবং উৎপাদিত ফলে আমাদেরকে শরীক করবে।" আনসারগণ জবাব দিলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমরা আনন্দিত চিত্তে এটা মেনে নিলাম।"

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ এই আনসারগণ মুহাজিরদের মান-মর্যাদা ও বুযুর্গী দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করে না। মুহাজিরগণ যা লাভ করে তাতে তারা মোটেই ঈর্ষা করে না।

এই অর্থেরই ইঙ্গিত বহন করে নিম্নের হাদীসটিঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে বসেছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "দেখো, এখনই একজন জান্নাতী লোক আগমন করবে।" অল্পক্ষণ পরেই একজন আনসারী (রাঃ) বাম হাতে তাঁর জুতা ধারণ করে নতুনভাবে অযু করা অবস্থায় আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি হতে টপ-টপ করে পানি পড়ছিল। দ্বিতীয় দিনও আমরা অনুরূপভাবে বসেছিলাম, তখনও তিনি (নবী সঃ) ঐ কথাই বললেন এবং ঐ লোকটিই ঐ ভাবেই আসলেন। তৃতীয় দিনেও ঐ একই ব্যাপার ঘটলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন মজলিস হতে উঠে গেলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) তাঁর (আগন্তুকের) পশ্চাদানুসরণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেনঃ "জনাব! আজ আমার মধ্যে ও আমার পিতার মধ্যে কিছু বচসা হয়েছে। তাই আমি শপথ করে বসেছি যে, তিন দিন পর্যন্ত আমি বাড়ীতে প্রবেশ করবো না। সুতরাং যদি দয়া করে আপনি আমাকে অনুমতি

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন

দেন তবে এই দিনগুলো আমি আপনার বাড়ীতে কাটিয়ে দিবো।” তিনি বললেনঃ “বেশ, ঠিক আছে।” অতএব, তিন দিন আমি তাঁর সাথে তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলাম। দেখলাম যে, তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়লেন না। শুধু এতোটুকু করলেন যে, জেগে ওঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে থাকলেন। হ্যাঁ, তবে এটা অবশ্যই ছিল যে, আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিনি। তিন রাত্রি অতিবাহিত হলে তাঁর আমল আমার কাছে হাল্‌কা লাগলো। অতঃপর আমি তাঁকে বললামঃ জনাব! আমার মধ্যে ও আমার পিতার মধ্যে কোন বচসাও হয়নি এবং অসন্তুষ্টির কারণে আমি বাড়িও ছাড়িনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উপর্যুপরি তিন দিন বলেন যে, এখনই একটি জান্নাতী লোক আসবে। আর তিন দিনই আপনারই আগমন ঘটে। তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, কয়েকদিন আপনার সাহচর্যে আমি কাটিয়ে দিবো। অতঃপর এটা লক্ষ্য করবো যে, আপনি কি এমন আমল করেন যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জীবিতাবস্থাতেই আপনার জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ আমাদেরকে প্রদান করলেন! তাই আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছিলাম এবং তিন দিন পর্যন্ত আপনার খিদমতে থাকলাম, যেন আপনার আমল দেখে আমিও ঐরূপ আমল করে জান্নাতবাসী হতে পারি। কিন্তু আমি তো আপনাকে কোন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে দেখলাম না এবং ইবাদতেও তো অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যেতে দেখলাম না? এখন আমি আপনার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি। কিন্তু বিদায় বেলায় আপনার নিকট আমি জানতে চাই যে, আর কি এমন আমল করেন যার কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আপনার জান্নাতী হওয়ার কথা বললেন? উত্তরে তিনি আমাকে বললেনঃ “তুমি আমাকে যে আমল করতে দেখেছো, এ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ ও গোপনীয় আমল আমি করি না।” তাঁর এ জবাব শুনে আমি তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে চলতে শুরু করলাম। অল্প দূরে গিয়েছি ইতিমধ্যে তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেনঃ “আমার আর একটি আমল রয়েছে, তা এই যে, আমি কখনো কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করিনি এবং কখনো কোন মুসলমানের অমঙ্গল কামনা করিনি।” আমি তাঁর এ কথা শুনে বললামঃ হ্যাঁ, এবার আমার জানা হয়ে গেছে যে, আপনার এই আমলই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং এটা এমনই এক আমল যে, অনেকেই এটার ক্ষমতা রাখে না।”[১]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসাঈও (রঃ) তাঁর عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন।

মোটকথা, আনসারদের মধ্যে এই বিশেষণ ছিল যে, মুহাজিরগণ মাল ইত্যাদি লাভ করলে এবং তাঁরা তা না পেলে তাঁরা মনক্ষুণ্ন হতেন না। বানী নাযীর গোত্রের মাল মুহাজিরদের মধ্যে বন্টিত হলে কোন একজন আনসারী সমালোচনা করেন। ঐ সময় ... وَمَا اَفَاۤءَ اللّٰهُ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আনসারদেরকে বলেনঃ "তোমাদের মুহাজির ভাইগণ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে তোমাদের কাছে এসেছে।" তাঁরা তখন বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের মাল-ধন আপনি তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিন!" তিনি উত্তরে বললেনঃ "তোমরা কি এর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে পার না?" তাঁরা জবাব দিলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! বলুন, কি ত্যাগ স্বীকার আমাদেরকে করতে হবে?" তিনি বললেনঃ "মুহাজিরগণ ক্ষেত-খামারের কাজ জানে না। সুতরাং তোমরাই তোমাদের ক্ষেতে ও বাগানে কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফল-শস্যাদি হতে তাদেরকে অংশ দিবে।" আনসারগণ সন্তুষ্ট চিত্তে এতে সম্মতি জানালেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তারা (আনসাররা) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।

সহীহ্ হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যার কাছে (মালের) স্বল্পতা রয়েছে এবং নিজেরই প্রয়োজন আছে, এতদ্সত্ত্বেও সাদকা করে, তার সাদকা হলো উত্তম সাদকা।" এই মর্যাদা ঐ লোকদের মর্যাদার চেয়েও অগ্রগণ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

অর্থাৎ "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম এবং বন্দীকে খাদ্য ভক্ষণ করিয়ে থাকে।"(৭৬ঃ ৮) আর এক জায়গায় আছেঃ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ "মালের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা তা দান করে।" কিন্তু এই লোকগুলো অর্থাৎ আনসারদের নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দান করে থাকেন। মালের প্রতি আসক্তি থাকে এবং প্রয়োজন থাকে না ঐ সময়ের দান-খায়রাত ঐ মর্যাদায় পৌঁছে না যে, প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও দান করা হয়।

এই প্রকারের দান ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দান। তিনি তাঁর সমস্ত মাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! তোমার পরিবারবর্গের জন্যে কি

রেখে এসেছো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তাদের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে রেখে এসেছি।" অনুরূপভাবে ঐ ঘটনাটিও এরই অন্তর্ভুক্ত যা ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে ঘটেছিল। যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদগণ (রাঃ) আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পিপাসায় কাতর হয়ে তাঁরা ছট্‌ফট্ করছেন এবং 'পানি পানি' করে চীৎকার করছেন! এমন সময় একজন মুসলমান পানির মশক কাঁধে নিয়ে আসলেন। ঐ পানি তিনি আহত মুজাহিদদের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু একজন বললেনঃ ঐ যে, ঐ ব্যক্তিকে দাও। তিনি ঐ দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর পার্শ্ববর্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন। ঐ মুসলমানটি তখন তৃতীয় মুজাহিদের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে! দৌড়িয়ে তিনি দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট ফিরে গিয়ে দেখতে পান যে, তাঁরও প্রাণ পাখী উড়ে গেছে! তারপর তিনি প্রথম মুজাহিদের নিকট ফিরে গিয়ে দেখেন যে, তিনিও এই নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র কাছে হাযির হয়ে গেছেন! আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন!"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি খুবই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। মেহেরবানী করে আমার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন!" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তাঁর স্ত্রীদের বাড়ীতে লোক পাঠান। কিন্তু তাঁদের কারো বাড়ীতেই কিছুই পাওয়া গেল না। তিনি তখন জনগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "রাত্রে আমার এই মেহ্‌মানকে নিয়ে যাবে এমন কেউ আছে কি?" একজন আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমি (আছি)।" অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী চললেন। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললেনঃ "দেখো, ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মেহ্‌মান! আজ যদি আমরা নিজেরা কিছুই খেতে না পাই তবুও যেন এ মেহ্‌মান অনাহারে না থাকে।" এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেনঃ "আল্লাহ্‌র কসম! বাড়ীতে আজ শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।" আনসারী তখন তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ "শিশুদের না খাইয়েই শুইয়ে দাও। আর আমরা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) তো পেটে কাপড় বেঁধে অনাহারেই রাত্রি কাটিয়ে দিবো। মেহ্‌মানের খাওয়ার সময় তুমি প্রদীপটি নিভিয়ে দিবে। তখন মেহ্‌মান মনে করবে যে, আমরা খেতে আছি।" স্ত্রী তাই করলেন। সকালে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হলে তিনি বলেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহ্

এই ব্যক্তির এবং তার স্ত্রীর রাত্রের কাজ দেখে খুশী হয়েছেন এবং হেসেছেন।” ঐ ব্যাপারেই وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এ- আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমরা যুলুম হতে বেঁচে থাকো। কেননা, এই যুলুম কিয়ামতের দিন যুলমত বা অন্ধকারের কারণ হবে। হে লোক সকল! তোমরা কার্পণ্য ও লোভ-লালসাকে ভয় কর। কেননা, এটা এমন একটা জিনিস যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে। এরই কারণে তারা পরস্পর খুনা-খুনি করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে।”[২]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা যুল্ম হতে দূরে থাকো। কেননা, যুল্ম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা কটুবাক্য প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলভাষীকে ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজকে ভালবাসেন না। তোমরা লোভ-লালসা ও কার্পণ্য হতে বিরত থাকো। কেননা, একারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তারা জনগণকে যুল্ম করার নির্দেশ দিতো তখন তারা যুল্ম করতো, তারা পাপাচারের হুকুম করতো ফলে তারা পাপাচার করতো এবং তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিতো, তাই তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতো।”[৩]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ্র পথের ধুলো-বালি এবং জাহান্নামের ধূঁয়া কোন বান্দার পেটে একত্রিত হতে পারে না (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথের ধুলো যার উপরে পড়েছে সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত হয়ে গেছে)।”[৪]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে ঐ আনসারীর নাম দেয়া হয়েছে হযরত আবূ তালহা (রাঃ)। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

৩. ইমাম আ'মাশ (রঃ) ও ইমাম শু'বা (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৪. ইমাম আহ্মাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত আসওয়াদ ইবনে হিলাল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে আবূ আবদির রহমান (রাঃ)! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি।” তিনি তার একথা শুনে বলেনঃ “কেন, ব্যাপার কি?” লোকটি উত্তরে বলেঃ “যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। আর আমি তো একজন কৃপণ লোক। আমি তো আমার মালের কিছুই খরচ করতে চাই না!” তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তাকে বললেনঃ “এখানে কার্পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাই-এর মাল যুল্‌ম করে ভক্ষণ করবে। হ্যাঁ, তবে কার্পণ্যও নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ জিনিস।”[১]

হযরত আবুল হাইয়াজ আসাদী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা অবস্থায় আমি দেখলাম যে, একটি লোক শুধু اَللّٰهُمَّ قِنِىْ شُحَّ نَفْسِىْ -এই দু'আটি পাঠ করছেন অর্থাৎ “হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আমার জীবনের কার্পণ্য ও লোভ-লালসা হতে রক্ষা করুন!” শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ জনাব! আপনি শুধু এই প্রার্থনাই কেন করছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ “যদি এটা হতে রক্ষা পাওয়া যায় তবে ব্যভিচার হবে না, চুরি হবে না এবং অন্য কোন খারাপ কাজও হতে পারে না।” অতঃপর আমি তাঁর দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি যে, তিনি হলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)।”[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করলো, মেহ্‌মানদারী করলো এবং আল্লাহ্‌র পথের জরুরী কাজে (মাল) প্রদান করলো সে তার নফসের কার্পণ্য ও লোভ-লালসা হতে দূর হয়ে গেল।”[৩]

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে, তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু!

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) ও হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এটাও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এঁরা হলেন ফায়-এর মালের তৃতীয় প্রকার হকদার। মুহাজির ও আনসারদের দরিদ্রদের পরে তাঁদের অনুসারী হলেন তাঁদের পরবর্তী লোকেরা। এই লোকদের মিসকীনরাও এই ফায়-এর মালের হকদার। এঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এঁদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। যেমন সূরায়ে বারাআতে রয়েছেঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ

অর্থাৎ "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট।" (৯ঃ ১০০) অর্থাৎ এই পরবর্তী লোকেরা ঐ পূর্ববর্তী লোকদের পদাংক অনুসরণকারী এবং তাঁদের উত্তম চরিত্রের অনুসারী ও ভাল দু'আর মাধ্যমে তাঁদেরকে স্মরণকারী। যেন তাঁদের ভিতর ও বাহির পূর্ববর্তীদের অনুসারী। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেনঃ যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেস রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

এই দু'আ দ্বারা হযরত ইমাম মালিক (রঃ) কতই না পবিত্র দলীল গ্রহণ করেছেন! তিনি বলেন যে, রাফেযী সম্প্রদায়ের কোন লোককে যেন সেই সময়ের নেতা ফায়-এর মাল হতে কিছুই প্রদান না করেন। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীদের জন্যে দু'আ করার পরিবর্তে তাঁদেরকে গালি দিয়ে থাকে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ "ঐ লোকদের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তারা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে! কুরআন হুকুম করছে যে, মানুষ যেন মুহাজির ও আনসারদের জন্যে দু'আ করে, অথচ এ লোকগুলো (রাফেযীরা) তাঁদেরকে গালি দেয়।" অতঃপর তিনি وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ ... -এ আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

হযরত মাসরূক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার তোমাদেরকে নির্দেশ

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দেয়া হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে গালি দিচ্ছ! আমি তোমাদের নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "এই উম্মত শেষ হবে না যে পর্যন্ত না তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করবে।"[১]

হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ...-এই আয়াতে যে ফায়-এর মালের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ওটা তো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্যে খাস। তারপর পরবর্তী مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى ...-এই আয়াতে যে মালের কথা বলা হয়েছে তা আম বা সাধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং সমস্ত মুসলমান এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন একজন মুসলমানও এমন নেই যার এই মালের অধিকার নেই, শুধু গোলামদের ছাড়া।[২]

হযরত মালিক ইবনে আউস ইবনে হাদসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (৯ঃ ৬০)-এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "যাকাতের হকদার তো হলো এই লোকগুলো।" তারপর তিনি وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى ... (৮ঃ ৪১) -এ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "গানীমাতের হকদার তো হলো এই লোকগুলো।" এরপর তিনি

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى .... وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ

এ আয়াতগুলো পাঠ করে বলেনঃ "ফায়-এর মালের হকদারদের বর্ণনা দেয়ার পর এই আয়াত সমস্ত মুসলমানকে এই ফায়-এর মালের হকদার বানিয়ে দিয়েছে। সবাই এই মালের হকদার। যদি আমি জীবিত থাকি তবে তোমরা দেখবে যে, গ্রাম-পল্লীর রাখালদেরকেও আমি এর অংশ প্রদান করবো যাদের কপালে এই মাল লাভ করার জন্যে ঘর্মও দেখা দেয়নি।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের সনদটি ছেদকাটা।
৩. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১১। তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখোনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে– তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখানো কারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١١- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ
لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَّإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكٰذِبُونَ ۝

১২। বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং তারা সাহায্য করতে আসলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না।

١٢- لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ
مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا
يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۝

১৩। প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর; এটা এই জন্যে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

١٣- لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي
صُدُورِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۝

১৪। তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

١٤- لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا

فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝

সমর্থ হবে না, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দূর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে; পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এই জন্যে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

١٥- كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৫। তাদের তুলনা– তাদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٦- كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬। তাদের তুলনা শয়তান– যে মানুষকে বলেঃ কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

١٧- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝ ع

১৭। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহূদী বানী নাযীরের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে

ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেঃ “আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রয়োজনে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। যদি তোমরা পরাজিত হয়ে যাও এবং তোমাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে এই শহর ছেড়ে চলে যাবো।” কিন্তু আসলে এই ওয়াদা করার সময় তা পূরণের নিয়তই তাদের ছিল না। তাদের এই মনোবলই ছিল না যে, তারা এরূপ করতে পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং বিপদের সময় তাদের সাথে থাকে। বদনামের ভয়ে যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু তখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবে না, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। এটা ভবিষ্যতের জন্যে শুভ সংবাদ।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে এই মুনাফিকদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! এদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশী আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِذَا فَرِيقٌ مِّنهُم يَخشَونَ النَّاسَ كَخَشيَةِ اللّٰهِ اَو اَشَدَّ خَشيَةً -

অর্থাৎ “তাদের একটি দল আল্লাহ্র ভয়ের মত মানুষকে ভয় করে অথবা আরো বেশী ভয় (অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় করার চেয়েও বেশী মানুষকে ভয় করে)।”(৪ঃ ৭৭)

এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

তাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার অবস্থা এই যে, তারা মুসলমানদের সাথে সামনা-সামনি কখনো যুদ্ধ করার সাহস রাখে না। হ্যাঁ, যদি সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে বসে থেকে কিংবা মরিচার (পরিখার) মধ্যে লুকিয়ে থেকে কিছু করার সুযোগ পায় তবে তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করা তাদের জন্যে সুদূর পরাহত। তারা পরস্পরই একে অপরের শত্রু। তাদের পরস্পরের মধ্যে কঠিন শত্রুতা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَيُذِيقَ بَعضَكُم بَاسَ بَعضٍ -

অর্থাৎ “তোমাদের কাউকেও তিনি কারো যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে থাকেন।”(৬ঃ ৬৫)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি মনে কর যে, তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঐব্যবদ্ধ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। তাদের মনের মিল নেই। মুনাফিকরা এক জায়গায় রয়েছে এবং কিতাবীরা অন্য জায়গায় রয়েছে। তারা একে অপরের শত্রু। কারণ এই যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এদের তুলনা— এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরায়েশ কাফিররাও হতে পারে যে, বদরের যুদ্ধের দিন তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা এর দ্বারা ইয়াহূদী বানী কাইনুকাকে বুঝানো হয়েছে। তারাও দুষ্কার্যে ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে তাদের উপর জয়যুক্ত করেন। নবী (সঃ) তাদেরকে মদীনা হতে বিতাড়িত করেন। এ দু'টিই নিকট অতীতের ঘটনা। এতে এদের জন্যে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে। তবে এখানে বানী কাইনুকার ঘটনাটি উদ্দেশ্য হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেননা, এর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বানী কাইনুকা নামক ইয়াহূদী গোত্রটিকে নির্বাসিত করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ 'এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শয়তান- যে মানুষকে বলেঃ কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই ইয়াহূদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের ঐ ইয়াহূদীদের কাজে না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বাসনের সময় ঐ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া, একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেনঃ দেখো, শয়তান এই ভাবেই মানুষকে কুফরী করতে উত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে বসে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহ্ ওয়ালা বলে প্রকাশ করে। ঐ সময় সে বলেঃ নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।

এখানে এই দৃষ্টান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বানী ইসরাঈলের একজন আবেদের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে নাহীক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন আবেদ ছিলেন। তিনি ষাট বছর আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে একজন মহিলার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। সে তার উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে যেন জ্বিনে ধরেছে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। এদিকে ঐ মহিলাটির ভাইদেরকে সে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, ঐ আবেদের কাছেই এর চিকিৎসা হতে পারে। তারা মহিলাটিকে ঐ আবেদের কাছে নিয়ে গেল। আবেদ লোকটি তখন তার চিকিৎসা অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক, দু'আ-তাবীয ইত্যাদি শুরু করে দিলেন। মহিলাটি তাঁর ওখানেই থাকতে লাগলো। একদিন আবেদ মহিলাটির পার্শ্বেই ছিলেন এমন সময় শয়তান তাঁর মনে কুচিন্তার উদ্রেক করলো। শেষ পর্যন্ত তিনি মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে বসলেন। মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে গেল। এখন এই লজ্জা নিবারণের পন্থা ঐ শয়তান এই বাতলিয়ে দিলো যে, তিনি যেন মহিলাটিকে মেরে ফেলেন, অন্যথায় রহস্য খুলে যাবে। সুতরাং ঐ আবেদ মহিলাটিকে হত্যা করে ফেললেন। ওদিকে শয়তান মহিলাটির ভাইদের মনে আবেদের উপর সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। তারা আবেদের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলো। এদিকে শয়তান আবেদের কাছে এসে বললোঃ "মহিলাটির লোকেরা আপনার কাছে আসছে। এখন আপনার মান-সম্মানও যাবে এবং প্রাণও যাবে। সুতরাং এখন যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করেন এবং আমি যা বলি তা মেনে নেন তবে আপনার মান-সম্মান ও প্রাণ বেঁচে যেতে পারে।" আবেদ বললেনঃ "ঠিক আছে, তুমি যা বলবে আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।" শয়তান তখন বললোঃ "আমাকে সিজদাহ্ করুন!" তিনি সিজদাহ্ করলেন। শয়তান তখন বললোঃ "হে হতভাগ্য! ধিক্ আপনাকে। আপনার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।"[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একটি স্ত্রীলোক বকরী চরাতো এবং একজন পাদরীর আশ্রমের নীচে রাত্রি যাপন করতো। তার চারটি ভাই ছিল। একদিন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পাদরী ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচার করে বসলেন। স্ত্রী লোকটি গর্ভবতী হয়ে গেল। শয়তান পাদরীর কাছে এসে বললোঃ "এটা তো বড়ই লজ্জার কথা। সুতরাং উত্তম পন্থা এটাই যে, মহিলাটিকে হত্যা করে কোন জায়গায় পুঁতে ফেলুন। আপনার সম্পর্কে মানুষের মনে কোন ধারণাই আসবে না। কেননা, আপনার পবিত্রতা সম্বন্ধে তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর যদি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয় তবে মিথ্যা কিছু একটা বলে

১. এ ঘটনাটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দিবেন। কে এমন আছে যে, আপনার কথা বিশ্বাস করবে না?” এক রাত্রে সুযোগ পেয়ে শয়তানের কথামত তিনি মহিলাটিকে হত্যা করে দিলেন এবং এক জন-মানব হীন জঙ্গলে পুঁতে ফেললেন। তখন শয়তান মহিলাটির চার ভাই এর নিকট গমন করলো এবং স্বপ্নে প্রত্যেককে ঘটনাটি শুনিয়ে দিলো। তাকে পুঁতে ফেলার জায়গাটির কথাও বলে দিলো। সকালে জেগে ওঠে তাদের একজন বললোঃ “আজ রাত্রে আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আমার সাহস হয় না যে, আপনাদের সামনে এটা বর্ণনা করি!” তার ভাইয়েরা বললোঃ “না, অবশ্যই তোমাকে বলতে হবে।” তখন সে বলতে শুরু করলো যে, এই ভাবে অমুক আবেদ তাদের বোনের সাথে কুকাজ করেছিল। ফলে সে গর্ভবতী হয়েছিল, তাই সে তাকে হত্যা করেছে এবং অমুক জায়গায় তার মৃতদেহ পুঁতে রেখেছে। তার এ স্বপ্নের কথা শুনে ঐ তিন ভাইয়ের প্রত্যেকে বললোঃ “আমিও এই স্বপ্নই দেখেছি।” এখন সবারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, এ স্বপ্ন সত্য। সুতরাং তারা এ খবর সরকারকে দিয়ে দিলো। বাদশাহ্‌র হুকুমে আবেদকে পাকড়াও করা হলো এবং যে জায়গায় সে মহিলাটির মৃতদেহ পুঁতে রেখেছিল সেখানে যাওয়া হলো। তারপর ঐ জায়গা খনন করিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। পূর্ণ প্রমাণের পর ঐ পাদরীকে শাহী দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। ঐ সময় শয়তান তার সামনে প্রকাশিত হয়ে বললোঃ “এসব আমিই করিয়েছি। এখনও যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবে আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করতে পারি।” আবেদ বললোঃ “বল, কি বলবে?” উত্তরে শয়তান বললোঃ “আমাকে সিজদাহ্ করুন।” আবেদ তাকে সিজদাহ্ও করলো। এভাবে তাকে পূর্ণ বে-ঈমান বানিয়ে নিয়ে শয়তান তাকে বললোঃ “আপনার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।” অতঃপর বাদশাহ্‌র নির্দেশক্রমে পাদরীকে হত্যা করে দেয়া হলো।

এটা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, ঐ পাদরীর নাম ছিল বারসীমা। হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত তাঊস (রাঃ), হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এ ঘটনাটি বিভিন্ন শব্দে কিছু কম-বেশীর সাথে বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরই সম্পূর্ণ বিপরীত হলো হযরত জুরায়েজ (রঃ) নামক আবেদের ঘটনাটি। একজন ব্যভিচারিণী মহিলা তাঁর উপর অপবাদ দেয় যে, তিনি তার সাথে ব্যভিচার করেছেন এবং এরই ফলে তার শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে। তার এই

কথার উপর বিশ্বাস করে জনগণ তাঁর ইবাদতখানাটি ঘিরে নেয় এবং গালি দিতে দিতে অত্যন্ত বে-আদবীর সাথে তাঁকে তাঁর ইবাদতখানা হতে বের করে আনে। তারা তাঁর ইবাদতখানাটি ভেঙ্গে ফেলে। এই বেচারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদেরকে বার বার বলতে থাকেনঃ "বল, ঘটনাটি কি?" কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। অবশেষে তাদের একজন বললোঃ "ওরে ভণ্ড তাপস! তাপসের পোশাক পরে ভণ্ডামী করছো? তোমার দ্বারা এই শয়তানী কাজ সংঘটিত হলো? এই মহিলাটির সাথে তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে!" হযরত জুরায়েজ (রঃ) তখন বললেনঃ "আচ্ছা, থামো, ধৈর্য ধর। ঐ শিশুটিকে নিয়ে এসো।" অতঃপর দুধের ঐ শিশুটিকে নিয়ে আসা হলো। হযরত জুরায়েজ (রঃ) নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি ঐ শিশুটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে শিশু! বলতো, তোমার পিতা কে?" নিজের ওলীর ইজ্জত রক্ষার্থে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঐ অবলা শিশুকে বাকশক্তি দান করলেন। সুতরাং শিশুটি সুন্দর ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলোঃ "আমার পিতা হলো এক রাখাল।" শিশুর মুখে একথা শুনে তো বানী ইসরাঈলের লজ্জার কোন সীমা থাকলো না। ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে তারা করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তখন তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।" জনগণ তাঁকে বললোঃ "আমরা সোনা দ্বারা আপনার ইবাদতখানাটি বানিয়ে দিচ্ছি।" তিনি উত্তরে বললেনঃ "না, বরং যেমন ছিল তেমনই বানিয়ে দাও।"

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ ফলে কুফরীকারী ও কুফরীর হুকুমদাতা উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর যালিমদের কর্মফল এটাই।

১৮- يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৮। হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্যে সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

১৯- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا

১৯। আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে,

ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী।	اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○
২০। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।	٢٠- لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

হযরত জারীর (রাঃ) বলেনঃ "একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় উলঙ্গ দেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট কতকগুলো লোক সেখানে আগমন করলো। তারা শুধু ই'বা (আরব দেশীয় পোশাক) দ্বারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল। তাদের কাঁধে তরবারী লটকানো ছিল। তাদের অধিকাংশই বরং সবাই ছিল মুযার গোত্রীয় লোক। তাদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আবার বেরিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রাঃ)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান হলো, ইকামত হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নামায পড়ালেন। তারপর তিনি খুৎবাহ্ শুরু করলেন। তিনি বললেনঃ ... يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ...।" তারপর তিনি সূরায়ে হাশরের وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি দান-খায়রাতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ দান-খায়রাত করতে শুরু করেন। বহু দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), কাপড়-চোপড়, গম, খেজুর ইত্যাদি আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ভাষণ দিতেই থাকেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেনঃ "তোমরা অর্ধেক খেজুর হলেও তা নিয়ে এসো।" একজন আনসারী (রাঃ) অর্থ বোঝাই ভারী একটি থলে কষ্ট করে উঠিয়ে দিয়ে আসলেন। তারপর তো লোকদের দানের পর দান আসতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের এক একটি স্তূপ হয়ে যায়। এর ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সোনার মত

ঝলমল করতে থাকে। তিনি বলেনঃ "যে কেউ ইসলামের কোন ভাল কাজ শুরু করবে তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদান তো দেয়া হবেই, এমনকি তার পরে যে কেউই ঐ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতিদানের কিছুই কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের গুনাহ্ তো হবেই, এমনকি তার পরে যে কেউই ঐ কাজ করবে, প্রত্যেকেরই গুনাহ্ তার উপর পড়বে এবং তাদের গুনাহ্ কিছুই কম করা হবে না।"[১]

আয়াতে প্রথমে নির্দেশ হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌র আযাব হতে বাঁচার ব্যবস্থা কর অর্থাৎ তাঁর হুকুম পালন করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থেকে তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা কর।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ সময়ের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর। চিন্তা করে দেখতে থাকো যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে তখন কাজে লাগার মত কতটা সঞ্চিত আমল তোমাদের কাছে রয়েছে!

আবার তাগীদের সাথে বলা হচ্ছেঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। না কোন ছোট কাজ তাঁর কাছে গোপন আছে, না কোন বড় কাজ তাঁর অগোচরে আছে। কোন গোপনীয় এবং কোন প্রকাশ্য কাজ তাঁর অজানা নেই।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরকে ভুলে বসো না, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে তোমাদের ঐ সৎকার্যাবলী ভুলিয়ে দিবেন যেগুলো আখিরাতে কাজে লাগবে। কেননা, প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ শ্রেণীরই হয়ে থাকে। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ তারাই তো পাপাচারী। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (৬৩ঃ ৯)

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

হযরত নাঈম ইবনে নামহাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেনঃ "তোমরা কি জান না যে, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের নির্দিষ্ট সময়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছ? সুতরাং তোমাদের উচিত যে, তোমরা তোমাদের জীবনের সময়গুলো আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে কাটিয়ে দিবে। আর এটা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া শুধু নিজের ক্ষমতার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। যারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজ ছাড়া অন্য কাজে লেগে যাবে তোমরা তাদের মত হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এটা হতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন।" তোমাদের পরিচিত ভাইয়েরা আজ কোথায়? তারা তাদের অতীত জীবনে যেসব আমল করেছিল তার প্রতিফল নেয়ার অথবা তার শাস্তি ভোগ করার জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে গেছে। সেখানে তারা সৌভাগ্য লাভ করেছে অথবা হতভাগ্য হয়েছে। যেসব উদ্ধত লোক জাঁকজমক পূর্ণ শহর বসিয়েছিল তারা আজ কোথায়? তারা ঐ শহরে মযবূত দূর্গসমূহ নির্মাণ করেছিল। আজ তারা কবরের গর্তে পাথরের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। এটা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন কারীম। তোমরা এর নূর হতে আলো নিয়ে নাও। এটা কিয়ামতের দিনের অন্ধকারে তোমাদের কাজে আসবে। এর সুন্দর বর্ণনা হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর এবং সুন্দর হয়ে যাও। দেখো, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তারা সৎকার্যে অগ্রগামী ছিল এবং বড় লোভ ও ভয়ের সাথে আমার কাছে প্রার্থনা করতো এবং আমার সামনে ঝুঁকে পড়তো।"(২১ঃ ৯০) জেনে রেখো যে, ঐ কথা কল্যাণশূন্য যার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয়। ঐ মাল কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ নয় যা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা হয় না। ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্য হতে দূরে রয়েছে যার মূর্খতা সহনশীলতার উপর বিজয়ী হয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিও পুণ্যলাভে বঞ্চিত হয়েছে যে আল্লাহ্‌র আহকাম পালনের ক্ষেত্রে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেছে।"[১]

১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিরবানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ খুবই উত্তম এবং এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। যদিও এর একজন বর্ণনাকারী নাঈম ইবনে নামহাহ্ নামক ব্যক্তি সুপরিচিত নন, কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী (রঃ)-এর এই ফায়সালাই যথেষ্ট যে, জারীর ইবনে উসমান (রঃ)-এর সমস্ত উস্তাদই বিশ্বাসযোগ্য এবং ইনিও তাঁর একজন উস্তাদ।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী **সমান** নয়। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নামী ও জান্নাতীরা আল্লাহ্ তা'আলার **নিকট** সমান হবে না। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاۤءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যারা পাপকার্যে লিপ্ত রয়েছে তারা কি ধারণা করেছে যে, আমি তাদেরকে ঈমান আনয়নকারী ও সৎ আমলকারীদের মত করবো? তাদের জীবিত ও মৃত কি সমান? তারা যা ফায়সালা করছে তা কতই না নিকৃষ্ট।"(৪৫ঃ ২১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْۤءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং মুমিন ও সৎ আমলকারী এবং দুষ্কার্যকারী সমান নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"(৪০ঃ ৫৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ـ

অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে কি আমি ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মত করবো অথবা আমি কি মুত্তাকীদেরকে পাপীদের মত করবো?"(৩৮ঃ ২৮) এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবানদেরকে সম্মানিত করেন এবং পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করেন। এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। অর্থাৎ মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'আলার আযাব হতে পরিত্রাণ লাভকারী।

২১। যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ

٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ

হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্যে যাতে তারা চিন্তা করে।

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

২২। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২৩। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, যারা তার শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

২৪। তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٤- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ع

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমের বুযুর্গী ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এই পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। এর সামনে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, লোম খাড়া হয়ে যায়, কলিজা কেঁপে ওঠে। এর সত্য ওয়াদা ও ভীতি প্রদর্শন প্রত্যেককে কাঁপিয়ে তোলে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় পতিত করে।

মহান আল্লাহ্ বলেন যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে অবশ্যই দেখা যেতো যে, ওটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ এই কুরআনকে কোন কঠিন ও উঁচু পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতেন এবং ওকে চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি দান করতেন তবে ওটাও তাঁর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। তাহলে মানুষের অন্তরে তো এটা আরো অধিক ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। কেননা, পর্বতের তুলনায় মানুষের অন্তর বহুগুণে নরম ও ক্ষুদ্র এবং তাতে পূর্ণমাত্রায় বোধ ও অনুভূতি শক্তি রয়েছে। মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উচিত আল্লাহকে ভয় করা ও বিনীত হওয়া।

মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে যে, মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ্ দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর তৈরী হয়ে গেল ও বিছিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি তার উপর দাঁড়িয়েই খুৎবাহ্ দিতে লাগলেন এবং ঐ গুঁড়িটিকে সরিয়ে দেয়া হলো। ঐ সময় ঐ গুঁড়ি হতে কান্নার শব্দ আসতে লাগলো। শিশুর মত ওটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। কারণ এই যে, ওকে আল্লাহ্‌র যিকির ও অহী কিছু দূর থেকে শুনতে হচ্ছে।

হযরত ইমাম বসরী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেনঃ "হে লোক সকল! খেজুর গাছের একটি গুঁড়ি যদি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি এতো আসক্ত হতে পারে তবে তো তোমাদের তাঁর প্রতি ওর চেয়ে বহুগুণ বেশী আসক্তি থাকা উচিত। অনুরূপভাবে এই আয়াতটি যে, যদি একটি পাহাড়ের এই অবস্থা হয় তবে এই অবস্থায় তোমাদের এর চেয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। কারণ তোমরা তো শুনছো ও বুঝছো?" অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ "যদি কোন কুরআন এরূপ হতো যে, ওর কারণে পর্বতরাজিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অথবা যমীনকে কেটে দেয়া হবে কিংবা মৃতকে কথা বলানো হবে (তবে এর যোগ্য একমাত্র এই কুরআনই ছিল, আর তখনো কিন্তু এই কাফিররা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ করতো না)।"(১৩ঃ ৩১) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ “পাথরও কতক এমন যে, ওটা হতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এই রূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর ওটা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে।”(২ঃ ৭৪)

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ্ ছাড়া না কোন পালনকর্তা রয়েছে, না তাঁর সত্তা ছাড়া এমন কোন সত্তা রয়েছে যে, কেউ তার কোন প্রকারের ইবাদত করতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ যাদের ইবাদত করে সেগুলো সবই বাতিল। তিনি সারা বিশ্বের দৃশ্যের ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই তাঁর কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান। তিনি এমন বড় ও প্রশস্ত রহমতের অধিকারী যে, তাঁর রহমত সমস্ত মাখলূকের উপর পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রহমানও বটে এবং রাহীমও বটে। আমাদের তাফসীরের শুরুতে এ দু'টি নামের পুরো তাফসীর গত হয়েছে। কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ “আমার রহমত সমস্ত জিনিসকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।”(৭ঃ ১৫৬)

অন্য জায়গায় আছেঃ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ অর্থাৎ “তোমাদের প্রতিপালক তাঁর নিজের উপর রহমত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।”(৬ঃ ৫৪) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

অর্থাৎ “আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণার প্রতিই তাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, তাদের জমাকৃত জিনিস হতে এটাই উত্তম।”(১০ঃ ৫৮)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত জিনিসের একক মালিক তিনিই। তিনিই সবকিছুকে হেরফেরকারী। সব কিছুরই অধিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই সব কিছুরই ব্যবস্থাপক। কেউই এমন নেই যে তাঁর কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বা তাঁকে তাঁর কার্যসম্পাদন করা হতে বিরত রাখতে পারে। তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনিই প্রকাশমান ও কল্যাণময়। সত্তাগত ও গুণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সমস্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশ্‌তা এবং অন্যান্য সবই তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় সর্বদা রত। তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তাঁর কোন কাজ হিকমতশূন্য নয়। তাঁর সমুদয় কাজকর্মেও তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক। অর্থাৎ তিনি সমস্ত

মাখলূককে এ ব্যাপারে নিরাপত্তা দান করেছেন যে, তাদের উপর তাঁর পক্ষ হতে কখনো কোন প্রকারের অত্যাচার হবে না। তিনি যে সত্য কথা বলেছেন, এ কথা বলে তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের ঈমানের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

তিনিই রক্ষক অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত মাখলূকের সমস্ত আমল সদা প্রত্যক্ষ ও রক্ষাকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ "আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে রক্ষক।"(৮৫ঃ ৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাদের সমস্ত আমলের উপর সাক্ষী।"(১০ঃ ৪৬) মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ ... اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ভাবার্থ এই যে, ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব-স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়?(১৩ঃ ৩৩)

তিনিই পরাক্রমশালী। প্রত্যেক জিনিস তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। প্রত্যেক মাখলূকের উপর তিনি বিজয়ী। সুতরাং তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তিমত্তা এবং বড়ত্ব দেখে কেউই তাঁর মুকাবিলা করতে পারে না। তিনিই প্রবল এবং তিনিই মহিমান্বিত। শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রকাশ করা শুধু তাঁরই জন্যে শোভনীয়। অহংকার করা শুধু তাঁরই সাজে। যেমন সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "বড়াই করা আমার ইযার এবং অহংকার করা আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টোর যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে শাস্তি প্রদান করবো।" সমস্ত কাজের সংস্কার ও সংশোধন তাঁরই হাতে। তিনি প্রত্যেক কুকর্মকে ঘৃণাকারী। যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহ্র শরীক স্থাপন করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, তিনিই উদ্ভাবনকর্তা। অর্থাৎ তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং তিনিই ওটাকে জারী ও প্রকাশকারী। তিনি যা চান তাই নির্ধারণ করেন। কেউই এমন নেই যে, ভাগ্য নির্ধারণ ও ওটাকে চালু এ দু'টোই করতে পারে। তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য নির্ধারণ করেন, অতঃপর ওটা অনুযায়ী ওকে চালিয়েও থাকেন। কখনো তিনি এতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে দেন না। বহু পরিমাণ ও পরিমাপকারী এবং বিন্যাসকারী রয়েছে যারা পরিমাণ ও পরিমাপ করার পর ওটাকে জারী করতে এবং ওটা অনুযায়ী চালু করতে সক্ষম নয়। পরিমাণ ও পরিমাপ করার সাথে সাথে তনফীযের উপরও যিনি ক্ষমতা রাখেন তিনিই আল্লাহ্। সুতরাং خَلْق দ্বারা تَقْدِيْر এবং بَرْء দ্বারা تَنْفِيْذ উদ্দেশ্য। আরবে এই শব্দগুলো এই অর্থে বরাবরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করার প্রচলন রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার শান বা মাহাত্ম্য এই যে, যে জিনিসকে তিনি যখন যেভাবে করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু 'হও' বলে দেন, আর তখনই তা ঐ ভাবেই এবং ঐ আকারেই হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেনঃ

فِىٓ اَىِّ صُوۡرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

অর্থাৎ "যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।"(৮২ঃ৮) এজন্যেই এখানে বলেনঃ তিনি রূপদাতা। অর্থাৎ যাকে তিনি যেভাবে গঠন করার ইচ্ছা করেন সেভাবেই করে থাকেন।

সকল উত্তম নাম তাঁরই। সূরায়ে আ'রাফে এই বাক্যটির তাফসীর গত হয়েছে। তাছাড়া ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যেটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওগুলো গণনা করবে ও স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি (আল্লাহ্) বে-জোড় অর্থাৎ তিনি একক এবং বে-জোড়কে অর্থাৎ একাকীকে ভালবাসেন।" জামেউত তিরমিযীতে নামগুলো স্পষ্টভাবে এসেছে। নামগুলো হলোঃ

আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনিই (১) রহমান, (২) রাহীম, (৩) মালিক, (৪) কুদ্দুস, (৫) সালাম, (৬) মুমিন, (৭) মুহাইমিন, (৮) আযীয, (৯) জাব্বার, (১০) মুতাকাব্বির, (১১) খালিক, (১২) বারী, (১৩) মুসাব্বির, (১৪) গাফ্‌ফার, (১৫) অহ্‌হাব, (১৬) রায্‌যাক, (১৭) কাহ্‌হার, (১৮) ফাত্তাহ্, (১৯) আলীম, (২০) কাবিয্, (২১) বাসিত, (২২) খাফিয্, (২৩) রাফি', (২৪) মুইয্‌য, (২৫) মুযিল্‌ল, (২৬) সামী', (২৭) বাসীর, (২৮) হাকীম, (২৯) আদ্‌ল, (৩০) লাতীফ, (৩১) খাবীর, (৩২) হালীম, (৩৩) আযীম, (৩৪) গাফুর, (৩৫) শাকূর, (৩৬) আলী, (৩৭) কাবীর, (৩৮) হাফীয্, (৩৯) মুকীত, (৪০) হাসীব, (৪১) জালীল, (৪২) কারীম, (৪৩) রাকীব, (৪৪) মুজীব, (৪৫) ওয়াসি, (৪৬) হাকীম, (৪৭) অদূদ, (৪৮) মাজীদ, (৪৯) বাই'স (৫০) শাহীদ, (৫১) হাক্ক, (৫২) অকীল, (৫৩) কাবী, (৫৪) মাতীন, (৫৫) ওয়ালী, (৫৬) হামীদ, (৫৭) মুহসী, (৫৮) মুবদী, (৫৯) মুঈদ, (৬০) মুহ্ঈ, (৬১) মুমীত, (৬২) হাই, (৬৩) কাইয়ূম, (৬৪) ওয়াজিদ, (৬৫) মাজিদ, (৬৬) ওয়াহিদ, (৬৭) সামাদ, (৬৮) কাদির, (৬৯) মুকতাদির, (৭০) মুকাদ্দিম, (৭১) মুআখ্‌খির, (৭২) আওয়াল, (৭৩) আখির, (৭৪) যাহির, (৭৫) বাতিন, (৭৬) ওয়ালী, (৭৭) মুতাআলী, (৭৮) বারর, (৭৯) তাওয়াব, (৮০) মুনতাকিম, (৮১) আফূ, (৮২) রাউফ, (৮৩) মালিকুল মুলক, (৮৪) যুলজালালি ওয়াল

ইকরাম, (৮৫) মুকসিত, (৮৬) জামি, (৮৭) গানী, (৮৮) মুগনী, (৮৯) মু'তী, (৯০) মানি, (৯১) যারর, (৯২) নাফি, (৯৩) নূর, (৯৪) হাদী, (৯৫) বাদী, (৯৬) বাকী, (৯৭) ওয়ারিস, (৯৮) রাশীদ (৯৯) সাবূর।

সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে কিছু আগা-পিছা এবং কম-বেশীও রয়েছে। মোটকথা, এসব হাদীস ইত্যাদির বর্ণনা পূর্ণরূপে সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে শুধু এটুকু লিখাই যথেষ্ট। বাকী সবগুলোর পুণরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন ।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

অর্থাৎ "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (১৭ঃ ৪৪)

তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি তাঁর শরীয়তের আহকামের ব্যাপারে অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সকালে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার পর সূরায়ে হাশ্‌রের শেষ তিনটি আয়াত পাঠ করে, তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে দেন যাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। যদি ঐ দিনে তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে তাকে শহীদের মর্যাদা দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এগুলো পাঠ করে সেও অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে থাকে।"[১]

সূরা ঃ হাশর -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। জামি তিরমিযীতেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন।

সূরাঃ মুমতাহিনাহ্ মাদানী

(আয়াত ঃ ১৩, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১। হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূল (সঃ)-কে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে।

٢- اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ

২। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের

اَعۡدَآءً وَّ يَبۡسُطُوۡۤا اِلَيۡكُمۡ اَيۡدِيَهُمۡ وَاَلۡسِنَتَهُمۡ بِالسُّوۡٓءِ وَوَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ ○	শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরা কুফরী কর।
٣- لَنۡ تَنۡفَعَكُمۡ اَرۡحَامُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَفۡصِلُ بَيۡنَكُمۡ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ○	৩। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।

হযরত হাতিব ইবনে আবি বুলতাআহ্ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, হযরত হাতিব (রাঃ) মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি, মাল-ধন মক্কাতেই ছিল এবং তিনি নিজে কুরায়েশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। শুধু তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর মিত্র ছিলেন, এ জন্যেই মক্কায় তিনি নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন মক্কাবাসী চুক্তি ভঙ্গ করে এবং এর ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মক্কা-আক্রমণের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মনে বাসনা এই ছিল যে, আকস্মিকভাবে তিনি মক্কা আক্রমণ করবেন, যাতে রক্তপাত বন্ধ থাকে এবং তিনি মক্কার উপর আধিপত্যও লাভ করতে পারেন। এ জন্যেই তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ্ ! মক্কাবাসীদের নিকট যেন আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না পৌঁছে।" এদিকে তিনি মুসলমানদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত হাতিব ইবনে আবি বুলতাআহ্ (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র দিখেন এবং একটি মহিলার হাতে পত্রটি দিয়ে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। পত্রটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সংকল্পের কথা এবং মুসলমানদের মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর লিখিত ছিল। হযরত হাতিব (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে কুরায়েশদের উপর কিছুটা

ইহসান করা হবে যার ফলে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধন রক্ষিত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দু'আ কবূল হয়ে গিয়েছিল বলে এটা অসম্ভব ছিল যে, কারো মাধ্যমে তাঁর সংকল্পের খবর মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছে যাবে। এজন্যে মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে এই গোপন তথ্য অবহিত করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মহিলাটির পিছনে নিজের ঘোড়-সওয়ারদেরকে পাঠিয়ে দেন। পথে তাঁরা তাকে আটক করেন এবং তার নিকট হতে পত্র উদ্ধার করেন। এই বিস্তারিত ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে পূর্ণভাবে এসেছে।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত মিকদাদ (রাঃ)-কে পাঠানোর সময় বললেনঃ "তোমরা যাত্রা শুরু কর, যখন তোমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছবে তখন সেখানে উষ্ট্রীর উপর আরোহিণী একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, তার নিকট হতে ওটা নিয়ে নিবে।" আমরা তিনজন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলতে লাগলাম। যখন আমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন দেখি যে, বাস্তবিকই একটি মহিলা উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছে। আমরা তাকে বললামঃ তোমার কাছে যে পত্রটি রয়েছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও। সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বললো যে, তার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললামঃ তোমার কাছে অবশ্যই পত্র আছে। তুমি যদি খুশী মনে আমাদেরকে পত্রটি না দাও তবে আমরা বাধ্য হয়ে তোমার দেহ তল্লাশী করে তা জোর পূর্বক বের করে নেবো। তখন মহিলাটি কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং অবশেষে তার চুলের ঝুঁটি খুলে ওর মধ্য হতে পত্রটি বের করে দিলো। আমরা তখন পত্রটি নিয়ে সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মদীনায় পৌঁছে পত্রটি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে হাযির করে দিলাম। পত্রপাঠে জানা গেল যে, ওটা হযরত হাতিব (রাঃ) লিখেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সংকল্পের খবর মক্কার কাফিরদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাতিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হাতিব (রাঃ)! ব্যাপার কি?" হযরত হাতিব (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! অনুগ্রহপূর্বক তাড়াতাড়ি করবেন না, আমার মুখে কিছু শুনে নিন! আমি কুরায়েশদের সাথে মিলে-মিশে থাকতাম কিন্তু আমি নিজে কুরায়েশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। অতঃপর আমি আপনার উপর ঈমান এনে হিজরত করে মদীনায় চলে আসি। এখানে যত মুহাজির রয়েছেন তাঁদের সবারই আত্মীয়-স্বজন মক্কায় রয়েছে। তারা এই মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের রক্ষণাবেক্ষণ

করছে। কিন্তু আমার কোন আত্মীয়-স্বজন মক্কায় নেই যে, তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযত করবে। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, কুরায়েশ কাফিরদের প্রতি কিছুটা ইহ্সান করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করবো। তাহলে তারা আমার ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির হিফাযত করবে। আর যেভাবে এখানে অবস্থানরত মুহাজিরদের আত্মীয়তার কারণে মক্কার কাফিরদের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, তেমনিভাবে আমার তাদের প্রতি ইহ্সানের কারণে তাদের সাথে আমারও সম্পর্ক ভাল থাকবে। হে আল্লাহ্র রাসূল (রঃ)! আমি কুফরী করিনি এবং ধর্মত্যাগীও হইনি। ইসলাম ছেড়ে কুফরীর উপর আমি সন্তুষ্ট হইনি। পত্রের মাধ্যমে মক্কায় অবস্থানরত আমার সন্তান-সন্ততির হিফাযত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া আর কিছুই নয়।"

হযরত হাতিব (রাঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জনগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে জনমণ্ডলী! হাতিব (রাঃ) যে বক্তব্য পেশ করেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শুধু কিছুটা উপকার লাভের খাতিরে ভুল করে বসেছে। মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা অথবা কফিরদের সাহায্য করা তার মোটেই উদ্দেশ্য নয়।" হযরত উমার (রাঃ) তখন বলে ওঠেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "তুমি কি জান না যে, এ ব্যক্তি বদরে হাযির হয়েছিল? আর আল্লাহ্ তা'আলা বদরী সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১]

এই রিওয়াইয়াতটি আরো বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীর মধ্যে এটুকু আরো রয়েছে যে, ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। কিতাবুত্ তাফসীরে আছে যে, হযরত আমর (রাঃ) বলেনঃ এই ব্যপারেই ... يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা হযরত আমর (রাঃ)-এর নিজের, না এটা হাদীসে রয়েছে এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রঃ) বলেন যে, হযরত সুফইয়ান (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "এ আয়াতটি হযরত হাতিব (রাঃ)-এর ঘটনার ব্যাপারেই কি অবতীর্ণ হয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এটা লোকদের কথা। আমি এটা হযরত আমর (রাঃ) হতে শুনেছি ও

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

মুখস্থ করেছি এবং একটি অক্ষরও আমি ছাড়িনি। আর আমার ধারণা এই যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ এটা মুখস্থ রাখেনি।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের একটি রিওয়াইয়াতে হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এর নামের স্থলে হযরত আবূ মুরসিদ (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একথাও বলেছিলেনঃ "ঐ স্ত্রীলোকটির কাছে হাতিব (রাঃ)-এর পত্র রয়েছে।" হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "আমরা মহিলাটির সওয়ারী বসিয়ে তার কাছে পত্রটি চাইলে সে অস্বীকার করে। আমরা বারবার অনুসন্ধান করার পরেও কোন পত্র পেলাম না। বহু চেষ্টার পরেও যখন পত্র পাওয়া গেল না তখন আমরা মহিলাটিকে বললামঃ তোমার কাছে যে পত্র আছে এতে কোনই সন্দেহ নেই। যদিও আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু তোমার কাছে ওটা আছেই। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কথা যে ভুল হবে এটা অসম্ভব। যদি তুমি আমাদেরকে পত্রটি না দাও তবে আমরা তোমার পরিধেয় বস্ত্র খুলে নিয়ে অনুসন্ধান করবো। সে যখন বুঝতে পারলো যে, আমরা নাছোড় বান্দা হয়ে লেগেছি এবং তার কাছে পত্র যে আছে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তখন সে তার চুলের মধ্য হতে পত্রটি বের করে আমাদেরকে দিয়ে দিলো। আমরা ওটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করলাম এবং নবী (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে গেলাম। ঘটনাটি শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "সে (হযরত হাতিব রাঃ) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাকে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি দিন!" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাতিব (রাঃ)-কে ঘটনাটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তিনি উত্তর দিলেন যা উপরে বর্ণিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সকলকে বললেনঃ "তোমরা তাকে কিছুই বলো না।" হযরত উমার (রাঃ)-কেও তিনি বললেন যে, হাতিব (রাঃ) বদরী সাহাবী, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর বদরী সাহাবীদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত অবধারিত করেছেন। একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।" এ হাদীসটি এসব শব্দে সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে বদর যুদ্ধের বর্ণনায় রয়েছে।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর মক্কা অভিযানের সংকল্পের কথা তাঁর কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর সাহাবীর (রাঃ) সামনে প্রকাশ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে হযরত হাতিবও (রাঃ) ছিলেন। আর সর্বসাধারণের মধ্যে

মশহূর হয়ে ছিল যে, তাঁরা খাইবার অভিযানে যাচ্ছেন। এই রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ মহিলাটির সবকিছু অনুসন্ধান করার পরও যখন আমরা পত্রটি পেলাম না তখন হযরত আবূ মুরসিদ (রাঃ) বললেনঃ "হয়তো তার কাছে কোন পত্রই নেই?" জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মিথ্যা কথা বলবেন এটা অসম্ভব। আর আমরা মিথ্যা বলবো এটাও সম্ভব নয়। আমরা যখন মহিলাটিকে ধমকালাম তখন সে বললোঃ 'তোমাদের কি আল্লাহ্র ভয় নেই? তোমরা কি মুসলমান নও'?" একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি তার দেহের মধ্য হতে পত্রটি বের করেছিল। হযরত উমার (রাঃ)-এর উক্তির মধ্যে এও ছিলঃ "হাতিব (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের গোপনীয় সংবাদ শত্রুদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছে।"

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি মুযীনা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, তার নাম ছিল সারা। সে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের আযাদকৃত দাসী ছিল। হযরত হাতিব (রাঃ) মহিলাটিকে কিছু দেয়ার অঙ্গীকারে মক্কার কুরায়েশদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে একটি পত্র প্রদান করেছিলেন। পত্রটি সে তার চুলের নীচে রেখে উপর হতে চুল বেঁধে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর ঘোড়-সওয়ারদেরকে বলেছিলেন যে, মহিলাটির কাছে হাতিব (রাঃ)-এর দেয়া পত্র রয়েছে। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আকাশ হতে এসেছিল। ঘোড়-সওয়ারগণ মহিলাটিকে বানী আবি আহমাদের হুলাইফায় পাকড়াও করেছিলেন। মহিলাটি তাদেরকে বলেছিলঃ "তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি বের করে দিচ্ছি।" তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিলে সে পত্রটি বের করে তাঁদের হাতে সমর্পণ করে। এ রিওয়াইয়াতে হযরত হাতিব (রাঃ)-এর জবাবে এও রয়েছেঃ "আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান রেখেছি। আমার ঈমানে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।" এ ব্যাপারেই এই সূরার আয়াতগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত হাতিব (রাঃ) মহিলাটিকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দশ দিরহাম প্রদান করেছিলেন। আর ঐ পত্রটি উদ্ধার করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। জুহ্ফাহ্ নামক স্থানে ওটা পাওয়া গিয়েছিল। আয়াতগুলোর ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা মুশরিক ও কাফিরদেরকে কখনো

বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। কেননা, তারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের সাথে যুদ্ধকারী। তাদের অন্তর তোমাদের প্রতি শত্রুতায় পরিপূর্ণ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (৫ ঃ ৫১)

এটা কঠিন হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীদেরকে ও কাফিরদেরকে, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হও।" (৫ঃ ৫৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?"(৪ঃ ১৪৪) আর এক জায়গায় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ -

অর্থাৎ "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।"(৩ঃ ২৮)

এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাতিব (রাঃ)-এর ওযর কবূল করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং মাল-ধনের হিফাযতের খাতিরেই শুধু এ কাজ করেছিলেন।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের সামনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। একটি, তিনটি, পাঁচটি, সাতটি, নয়টি এবং এগারোটি। অতঃপর শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্তই তিনি আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং বাকীগুলো ছেড়ে দেন। তিনি বলেনঃ "একটি দুর্বল ও দরিদ্র সম্প্রদায় ছিল যাদের উপর শক্তিশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় আক্রমণ চালায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দুর্বল সম্প্রদায়কে সাহায্য করে তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন। বিজয় লাভ করে ঐ দুর্বল সম্প্রদায়টি গর্বে ফেটে পড়ে এবং তাদের শত্রুদের উপর যুলুম করতে শুরু করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চিরতরে অসন্তুষ্ট হয়ে যান।"[১]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলেনঃ কেন তোমরা দ্বীনের এই শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছো? অথচ তারা তো তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে কোন প্রকারের ত্রুটি করে না? তোমরা কি এই নতুন ঘটনাটিও বিস্মৃত হয়েছো যে, তারা তোমাদেরকে এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কেও জোর পূর্বক মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে? তোমাদের অপরাধ তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েছো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করেছো।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

অর্থাৎ "তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।" (৮৫ঃ ৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ "যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের দেশ হতে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।"(২২ঃ ৪০)

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা সত্যিই যদি আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাকো এবং আমার সন্তুষ্টিকামী হও তবে কখনো ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না যারা আমার শত্রু, আমার দ্বীনের শত্রু এবং তোমাদের জান ও মালের ক্ষতি সাধনকারী। এটা কতই না বড় ভুল যে, তোমরা গোপনীয়ভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে! এই গোপনীয়তা কি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন থাকতে পারে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই খবর রাখেন? অন্তরের রহস্য এবং নফ্সের কুমন্ত্রণাও যিনি পূর্ণরূপে অবগত। সুতরাং জেনে রেখো যে, যে কেউই ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তোমরা কি বুঝ না যে, এই কাফিররা যদি সুযোগ পায় তবে তারা তাদের হাত পা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবে না এবং মন্দ কথা বলা হতে রসনাকে মোটেই সংযত রাখবে না? তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে তারা সাধ্যমত চেষ্টা করবে এবং সুযোগ পেলে একটুও পিছ পা হবে না। তাদের মত তোমরাও কাফির হয়ে যাও এ কাজে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কাজেই তোমরা যখন তাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত রয়েছো তখন কি করে তাদেরকে বন্ধু মনে করে নিজেদের পথে নিজেরাই কাঁটা গাড়ছো? মোটকথা, মুসলমানদেরকে কাফিরদের উপর ভরসা করতে এবং তাদের সাথে গভীরভাবে ভালবাসা স্থাপন করে মেলামেশা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা তাদেরকে তাদের হতে পৃথক থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি বলেনঃ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসবে না, অথচ তাদের খাতিরে তোমরা আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে কাফিরদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছ! এটা তোমাদের বড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। না আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আগত ক্ষতি কেউ রোধ করতে পারে এবং না তাঁর প্রদত্ত লাভে কেউ বাধা দিতে পারে। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কুফরীর উপর যে আনুকূল্য করলো সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলো। আত্মীয় যেমনই হোকনা কেন, কোনই লাভ নেই।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে (জান্নাতে, না জাহান্নামে)?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "জাহান্নামে

(রয়েছে)।” লোকটি (বিষণ্ন মনে) ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে নিয়ে বলেনঃ “আমার পিতা ও তোমার পিতা (উভয়েই) জাহান্নামে (রয়েছে)।”[১]

৪। তোমাদের জন্যে ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌য় ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তিঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নিকট কোন অধিকার রাখি না। (ইবরাহীম আঃ ও তার অনুসারীগণ বলেছিলঃ) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট।

٤- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে ও সুনানে আবি দাউদেও হাদীসটি রয়েছে।

৫। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৬। তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

٦- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○ (ع ١٧)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার হিদায়াত দানের পর তাদের জন্যে তাঁর খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের (রাঃ) নমুনা বা আদর্শ পেশ করছেন যে, তাঁরা স্পষ্টভাবে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে বলে দেনঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের দ্বীন ও পন্থাকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা আমাদেরকে শত্রু মনে করতে থাকো যে পর্যন্ত তোমরা এই পন্থা ও মাযহাবের উপর রয়েছো। ভ্রাতৃত্বের কারণে যে আমরা তোমাদের কুফরী সত্ত্বেও তোমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কায়েম রাখবো এটা অসম্ভব। হ্যাঁ, তবে যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং তোমরা এক ও শরীক বিহীন আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন কর ও তাঁর একত্ববাদকে মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত করতে শুরু করে দাও এবং যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক মনে করে রেখেছো ও তাদের উপাসনায় লেগে রয়েছো তাদের সবকেই পরিত্যাগ করে দাও ও নিজেদের কুফরীর নীতি ও শির্কের পন্থা হতে সরে পড় তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা! এ অবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমাদের ভাই ও বন্ধু হয়ে যাবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক নেই। আমরা তোমাদের হতে ও তোমরা আমাদের হতে

পৃথক। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা পূর্ণ করেছিলেন, এতে তাঁর অনুসরণ করা চলবে না। কেননা, এই ক্ষমা প্রার্থনা ঐ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যে পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার আল্লাহ্ তা'আলার শত্রু হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারেননি। যখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহ্র শত্রু তখন তিনি স্পষ্টভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কোন কোন মুমিন নিজের মুশরিক মাতা-পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দলীল হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনাটি পেশ করতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ-وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ-

অর্থাৎ "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্যে সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী। ইবরাহীম (আঃ) তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে। অতঃপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইবরাহীম (আঃ) ওর সম্পর্ক ছিন্ন করলো। ইবরাহীম (আঃ) তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" (৯ঃ ১১৩-১১৪) আর এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-এর জন্যে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তিঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না। অর্থাৎ মুশ্রিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে আদর্শ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ), মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ), যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, কওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্

তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট আরয করছেনঃ হে আল্লাহ্! সমস্ত কাজে-কর্মে আমাদের ভরসা আপনার পবিত্র সত্তার উপরই রয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত কার্য আপনার কাছেই সমর্পণ করছি। আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট।

এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেন না। অর্থাৎ যেন এমন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে যেন এরূপও না হয় যে, আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় এবং ওটা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয় যে, যদি আমরা সত্যের উপর থেকে থাকি তবে আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আসলো কেন? তদ্রূপ এও যেন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে আপনার দ্বীন হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করছেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী। আপনার নিকট আশ্রয়প্রার্থী কখনো বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে না। আপনার দ্বারে করাঘাতকারী কখনো শূন্য হস্তে ফিরে না। আপনি আপনার কথায়, কাজে, শরীয়ত ও ভাগ্য নির্ধারণে প্রজ্ঞাময়। আপনার কোন কাজই হিকমত শূন্য নয়।

এরপর গুরুত্ব হিসেবে মহান আল্লাহ্ পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেনঃ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে কেউই আল্লাহ্ তা'আলার উপর, কিয়ামত সংঘটনের সত্যতার উপর ঈমান রাখে তার তাদের অনুসরণে আগে বেড়ে পা রাখা উচিত। আর যে কেউই আল্লাহ্র আহ্কাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত। তিনি কারো কোন পরোয়া করেন না। তিনি প্রশংসার্হ। মাখলূক সৃষ্টিকর্তার প্রশংসায় নিমগ্ন রয়েছে। যেমন তিনি বলেনঃ

اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ -

অর্থাৎ "যদি তোমরা এবং ভূ-পৃষ্ঠের সবাই কুফরী কর বা অবাধ্য হয়ে যাও তবে জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।।"(১৪ঃ ৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, غَنِيٌّ তাঁকেই বলা হয় যিনি তাঁর অভাবহীনতায় পরিপূর্ণ। একমাত্র আল্লাহ্‌রই মধ্যে এই বিশেষণ রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রকারের অভাবমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। অন্য কারো সত্তা এরূপ নয়। তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। কেউই তাঁর সাথে তুলনীয় হতে পারে না। তিনি পবিত্র ও একক। তিনি সবারই উপর হাকিম, সবারই উপর বিজয়ী এবং সবারই বাদশাহ্। তিনি প্রশংসার্হ। সমস্ত সৃষ্টজীব সদা তাঁর প্রশংসায় রত রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত কথায় ও কাজে প্রশংসনীয়। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালকও নেই।

٧- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭। যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

٨- لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৮। দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

٩- اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى

৯। আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং

তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো অত্যাচারী।	إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ○

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এবং তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা এখন বলেনঃ হতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিবেন। শত্রুতা, ঘৃণা ও বিচ্ছেদের পর হয়তো তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। কোন্ জিনিস এমন আছে যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওর উপর ক্ষমতা রাখেন না? তিনি পৃথক পৃথক ও পরস্পর বিরোধী জিনিসকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। শত্রুতার পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার হাত তাঁর রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ ওটা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।"(৩ঃ ১০৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? অতঃপর আল্লাহ্ আমারই কারণে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা পৃথক পৃথক ছিলে, তারপর আমারই কারণে আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন।" আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ـ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনিই যিনি তোমাকে (নবী সঃ -কে) তাঁর সাহায্যের দ্বারা এবং মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর তাদের হৃদয়ে তিনি প্রেম-প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ভূ-পৃষ্ঠে যত কিছু আছে সবই যদি তুমি খরচ করতে তবুও তাদের হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। বরং

আল্লাহ্ই তাদের হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।” (৮ঃ ৬২-৬৩)

একটি হাদীসে এসেছেঃ “বন্ধুত্বের সময়ও একথা স্মরণ রেখো যে, কোন সময় শত্রুতা হয়ে যেতে পারে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। আর শত্রুতায়ও সীমালংঘন করে যেয়ো না। কেননা, এই শত্রুতার পরে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে এতেও বিস্ময়ের কিছুই নেই।” কোন কবি বলেছেনঃ

وَقَدْ يَجْمَعُ اللّٰهُ الشَّتِيْتَيْنِ بَعْدَ مَا * يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ اَنْ لَّا تَلَاقِيَا ـ

অর্থাৎ “এমন দুই জন শত্রু যারা একে অপর হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে রয়েছে এবং তারা পূর্ণরূপে ধারণা করেছে যে, তারা পরস্পরে কখনো মিলিত হবে না, এদেরকেও আল্লাহ্ একত্রিত করে থাকেন এবং এমনভাবে তাদেরকে মিলিত করেন যে, তারা যেন কখনো দুই জন ছিলই না।”

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কাফির তাওবা করলে তিনি তার তাওবা কবূল করে থাকেন। সে যখন তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন তিনি তাকে নিজের করুণার ছায়ায় স্থান দেন, গুনাহ্ যত বড়ই হোক না কেন এবং গুনাহ্গার যেই হোক না কেন। সে যখনই মালিকের দিকে ঝুঁকে পড়ে তখনই তাঁর রহমতের তরঙ্গ উথলিয়ে ওঠে।

হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ সুফিয়ান সাখর ইবনে হার্বের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁর কন্যা উম্মে হাবিবাহ্ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বিয়ে করে নেন। আর এই বিবাহই মহব্বতের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু এ উক্তিটি মনে ধরে না। কেননা, এই বিবাহ্ মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর সর্বসম্মত মত এই যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) মক্কা বিজয়ের রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বরং এর চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা ওটাই যা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইবনে হার্বকে (রাঃ) ইয়ামনের কতক অংশের উপর আমিল নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইন্তেকাল করেন তখন হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) মদীনায় আগমন করছিলেন। পথে যুল-খিমারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ। সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। তখন হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তার সাথে যুদ্ধ করেন। সুতরাং ধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদকারী তিনিই ছিলেন। হযরত

ইবনে শিহাব (রঃ) বলেন যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর ব্যাপারেই عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ... - এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার তিনটি আবেদন রয়েছে। যদি অনুমতি দেন তবে তা আরয করি।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "ঠিক আছে, বল।" তখন তিনি বললেনঃ "আমাকে আপনি অনুমতি দিন যে, আমি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো যেমন (পূর্বে) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতাম।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ (ঠিক আছে)।" তিনি বললেনঃ "আমার পুত্র মুআবিয়া (রাঃ)-কে আপনার অহী লেখক নিযুক্ত করুন!" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ (তাই হবে)।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "আমার উত্তম আরবী কন্যা উম্মে হাবীবাহ্ (রাঃ)-কে আপনি বিয়ে করে নিন!" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এটাও মেনে নিলেন। এ ব্যাপারে সমালোচনা আছে যা পূর্বে গত হয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ "যেসব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারও করেনি, যেমন স্ত্রীলোক এবং দুর্বল লোকেরা, তাদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার, ইহসান এবং আদল ও ইনসাফ করতে থাকো। এরূপ করতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। বরং তিনি তো এরূপ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন। হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমার মাতা মুশ্রিকা থাকা অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, এটা ঐ যুগের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও মক্কার কুরায়েশদের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ছিল। আমি তখন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার মাতা আমার নিকট আগমন করেছে এবং সে ইসলাম হতে বিমুখ। সুতরাং আমি তার সাথে (আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে) মিলিত হবো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে মিলিত হও (ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখো)।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

মুসনাদে আহমাদের এক রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল কাতীলাহ্। সে পনীর, ঘি ইত্যাদি উপঢৌকন হিসেবে আনয়ন করেছিল। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) প্রথমে না তাঁর মাতাকে তাঁর বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, না তার উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাকে তাঁর বাড়ীতে স্থানও দেন।

হযরত বাযযার (রঃ)-এর বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নামও রয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মাতার নাম ছিল উম্মে রূমান এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হ্যাঁ, তবে হযরত আসমা (রাঃ)-এর মাতা উম্মে রূমান ছিল না, বরং তাঁর মাতার নাম ছিল কাতীলা, যেমন উপরের হাদীসে বর্ণিত হলো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সব চেয়ে ভাল জানেন। مُقْسِطِيْن-এর তাফসীর সূরায়ে হুজুরাতে গত হয়েছে যে, مُقْسِطِيْن হলো ঐ লোকেরা যারা তাদের পরিবারবর্গের ব্যাপারে হলেও ন্যায় বিচার করে থাকে (এবং যদিও ঐ বিচার তাদের পরিবারবর্গের বিপক্ষে হয়)। আল্লাহ্ তা'আলার আরশের ডান দিকে নূরের মিম্বরের উপর তারা সমাসীন থাকবে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুশরিকদের সাথে মেলা-মেশাকারী ও বন্ধুত্বকারীদেরকে ধমকের সুরে বলছেনঃ যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاۤءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।"(৫ঃ ৫১)

১০। হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকট মুমিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিনা তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিনা নারীরা কাফিরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিনা নারীদের জন্যে বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফিরা নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে

١١- وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ

কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রীরা হাত ছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁতে তোমরা বিশ্বাসী।	أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

সূরায়ে ফাত্হর তাফসীরে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং কুরায়েশ কাফিরদের মধ্যে যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে কাফির মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাকে তিনি মক্কাবাসীর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআন কারীম এর মধ্য হতে ঐ মহিলা বা নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনয়ন করে এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেন না।

কুরআন কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত। কারো কারো মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী।

এই আয়াতের শানে নুযূল এই যে, হযরত উম্মে কুলসূম বিনতে উক্বা ইবনে আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে মদীনায় চলে যান। আম্মারাহ্ এবং ওয়ালীদ নামক তাঁর দুই ভ্রাতা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইমতেহান বা পরীক্ষার এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। এভাবে আল্লাহ্ পাক মুমিনা নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করে দেন।

হযরত আবূ নাস্র আসাদী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কি ভাবে নারীদের পরীক্ষা নিতেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তা এই ভাবে যে, তারা শপথ করে করে বলতো যে, তারা স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে নয় এবং শুধু আবহাওয়া ও মাটির পরিবর্তনের জন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল

(সঃ)-এর মহব্বতে ইসলামের খাতিরেই দেশ ত্যাগ করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।"[১]

কসম দিয়ে এই প্রশ্নগুলো করা ও ভালভাবে পরীক্ষা করার দায়িত্ব হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর উপর অর্পিত ছিল।[২]

ইমাম আওফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তাদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিলঃ তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। পরীক্ষা নেয়ার পর যদি বুঝা যেতো যে, তারা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্যে হিজরত করেছে তবে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতো। যেমন জানা যেতো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে বা কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে স্ত্রী হিজরত করেছে ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা (নারীরা) মুমিনা তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কারো ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'মুমিনা নারীরা কাফিরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিনা নারীদের জন্যে বৈধ নয়।' এই আয়াত এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে হারাম করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে মুমিনা নারীদের বিবাহ কাফিরদের সাথে বৈধ ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ)-এর বিয়ে হয়েছিল আবুল আ'স ইবনে রাবী (রাঃ)-এর সাথে। অথচ ঐ সময় তিনি কুফরীর উপর ছিলেন। আর হযরত যায়নাব (রাঃ) ছিলেন মুসলমান। বদরের যুদ্ধে তিনিও কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধে যে কাফিররা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। হযরত যায়নাব (রাঃ) তাঁর মাতা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর হারটি তাঁর স্বামী আবুল আ'স (রাঃ)-এর মুক্তিপণ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মুসলমানদেরকে বলেনঃ "যদি তোমরা আমার কন্যার বন্দীকে মুক্তি দেয়া পছন্দ কর তবে তাকে মুক্ত করে দাও।" মুসলমানরা মুক্তিপণ ছাড়াই সন্তুষ্টচিত্তে আবুল আ'স (রাঃ)-কে মুক্ত করে দিতে সম্মত হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে আযাদ

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করে দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আ'স (রাঃ) তা স্বীকার করেন। মক্কায় গিয়ে তিনি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর সাথে হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এটা হলো দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। হযরত যায়নাব (রাঃ) মদীনাতেই অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ হযরত আবুল আ'স (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর কন্যাকে পূর্বের বিবাহের উপরই নতুন মহর ছাড়াই হযরত আবুল আ'স (রাঃ)-এর কাছে সমর্পণ করেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, দুই বছর পর হযরত আবুল আ'স (রাঃ) মুসলমান হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে ঐ পূর্ব বিবাহের উপরই তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেন।

এটা সঠিক কথা যে, মুমিনা নারীরা মুশ্রিক পুরুষদের উপর হারাম হওয়ার দুই বছর পরে হযরত আবুল আ'স (রাঃ) মুসলমান হয়েছিলেন। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবুল আ'স (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর আবার নতুনভাবে বিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং নতুনভাবে মহরও ধার্য করা হয়েছিল। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াযীদ (রঃ) বলেছেনঃ প্রথম হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইসনাদ হিসেবে এ রিওয়াইয়াতটি উন্নততর। আর দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) এবং আমল এর উপরই রয়েছে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, হযরত আমর ইবনে শুয়ায়েব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন হাজ্জাজ ইবনে ইরতাত যাঁকে হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন দুর্বল বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের জবাব জমহূর এই দেন যে, এটা ব্যক্তিগত ঘটনা, হয়তো তাঁর ইদ্দত শেষই হয়নি। অধিকাংশ গুরুজনের মাযহাব এই যে, এই অবস্থায় যখন স্ত্রী ইদ্দত পুরো করে নিবে এবং তখন পর্যন্ত তার স্বামী মুসলমান না হবে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কোন কোন মনীষীর মাযহাব এটাও যে, ইদ্দত পুরো করার পর স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে তার পূর্ব বিবাহ ঠিক রাখতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ফসখ্ করে দিতেও পারে। এর উপরই তাঁরা হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতকে মাহ্মূল করে থাকেন।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ কাফির স্বামীরা তাদের ঐ মুহাজিরা স্ত্রীদের জন্যে যা ব্যয় করেছে তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন মহর।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে মুমিনগণ! এখন তোমরা হিজরতকারিণী ঐ মুহাজিরা মুমিনা নারীদেরকে মহর দিয়ে বিয়ে করে নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়া, ওলী নির্ধারণ করা ইত্যাদি যেসব বিষয় বিয়ের জন্যে শর্ত, এসব শর্ত পূরণ করে ঐ মুহাজির নারীদেরকে যেসব মুসলমান বিয়ে করতে চায় করতে পারে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। অনুরূপভাবে কাফিরা নারীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্যে হারাম।

এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই হযরত উমার (রাঃ) তাঁর দু'টি কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন যাদের একজনকে হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বিয়ে করেন এবং অপরজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কাফিরদের সাথে সন্ধি করে ফেলেছেন এবং তখনও তিনি হুদায়বিয়ার নীচের অংশেই রয়েছেন এমতাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হয় এবং মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়ঃ "হিজরত করে যেসব নারী আসবে এবং তাদের খাঁটি মুমিনা হওয়া এবং আন্তরিকতার সাথে হিজরত করার অবস্থাও জানা যাবে তখন তোমরা তাদের কাফির স্বামীদেরকে তাদের দেয়া মহর ফিরিয়ে দিবে।" অনুরূপভাবে কাফিরদেরকেও এই হুকুম শুনিয়ে দেয়া হয়। এই হুকুমের কারণ ঐ চুক্তিপত্র ছিল যা সবেমাত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। হযরত উমার (রাঃ) তাঁর যে দু'টি কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন তাদের একজনের নাম ছিল কুরাইবা।[১] সে আবূ উমাইয়া ইবনে মুগীরার কন্যা ছিল। অপরটির নাম ছিল কুলসূম এবং সে ছিল আমর ইবনে জারওয়ান খুযায়ীর কন্যা। সে-ই ছিল হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর মাতা। তাকে আবূ জাহাম ইবনে হুযাইফা ইবনে গানিম খুযায়ী বিয়ে করে নিয়েছিল। এও মুশরিক ছিল। এই হুকুমের ভিত্তিতেই হযরত তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ্ (রাঃ) তার কাফিরা স্ত্রী আরওয়া বিনতে বাবীআহ্ ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিবকে তালাক দিয়ে দেন। তাকে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স বিয়ে করে।

১. তাফসীরে বাগাভীতে এর নাম রয়েছে ফাতিমা।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ এরপর বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের (কাফিরা) স্ত্রীদের উপর যা খরচ করেছো তা তোমরা কাফিরদের নিকট হতে নিয়ে নাও যখন তারা তাদের মধ্যে চলে যাবে। আর কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলমান হয়ে তোমাদের নিকট চলে আসবে তাদেরকে তোমরা দিয়ে দাও যা তারা তাদের এই স্ত্রীদের উপর খরচ করেছে।

এটাই আল্লাহ্র বিধান। তিনি মুমিনদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বান্দাদের জন্যে কি যোগ্য ও উপযুক্ত তা তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। তাঁর কোন হুকুমই হিকমত শূন্য নয়। কারণ সাধারণভাবে তিনিই প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَئٌ ...-এই আয়াতের ভাবার্থ হযরত কাতাদা (রঃ) এই বর্ণনা করেনঃ হে মুমিনগণ! যে কাফিরদের সাথে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি হয়নি, যদি কোন স্ত্রী তার মুসলমান স্বামীর ঘর হতে বের হয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয় তবে এটা প্রকাশমান যে, তার মুসলমান স্বামী তার উপর যা খরচ করেছে তা তারা ফেরত দিবে না। সুতরাং এর বিনিময়ে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, যদি তাদের মধ্য হতে কোন নারী মুসলমান হয়ে তোমাদের মধ্যে চলে আসে তবে তোমরাও তার স্বামীকে কিছুই দিবে না, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে দেয়।

হযরত যুহ্রী (রঃ বলেন যে, মুসলমানরা তো আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুম পালন করেছিল এবং কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলমান হয়ে হিজরত করে চলে এসেছিল, তাদের স্বামীদেরকে তারা তাদের দেয়া মহর ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে অনুমতি দিয়ে বলা হয়ঃ যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তারা তোমাদেরকে তোমাদের খরচকৃত জিনিস না দেয় তবে যখন তাদের মধ্য হতে কোন নারী তোমাদের নিকট চলে আসবে তখন তোমরা তোমাদের কৃত খরচ বের করে দিয়ে কিছু অতিরিক্ত হলে তা তাদেরকে প্রদান করবে, অন্যথায় মুআমালা এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদেরকে কিছুই দিতে হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এর ভাবার্থ বর্ণিত আছেঃ এতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, যে মুসলিমা নারী কাফিরদের মধ্যে চলে যাবে এবং কাফিররা তার স্বামীকে তার কৃত খরচ প্রদান না করবে, তাকে তিনি

গানীমাতের মাল হতে তার খরচ পরিমাণ প্রদান করবেন। সুতরাং فَعَاقَبْتُمْ -এর অর্থ দাঁড়ালোঃ হে মুমিনগণ! এর পর যদি তোমরা কুরায়েশদের হতে অথবা কাফিরদের অন্য কোন দল হতে গানীমাতের মাল লাভ কর তবে তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রীরা কাফিরদের মধ্যে চলে গেছে তাদের খরচকৃত মালের সমপরিমাণ তাদেরকে তা হতে দিয়ে দাও। অর্থাৎ মহরে মিসাল প্রদান কর। এই উক্তিগুলোতে বৈপরীত্য কিছুই নেই। ভাবার্থ এই যে, প্রথম রূপ যদি সম্ভব হয় তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় গানীমাতের মাল হতে তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। দু'টোতেই ইখতিয়ার রয়েছে এবং হুকুমের মধ্যে প্রশস্ততা আছে। হযরত ইবনে জারীর (রঃ) এই আনুকূল্যই পছন্দ করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্যে।

১২- يَايُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২। হে নবী (সঃ)! মুমিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যেসব মুসলমান নারী হিজরত করে নবী (সঃ)-এর নিকট আসতো তাদের পরীক্ষা এই আয়াত দ্বারাই নেয়া হতো। যারা এ কথাগুলো স্বীকার করে নিতো তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "আমি তোমাদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ

করলাম।" এটা নয় যে, তিনি তাদের হাতে হাত রাখতেন। আল্লাহ্র কসম! বায়আত গ্রহণের সময় তিনি কখনো কোন নারীর হাতে হাত রাখেননি। শুধু মুখে বলতেনঃ "আমি এই কথাগুলোর উপর তোমাদের বায়আত গ্রহণ করলাম।"

হযরত উমাইমাহ্ বিনতে রুকাইকাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণের জন্যে হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আমাদের নিকট হতে আহাদ-অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আমরা এগুলো স্বীকার করে নিলে তনি বলেনঃ 'আমরা আমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করবো' একথাও বল। আমরা বললামঃ আমাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর করুণা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। আমরা বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবেন না? তিনি উত্তরে বললেনঃ "না, আমি বেগানা নারীদের সাথে করমর্দন করি না। আমার একজন নারীকে বলে দেয়া একশ' জন নারীর জন্যে যথেষ্ট।"[১]

মুসনাদে আহমাদে এটুকু বেশীও রয়েছে যে, হযরত উমাইমাহ্ (রাঃ) বলেনঃ "তিনি আমাদের মধ্যে কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা করেননি।" হযরত উমাইমাহ্ নাম্নী এই মহিলাটি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ভগ্নী ও হযরত ফতিমা (রাঃ)-এর খালা হতেন।

হযরত সালমা বিনতে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খালা ছিলেন, তাঁর সাথে দুই কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছেন এবং যিনি বানী আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন, তিনি বলেন, আনসারদের নারীদের সাথে বায়আত গ্রহণের জন্যে আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়েছিলাম। যখন তিনি আমাদের উপর শর্ত করলেন যে, আমরা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবো না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবো না এবং সৎকার্যে তাঁকে অমান্য করবো না, তারপর তিনি এ কথাও বললেনঃ "তোমরা তোমাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করবে না।" তখন আমরা এগুলো স্বীকার করে নিয়ে বায়আত গ্রহণ করলাম এবং ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ করে আমার একটি কথা স্মরণ হওয়ায় আমি একজন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট পাঠালাম এই উদ্দেশ্যে যে, স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করার অর্থ কি তা যেন সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে তিনি বললেনঃ "এর অর্থ এই যে, তুমি তোমার স্বামীর মাল গোপনে তার অজান্তে কাউকেও দিবে না।"[১]

হযরত আয়েশা বিনতে কুদামাহ্ (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার মাতা রায়েতাহ্ বিনতে সুফিয়ান খুযাইয়্যাহ্ (রাঃ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণকারিণীদের মধ্যে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "আমি এই মর্মে তোমাদের বায়আত নিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে আমাকে অমান্য করবে না।" নারীরা স্বীকারোক্তি করছিল। আমার মাতার নির্দেশক্রমে আমিও স্বীকার করলাম এবং বায়আত গ্রহণ কারিণীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলাম।"[২]

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট বায়আত করলাম, তখন তিনি আমাদের সামনে لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا ... -এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বায়আত গ্রহণকালীন সময়ের মাঝেই একজন মহিলা তার হাতখানা টেনে নেয় এবং বলেঃ "মৃতের উপর বিলাপ করা হতে বিরত থাকার উপর বায়আত করছি না। কারণ অমুক মহিলা আমার অমুক মৃতের উপর বিলাপ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এর বিনিময় হিসেবে তার মৃতের উপর আমাকে বিলাপ করতেই হবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ কথা শুনে নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না। অতঃপর সে চলে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পর সে ফিরে এসে বায়আত করলো।

সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি আছে। তাতে এও রয়েছে যে, এই শর্তটি শুধু ঐ মহিলাটি এবং হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মুলহানই (রাঃ) পুরো করেছিলেন।

সহীহ্ বুখারীর অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, পাঁচজন মহিলা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন উম্মে সুলাইম (রাঃ), উম্মুল আ'লা (রাঃ), আবূ সাবরার কন্যা ও হযরত মুআয (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং আর দুই জন মহিলা। অথবা আবূ সাবরার কন্যা ও হযরত মুআয (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং আর একজন মহিলা।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এই হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নবী (সঃ) ঈদের দিনেও নারীদের নিকট হতে এই বিষয়গুলোর উপর বায়আত গ্রহণ করতেন। সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "আমি রমযানের ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে, হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা প্রত্যেকেই খুৎবার পূর্বে নামায পড়তেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) খুৎবার অবস্থায় মিম্বর হতে নেমে পড়েন। এখনো যেন ঐ দৃশ্য আমার চোখের সামনে রয়েছে। লোকদেরকে বসানো হচ্ছিল এবং তিনি তাদের মধ্য দিয়ে আসছিলেন। অবশেষে তিনি স্ত্রী লোকদের নিকট আসেন। তাঁর সাথে হযরত বিলালও (রাঃ) ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذْ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ.... এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি নারীদেরকে প্রশ্ন করেনঃ "তোমরা এই অঙ্গীকারের উপর অটল থাকবে তো?" একজন স্ত্রী লোক জবাবে বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! হ্যাঁ (আমরা এর উপ দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবো)।" অন্য কোন স্ত্রীলোক জবাব দিলো না। হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত হাসান (রঃ)-এর জানা নেই যে, যে মহিলাটি জবাব দিয়েছিলেন তিনি কে ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মহিলাদেরকে বলেনঃ "তোমরা দান-খায়রাত কর।" হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন নারীরা তাঁদের পাথর বিহীন ও পাথরযুক্ত আংটিগুলো আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করতে লাগলেন।

মুসনাদে আহমাদের রিওয়াইয়াতে হযরত উমাইমাহ্ (রাঃ)-এর বায়আতের বর্ণনায় এ আয়াত ছাড়াও এটুকু আরো রয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করা এবং অজ্ঞতার যুগের মত সাজ-সজ্জা করে অপর পুরুষকে না দেখানো।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক মজলিসে পুরুষদেরকেও বলেনঃ "আমার নিকট ঐ বিষয়গুলোর উপর বায়আত কর যা এই আয়াতে রয়েছে। যে ব্যক্তি এই বায়আতকে ঠিক রাখবে তার পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করবে এবং তা মুসলিম হুকুমতের কাছে গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে তার হিসাব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন।"

হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেনঃ "আকাবায়ে ঊলায় (প্রথম আকাবায়) আমরা বারজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে বায়আত করি এবং

তিনি আমাদের নিকট হতে ঐ বিষয়গুলোর উপর বায়আত গ্রহণ করেন যেগুলো এই আয়াতে রয়েছে। আর তিনি আমাদেরকে বলেনঃ "যদি তোমরা এগুলো পূর্ণ কর তবে তোমাদের জন্যে জান্নাত অবধারিত।" এটা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন নারীদেরকে বলে দেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তোমাদের কাছে ঐ বিষয়ের উপর বায়আত নিচ্ছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকেও শরীক করবে না।" এই বায়আতের জন্যে আগমনকারিণীদের মধ্যে হিন্দাও ছিল, যে ছিল উত্বা ইবনে রাবীআর কন্যা, যে (উহুদের যুদ্ধে) হযরত হামযা (রাঃ)-এর পেট ফেঁড়েছিল। সে নারীদের মধ্যে এমন অবস্থায় ছিল যে, কেউ যেন তাকে চিন্তে না পারে। ঘোষণা শুনার পর সে বললোঃ "আমি কিছু বলতে চাই। কিন্তু যদি আমি বলি তবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে চিনে ফেলবেন এবং যদি তিনি চিনে নেন তবে অবশ্যই আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেন। আর এ কারণেই আমি এই বেশে এসেছি, যেন তিনি আমাকে চিনতে না পারেন।" তার এ কথায় নারীরা নীরব থাকলো এবং তার পক্ষ হতে কথা বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন হিন্দা অপরিচিতা অবস্থাতেই বললোঃ "এটা ঠিকই তো, পুরুষদেরকে যখন শির্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে তখন নারীদেরকে কেন নিষেধ করা হবে না?" তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) শুধু তার দিকে তাকালেন। অতঃপর তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে বললেনঃ "বল– তারা চুরি করবে না।" তখন হিন্দা বললোঃ "আমি মাঝে মাঝে আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর খুবই সাধারণ জিনিস তার অজান্তে নিয়ে থাকি, এটাও কি চুরির মধ্যে গণ্য হবে, না হবে না?" হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ মজলিসেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে বললেনঃ "আমার ঘর হতে তুমি যা কিছু নিয়েছো তা খরচ হয়েই থাকুক অথবা এখনো কিছু বাকী থাকুক, সবই আমি তোমার জন্যে বৈধ ঘোষণা করলাম।" এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হেসে ফেললেন এবং তিনি তাকে চিনে নিলেন। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন। সে এসেই তাঁর হাত ধরে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তুমিই কি হিন্দা?" সে উত্তরে বললোঃ "অতীতের গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তার দিক হতে ফিরে গিয়ে পুনরায় বায়আত প্রসঙ্গ উঠিয়ে বললেনঃ "তারা (নারীরা) ব্যভিচার করবে না।" তখন

হিন্দা বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন স্বাধীনা নারী কি ব্যভিচার করে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "না, আল্লাহ্র কসম! স্বাধীনা নারী ব্যভিচার করে না।" তারপর তিনি বললেনঃ "তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।" একথা শুনে হিন্দা বললোঃ "আপনি তাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিন হত্যা করেছেন, সুতরাং আপনি জানেন এবং তারা জানে।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না।" তারপর বললেনঃ "সৎকার্যে আমাকে অমান্য করবে না।" বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নারীদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করেন। অজ্ঞতাযুগের লোকেরা মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করতো, কাপড় চিড়তো, মুখ নুচ্তো, চুল কাটাতো এবং হায়, হায় করতো।[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন বায়আত সম্পর্কীয় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। নবী (সঃ) সাফা পাহাড়ের উপর পুরুষদের বায়আত নিয়েছিলেন এবং হযরত উমার (রাঃ) নারীদের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, সন্তান-হত্যার নিষেধাজ্ঞা শুনে হযরত হিন্দা (রাঃ) বলেছিলেনঃ "আমরা তো তাদেরকে ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছি, আপনারা বড় অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করেছেন!" একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) হাসিতে লুটিয়ে পড়েন।[২]

হযতর আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হিন্দা বিনতে উৎবাহ্ বায়আত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তার হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেনঃ "তুমি যাও এবং হাতের রঙ বদলিয়ে এসো।" সে গেল এবং মেহেদী দ্বারা হাত রাঙ্গিয়ে আসলো। তিনি তখন বললেনঃ "আমি তোমার কাছে বায়আত নিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক করবে না।" অতঃপর সে তাঁর কাছে বায়আত করলো। ঐ সময় তার হাতে সোনার দু'টি কংকন ছিল। সে বললোঃ "এ দু'টি সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন?" জবাবে তিনি বললেনঃ "এ দু'টি হলো জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার।"[৩]

১. এই আসারটি গারীব এবং এর কতক অংশে নাকারাতও রয়েছে। কেননা, হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দার ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁদের রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিক হতে কোন ভয়ই ছিল না, বরং ঐ সময়ও তিনি আন্তরিকতা এবং প্রেম-প্রীতি প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৩. এটাও বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)।

হযরত শা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এমন অবস্থায় নারীদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করেন যে, তাঁর হাতে একখানা কাপড় ছিল যা তিনি তার হস্ত-তালুতে রেখেছিলেন। তিনি বলেনঃ “তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।” তখন একজন মহিলা বলে ওঠেঃ “আপনি তাদের বাপ-দাদাদেরকে হত্যা করেছেন, আর আমাদেরকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন!” এটা ছিল বায়আতের প্রাথমিক রূপ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ এই নীতি চালু করেন যে, বায়আত করার জন্যে যখন নারীরা একত্রিত হতো তখন তিনি সমস্ত বিষয় তাদের সামনে পেশ করতেন এবং তারা ওগুলো মেনে নিয়ে ফিরে যেতো।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! মুমিনা নারীরা যখন তোমার নিকট বায়আত করার জন্যে আসে অর্থাৎ যখন তারা তোমার কাছে এসব শর্তের উপর রায়আত করার জন্যে আসে তখন তুমি তাদের নিকট হতে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করো যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, অপর লোকের মাল চুরি করবে না, তবে হ্যাঁ, যার স্বামী তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে খাদ্য ও পোশাক না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্যে এটা বৈধ যে, সে তার স্বামীর মাল হতে প্রথা অনুযায়ী ও নিজের প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে, যদিও তার স্বামী তা জানতে পারে। এর দলীল হচ্ছে হযরত হিন্দা সম্পর্কীয় হাদীসটি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ লোক। তিনি আমাকে এই পরিমাণ খরচ দেন না যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর অজান্তে তাঁর মাল হতে কিছু গ্রহণ করি তবে তা আমার জন্যে বৈধ হবে কি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ “প্রচলিত পন্থায় তুমি তার মাল হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয়।”[১]

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তারা ব্যভিচার করবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلًا ـ

অর্থাৎ “তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই এটা নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ ও মন্দ পথ।”(১৭ ঃ ৩২)

১. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে।

হযরত সামরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যভিচারের শাস্তি জাহান্নামের অগ্নির যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা বিনতে উৎবাহ্ (রাঃ) যখন বায়আত করার জন্যে আগমন করেন এবং তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ... أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ -এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি তাঁর হাতখানা তাঁর মাথার উপর রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর এই লজ্জা দেখে মুগ্ধ হন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "সবাই এই শর্তগুলোর উপর বায়আত করেছে।" একথা শুনে তিনিও বায়আত করেন।[১] রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বায়আত গ্রহণের পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ 'তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।' এই হুকুমটি সাধারণ। ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে এরূপ সন্তানও এই হুকুমেরই আওতায় পড়ে। যেমন জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের এরূপ সন্তানকে পানাহারের ভয়ে হত্যা করতো। আর সন্তান গর্ভপাত করাও এই নিষেধাজ্ঞারই আওতাধীন, হয় তা এই ভাবেই হোক যে ঔষধের মাধ্যমে গর্ভধারণই করবে না, না হয় গর্ভস্থ সন্তানকে কোন প্রকারে ফেলে দিবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ 'তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীর সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানকে তাদের স্বামীর সন্তান বলবে না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মুলাআনার (স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের উপর লা'নত করা) আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "যে নারী (সন্তানকে) এমন কওমের মধ্যে প্রবেশ করায় যে ঐ কওমের নয় তার সাথে আল্লাহ্র কোনই সম্পর্ক নেই। আর যে পুরুষ তার সন্তানকে অস্বীকার করে অথচ সে তার দিকে তাকায়, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তি হতে আড়াল হয়ে যাবেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।"[২]

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'তারা সৎকার্যে তোমাকে (নবী সঃ-কে) অমান্য করবে না।' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যা নির্দেশ দিবেন তা তারা মেনে চলবে এবং যা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হতে নিষেধ করবেন তা হতে তারা বিরত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর আনুগত্যও শুধু মা'রূফ বা সৎকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আর মা'রূফই হচ্ছে আনুগত্য। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেনঃ "দেখুন, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য করার হুকুমও শুধু সৎকার্যেই রয়েছে। এই বায়আত গ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নারীদের নিকট হতে মৃতের উপর বিলাপ না করার স্বীকৃতিও নিয়েছিলেন, যেমন হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাঃ)-এর হাদীসে গত হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে– এই বায়আতে এও ছিল যে, গাইরি মুহরিম বা বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এরূপ পুরুষ লোকের সঙ্গে যেন নারীরা কথা না বলে। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কোন কোন সময় এমনও হয় যে, আমরা বাড়ীতে থাকি না এমতাবস্থায় আমাদের বাড়ীতে মেহমান এসে পড়ে (ঐ সময়ও কি আমাদের স্ত্রীরা মেহ্মানের সাথে কথা বলতে পারবে না?)।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "তাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করা আমার উদ্দেশ্য নয় (তাদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতে আমি নিষেধ করছি না)।"[১]

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই বায়আত গ্রহণের সময় নারীদেরকে মুহরিম ছাড়া অন্য কোন পুরুষ লোকের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "কোন কোন লোক এমনও আছে যে, সে বেগানা নারীর সাথে কথা বলে মজা উপভোগ করে থাকে, এমনকি তার উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ হতে মযী বেরিয়ে পড়ে।"[২]

উপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করার শর্তের উপর একটি নারী বলেছিলঃ "অমুক গোত্রের মহিলারা আমার বিলাপের সময় আমার সাথে বিলাপে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের বিলাপের সময় আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়ে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করবো।" তখন তাকে তাদের বিলাপে যোগ দেয়ার জন্যে যেতে বলা হয়। সুতরাং সে যায় ও তাদের বিলাপে যোগ দেয় এবং সেখান হতে ফিরে এসে আর বিলাপ না করার উপর বায়আত করে।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)।

উম্মে মুলায়েম (রাঃ), যাঁর নাম ঐ দুই মহিলার মধ্যে রয়েছে যাঁরা বিলাপ না করার বায়আত পূর্ণ করেছিলেন, তিনি হলেন মুলহানের কন্যা এবং হযরত আনাস (রাঃ)-এর মাতা।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে মহিলাটি বিনিময় হিসেবে বিলাপ করার অনুমতি চেয়েছিল, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

এটাই হলো ঐ মা'রূফ বা সৎকার্য যাতে অবাধ্যতা নিষিদ্ধ। বায়আতকারিণীদের মধ্য হতে একজন মহিলা বলেছিলেনঃ "সৎকার্যে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে অমান্য করবো না।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ বিপদের সময় আমরা মুখ নুচবো না, চুল কাটাবো না, কাপড় ফাড়বো না এবং হায়, হায় করবো না।

হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন মদীনায় আমাদের নিকট শুভাগমন করেন তখন একদা তিনি নির্দেশ দেন যে, সমস্ত আনসারিয়্যাহ্ মহিলা যেন একটি ঘরে একত্রিত হয়। অতঃপর তিনি হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে তথায় প্রেরণ করেন। হযরত উমার (রাঃ) তখন দরযার উপর দাঁড়িয়ে যান এবং সালাম করেন। আমরা তাঁর সালামের জবাব দিই। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দূতরূপে আপনাদের নিকট আগমন করেছি।" আমরা বললামঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং তাঁর দূতকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। তিনি বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে আমি আপনাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আপনারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক না করার, চুরি না করার এবং ব্যভিচার না করার বায়আত আমার কাছে করবেন।" আমরা বললামঃ "আমরা প্রস্তুত আছি এবং স্বীকার করছি। অতঃপর তিনি বাইরে দাঁড়িয়েই স্বীয় হস্ত ভিতরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরাও আমাদের হস্তগুলো ভিতরেই বাড়িয়ে দিলাম। তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন!" তারপর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, আমরা যেন আমাদের ঋতুবতী নারীদেরকে এবং যুবতী ও কুমারী মেয়েদেরকে ঈদের মাঠে নিয়ে যাই। জুমআর নামায আমাদের উপর ফরয নয়। আমরা যেন জানাযার সাথে গমন না করি।" হাদীসের বর্ণনাকারী ইসমাঈল (রাঃ) বলেনঃ "আমি হযরত উম্মে আতিয়্যাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি– সৎকার্যে নারীরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অবাধ্য হবে না এ কথার অর্থ কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "এর অর্থ এই যে, তারা বিলাপ করবে না।"[১]

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি বিপদের সময় গাল চাপড়ায়, চুল ছিঁড়ে, কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের লোকের মত হায়, হায় করে সে আমাদের মধ্যে নয়।"[১]

হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের চারটি কাজ রয়েছে যা তারা পরিত্যাগ করবে না। (এক) বংশের উপর গৌরব প্রকাশ করা, (দুই) মানুষকে তার বংশের কারণে বিদ্রূপ করা, (তিন) নক্ষত্রের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং (চার) মৃতের উপর বিলাপ করা।" তিনি আরো বলেনঃ "বিলাপকারিণী নারী তাওবা না করে মারা গেলে তাকে কিয়ামতের দিন গন্ধকের জামা পরানো হবে এবং খোস-পাঁচড়াযুক্ত চাদর গায়ে জড়ানো হবে।"[২]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বিলাপকারিণীর উপর এবং কান লাগিয়ে বিলাপ শ্রবণকারিণীর উপর লা'নত করেছেন।[৩]

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তারা সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না' এর দ্বারা বিলাপ করাকে বুঝানো হয়েছে।[৪]

١٣- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ○ ع

১৩। হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ)।
৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) কিতাবুত তাফসীরের মধ্যে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

এই সূরার শুরুতে যে হুকুম ছিল ওটাই শেষে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইয়াহূদী, নাসারা এবং অন্যান্য কাফির, যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত, যাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়েছে এবং যারা তাঁর রহমত ও ভালবাসা হতে দূরে রয়েছে, তাদের সাথে যেন মুসলমানরা বন্ধুত্ব স্থাপন না করে এবং মিলজুল না রাখে। তারা আখিরাতের পুরস্কার হতে এবং তথাকার নিয়ামত হতে এমনই নিরাশ হয়েছে যেমন নিরাশ হয়েছে কবরবাসী কাফিররা।

পরবর্তী বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, যেমন জীবিত কাফিররা তাদের মৃত কবরবাসী কাফিরদের পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান হতে নিরাশ হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যেমন মৃত কবরবাসী কাফিররা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা মরে আখিরাতের অবস্থা অবলোকন করেছে এবং এখন তাদের কোন প্রকারের কল্যাণ লাভের আশা নেই।

সূরা ঃ মুমতাহিনাহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ সাফ্ফ মাদানী

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১৪, রুকূ' ঃ ২)

(اٰيَاتُهَا : ١٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনো কেউ দাঁড়ায়নি, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত আমাদের নিকট আসলেন এবং এক এক করে প্রত্যেককে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই একত্রিত হলে তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শুনালেন।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম।" তাতে এও রয়েছে যে, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ণ সূরাটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তেমনিভাবেই এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী তাবেয়ীকে পাঠ করে শুনান, তাবেয়ী তাঁর ছাত্রকে এবং তাঁর ছাত্র তাঁর ছাত্রকে পাঠ করে শুনান। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত উস্তাদ তাঁর শাগরিদকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেনঃ "আমরা বলেছিলাম যে, যদি আমরা এরূপ আমলের খবর জানতে পারি তবে অবশ্যই আমরা ওর উপর আমলকারী হয়ে যাবো।"

আমাকে আমার উস্তাদ শায়খুল মুসনাদ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবি তালিব হাজ্জারও (রঃ) স্বীয় সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন এবং তাতেও ক্রমিকভাবে প্রত্যেক শিক্ষকের তাঁর ছাত্রকে এই সূরাটি পাঠ করে শুনানো বর্ণিত আছে। এমনকি আমার উস্তাদও এটা তাঁর উস্তাদ হতে শুনেছেন। কিন্তু তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন এবং এটাকে মুখস্থ করার সময় পাননি বলে আমাকে পাঠ করে শুনাননি। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, আমার অন্য উস্তাদ হাফিয কাবীর আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান (রঃ) স্বীয় সনদে এ হাদীসটি আমাকে পড়াবার সময় এই সূরাটিও পূর্ণভাবে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

২। হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?

٣- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

৩। তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

٤- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

৪। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

প্রথম আয়াতের তাফসীর কয়েকবার গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা এমন কথা বলে যা নিজেরা করে না এবং ওয়াদা করার পর তা পুরো করে না। পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব। যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করার তাগিদ করুক আর নাই করুক। তাঁরা তাঁদের দলীল হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি। (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলবে এবং (তিন) তার কাছে আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করবে।" অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত

না সে তা পরিত্যাগ করে।" এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হলো ওয়াদা ভঙ্গ করা। শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলো পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

এ জন্যেই এখানেও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেনঃ তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমির ইবনে রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন, ঐ সময় আমি নাবালক ছিলাম। খেলা করার জন্যে আমি বের হলে আমার মাতা আমাকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর বান্দা! এসো, তোমাকে কিছু দিচ্ছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার মাতাকে বললেনঃ 'সত্যি কি তুমি তোমার ছেলেকে কিছু দিতে চাও?' আমার মাতা উত্তরে বললেনঃ "জ্বী হ্যাঁ, খেজুর দিতে চাই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "তাহলে ভাল, অন্যথায় জেনে রেখো যে, যদি কিছুই না দেয়ার ইচ্ছা করতে তবে মিথ্যা বলার পাপ তোমার উপর লিখা হতো (তোমাকে মিথ্যাবাদিনী হিসেবে গণ্য করা হতো)।"[১]

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি ওয়াদার সাথে ওয়াদাকৃত ব্যক্তির তাগীদের সম্পর্ক থাকে তবে ঐ ওয়াদা পুরো করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি কাউকেও বলেঃ "তুমি বিয়ে কর, আমি তোমাকে দৈনিক এতো এতো দিতে থাকবো।" তার কথা মত যদি ঐ লোকটি বিয়ে করে নেয় তবে যতদিন ঐ বিয়ে টিকে থাকবে ততদিন ঐ ব্যক্তির উপর তার ওয়াদা মুতাবিক দিতে থাকা ওয়াজিব হবে। কেননা, তাতে মানুষের এমন হকের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে গেছে যার উপর তাকে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। জমহূরে মাযহাব এই যে, ওয়াদা পূরণ করা সাধারণভাবে ওয়াজিবই নয়। এই আয়াতের জবাব তাঁরা এই দেন যে, যখন জনগণ তাদের উপর জিহাদ ফরয হওয়া কামনা করলো এবং তা তাদের উপর ফরয হয়ে গেল তখন কতক লোক ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং জিহাদ হতে বিমুখ হয়ে গেল। ঐ সময় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবু দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا - أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ -

অর্থাৎ "তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে বলা হয়েছিলঃ তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলতে লাগলোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ দেন না? বলঃ পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্যে পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও।" (৪ঃ ৭৭-৭৮) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ "মুমিনরা বলে– কেন তাদের উপর কোন সূরা অবতীর্ণ হয় না? অতঃপর যখন কোন সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয় তখন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদেরকে তুমি দেখো যে, মৃত্যুর অজ্ঞানতা যাকে পেয়ে বসেছে তার মত তারা তোমার দিকে তাকাতে রয়েছে।" (৪৭ঃ ২০) এই আয়াতটিও এই রূপই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে কতক মুমিন বলেছিলঃ 'যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এমন আমল অবশ্যপালনীয় করতেন যা তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় তাহলে কতই না ভাল হতো!' তখন মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দিলেনঃ 'আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো ঈমান, যা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং বেঈমানদের

সাথে জিহাদ করা।' এটা কতক মুমিনের নিকট খুবই ভারী বোধ হলো। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন বললেনঃ "তোমরা যা কর না তা কেন বল?" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, মুমিনরা বলেছিলঃ 'কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তবে অবশ্যই আমরা ঐ আমল করতাম।' তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে এটা জানাতে গিয়ে বলেনঃ "যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।" অতঃপর উহুদের দিন তাদের পরীক্ষা হয়ে যায়। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?" তিনি বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার পথে যুদ্ধ করেছে।'

কোন কোন গুরুজন বলেন যে, এটা ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বলতোঃ 'আমরা যুদ্ধ করেছি', অথচ তারা যুদ্ধ করেনি, বলতোঃ 'আমরা আহত হয়েছি', অথচ আহত হয়নি, বলতোঃ 'আমরা প্রহৃত হয়েছি' অথচ প্রহৃত হয়নি, বলতোঃ 'আমরা ধৈর্যধারণ করেছি', অথচ ধৈর্যধারণ করেনি, বলতোঃ 'আমাদেরকে বন্দী করা হয়েছে', অথচ তাদেরকে বন্দী করা হয়নি।

ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করতো, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতো না। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জিহাদ উদ্দেশ্য।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যাঁরা এসব কথা বলেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারী (রাঃ)-ও একজন ছিলেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং জানা গেল যে, জিহাদ হলো সবচেয়ে উত্তম আমল তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিজেকে আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিলেন। ওরই উপর তিনি কায়েম থাকেন এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান।

হযরত আবুল আসওয়াদ দাইলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ মূসা (রাঃ) একবার বসরার কারীদেরকে ডেকে পাঠান। তখন তিনশজন কারী তাঁর নিকট আগমন করেন যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কুরআনের পাঠক। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "দেখুন, আপনারা হলেন বসরাবাসীদের কারী এবং

তাদের মধ্যে উত্তম লোক। জেনে রাখুন যে, আমরা একটি সূরা পাঠ করতাম যা مُسَبِّحَات সূরাগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত ছিল। অতঃপর তা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ওর মধ্য হতে শুধু এটুকু আমার স্মরণ আছেঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! যা তোমরা কর না তা তোমরা কেন বল?" সুতরাং ওটা লিখা হবে এবং সাক্ষী হিসেবে তোমাদের গলদেশে লটকানো হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন ওটা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।' অর্থাৎ এটা হলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ যে, তিনি তাঁর ঐ মুমিন বান্দাদেরকে ভালবাসেন যারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, যাতে আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত হয়, ইসলামের হিফাযত হয় এবং তাঁর দ্বীন সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকারের লোককে দেখে আল্লাহ্ তা'আলা হেসে থাকেন। (এক) যারা রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে, (দুই) নামাযের জন্যে যারা কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হয় এবং (তিন) যুদ্ধের জন্যে যারা সারিবদ্ধ হয়।"[১]

হযরত মাতরাফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "হযরত আবূ যারের (রাঃ) রিওয়াইয়াতকৃত একটি হাদীস আমার নিকট পৌঁছে। আমার মনে বাসনা জাগলো যে, আমি স্বয়ং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখে হাদীসটি শুনবো। সুতরাং একদা আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আমার মনের বাসনা তাঁর সামনে প্রকাশ করলাম। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেনঃ "হাদীসটি কি?" আমি বললামঃ আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে শত্রু মনে করেন এবং তিন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, আমি আমার বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর কখনো মিথ্যা আরোপ করতে পারি না। সত্যিই তিনি আমাদের নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।" আমি তখন জিজ্ঞেস করলামঃ যাদের সাথে আল্লাহ পাক বন্ধুত্ব রাখেন ঐ তিন ব্যক্তি কারা? তিনি জবাবে বললেনঃ "এক তো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের সাথে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে। তুমি এর সত্যতা আল্লাহর কিতাবেও দেখতে পার।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন, তারপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।" মুসনাদে ইবনে আবি

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

হাতিমের এ হাদীসটি এভাবে এই শব্দেই এতোটুকুই বর্ণিত হয়েছে। হ্যাঁ, তবে জামে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈতে হাদীসটি পূর্ণভাবে রয়েছে এবং আমরাও এটাকে অন্য জায়গায় পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "তুমি আমার বান্দা, আমার উপর নির্ভরশীল এবং আমার নিকট পছন্দনীয়। তুমি দুশ্চরিত্র ও কর্কশভাষী নও। তুমি বাজারে শোরগোলকারী নও। মন্দের প্রতিশোধ তুমি মন্দ দ্বারা গ্রহণ কর না বরং মার্জনা ও ক্ষমা করে থাকো। তোমার জন্মস্থান মক্কা, হিজরতের স্থান তাবাহ, দেশ সিরিয়া। তোমার উম্মতের সংখ্যা অধিক যারা আল্লাহর প্রশংসাকারী। সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থলে তারা সদা আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে। সকাল বেলায় নিম্নস্বরে তাদের আল্লাহর যিক্রের শব্দ সর্বদা শোনা যায়, যেমন মৌমাছির গুন্গুন্ শব্দ। তারা তাদের গোঁফ ছেঁটে থাকে ও নখ কেটে থাকে। তারা তাদের পদনালীর অর্ধেক পর্যন্ত তাদের লুঙ্গী লটকিয়ে থাকে। জিহাদের মাঠে তাদের সারি নামাযের সারীর মত।" অতঃপর হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ....-এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। তারপর বলেনঃ "তারা সূর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যখনই এবং যেখানেই সময় হয় তারা নামায আদায় করে থাকে যদিও সওয়ারীর উপরও অবস্থান করে।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেন না। সুতরাং কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-এর অর্থ হচ্ছেঃ যুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে মিলিত অবস্থায় সারিবদ্ধ হয়। কাতাদা (রঃ) كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তুমি কি দেখনি যে, অট্টালিকা নির্মাণকারী তার অট্টালিকার কোন জায়গায় উঁচু নীচু হোক বা আঁকা বাঁকা হোক এটা সে চায় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও চান না যে, তাঁর কাজে মতভেদ হোক। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুমিনদেরকে তাদের যুদ্ধে এবং তাদের নামাযে কাতারবন্দী করেছেন। সুতরাং মুমিনদের উচিত যে, তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে চলবে। যারা তাঁর হুকুম মেনে চলবে ওটা হবে তাদের পরিত্রাণের উপায়।"

'যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।' অতঃপর হযরত আবূ বাহরিয়্যাহ (রঃ) বলেনঃ "যখন

আপনারা আমাকে দেখবেন যে, আমি কাতার বা সারির মধ্যে এদিক ওদিক ভ্রূক্ষেপ করছি তখন আপনারা আমাকে ইচ্ছামত ভর্ৎসনা ও গালিগালাজ করতে পারেন।"[১]

৫। স্মরণ কর, মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

٥- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ○

৬। স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) বলেছিলঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ (সঃ) নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসলো তখন তাঁরা বলতে লাগলোঃ এটা তো এক স্পষ্ট যাদু।

٦- وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

১. এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কওমকে বলেনঃ "হে আমার কওম! তোমরা তো আমার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছো, এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?" এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। দেখা যায় যে, তাঁকেও যখন মক্কার কাফিররা কষ্ট দেয় তখন তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর রহম করুন, তাঁকে তো এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" সাথে সাথে মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নবী (সঃ)-কে কষ্ট না দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! মূসা (আঃ)-কে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।" (৩৩ঃ ৬৯)

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 'অতঃপর যখন তারা বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন।' অর্থাৎ যখন তারা জেনে শুনে সত্যের অনুসরণ হতে সরে গিয়ে বক্র পথে চললো তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদের অন্তরকে হিদায়াত হতে সরিয়ে দিলেন এবং ওকে সন্দেহ ও বিস্ময় দ্বারা পূর্ণ করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি তাদের অন্তর ও চক্ষুগুলো ফিরিয়ে দিবো, যেমন তারা প্রথমবার এর উপর ঈমান আনেনি এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিবো।" মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার কাছে হিদায়াত প্রকাশিত হবার পর এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করবে, আমি তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দিবো যে দিকে সে ফিরে গেছে এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর ওটা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।" (৪ঃ ১১৫)

এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বলেনঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে ভাষণ তিনি বানী ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ 'হে বানী ইসরাঈল! তাওরাতে আমার (আগমনের) শুভসংবাদ হয়েছিল, আর আমি দৃঢ়ভাবে এর সত্যতা অনুমোদনকারী। এখন আমি তোমাদের সামনে একজন রাসূল (সঃ)-এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি যিনি হলেন নবী, উম্মী, মক্কী আহমাদে মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)।" সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) হলেন বানী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হলেন সমস্ত নবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে কোন নবীও আসবেন না এবং কোন রাসূলও আসবেন না। তাঁর পরে সর্বদিক দিয়েই নবুওয়াত ও রিসালাত শেষ হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী (রঃ) একটি অতি সুন্দর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছেঃ হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (সঃ), আমি আহমাদ (সঃ), আমি মা'হী, যার কারণে আল্লাহ্ কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, আমি হা'শির, আমার পায়ের উপর লোকদের হাশর হবে এবং আমি আ'কিব।"[১]

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে তাঁর বহু নামের উল্লেখ করেছেন। ওগুলোর মধ্যে আমি কয়েকটি মনে রেখেছি। তিনি বলেছেনঃ "আমি মুহাম্মাদ (সঃ), আমি আহমাদ (সঃ), আমি হা'শির, আমি মুকাফ্ফা, আমি নবীউর রহমত, আমি নবীইউত তাওবাহ এবং আমি নবীইউল মালহামাহ্।"[২]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

অর্থাৎ "যারা ঐ রাসূল নবী উম্মীর অনুসরণ করে যাকে তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায়।" (৭ঃ ১৫৭) অন্য জায়গায় আছেঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেনঃ তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেনঃ তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বললোঃ স্বীকার করলাম। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।" (৩ঃ ৮১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যাঁর কাছে এই অঙ্গীকার নেননি যে, যদি তাঁর জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) প্রেরিত হন তবে তিনি তাঁর অনুসরণ করবেন। বরং প্রত্যেক নবীর (আঃ) নিকট হতেই এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তিনি তাঁর উম্মত হতেও যেন এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

একদা সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদেরকে আপনার নিজের খবর দিন!" তখন তিনি বলেনঃ "আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর শুভসংবাদ। আর আমার মাতা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তাঁর মধ্য হতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বের হলো যার কারণে সিরিয়ার বসরা শহরের প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে উঠলো।"[১]

১. এটা ইবনে ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ উত্তম। একে মযবূতকারী অন্য সনদও রয়েছে।

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট শেষ নবী হিসেবে ছিলাম, অথচ হযরত আদম (আঃ) তখন ঠাসা মাটি রূপে ছিলেন। তোমাদেরকে আমি এর সূচনা শুনাচ্ছি। আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শুভসংবাদ এবং আমার মাতার স্বপ্ন। নবীদের মাতাদেরকে এভাবেই স্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে।"[১]

হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার কাজের সূচনা কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শুভসংবাদ এবং আমার মাতা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর মধ্য হতে এক নূর বের হয় যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশে প্রেরণ করেন। আমরা প্রায় আশিজন লোক ছিলাম যাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত জা'ফর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে মায্উন (রাঃ) এবং হযরত আবূ মূসাও (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা নাজ্জাশীর নিকট আসেন। আর ওদিকে কুরায়েশরা আমর ইবনুল আ'স এবং আম্মারাহ ইবনুল ওয়ালীদকে নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকন সহ প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে নাজ্জাশীর সামনে হাযির হয়ে তাঁকে সিজদাহ করে। তারপর ডানে বামে ঘুরে বসে পড়ে। এরপর আবেদন করেঃ "আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে কতক লোক আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে বিপথগামী হয়েছে এবং আপনার দেশে চলে এসেছে। আমাদের সম্প্রদায় আমাদেরকে আপনার দরবারে এজন্যেই পাঠিয়েছে যে, আপনি তাদেরকে আমাদের সাথে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিবেন।" নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেনঃ "তারা কোথায়?" তারা জবাব দিলোঃ "এখানেই এই শহরেই তারা রয়েছে।" তিনি তখন সাহাবীদেরকে তাঁর সামনে হাযির করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ শাহী দরবারে হাযির হলেন। হযরত জা'ফর (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেনঃ "আমি আজ তোমাদের মুখোপাত্র।" তখন সবাই তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি সভাষদবর্গকে সালাম দিলেন, কিন্তু

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি সিজদাহ করলেন না। সভাষদবর্গ তখন বললোঃ "তুমি সিজদাহ্ করলে না কেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া কাউকেও সিজদাহ করি না।" তারা প্রশ্ন করলোঃ "কেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট তাঁর রাসূল (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন নামায পড়ি, যাকাত আদায় করি।" এখন আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) আর কথা না বলে থাকতে পারলেন না, তিনি চিন্তা করলেন যে, এসব কথা হয়তো বাদশাহ ও তাঁর সভাষদবর্গের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। তাই তিনি বাদশাহকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর কথার মাঝে বলে উঠলেনঃ "জনাব! হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে এদের আকীদা বা বিশ্বাস আপনাদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত।" তখন বাদশাহ্ হযরত জা'ফর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেনঃ "হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে তোমাদের আকীদা কি?" হযরত জা'ফর (রাঃ) জবাবে বললেনঃ "এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা ওটাই যা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ, যা তিনি কুমারী ও সতী-সাধ্বী নারী হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁকে কখনো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।" বাদশাহ্ এ ভাষণ শুনে ভূমি হতে একটি কুটা উঠিয়ে নিয়ে বললেনঃ "হে হাবশের অধিবাসী! হে বক্তাগণ! হে বিদ্বানমণ্ডলী! হে দরবেশবৃন্দ! এই ব্যাপারে এই লোকদের (মুসলমানদের) এবং আমাদের আকীদা একই। আল্লাহর কসম! এই ব্যাপারে এদের আকীদা এবং আমাদের আকীদার মধ্যে এই কুটা পরিমাণও পার্থক্য নেই। হে মুহাজিরদের দল! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে এবং ঐ রাসূল (সঃ)-কেও আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি যাঁর নিকট হতে তোমরা এসেছো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনিই ঐ রাসূল যাঁর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইঞ্জীলে পড়েছি। ইনিই ঐ নবী যাঁর সুসংবাদ আমাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) প্রদান করেছেন। আমার পক্ষ হতে তোমাদেরকে আমার দেশে তোমাদের ইচ্ছামত যে কোন জায়গায় বসবাস করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হলো। আল্লাহর কসম! যদি আমার উপর দেশ পরিচালনার ঝামেলাযুক্ত দায়িত্ব অর্পিত না থাকতো তবে এখনই আমি এই রাসূল (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর জুতা বহন করতাম, তাঁর সেবা করতাম এবং তাঁকে অযু করিয়ে দিতাম।" এটুকু বলে তিনি ঐ দুই জন কুরায়েশীকে তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এই মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তাড়াতাড়ি করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন এবং তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন। তিনি ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নাজ্জাশী বাদশাহর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই পূর্ণ ঘটনাটি হযরত জা'ফর (রাঃ) ও হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আমাদের তাফসীরের বিষয়বস্তুই আলাদা। তাই আমরা এ ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। বিস্তারিত আলোচনা সীরাতের কিতাবগুলোতে দ্রষ্টব্য। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) বরাবরই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থেকেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ উম্মতকে নিজ নিজ কিতাব হতে তাঁর গুণাবলী শুনিয়েছেন। আর তাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার ও তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। হ্যাঁ, তবে তাঁর কাজের খ্যাতি জগতবাসীর কাছে ছড়িয়ে পড়েছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর পর, যিনি সমস্ত নবীর পিতা ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর আরো অধিক খ্যাতির কারণ হয় হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ। যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর নবুওয়াতের বিষয়টির সম্পর্ক হযরত খালীল (আঃ)-এর দু'আ ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের দিকে করেছিলেন তার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এ দুটোর সাথে তাঁর স্বীয় সম্মানিতা মাতার স্বপ্নের উল্লেখ করার কারণ এই ছিল যে, মক্কাবাসীর মধ্যে তাঁর খ্যাতির সূচনার কারণ এই স্বপ্নই ছিল। তাঁর উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসলো তখন তারা বলতে লাগলোঃ এটা তো এক স্পষ্ট যাদু।' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এতো খ্যাতি এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও যখন তিনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা অর্থাৎ কাফিররা ও বিরোধীরা বলে উঠলোঃ এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

৭- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৭। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৮। তারা আল্লাহর নূর ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

৯। তিনিই তাঁর রাসূল (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

٨- يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ۝

٩- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ ع

মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেউই হতে পারে না। সে যদি বে-খবর হতো তবে তো একটা কথা ছিল, কিন্তু তার তো অবস্থা এই যে, তাকে তাওহীদ ও ইখলাসের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান করা হচ্ছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরনের যালিম তার ভাগ্যে হিদায়াত আসবে কোথা হতে? তাদের চাহিদা এই যে, তারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা হারিয়ে ফেলবে। তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি সূর্যের রশ্মিকে মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। এটা যেমন অসম্ভব যে, তাদের মুখের ফুঁ দ্বারা সূর্যের আলো নিভে যাবে ঠিক তদ্রূপ এটাও অসম্ভব যে, এই কাফিরদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন দুনিয়ার বুক হতে মুছে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ এই ফায়সালা করেছেন যে, তিনি তাঁর নূরকে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। আর তিনিই তাঁর রাসূল (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

এই দুটি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে বারাআতে গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে এবং আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

১০। হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?

١٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

১১। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।

١٢- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরোও একটি অনুগ্রহঃ আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।

١٣- وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পূর্বে গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?" তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এতে তিনি বলেনঃ এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দিই যাতে ক্ষতির কোনই

সম্ভাবনা নেই। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর একত্বে ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এই ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা হতে বহুগুণে উত্তম। যদি তোমরা এই ব্যবসায়ে হাত দাও তবে তোমাদের পদস্খলন ও পাপ-অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিবো। আর তোমাদেরকে দাখিল করবো এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে প্রবিষ্ট করবো স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। বিশ্বাস রেখো যে, মহাসাফল্য এটাই।

আরো জেনে রেখো যে, তোমরা সদা তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে থাকো, এই মুকাবিলার সময় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে থাকবো এবং তোমাদের ঈপ্সিত বিজয় দান করবো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলো স্থির রাখবেন।" (৪৭ঃ ৭) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।" (২২ঃ ৪০) দুনিয়ার এই সাহায্য ও বিজয় এবং আখিরাতের ঐ জান্নাত ও নিয়ামত ঐ লোকদের জন্যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের কাজে সদা লেগে থাকে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করে। তাই তো তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি আমার পক্ষ হতে মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।

১৪। হে মুমিনগণ! আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) বলেছিল তার শিষ্যদেরকেঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যগণ বলেছিলঃ আমরাই তো

١٤- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ

الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَیَّدْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِیْنَ ۝

আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হলো।

মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সদা-সর্বদা জান-মাল, ইজ্জত-আবরূ, কথা এবং কাজ দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ডাকে সাড়া দেয়, যেমন হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর পথে কে আমাকে সাহায্যকারী হবে? অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজে কে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। অর্থাৎ আল্লাহর এই দ্বীনের কাজে আমরাই আপনার সঙ্গী হিসেবে কাজ করবো, আপনাকে সাহায্য করবো ও আপনার অনুসারী হিসেবে থাকবো। তখন হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে প্রচারক হিসেবে সিরিয়ার শহরগুলোতে পাঠিয়ে দেন।

হজ্বের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও বলেছিলেনঃ "এমন কেউ আছে কি যে আমাকে জায়গা দিতে পারে যাতে আমি আল্লাহর রিসালাতকে জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি? কুরায়েশরা তো আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজে বাধা প্রদান করেছে।" তখন মদীনার অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে মহান আল্লাহ এই সৌভাগ্যের অধিকারী করেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁর কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের বাসভূমিতে চলে যান তবে কোনক্রমেই তাঁরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন হতে দিবেন না। তাঁরা তাঁর পক্ষ হতে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাঁকে রক্ষা করবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাঁর সঙ্গীগণসহ হিজরত করে তাঁদের বাসভূমি মদীনা নগরীতে পৌঁছলেন তখন বাস্তবিকই তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং তাঁদের কথাকে বাস্তবে রূপদান করলেন। এ কারণেই তাঁরা 'আনসার' এই মহান

উপাধিতে ভূষিত হন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো' অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীদেরকে নিয়ে দ্বীনের তাবলীগ করতে শুরু করলেন তখন বানী ইসরাঈলের কিছু লোক সঠিক পথে এসে গেল, আর কিছু লোক এপথে আসলো না। এমনকি তারা তাঁকে এবং তাঁর সতী-সাধ্বী মাতার প্রতি জঘন্যতম অপবাদ রচনা করলো। এই ইয়াহূদীদের উপর চিরতরে আল্লাহর গযব পতিত হলো। আবার যারা তাঁকে মেনে নিলো তাদের মধ্যে একটি দল মানার ব্যাপারে সীমালংঘন করলো এবং তাঁকে তার মর্যাদার চেয়েও বাড়িয়ে দিলো। এদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল হয়ে গেল। একটি দল বলতে লাগলো যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। অন্য একটি দল বললো যে, হযরত ঈসা (আঃ) তিনজনের একজন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদস। আর একটি দল তো তাঁকে আল্লাহ্ বলেই স্বীকার করে নিলো। এসবের আলোচনা সূরায়ে নিসায় বিস্তারিতভাবে রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের শত্রু খৃষ্টানদের উপর বিজয়ী করলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন হযরত ঈসা (আঃ) গোসল করে পাক সাফ হয়ে স্বীয় সহচরদের নিকট আসলেন। ঐ সময় তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তাঁর সহচরগণ ছিলেন বারোজন। তাঁরা একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে এসেই বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে আমার উপর ঈমান এনেছে বটে কিন্তু পরে কুফরী করবে। একবার নয়, বরং বারো বার।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে এই ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে যে, তাকে আমার চেহারার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমার পরিবর্তে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে, অতঃপর সে জান্নাতে আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে?" তাঁর একথার জবাবে তাঁদের মধ্যে বয়সে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি বললেনঃ "আমি এ জন্যে প্রস্তুত আছি।" হযরত ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "তুমি বসে পড়।" অতঃপর পুনরায় তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ঐ যুবকটি দাঁড়িয়ে বললেনঃ "আমিই এজন্যে প্রস্তুত।" হযরত ঈসা (আঃ) এবারও তাঁকে বসে যেতে বললেন। তৃতীয়বার হযরত ঈসা (আঃ) ঐ কথাই বললেন এবং

তৃতীয়বারও ঐ যুবকটিই দাঁড়িয়ে সম্মতি জানালেন। এবার তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, বেশ!" তৎক্ষণাৎ তাঁর আকৃতি সম্পূর্ণরূপে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে গেল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে ঐ ঘরের একটি ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হলো। হযরত ঈসা (আঃ)-কে অনুসন্ধানকারী ইয়াহূদীরা দৌড়িয়ে আসলো এবং ঐ যুবকটিকে ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করলো ও হত্যা করে শূলে চড়িয়ে দিলো। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐ অবশিষ্ট এগারোজন লোকের মধ্য হতে কেউ কেউ বারো বার কুফরী করলো, অথচ ইতিপূর্বে তারা ঈমানদার ছিল।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-কে মান্যকারী বানী ইসরাঈলের দলটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি দল বললোঃ "স্বয়ং আল্লাহ হযরত (হযরত ঈসা আঃ-এর আকৃতিতে) যতদিন ইচ্ছা করেছিলেন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশে উঠে গেলেন।" এই দলটিকে ইয়াকূবিয়্যাহ বলা হয়। দ্বিতীয় দলটি বললোঃ "আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের মাঝে ছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন।" এই দলটিকে বলা হয় নাসতুরিয়্যাহ। তৃতীয় দলটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের আকীদাহ্ বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাদের মধ্যে ছিলেন, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এই দলটি হলো মুসলিম দল।

অতঃপর ঐ কাফির দল দুটির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঐ মুসলিম দলটিকে মেরে পিটে হত্যা ও ধ্বংস করতে শুরু করে। অবশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈলের ঐ মুসলিম দলটি তাঁর উপরও ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং এই ঈমানদার দলটিকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিজয়ী হওয়া এবং দ্বীন ইসলামের অন্যান্য দ্বীনগুলোকে পরাজিত করাই হলো তাদের বিজয়ী হওয়া ও তাদের শত্রুদের উপর জয়লাভ করা।"[১]

সুতরাং এই উম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সদাসর্বদা বিজয়ীই থাকবে, শেষ পর্যন্ত কিয়ামত এসে যাবে এবং এই উম্মতের শেষের লোকগুলো হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী হয়ে মাসীহ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, যেমন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ঃ সাফ্ফ -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এটা তাফসীরে ইবনে জারীরে ও সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরাঃ জুমুআ'হ্ মাদানী

(আয়াতঃ ১১, রুকূ'ঃ ২)

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢

সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমআহ্র নামাযে সূরায়ে জুমআ'হ্ ও সূরায়ে মুনাফিকূন পাঠ করতেন।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্র, যিনি অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

২। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

٢- هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩। আর তাদের অন্যান্যের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪। এটা আল্লাহ্রই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

٤- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্ট সব কিছু বাকশক্তি সম্পন্ন হোক বা নির্বাক হোক, সদা-সর্বদা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মগ্ন রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ -

অর্থাৎ "এমন কোন জিনিস নেই যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে না।" (১৭ঃ ৪৪) সমস্ত মাখলূক, আসমানেরই হোক বা যমীনেরই হোক, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল রয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্ এবং এ দু'টির মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে স্বীয় ব্যবস্থাপনা ও হুকুম জারীকারী। তিনি সর্ব প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দোষ মুক্ত এবং সমস্ত উত্তম গুণাবলী ও বিশেষণের সাথে বিশেষিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এর তাফসীর কয়েক জায়গায় গত হয়েছে।

উম্মী দ্বারা আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّیّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" (৩ঃ ২০)

এখানে আরবের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অনারব এর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং কারণ শুধু এটাই যে, তাদের উপর অন্যদের তুলনায় ইহ্সান ও ইকরাম বহুগুণে বেশী রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এটা তোমার জন্যে ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে উপদেশ।" (৪৩ঃ ৪৪) এখানেও কওমকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, কুরআন সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে উপদেশ। অনুরূপভাবে আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ

অর্থাৎ "তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন কর।" (২৬ঃ ২১৪) এখানেও উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভীতি প্রদর্শন

শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যেই খাস, বরং তাঁর সতর্ককরণ তো সাধারণভাবে সবারই জন্যে। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ!) তুমি বলঃ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহর রাসূল (রূপে এসেছি)।" (৭ঃ ১৫৮) আর এক জায়গায় আছে ঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

অর্থাৎ "এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবো এবং তাদেরকেও, যাদের কাছে পৌঁছবে।" (৬ঃ ১৯) অনুরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থাৎ "সমস্ত দলের মধ্যে যে কেউই এটাকে অস্বীকার করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" (১১ঃ ১৭) এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সারা বিশ্ববাসীর জন্যে রাসূল। সমস্ত মাখলূকের তিনি নবী, তারা লাল হোক না কালোই হোক। সূরায়ে আনআ'মের তাফসীরে আমরা এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি এবং বহু আয়াত ও হাদীসও আনয়ন করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্রই জন্যে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, ঐ নিরক্ষর অর্থাৎ আরবদের মধ্যে তিনি স্বীয় রাসূল (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন। এটা এই জন্যে যে, যেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ কবূল হওয়া জানা যায়। তিনি মক্কাবাসীর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ দু'আ কবূল করেন।

ঐ সময় সমস্ত মাখলূকের জন্যে আল্লাহ্র নবীর কঠিন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আহ্লে কিতাবের শুধুমাত্র কতক লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ইফরাত ও তাফরীত হতে বেঁচে ছিলেন। তাঁরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সত্য দ্বীনকে ভুলে বসেছিল এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি ঐ নিরক্ষরদেরকে আল্লাহ্র

আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনালেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করলেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল।

আরবরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের দাবীদার ছিল বটে, কিন্তু অবস্থা এই ছিল যে, তারা ঐ দ্বীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বদল করে ফেলেছিল। তারা ঐ দ্বীনের মধ্যে এতো বেশী পরিবর্তন আনয়ন করেছিল যে, তাওহীদ শিরকে এবং বিশ্বাস সন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছিল। তারা নিজেরাই বহু কিছু বিদআত আবিষ্কার করে নিয়ে আল্লাহ্র দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবও তাদের কিতাবগুলো বদলিয়ে দিয়েছিল, সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হয়রত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আযীমুশ শান শরীয়ত এবং পরিপূর্ণ দ্বীনসহ দুনিয়াবাসীর নিকট প্রেরণ করেন, যেন তিনি এই গোলযোগ মিটিয়ে দিতে পারেন। যেন তিনি আহলে কিতাবের নিকট মহান আল্লাহর আসল আহকাম পৌঁছিয়ে দেন, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম জনগণকে জানিয়ে দেন, এমন আমল তাদেরকে বাতলিয়ে দেন যা তাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করাবে, তিনি সমস্ত মাখলূকের জন্যে পথ প্রদর্শক হন, শরীয়তের মূল ও শাখা সবই শিক্ষা দেন, ছোট বড় কোন কথা ও কাজ না ছাড়েন, সবারই সমস্ত শক-সন্দেহ দূর করে দেন এবং জনগণকে এমন দ্বীনের উপর আনয়ন করেন যার মধ্যে সর্বপ্রকারের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে।

এসব মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গী একত্রিত করেন যা না তাঁর পূর্বে কারো মধ্যে ছিল এবং না তাঁর পরে কারো মধ্যে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ্ সদা-সর্বদা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন!

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পার্শ্বে বসেছিলাম এমন সময় তাঁর উপর সূরায়ে জুমআহ্ অবতীর্ণ হয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?" কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনবার এই প্রশ্ন করা হয়। আমাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসীও (রঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাতখানা হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) উপর রেখে বললেনঃ "ঈমান যদি সারিয়্যা নক্ষত্রের নিকট হতো তাহলেও এই লোকগুলোর মধ্যে এক বা কয়েক ব্যক্তি এটা পেয়ে যেতো।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ আবদিল্লাহ্ বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ রিওয়াইয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা এবং এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে নবী, শুধু আরববাসীদের জন্যে নয়। কেননা, তিনি এই আয়াতের তাফসীরে পারস্যবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ জন্যেই তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) পারস্য ও রোমের সম্রাটদের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও বলেন যে, এর দ্বারা অনারবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর অহীর সত্যতা স্বীকার করেছে।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ "এখন হতে নিয়ে বংশানুক্রমে তিন পুরুষ (পিঁড়ী) পর্যন্ত আগমনকারী আমার উম্মতের নারী ও পুরুষরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতঃপর তিনি وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ .... এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[১]

'তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ তিনি স্বীয় শরীয়ত ও তকদীর নির্ধারণে প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানময়।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ 'এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা এটা তিনি দান করেন। আল্লাহ তো বড় অনুগ্রহশীল।' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এরূপ আযীমুশ শান নবুওয়াত দান করা এবং এই মহান অনুগ্রহে অনুগৃহীত করা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

٥- مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫। যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৬। বলঃ হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٦- قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
৭। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।	٧- وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○
৮। বলঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।	٨- قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ع

এই আয়াতগুলোতে ইয়াহূদীদেরকে নিন্দে করা হচ্ছে যে, তাদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয় এবং আমল করার জন্যে তারা তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমল করেনি। ঘোষিত হচ্ছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গর্দভ। যদি গর্দভের উপর কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তবে সে তো এটা বুঝতে পারবে যে, তার উপর বোঝা রয়েছে, কিন্তু কি বোঝা রয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে পারবে না। অনুরূপভাবে এই ইয়াহূদীরা বাহ্যিকভাবে তো তাওরাতের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করছে, কিন্তু মতলব কিছুই বুঝে না। এর উপর তারা আমল তো করেই না, এমন কি একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ফেলছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা এ নির্বোধ ও অবুঝ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা, মহান আল্লাহ এদেরকে বোধশক্তিই দান করেননি। কিন্তু এ লোকগুলোকে তো তিনি বোধশক্তি দিয়েছেন, অথচ তারা তা ব্যবহার করে না ও কাজে লাগায় না। এ জন্যেই অন্য আয়াতে বলেছেনঃ

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ـ

অর্থাৎ "তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট! তারাই গাফিল।" (৭ঃ ১৭৯)

এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট। তারা অত্যাচারী এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমআ'হ্র দিন ইমামের খুৎবাহ দান অবস্থায় কথা বলে সে পুস্তক বহনকারী গর্দভের মত এবং যে ব্যক্তি তাকে বলেঃ 'চুপ কর' তার জুমআ'হ্ হয় না।"[১]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' অর্থাৎ হে ইয়াহূদীদের দল! যদি তোমাদের দাবী এই হয় যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছো আর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর সহচরবৃন্দ অসত্যের উপর রয়েছেন তবে তোমরা প্রার্থনা করঃ আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা অসত্যের উপর রয়েছে তাকে যেন আল্লাহ মৃত্যু দান করেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'কিন্তু তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না।' অর্থাৎ যারা যে কুফরী, যুল্ম ও পাপের কাজ করেছে সেই কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না।

আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সূরায়ে বাকারার নিম্নের আয়াতগুলোর তাফসীরে ইয়াহূদীদের সাথে মুবাহালার পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছেঃ "বলঃ যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যেই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর– যদি সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্যে তারা কখনো ওটা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে অবহিত। তুমি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে সহস্র বছর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ ওর দ্রষ্টা।" সূরায়ে আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টানদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বলঃ এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দিই আল্লাহর লা'নত।" আর মুশরিকদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে সূরায়ে মারইয়ামের নিম্নের আয়াতে "বলঃ যারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জেহেল (আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন!) বলেঃ "আমি যদি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে কা'বার নিকট দেখতে পাই তবে অবশ্যই তার গর্দান পরিমাপ করবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেনঃ "যদি সে এরূপ করতো তবে অবশ্যই ফেরেশতাগণ জনগণের চোখের সামনে তাকে পাকড়াও করতেন। আর যদি ইয়াহূদীরা মৃত্যু কামনা করতো তবে অবশ্যই তারা মরে যেতো এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখে নিতো। আর আল্লাহর সাথে যারা মুবাহালা করতে চেয়েছিল তারা যদি মুবাহালার জন্যে বের হতো তবে অবশ্যই তারা এমন অবস্থায় ফিরে আসতো যে, তাদের পরিবারবর্গ এবং মাল-ধন তারা পেতো না।"[১]

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উক্তিঃ 'বলঃ (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।' যেমন সূরায়ে নিসার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি রয়েছেঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ـ

অর্থাৎ "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।"

তিবরানী (রঃ)-এর মু'জাম গ্রন্থে হযরত সমরা' (রাঃ) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ খেঁকশিয়াল যার কাছে ভূমি তার প্রদত্ত ঋণ চায়। তখন সে দ্রুত বেগে পালাতে

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

শুরু করে। শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন ভূমি তাকে বলেঃ "হে খেঁকশিয়াল! আমাকে আমার ঋণ দিয়ে দাও।" একথা শুনে সে পুনরায় লেজগুটিয়ে ভীষণ বেগে দৌড়াতে শুরু করে। অবশেষে তার গর্দান ভেঙ্গে যায় এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

৯। হে মুমিনগণ! জুমআ'হ্র দিনে যখন নামাযের জন্যে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১০। নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।

١٠- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

جُمُعَة শব্দটি جَمْع শব্দ হতে বের করা হয়েছে, কারণ এই যে, এই দিনে মুসলমানরা বড় বড় মসজিদে ইবাদতের জন্যে জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে। আর এটিও একটি কারণ যে, এই দিনে সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি-কার্য পূর্ণ হয়েছিল। ছয় দিনে সারা জগত বানানো হয়। ষষ্ঠ দিন ছিল জুমআর দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই জান্নাতে তাঁর অবস্থান ঘটে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, ঐ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যা যাজ্ঞা করা হয় তা-ই তিনি দান করে থাকেন।

হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে সালমান (রাঃ)! জুমআ'হ্র দিন কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্ এবং

তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জমুআ'হ্র দিন এমন এক দিন যে, এ দিনে তোমাদের পিতা-মাতাকে (হযরত আদম আঃ ও হযরত হাওয়া আঃ কে) আল্লাহ একত্রিত করেন।" অথবা বলেনঃ "তোমাদের পিতাকে (হযরত আদমকে আঃ) জমা করেন।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে (মাওকুফরূপেও) অনুরূপ বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রাচীন অভিধানে এটাকে ইয়াওমুল আরূবাহ বলা হতো। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও প্রতি সাতদিনে একটি দিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জুমআর দিনের হিদায়াত তারা লাভ করেনি। ইয়াহূদীরা শনিবারকে পছন্দ করে যেদিন মাখলূকের সৃষ্টি কার্য শুরুই হয়নি। নাসারাগণ রবিবারকে পছন্দ করে যেই দিন মাখলূক সৃষ্টির সূচনা হয়। আর এই উম্মতের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জুমআ'হ্কে পছন্দ করেছেন যেই দিন তিনি মাখলূকের সৃষ্টিকার্য পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামতের দিন আমরা সর্বাগ্রে হবো। যাদেরকে আমাদের পূর্বে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয় তারা এ দিনের ব্যাপারে মতভেদ করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারেও তারা আমাদের পিছনে রয়েছে। ইয়াহূদীরা আগামী কাল এবং খৃষ্টানরা আগামী কালের পরের দিন।" এটা সহীহ বুখারীর শব্দ আর সহীহ মুসলিমের শব্দ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা জুমআ'হ্ হতে ভ্রষ্ট করেছেন আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। ইয়াহূদীদের জন্যে ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্যে ছিল রবিবার। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আনয়ন করেন এবং জুমআ'হ্র জন্যে আমাদেরকে হিদায়াত দান করেন। সুতরাং তিনি রেখেছেন শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার। এভাবে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা কিয়ামতের দিন আমাদের পিছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীর হিসেবে আমরা শেষে রয়েছি। কিন্তু কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা জুমআ'হ্র দিন স্বীয় মুসলিম বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্যে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। سَعْیٌ দ্বারা এখানে দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছেঃ তোমরা আল্লাহর যিকর অর্থাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বেরিয়ে পড়, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মসজিদ পানে অগ্রসর হও। যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ـ

অর্থাৎ "মুমিন অবস্থায় যে আখিরাতের কামনা করে এবং ওর জন্যে চেষ্টা সাধনা করে।" (১৭ঃ ১৯)

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআত فَاسْعَوْا এর স্থলে فَامْضُوْا রয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, নামাযের জন্যে দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা ইকামত শুনলে নামাযের জন্যে ধীরে সুস্থে যাবে, দৌড়াবে না। নামাযের যে অংশ (জামাআতের সাথে) পাবে তা পড়ে নিবে এবং যা ছুটে যাবে তা পুরো করবে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে ছিলেন এমতাবস্থায় তিনি দরযার কাছে জনগণের পায়ের জোর শব্দ শুনতে পান। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যাপার কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তাড়াতাড়ি করে নামাযে শরীক হয়েছি।" তখন তিনি বললেনঃ "না, না, এরূপ করো না। ধীরে সুস্থে নামাযে আসবে। যা পাবে পড়বে এবং যা ছুটে যাবে তা পুরো করে নিবে।" হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! এখানে এ হুকুম কখনো নয় যে, মানুষ নামাযের জন্যে দৌড়িয়ে আসবে। এটা তো নিষেধ। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে নামায পড়া। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ স্বীয় মন ও আমল দ্বারা চেষ্টা কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ـ অর্থাৎ "যখন তিনি (হযরত ইসমাঈল আঃ) এমন বয়সে পদার্পণ করলেন যে, তাঁর সাথে (হযরত ইবরাহীম আঃ এর সাথে) চলাফেরা করতে সক্ষম হলেন।"(৩৭ঃ ১০২) জুমআ'হ্র নামাযের জন্যে আগমনকারীর জুমআ'হ্র পূর্বে গোসল করা উচিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন জুমআ'হ্র জন্যে আসবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়। এ দু' গ্রন্থেই হযরত আবূ সাঈদ

(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জুমআর দিন প্রত্যেক মুসলমানের উপর গোসল ওয়াজিব।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর হক এই যে, সে প্রতি সাত দিনে এক দিন গোসল করবে, যাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।"[১]

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল রয়েছে এবং তা হলো জুমআর দিন।"[২]

হযরত আউস ইবনে আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমআ'হ্র দিন ভালভাবে গোসল করে এবং সকালেই মসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, সওয়ার হয় না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে খুৎবাহ শুনে এবং বাজে কথা বলে না, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের রোযা ও সারা বছরের কিয়ামের (রাত্রে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার) পুণ্য লাভ করে।"[৩]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জুমআ'হ্র দিন যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থার গোসলের ন্যায় গোসল করে আওয়াল বা প্রথম সময়ে মসজিদে গেল সে যেন একটা উট কুরবানী করলো, যে দ্বিতীয় সময়ে হাযির হলো সে যেন একটা গরু কুরবানী করলো, যে তৃতীয় সময়ে পৌঁছলো সে একটা মেষ কুরবানী করার সওয়াব পেলো, যে হাযির হলো চতুর্থ ওয়াক্তে সে যেন সাদকাহ করলো একটা মোরগ এবং যে হাযির হলো পঞ্চম ওয়াক্তে, একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদকাহ করার মত পুণ্য সে লাভ করলো। অতঃপর যখন ইমাম (খুৎবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন ফেরেশতামণ্ডলী হাযির হয়ে যিক্র শুনতে থাকেন।"[৪]

জুমআ'হ্র দিন স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র হয়ে জুমআ'হ্র নামাযের জন্যে আসা উচিত। একটি হাদীসে গোসলের বর্ণনার সাথে সাথেই মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহারের বর্ণনাও রয়েছে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম হিব্বান (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি আহলে সুনানে আরবাআহ ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে খুবই উত্তম বলেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমআ'হ্র দিন গোসল করে ও স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে সুগন্ধি মাখায় যদি থাকে, অতঃপর ভাল কাপড় পরিধান করে মসজিদে আসে ও ইচ্ছা হলে কিছু নফল নামায পড়ে নেয় এবং কাউকেও কষ্ট দেয় না (অর্থাৎ কারো ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না ও কোন উপবিষ্ট লোককে উঠায় না), অতঃপর ইমাম এসে খুৎবাহ শুরু করলে নীরবে তা শুনতে থাকে, তার এই জুমআ'হ্ হতে পরবর্তী জুমআ'হ্ পর্যন্ত যত পাপ হয় সবই কাফফারা বা মাফ হয়ে যায়।"[১]

সুনানে আবূ দাউদে ও সুনানে ইবনে মাজা হতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দৈনন্দিনের পরিশ্রমের কাপড় ছাড়া দু'টি কাপড় ক্রয় করে নিয়ে জুমআ'হ্র নামাযের জন্যে খাস বা নির্দিষ্টি করে রাখে তবে ক্ষতি কি?" একথা তিনি ঐ সময় বলেন যখন দেখেন যে, জনগণ সাধারণ কাপড় পরিধান করে রয়েছে। তাই তিনি বলেন যে, শক্তি থাকলে কেন এরূপ করবে না?

এ আয়াতে যে আযানের বর্ণনা রয়েছে ওর দ্বারা ঐ আযান উদ্দেশ্য যা ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর দেয়া হয়। নবী (সঃ)-এর যুগে এ আযান ছিল। যখন নবী (সঃ) বাড়ী হতে বেরিয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করতেন তখন তাঁর সামনে এই আযান দেয়া হতো। এর পূর্ববর্তী আযান নবী (সঃ)-এর যুগে ছিল না। আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই আযান চালু করেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, নবী (সঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-এর যুগে জুমুআ'হ্র আযান শুধু ঐ সময় হতো যখন ইমাম খুৎবাহ দেয়ার জন্যে মিম্বরে বসতেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তখন তিনি এই দ্বিতীয় আযান একটি পৃথক স্থানের উপর বলিয়ে নেন। ঐ স্থানটির নাম ছিল যাওরা, মসজিদের নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গা এটাই ছিল।

হযরত মাকহূল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম জুমআ'হ্র খুৎবার জন্যে বেরিয়ে আসতেন তখনই শুধু মুআযযিন আযান দিতেন। এর পর শুধু তাকবীর দেয়া হতো এবং মুসল্লীগণ নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এই সময়েই ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। হযরত উসমান (রাঃ) শুধু লোক জমা করবার জন্যেই প্রথম আযান চালু করেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

জুমআ'হ্য় হাযির হওয়ার হুকুম শুধু আযাদ-পুরুষদের উপর রয়েছে। নারী, গোলাম ও শিশুদের উপর এ হুকুম নেই। রুগ্ন, মুসাফির এবং অন্যান্য মাযুর ব্যক্তিদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। যেমন ফুরূর কিতাব সমূহের মধ্যে এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।' অর্থাৎ বেচা-কেনা ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও।

উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে একমত যে, জুমআ'হ্র দিন যখন আযান হয়ে যাবে তখন এর পরে বেচা-কেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। তবে দাতা যখন দিবে তখন সেটাও শুদ্ধ হবে কি-না এই ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, ওটাও শুদ্ধ হবে না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ বেচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর যিকর ও নামাযের দিকে তোমাদের গমন তোমাদের জন্যে শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। হ্যাঁ, তবে যখন তোমাদের নামায পড়া হয়ে যাবে তখন সেখান হতে চলে যাওয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে লেগে পড়া তোমাদের জন্যে বৈধ।

আরাক ইবনে মালিক (রাঃ) জুমআ'হ্র নামায হতে ফারেগ হয়ে মসজিদের দরযার উপর দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি ও আপনার হুকুম অনুযায়ী এই সমাবেশ হতে উঠে এসেছি (ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি), সুতরাং আপনি আমাকে আপনার অনুগ্রহ দান করুন, আপনি তো সর্বোত্তম রিযকদাতা।"[১]

এই আয়াতকে সামনে রেখে পূর্বযুগীয় কয়েকজন মনীষী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন নামাযের পরে ক্রয়-বিক্রয় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্তর গুণ বেশী বরকত দান করবেন।

১. এটা ইমাম ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থাতেও আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার লাভের মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়বে না যে, পরকালের লাভের কথা একেবারে ভুলে যাবে। এজন্যেই হাদীসে এসেছেঃ "যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে পাঠ করেঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে এক লক্ষ পুণ্য লিখে নেন এবং এক লক্ষ পাপ ক্ষমা করে থাকেন।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিকরকারী হতে পারে যখন সে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর যিকর করে।

١١- وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَاْ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

১১। যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বলঃ আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।

জুমআহ্র দিন মদীনায় ব্যবসার মাল আসার কারণে যেসব সাহাবী খুৎবাহ ছেড়ে দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন যে, এই সব লোক যখন কোন ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন ওদিকে ছুটে যায় এবং নবী (সঃ)-কে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেয়। হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল দাহইয়া ইবনে খালফিয়্যাহ (রাঃ)-এর ব্যবসার মাল। তিনি জুমআ'হ্র দিন ব্যবসার মালসহ মদীনায় আগমন করেন এবং খবর প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি।

ঢোলের শব্দ শুনে মাত্র কয়েকজন ছাড়া সবাই মসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী সবাই ঐ বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে ছুটে যান। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আবূ ইয়ালায় হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণিত আছে তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যদি তোমরা সবাই চলে যেতে এবং তোমাদের একজনও বাকী না থাকতো তবে যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উপত্যকা আগুন হয়ে তোমাদের উপর পতিত হতো।" যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট রয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-ও ছিলেন।

এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, জুমআ'হ্র খুৎবা দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির ইবনে সামরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) জুমআ'হ্র দিন দুটি খুৎবাহ পাঠ করতেন, মাঝে বসতেন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। এখানে একথাটিও স্মরণ রাখার বিষয় যে, কারো কারো মতে এটা হলো ঐ সময়ের ঘটনা যখন নবী (সঃ) জুমআ'হ্র নামাযের পরে খুৎবাহ পাঠ করতেন।

মারাসীলে আবি দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুৎবাহর পূর্বে জুমআ'হ্র নামায পড়তেন, যেমন ঈদের নামায পড়া হয়। একদা তিনি খুৎবাহ দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি লোক এসে বললোঃ "দাহিয়্যাহ্ খালফিয়্যাহ (রাঃ) ব্যবসার মাল নিয়ে এসেছে।" একথা শোনামাত্রই কয়েকজন ছাড়া সবাই উঠে যান।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণকে জানিয়ে দাও যে, আখিরাতের সাওয়াব, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ক্রয়-বিক্রয় ও খেল-তামাশা হতে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহর উপর ভরসা করে অনুমতিযুক্ত সময়ে যে ব্যক্তি রিযক তলব করবে, আল্লাহ তাকে উত্তমরূপে রিযক দান করবেন।

সূরা ঃ জুম'আ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ মুনাফিকূন মাদানী

(আয়াতঃ ১১, রুকূ'ঃ ২)

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا: ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তখন তারা বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١- اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ○

২। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!

٢- اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩। এটা এই জন্যে যে, তারা ঈমান আনবার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৪। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা

٤- وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ ○

শ্রবণ কর যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তারা নবী (সঃ)-এর নিকট আসে তখন শপথ করে করে ইসলাম প্রকাশ করে এবং তাঁর রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর ইসলাম হতে বহু দূরে রয়েছে। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর নবী এবং মুনাফিকদের উক্তিও এটাই, কিন্তু তাদের অন্তরে এর কোন ক্রিয়া নেই। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ এই মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে কসম খেয়ে খেয়ে তোমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস রেখো যে, তাদের এই কসমের কোনই মূল্য নেই। এটা তাদের মিথ্যাকে সত্য বানাবার একটা মাধ্যম মাত্র।

এর দ্বারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মুমিনগণ যেন তাদের হতে সতর্ক থাকে। তারা যেন এই মুনাফিকদেরকে খাঁটি মুমিন মনে করে তাদের কোন কাজে তাদের অনুসরণ না করে। কেননা, তারা ইসলামের নামে কুফরী করিয়ে ফেলবে। তারা আল্লাহর পথ হতে বহু দূরে রয়েছে এবং তাদের আমল অতি জঘন্য।

যহহাক (রাঃ)-এর কিরআতে إِيمَانَهُمْ অর্থাৎ هَمْزَه তে যের দিয়ে রয়েছে। তখন ভাবার্থ হবেঃ তারা তাদের বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা হত্যা ও কুফরীর হুকুম হতে দুনিয়ায় বেঁচে যাবে। তাদের অন্তরে নিফাক স্থান করে নিয়েছে। তাই তারা ঈমান হতে ফিরে গিয়ে কুফরীর দিকে এবং হিদায়াত হতে সরে গিয়ে গুমরাহীর দিকে চলে এসেছে। এখন তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে যে

বোধশক্তি ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। বাহ্যতঃ তো তারা মুখে মিষ্টি কথা বলে এবং তারা বেশ বাকপটু। কিন্তু তাদের অন্তর কালিমাময়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে।' অর্থাৎ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তখন তারা ধারণা করে নেয় যে, তাদের উপর হয়তো তা আপতিত হচ্ছে। তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে হা-হুতাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ـ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ـ اُولٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশতঃ (যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার ব্যাপারে মুনাফিকরা কৃপণতা প্রকাশ করেছিল), যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে, মৃত্যু ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি, এই জন্যে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন, আর আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।" (৩৩ঃ ১৯)

এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুনাফিকদের বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। তাদের সালাম হলো লা'নত, তাদের খাদ্য হলো লুঠতরাজ, তাদের গানীমাত হলো হারাম ও খিয়ানত, তারা মসজিদের নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করে, নামাযের জন্যে তারা শেষ সময়ে এসে থাকে, তারা অহংকারী ও আত্মগর্বী হয় এবং তারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকে। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করে না এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে না। তারা রাত্রে খড়ি এবং দিনে শোরগোলকারী।"[১] অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তারা দিনে খুবই পানাহারকারী হয় এবং রাত্রে শুষ্ক কাঠের মত তারা পড়ে থাকে।

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

٥- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

৫। যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।

٦- سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৬। তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্যে সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٧- هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৭। তারাই বলেঃ আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সহচরদের জন্যে ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

٨- يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ع

৮। তারা বলেঃ আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহরই আর তাঁর রাসূল (সঃ) ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেনঃ তাদের কৃত পাপের ব্যাপারে খাঁটি মুসলমানরা যখন তাদেরকে বলেঃ এসো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা গর্বভরে মাথা দুলিয়ে থাকে। এভাবে তারা বিমুখ হয়ে যায়। এর প্রতিফল হলো এই যে, তাদের জন্যে ক্ষমার দরযা বন্ধ। তাদের জন্যে নবী (সঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনই উপকারে আসবে না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। সূরায়ে বারাআতে এই বিষয়েই আয়াত গত হয়েছে এবং সেখানে এর তাফসীর এবং সাথে সাথে এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহও বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনাফিক সুফইয়ান তার মুখখানা ডান দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ক্রোধ ও গর্বের সাথে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল। ওরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। এগুলো সবই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল সম্পর্কে বর্ণনা, এরূপ মন্তব্য করেছেন পূর্বযুগীয় অধিকাংশ গুরুজন। যেমন এটা সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ।

সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের মধ্যে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল তার কওমের মধ্যে এক বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল। জুমআর দিন নবী (সঃ) যখন খুৎবাহ দেয়ার জন্যে দাঁড়াতেন তখন সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলতোঃ "হে জনমণ্ডলী! ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সঃ)। ইনি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। এঁরই কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং তাঁকে সাহায্য করা এখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা তাঁকে সম্মান করবে ও মর্যাদা দিবে এবং তিনি যা কিছু বলবেন সবই মেনে চলবে।" এ কথা বলে সে বসে পড়তো। উহূদের যুদ্ধে তার কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায়। সেখান হতে সে প্রকাশ্যভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্যাচরণ করে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসেন এবং জুমআর দিনে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হন তখন অভ্যাসমত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সেদিনও দাঁড়িয়ে যায় এবং সে কথা বলতে যাবে এমতাবস্থায় কয়েক জন সাহাবী এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে যান এবং তার কাপড় ধরে নিয়ে বলে ওঠেনঃ "ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই বসে যা। এখন তোর কথা বলার মুখ নেই। তুই যা কিছু করেছিস তা আর কারো কাছে গোপন নেই। তোর আর ঐ যোগ্যতা নেই যে, মন যা চাইবে তাই বলবি।" সে

তখন অসন্তুষ্ট হয়ে জনগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সে বলতে বলতে গেলঃ "আমি কি কোন মন্দ কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম? আমি তো তাঁর কাজ মযবূত করার উদ্দেশ্যেই দাঁড়িয়েছিলাম।" মসজিদের দরযার উপর কয়েক জন আনসারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" উত্তরে সে বললঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাজকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় কয়েকজন সাহাবী আমার উপর লাফিয়ে পড়ে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে শুরু করে এবং আমাকে ধমকাতে থাকে। তাদের ধারণায় আমি যেন কোন মন্দ কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। অথচ আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আমি তাঁর কথা ও কাজেরই পৃষ্টপোষকতা করবো।" একথা শুনে ঐ আনসারীগণ বললেনঃ "ভাল কথা, তুমি ফিরে চল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানাবো যে, তিনি যেন তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।" সে তখন বললোঃ "আমার এর কোন প্রয়োজন নেই।"

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) ও হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, তারই কওমের একজন যুবক মুসলমান তার এ ধরনের কার্যকলাপের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ডাকিয়ে নেন। সে সরাসরি অস্বীকার করে। সে মিথ্যা শপথও করে। তখন আনসারীগণ ঐ সাহাবীকে তিরস্কার এবং শাসন-গর্জন করেন ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। ঐ সময় এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের এবং যুবক সাহাবীটির সত্যবাদীতার বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর ঐ মুনাফিককে বলা হয়ঃ "চলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে তোমার পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নাও।" তখন সে অস্বীকার করে এবং মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন মনযিলে অবতরণ করলে সেখানে নামায না পড়া পর্যন্ত যাত্রা শুরু করতেন না। তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খবর পেলেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই বলছেঃ "আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল ও সম্মানীরা দুর্বল ও লাঞ্ছিতদেরকে বহিষ্কার করবেই।" অর্থাৎ আমরা এই দুর্বল ও মর্যাদাহীন মুহাজিরদেরকে আমাদের শহর মদীনা হতে বের করে দিবো। একথা শুনে

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দিনের শেষ ভাগে অবতরণের পূর্বেই যাত্রা শুরু করে দেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে বলা হয়ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ হতে وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।[১]

এই ঘটনায় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হিব্বান (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর (রঃ) এবং হযরত আসিম ইবনে উমার ইবনে কাতাদাহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই যুদ্ধস্থলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তথায় পানির জায়গার উপর যে জনসমাবেশ ছিল ওর মধ্যে হযরত জাহ্জাহ ইবনে সাঈদ গিফারী (রঃ) ও হযরত সিনান ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ)-এর মাঝে কিছু ঝগড়া হয়ে যায়। হযরত জাহ্জাহ্ (রাঃ) হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর একজন কর্মচারী ছিলেন। ঝগড়া চরম আকার ধারণ করে। হযরত সিনান (রাঃ) সাহায্যের জন্যে আনসারদেরকে আহবান করেন এবং হযরত জাহ্জাহ্ (রাঃ) আহ্বান করেন মুহাজিরদেরকে। ঐ সময় হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) প্রমুখ আনসারদের একটি দল আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর পাশে উববিষ্ট ছিলেন। এই ফরিয়াদ শুনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই বলতে শুরু করেঃ "আমাদের শহরেই এ লোকগুলো আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিলো? আমাদের ও এই কুরায়েশদের দৃষ্টান্ত ওটাই যাকে একজন বলেছে– 'স্বীয় কুকুরকে তুমি মোটা-তাজা কর যাতে সে তোমাকেই কামড় দেয়।' আল্লাহ্র শপথ! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই।" অতঃপর সে তার পাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করলোঃ "সব বিপদ তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে এনেছো। তোমরা এই মুহাজিরদেরকে তোমাদের শহরে জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের সম্পদের অর্ধাংশ দান করেছো। এখনো যদি তোমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য না কর তবে তারা সংকটে পড়ে মদীনা হতে বেরিয়ে যাবে।" হযরত

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ ইবনে সীরীন পর্যন্ত তো সঠিক বটে, কিন্তু এটা তাবূকের ঘটনা একথা বলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে, এমনকি এটা সঠিক কথাই নয়। কেননা, তাবূকের যুদ্ধে তো আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই হাযিরই ছিল না, বরং সে তার একটি দল নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। কুতুবে মাগাযী ও সিয়ারের লেখকগণ এ মন্তব্য করেছেন যে, এ মুরীসী যুদ্ধের ঘটনা এবং ???

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) এসব কথাই শুনলেন। ঐ সময় তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি সরাসরি নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট হযরত উমার ইবনে খাত্তাবও (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (রঃ)! আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।" তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "এ কাজ করলে এটা প্রচারিত হয়ে পড়বে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকেও হত্যা করে থাকেন। এটা ঠিক হবে না। যাও, লোকদেরকে যাত্রা শুরু করার হুকুম দিয়ে দাও।" আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন এ খবর পেলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কথা জেনে ফেলেছেন তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তাঁর দরবারে হাযির হয়ে ওযর-আপত্তি, হীলা-বাহানা করতে লাগলো এবং কথা পাল্টাতে শুরু করলো। আর শপথ করে বলতে লাগলো যে, সে এরূপ কথা কখনো বলেনি। এই লোকটি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ছিল। তাছাড়া লোকেরাও বলতে লাগলোঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! সম্ভবতঃ এই বালকটিই ভুল বলেছে। সে হয়তো ধারণা করেছে, প্রকৃত ঘটনা হয়তো এটা নয়।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সময়ের পূর্বেই এখান হতে তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। পথে হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর নবুওয়াতের যথাযোগ্য আদবের সাথে তাঁকে সালাম করেন। অতঃপর আরয করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আজ যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছেন, ব্যাপার কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বলেনঃ "তোমার কি জানা নেই যে, তোমাদের সঙ্গী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই বলেছেঃ "মদীনায় পৌঁছে আমরা সম্মানিত ব্যক্তিরা লাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরকে অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে বহিষ্কার করে দিবো?" তখন হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! সম্মানিত তো আপনিই, আর লাঞ্ছিত হলো তো সেই। আপনি তার কথাকে মোটেই পরোয়া করবেন না। আসলে মদীনায় আপনার আগমনে সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। মদীনাবাসীরা তাকে নেতা নির্বাচন করার উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছিল এবং তার মাথার মুকুটও তৈরী হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আপনাকে এখানে আনিয়েছেন এবং রাজত্ব তার হাত হতে ছুটে গেছে। কাজেই আপনার উপর সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! চলতে থাকুন।" তাঁরা দুপুরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। সন্ধ্যা হলো, রাত্রি হলো, সকাল হলো, এমনকি রৌদ্রের প্রখরতা এসে গেলে তিনি শিবির স্থাপন করলেন, যাতে

জনগণ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর ঐ কথায় মুষড়ে না পড়ে। জনগণের ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণ ছিল বলে অবতরণ করা মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। আর এদিকে এই সূরায়ে মুনাফিকূন অবতীর্ণ হয়ে গেল।[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। একজন মুহাজির একজন আনসারকে পাথর মেরে দেন। এটাকে কেন্দ্র করে কথা বেড়ে চলে এবং উভয়েই নিজ নিজ দলের নিকট ফরিয়াদ জানান এবং তাঁদেরকে আহ্বান করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ "একি অজ্ঞতার যুগের কাজ-কারবার শুরু করলে তোমরা? এই বেদুঈনী অভ্যাস পরিত্যাগ কর।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলতে লাগলোঃ "এখন মুহাজিরগণ এরূপ করতে শুরু করলো? আল্লাহর কসম! মদীনায় পৌঁছেই আমরা সম্মানীরা এই লাঞ্ছিতদেরকে মদীনা হতে বের করে দিবো।" ঐ সময় মদীনায় আনসারদের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বহু গুণে বেশী ছিল। তবে পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। হযরত উমার (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন।"[২]

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেনঃ "আমি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললোঃ "আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই।" আমি তার এ কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বর্ণনা করলাম। কিন্তু সে এসে অস্বীকার করে বসলো ও শপথ করলো। ঐ সময় আমার সম্প্রদায় আমাকে বহু কিছু গাল মন্দ দিলো এবং নানা প্রকারে তিরস্কার করলো যে, আমি এরূপ কেন করলাম? আমি দুঃখিত মনে সেখান হতে চলে আসলাম। আমার দুঃখের কোন সীমা থাকলো না। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমার ওযর ও সত্যবাদিতা (সম্পর্কীয় আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন।" ঐ সময় هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا.... –এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।"[৩]

১. এটা সীরাতে ইসহাক নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আহমাদে এটা এভাবেও বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার চাচার সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে এ দুটি কথা বলতে শুনলামঃ "আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সহচরদের জন্যে ব্যয় করো না" এবং "তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই।"আমি এটা আমার চাচার নিকট বর্ণনা করি এবং আমার চাচা তা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালে সে সম্পূর্ণরূপে কথাগুলো অস্বীকার করে এবং শপথও করে নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কথা সত্য ও আমার কথা মিথ্যা বলে মেনে নেন। আমার চাচাও আমাকে বহু তিরস্কার করেন। আমি এতে এতো বেশী দুঃখিত ও লজ্জিত হই যে, বাড়ী হতে বের হওয়া পরিত্যাগ করি। শেষ পর্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সত্যতা স্বীকার করেন এবং সূরাটি আমাকে পড়ে শুনিয়ে দেন।

মুসনাদে আহমাদের অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, এক সফরে সাহাবীগণ সংকটময় অবস্থায় পতিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উপরোক্ত কথা দুটি বলে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ডেকে পাঠিয়ে একথা জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার করে এবং শপথ করে বলে যে, সে এরূপ কথা কখনো বলেনি। তখন জনগণ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত করেন। এতে হযরত যায়েদ (রাঃ) খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত হন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) ডাকলে তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ এই কারণে বলেছেন যে, তারা দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে সুন্দর ছিল।

জামে তিরমিযীতে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হই। কিছু বেদুঈনও আমাদের সাথে ছিল। পানির জায়গায় তারা প্রথমেই পৌঁছতে চাইতো। অনুরূপভাবে আমরাও ঐ চেষ্টাতেই থাকতাম। একদা একজন বেদুঈন গিয়ে পানি দখল করে নেয় এবং হাউয পূর্ণ করে হাউযের চতুর্দিকে সে পাথর রেখে দেয় এবং উপর হতে চামড়া ছড়িয়ে দেয়। একজন আনসারী এসে ঐ হাউযের মধ্য হতে নিজের উটকে পানি পান করাবার ইচ্ছা করে। বেদুঈন তাকে বাধা দেয়। আনসারী জোরপূর্বক পানি পান করাতে গেলে ঐ বেদুঈন লাঠি দ্বারা

আনসারীর মাথায় আঘাত করে। ফলে আনসারীর মাথা জখম হয়। আনসারী আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর লোক ছিল বলে সরাসরি তার কাছে চলে যায় এবং ঘটনাটি বর্ণনা করে। এতে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং বলেঃ "এই বেদুঈনদেরকে কিছুই দিয়ো না, তাহলে তারা আপনা আপনি ক্ষুধার জ্বালায় পালিয়ে যাবে। এই বেদুঈনরা আহারের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসতো এবং খেয়ে নিতো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বললোঃ "তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খাদ্য নিয়ে এমন সময় যাবে যখন এই বেদুঈনরা থাকবে না। তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে খাদ্য খেয়ে নিবেন এবং এরা খেতে পাবে না। তখন এরা না খেয়ে খেয়ে আপনা আপনি পালিয়ে যাবে। আর আমরা মদীনায় গিয়ে এ হীন ও ছোট লোকদেরকে মদীনা হতে বের করে দিবো।" আমি আমার চাচার পিছনে বসতাম। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যা কিছু বললো আমি তার সবই শুনলাম এবং আমার চাচার নিকট বর্ণনা করলাম। আমার চাচা তা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডাকিয়ে নিলেন। সে সবকিছুই অস্বীকার করলো এবং শপথও করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে সত্যবাদী মনে করলেন এবং আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন। আমার চাচা আমার কাছে এসে আমাকে বললেনঃ "তুমি এটা করলে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছেন। অন্যান্য মুসলমানরাও তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছে।" এ কথা শুনে তো আমার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। আমি অত্যন্ত দুঃখিত অবস্থায় মাথা নীচু করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আসলেন এবং আমার কান ধরলেন। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, তিনি মুচকি হাসছেন। আল্লাহর শপথ! ঐ সময় আমি এতো বেশী খুশী হয়েছিলাম যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যদি আমি দুনিয়ার চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতাম তবুও এতো খুশী হতে পারতাম না। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) আমার কাছে এসে আমাকে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে কি বললেন?" আমি উত্তরে বললাম, তিনি কিছুই আমাকে বলেনি, শুধু মুচকি হেসে চলে গেলেন। তখন তিনি বললেনঃ "ঠিক আছে, তুমি খুশী হও।" তাঁর চলে যাওয়ার পরেই হযরত উমার (রাঃ) আমার কাছে আসলেন এবং ঐ প্রশ্নই আমাকে করলেন। আমিও ঐ একই জবাব দিলাম। সকালে সূরায়ে মুনাফিকূন অবতীর্ণ হলো।" অন্য রিওয়াইয়াতে সূরাটি مِنْهَا الْاَذَلَّ পর্যন্ত পড়াও বর্ণিত আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে লাহীআহ (রঃ) এবং মূসা ইবনে উকবাও (রঃ) এই হাদীসটি মাগাযীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ দু'জনের বর্ণনায় সংবাদদাতার নাম আউস ইবনে আকরাম রয়েছে, যে বানু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিল। তাহলে সম্ভবতঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-ও খবর পৌঁছিয়েছিলেন এবং হযরত আউসও (রাঃ) পৌঁছিয়েছিলেন। আবার এও হতে পারে যে, বর্ণনাকারী নামে ভুল করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আমর ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা গাযওয়ায়ে মুরীসীর ঘটনা। এটা ঐ যুদ্ধ যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করে 'মানাত' প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়েছিলেন যা কিফা মুশাল্লাল ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। এই যুদ্ধেই দুই জন লোকের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। একজন ছিলেন মুহাজির এবং অন্যজন ছিলেন বাহায গোত্রের লোক। বাহায গোত্র আনসারদের মিত্র ছিল। বাহ্যী আনসারদেরকে এবং মুহাজির মুহাজিরদেরকে আহ্বান করে। উভয়পক্ষের কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়া শেষ হলে মুনাফিক ও রোগা অন্তরের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট একত্রিত হয় এবং তাকে বলেঃ "আপনার কাছে তো আমরা বহু কিছু আশা করেছিলাম। আমাদের শত্রুদের ব্যাপারে আপনি ছিলেন আমাদের রক্ষক। এখন তো আপনি একেবারে অকেজো ও কর্ম বিমুখ হয়ে পড়েছেন। এখন না আছে আপনার কোন উপকারের চিন্তা, না ক্ষতির চিন্তা। আপনিই তো এই মুহাজিরদেরকে এতোটা উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন? কথায় কথায় তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।" নতুন মুহাজিরদেরকে তারা জালাবীব বলতো। আল্লাহর ঐ শত্রু জবাবে বললোঃ "আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে অবশ্যই প্রবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে।" মুনাফিক মালিক ইবনে দাখশান বললোঃ "আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, এদের সঙ্গে সুসম্পর্ক পরিত্যাগ করা হোক, তাহলে তারা আপনা আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে?" হযরত উমার (রাঃ) এসব কথা শুনে নেন। তিনি নবী পাক (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ লোকদের মধ্যে হাঙ্গামার গোড়া পত্তনকারী এই লোকটির ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "আমি যদি তোমাকে অনুমতি দিই তবে কি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলবে?" জবাবে হযরত উমার (রাঃ)

বললেনঃ "আল্লাহর কসম! এখনই আমি তাকে নিজ হাতে হত্যা করে ফেলবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, বসে পড়।" ইতিমধ্যে হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়েরও (রাঃ) ঐ কথা বলতে বলতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকেও ঐ একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনিও ঐ একই উত্তর দিলেন। তাঁকেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) বসে যেতে বললেন। এরপর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে তিনি সকলকে তথা হতে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন এবং সময়ের পূর্বেই তাঁরা সেখান হতে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁরা ঐ দিন-রাত এবং পরবর্তী দিনের সকাল পর্যন্ত বরাবর চলতেই থাকলেন। যখন রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠলো তখন অবতরণের হুকুম করলেন। দ্বিপ্রহর ঢলে পড়ার সাথে সাথেই পুনরায় তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। এভাবে চলতে চলতে তৃতীয় দিনের সকাল বেলায় কিফা মুশাল্লাল হতে মদীনা শরীফে পৌঁছে গেলেন। হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করার আমি নির্দেশ দিলে সত্যিই কি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে?" জবাবে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "নিশ্চয়ই আমি তার মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যদি তুমি সেই দিন তাকে হত্যা করে ফেলতে তবে বহু লোকের নাক ধূলো-মলিন হয়ে যেতো। কেননা, যদি আমি তাদেরকে বলতাম তবে তারাও তাকে হত্যা করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতো না। তখন লোকদের একথা বলার সুযোগ হয়ে যেতো যে, মুহাম্মাদ (সঃ) স্বীয় সহচরদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে থাকেন।" এই ঘটনারই বর্ণনা এই আয়াতগুলোতে রয়েছে।"[১]

সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ), যিনি একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন, এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি শুনেছি যে, আমার পিতা যে উক্তি করেছে তার প্রতিশোধ হিসেবে আপনি তাকে হত্যা করতে চান। যদি এটা সত্য হয়, তবে তাকে হত্যা করার আদেশ আপনি অন্য কাউকেও দিবেন না। আমিই যাচ্ছি এবং তার কর্তিত মস্তক এনে আপনার পদতলে নিক্ষেপ করছি। আল্লাহর কসম! খাযরাজ গোত্রের প্রত্যেকেই জানে যে, কোন ছেলে তার পিতাকে আমার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকারী নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

১. এ বর্ণনাটি খুবই গারীব। এতে এমন কতকগুলো চমকপ্রদ কথা রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য রিওয়াইয়াতে নেই।

নির্দেশক্রমে আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পিতাকেও হত্যা করতে প্রস্তুত আছি। যদি আপনি অন্য কাউকেও নির্দেশ দেন এবং সে আমার পিতাকে হত্যা করে তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবো। আর যদি আমার দ্বারা এ কাজই হয়ে যায় তবে একজন কাফিরের বিনিময়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করার অপরাধে আমি জাহান্নামী হয়ে যাবো। সুতরাং এখন আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ আমাকেই করুন।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "না, না। আমি তাকে হত্যা করতে চাই না। আমি তো তার সাথে আরো উত্তম ও নম্র ব্যবহার করতে চাই যতক্ষণ সে আমাদের সাথে রয়েছে।"

হযরত ইকরামা (রঃ) ও হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সেনাবাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনা শরীফের দরযার উপর দাঁড়িয়ে যান ও তরবারী তুলে ধরেন। জনগণ মদীনায় প্রবেশ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা এসে পড়ে। তিনি স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ "দাঁড়িয়ে যাও, মদীনায় প্রবেশ করো না।" সে বললোঃ "ব্যাপার কি? আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পার না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমতি দেন। সম্মানিত তিনিই এবং লাঞ্ছিত তুমিই।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসলেনঃ তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখে ঐ মুনাফিক তাঁর কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতাকে আটক করে রেখেছো কেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আল্লাহর কসম! আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমার পিতাকে আমি মদীনায় প্রবেশ করতে দিবো না।" অতঃপর নবী (সঃ)-এর অনুমতিক্রমে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিলেন।

মুসনাদে হুমাইদীতে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে বলেনঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের মুখে একথা না বলবে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হলেন সম্মানিত এবং তুমি লাঞ্ছিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি মদীনায় প্রবেশ করতে দিবো না। এর পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতার অত্যধিক গাম্ভীর্য ও প্রভাবের কারণে আজ পর্যন্ত আমি তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিনি, কিন্তু

আপনি যদি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তবে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মাথা কেটে নিয়ে আপনার নিকট হাযির করছি। অন্য কাউকেও তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেন না। এমনও হতে পারে যে, আমার পিতৃহন্তাকে আমি চলাফেরা অবস্থায় দেখতে পারবো না।"

৯- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯। হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে- যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১০- وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১০। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্যে অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

১১- وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ ع

১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খুব বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর বলেনঃ যারা আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর আনুগত্যের কাজে মাল খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে প্রদত্ত মাল হতে খরচ করে। মৃত্যুর সময়ের নিরুপায় অবস্থা দেখে মাল খরচ করতঃ শান্তি লাভের আশা করা বৃথা হবে। ঐ সময় তারা চাইবে যে, যদি অল্প সময়ের জন্যেও ছেড়ে দেয়া হতো তবে যা কিছু ভাল কাজ আছে সবই তারা করতো এবং মন খুলে আল্লাহর পথে দান-খায়রাত করতো। কিন্তু তখন সময় কোথায়? যে বিপদ আসার তা এসেই গেছে। এটা কখনো টলবার নয়। বিপদ মাথার উপর এসেই পড়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ـ

অর্থাৎ "যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্যে অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসূলদেরকে অনুসরণ করবো! তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?" (১৪ঃ ৪৪) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ـ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ـ

অর্থাৎ "শেষ পর্যন্ত তাদের কারো যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন বলবে– হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ফিরিয়ে দিন, যেন আমি ভাল কাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, কখনো নয়।" (২৩ঃ ৯৯-১০০)

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ নির্ধারিত সময়কাল যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এ লোকগুলোকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তবে এসব কথা তারা ভুলে যাবে এবং পূর্বে যে কাজ করতো পুনরায় ঐ কাজই করতে থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "ঐ মালদার ব্যক্তি যে হজ্ব করেনি ও যাকাত দেয়নি সে মৃত্যুর সময় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে।" একটি লোক তখন বললোঃ "জনাব! আল্লাহকে ভয় করুন। দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা তো করবে কাফির।" তখন তিনি বললেনঃ "তাড়াতাড়ি করছো কেন? আমি তোমাকে কুরআন থেকে এটা পাঠ করে শুনাচ্ছি।" অতঃপর তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হতে পূর্ণ রুকূটি পাঠ করে শুনালেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ "কি পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়?" জবাবে তিনি বলেনঃ "দুই শত এবং এর চেয়ে বেশী হলে।" সে প্রশ্ন করলোঃ "হজ্ব কখন ফরয হয়?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "যখন পথ খরচ ও সওয়ারীর শক্তি থাকে।" একটি মারফূ' রিওয়াইয়াতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এর মাওকুফটাই সঠিকতর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত যহ্হাক (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে ইনকিতা' রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বেশী বয়সের আলোচনা করেন। তখন তিনি বলেনঃ "নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনো অবকাশ দিবেন না। বয়সের আধিক্য এই ভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে সুসন্তান দান করেন এবং ঐ সন্তানরা তাদের পিতার মৃত্যুর পর তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। ঐ দু'আ তার কবরে পৌঁছে থাকে।"

সূরা ঃ মুনাফিকূন এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ তাগাবুন মাদানী

(আয়াত ঃ ১৮, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

আবার এটাকে মাক্কী সূরাও বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তার মাথার জোড়ে সূরায়ে তাগাবূনের পাঁচটি আয়াত লিখিত থাকে।"[১]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন– তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন, আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

১. ইমাম তিবরানী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আসাকির (রঃ) ওয়ালী ইবনে সালেহ এর জীবনীতে আনয়ন করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব এমনকি মুনকারও বটে।

৪। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।	٤- يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

সাব্বাহাতের সূরাগুলোর মধ্যে এটাই সর্বশেষ সূরা। সৃষ্টি কুলের আল্লাহ্ পাকের তাসবীহ্ পাঠের বর্ণনা কয়েকবার দেয়া হয়েছে। রাজত্ব ও প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। সব কিছুরই উপর রয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব, প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক জিনিসের পরিমাপ বা মূল্যায়ন নির্ধারণকারী তিনিই। তিনিই প্রশংসারযোগ্য। যে জিনিসের তিনি ইচ্ছা করেন তা তিনি কার্যে পরিণতকারী। কেউই তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি না চাইলে কোন কিছুই হবে না। তিনি সারা মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই ইচ্ছায় মানবমণ্ডলীর কেউ হয়েছে কাফির এবং কেউ হয়েছে মুমিন। কে হিদায়াতের যোগ্য এবং কে গুমরাহীর যোগ্য তা তিনি সম্যক অবগত। তিনি স্বীয় বান্দাদের সমুদয় কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী। তাদেরকে তিনি তাদের সমুদয় কাজের প্রতিদান প্রদানকারী। তিনি আদল ও হিকমতের সাথে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ـ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ـ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاۤءَ رَكَّبَكَ ـ

অর্থাৎ “হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন, যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।” (৮২ঃ ৬-৮) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ـ

অর্থাৎ “আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে শান্তির স্থল বানিয়েছেন এবং আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ স্বরূপ, আর তোমাদেরকে আকৃতি

দান করেছেন– তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট ও পবিত্র বস্তু হতে রিয্ক দান করেছেন।”(৪০ঃ ৬৪)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। আল্লাহ তা'আলা যে আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অবগত আছেন এ সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তিনি বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

٥- اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৫। তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? তারা তাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করেছিল এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْۤا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

৬। তা এই জন্যে যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলতোঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

এখানে পূর্ববর্তী কাফিরদের কুফরী এবং তাদের মন্দ শাস্তি ও নিকৃষ্ট বিনিময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত নেই? তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। দুনিয়াতেও তারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে এবং আখিরাতের শাস্তি তাদের জন্যে বাকী রয়েছে। ঐ শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, রাসূলগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে

স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা ওগুলো অবিশ্বাস করেছিল। একজন মানুষ যে নবী হতে পারেন তা তারা অসম্ভব মনে করেছিল। তাই তারা নবীদেরকে স্বীকার করেনি এবং সৎ আমলও পরিত্যাগ করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে পরোয়া করেননি। কারণ তিনি তো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

٧- زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

৭। কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সহজ।

٨- فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

৮। অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

৯। স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য।

১০। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল!	١٠- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۟ ع

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করছে, তাই তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা, তোমাদের বিনিময় প্রদান করা ইত্যাদি কাজ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।

এটা হচ্ছে তৃতীয় আয়াত যাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে কসম খেয়ে কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করতে বলেছেন। প্রথম সূরায়ে ইউনুসে রয়েছেঃ

وَيَسْتَنْۢبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা তোমার নিকট জানতে চায় যে, এটা কি সত্য? বল– হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।" (১০ঃ ৫৩) দ্বিতীয় আয়াত সূরায়ে সাবাতে রয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ـ

অর্থাৎ "কাফিররা বলে– আমাদের কিয়ামত আসবে না। বল– আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবেই।" (৩৪ঃ ৩) আর তৃতীয় হলো এই আয়াতটিঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বল– নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে।

অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।"

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ অতএব তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং যে নূর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার উপর অর্থাৎ কুরআনের উপর। আর তোমাদের কোন গোপন আমলও আল্লাহ্র নিকট অজানা নয়, বরং তিনি সব কিছুরই খবর রাখেন।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ সমাবেশের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। ঐদিন আল্লাহ তা'আলা সকলকে একত্রিত করবেন বলেই ঐ দিনকে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে يَوْمُ الْجَمْعِ বলা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ـ

অর্থাৎ "ওটা লোকদেরকে একত্রিত করার ও হাযির করার দিন।" (১১ঃ ১০৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ـ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

অর্থাৎ "বলঃ নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে।" (৫৬ঃ ৪৯-৫০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَوْمُ التَّغَابُنِ হলো কিয়ামতের একটি নাম। কিয়ামতের এই নামের কারণ এই যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এর চেয়ে বড় তাগাবুন বা ক্ষতি কি হতে পারে যে, জান্নাতীদের সামনে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে? এর পরবর্তী আয়াতই যেন এর তাফসীর। মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল!

১১- مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ

১১। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস

يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○	করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।
١٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○	১২। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।
١٣- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○	১৩। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং মুমিনরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।

সূরায়ে হাদীদেও এ বিষয়টি গত হয়েছে যে, যা কিছু হয় তা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়। তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়া কিছুই হয় না। এখন কোন লোকের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তার এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, এ বিপদ আল্লাহ্র ফায়সালা ও নির্ধারণক্রমেই আপতিত হয়েছে। সুতরাং তার উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর মর্জির উপর স্থির থাকা। আর সে যেন পুণ্য ও কল্যাণের আশা রাখে। সে যেন আল্লাহ্র ফায়সালাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়। তাহলে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার অন্তরে হিদায়াত দান করবেন। সে তখন সঠিক বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য স্বীয় অন্তরে দেখতে পাবে। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, ঐ বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই অফুরন্ত কল্যাণ দান করে থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার ঈমান দৃঢ় হয়ে যায়। সে বিশ্বাস রাখে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা আপতিত হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা হওয়ারই ছিল না।

হযরত আলকামা (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হয় এবং তাঁকে এর ভাবার্থ জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেনঃ "এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে প্রত্যেক বিপদের সময় এই বিশ্বাস রাখে যে, ঐ বিপদ আল্লাহ্র পক্ষ হতে এসেছে। অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে সে তা সহ্য করে।"[১]

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) ও হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেনঃ এর ভাবার্থ এই যে, সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে।

'মুত্তাফাকুন আলাইহি' এর হাদীসে রয়েছেঃ মু'মিনের জন্যে বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে যে ফায়সালাই করেন তা তার জন্যে কল্যাণকরই হয়ে থাকে। তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে সবর করে, সুতরাং তা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। আবার তার জন্যে আনন্দদায়ক কোন ব্যাপার ঘটলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেটাও হয় তার জন্যে কল্যাণকর। এটা মু'মিন ছাড়া আর কারো জন্যে নয়।"

হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কোন্ আমল সর্বোত্তম?" উত্তরে তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা, তাঁর সত্যতা বিশ্বাস করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।" লোকটি বললোঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আমি এর চেয়ে কোন সহজ আমল কামনা করছি।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "তোমার ভাগ্যে যে ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে ঐ ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে তিরস্কার বা নিন্দে করবে না (বরং তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে)।"[১]

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা করার আদেশ করেছেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেনঃ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (তবে জেনে রেখো যে,) আমার রাসূল (সঃ)-এর দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। অর্থাৎ যদি তোমরা মান্য না কর তবে তোমাদের আমলের জন্যে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) মোটেই দায়ী হবেন না। তাঁর দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেয়া এবং তাঁর এ দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। এখন তোমাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে।' প্রথম বাক্যে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাওহীদের খবর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো তলব, অর্থাৎ আল্লাহ্র তাওহীদকে মেনে নাও এবং ইখলাসের সাথে শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

যেহেতু নির্ভরযোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ সেই হেতু মু'মিনদের উচিত একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

অর্থাৎ "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্ম বিধায়করূপে।" (৭৩ঃ ৯)

১৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষা; আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।

١٥- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৬। তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

١٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তবে তিনি

١٧- إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا

حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

তোমাদের জন্যে ওটা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল।

১৮- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৮। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেনঃ কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (৬৩ঃ ৯)

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের প্রয়োজন ও ফরমায়েশ পূর্ণ করার উপর প্রাধান্য দিবে। মানুষ স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এবং মাল-ধনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে এবং আল্লাহ্র নাফরমানী করে বসে। তাদের প্রেমে পড়ে আহকামে ইলাহীকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবূল করে নিয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের প্রেমে পড়ে হিজরত করেনি। অতঃপর যখন ইসলামের খুব বেশী প্রকাশ ঘটে তখন তারা হিজরত করে আল্লাহ্র নবী (সঃ)-এর নিকট চলে যায়। গিয়ে দেখে যে, যাঁরা পূর্বে হিজরত করেছিলেন তাঁরা বহু কিছুর জ্ঞান লাভ করেছেন। তখন এই লোকদের মনে হলো যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শাস্তি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেনঃ তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ এখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ক্ষমা করে দাও, ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকবে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা, আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলো পেয়ে কে নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য করছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে মহাপুরস্কার রয়েছে সেদিকে মানুষের খেয়াল রাখা উচিত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থাৎ "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি, মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এই সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।" (৩ঃ ১৪) আরো, যা এর পরে রয়েছে।

হযরত আবূ বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুৎবাহ্ দিচ্ছিলেন এমন সময় হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) লম্বা লম্বা জামা পরিহিত হয়ে এসে পড়লেন। তাঁরা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে বাধা লেগে লেগে পড়ছিলেন ও উঠছিলেন, এই ভাবে আসছিলেন। তাঁরা তো তখন শিশু! জামাগুলো লাল রঙএর ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দৃষ্টি তাঁদের উপর পড়া মাত্রই তিনি মিম্বর হতে নেমে গিয়ে তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন এবং নিজের সামনে বসিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ও সত্য কথা বলেছেন, তা হলোঃ "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা।" এই দুই শিশুকে পড়ে উঠে আসতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তাই খুৎবাহ্ ছেড়ে এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হলো।[১]

হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "কিনদাহ গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল হয়ে আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সন্তান-সন্ততি আছে কি?" আমি উত্তরে বললামঃ জ্বী হ্যাঁ, আপনার খিদমতে হাযির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হবার সময় আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। যদি তার স্থলে একটি বন্য জন্তু হতো তবে ওটাই আমার জন্যে ভাল ছিল। তিনি একথা শুনে বললেনঃ "না, না, এরূপ কথা বলো না। এরাই হলো চক্ষু ঠাণ্ডাকারী এবং এরা মারা গেলেও পুণ্য রয়েছে।" তারপর তিনি বললেনঃ "তবে হ্যাঁ, এরা আবার ভীরুতা ও দুঃখেরও কারণ হয়ে থাকে।"[১]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সন্তান অন্তরের ফল বটে, কিন্তু আবার সন্তানই কাপুরুষতা, কৃপণতা ও দুঃখেরও কারণ হয়।"[২]

হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "শুধু ঐ ব্যক্তি তোমার শত্রু নয় যে, (সে কাফির বলে) তুমি (যুদ্ধে) তাকে হত্যা কর তবে ওটা হবে তোমার জন্যে সফলতা, আর যদি তুমি নিহত হও তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। বরং সম্ভবতঃ তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তোমার সন্তান, যে তোমার পৃষ্ঠ হতে বের হয়েছে। অতঃপর তোমার আর একটি চরম শত্রু হলো তোমার মাল, যার মালিক হয়েছে তোমার দক্ষিণ হস্ত।"[৩]

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করবো তখন তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে এবং যখন নিষেধ করবো (কোন কিছু হতে) তখন তা হতে বিরত থাকবে।"

কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, এই আয়াতটি সূরায়ে আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতটিকে রহিতকারীঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণ না করে কোন অবস্থায় মরো না।" (৩ঃ ১০২) অর্থাৎ প্রথমে বলেছিলেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর।' আর পরে বললেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।'

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিবরানী (রঃ)।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন, প্রথম আয়াতটি জনগণের কাছে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। তাঁরা নামাযে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁদের পা ফুলে যেতো। আর তাঁরা সিজদায় এতো দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়ে থাকতেন যে, তাঁদের কপালে ক্ষত হয়ে যেতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এই দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিল করে তাঁদের উপর হালকা করে দিলেন। আরো কিছু মুফাসসিরও একথাই বলেছেন যে, প্রথম আয়াতটি মানসূখ এবং দ্বিতীয় আয়াতটি নাসেখ।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত হয়ে যাও। তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক হয়ো না। আগেও বেড়ে যেয়ো না এবং পিছনেও সরে এসো না। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়ে রেখেছেন তা হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ফকীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করতে থাকো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে ইহ্সান করেছেন ঐ ইহ্সান তোমরা তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি করে যাও। তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি এটা না কর তবে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে আনবে।

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ -এর তাফসীর সূরায়ে হাশরের এই আয়াতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তবে তিনি তোমাদের জন্যে ওটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের উপর খরচ করাই হলো আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দেয়া। সূরায়ে বাকারাতেও এটা গত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের অপরাধসমূহ তিনি মার্জনা করবেন। এ জন্যেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এখানে বলেনঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অল্প সৎকাজের বেশী পুণ্য দান করেন এবং তিনি সহনশীল অর্থাৎ তিনি পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে থাকেন এবং স্বীয় বান্দাদের পাপ দেখেও দেখেন না। অর্থাৎ ক্ষমার চক্ষে দেখেন।

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এর তাফসীর ইতিপূর্বে কয়েকবার গত হয়েছে।

সূরা ঃ তাগাবুন এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ তালাক মাদানী

(আয়াত ঃ ১২, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে নবী (সঃ)! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তবে তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করো; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলো আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোন উপায় করে দিবেন।

١- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

প্রথমতঃ নবী (সঃ)-কে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে, অতঃপর এরই অনুসরণে তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে তালাকের মাসআলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দেন। তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতার বাড়ীতে চলে যান। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়ঃ “তাকে

(হযরত তাফসা রাঃ-কে) ফিরিয়ে নাও। সে খুব বেশী রোযাব্রত পালনকারিণী ও অধিক নামায আদায়কারিণী। সে দুনিয়াতেও তোমার স্ত্রী এবং জান্নাতেও তোমার স্ত্রীদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"[১] অন্যান্য সনদেও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর রুযূ করেছিলেন বা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিক ঋতুর অবস্থায় তালাক দেন। হযরত উমার (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ "সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং ঋতু হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীরূপেই রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় ঋতুবতী হওয়ার পর যখন পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা হলে এই পবিত্র অবস্থায় সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই ঐ ইদ্দত যার হুকুম আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।"[২]

হযরত আবূ যুবায়ের (রঃ) ইযযাহর মাওলা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়মান (রঃ) হতে শুনেছেন যে, তিনি হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেয় তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "তাহলে শুনো! হযরত ইবনে উমার (রাঃ) অর্থাৎ তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেন যে, এখন হয় তিনি তাকে তালাক দিবেন, না হয় রেখে দিবেন। অতঃপর নবী (সঃ) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ -এই আয়াতটি পাঠ করেন।"[৩] অন্য রিওয়াইয়াতে فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -এর ভাবার্থ করা হয়েছেঃ "যে তোহর বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস করা হয়নি ঐ তোহরে তালাক দেয়া।' বহু লোকই এটাই বলেছেন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ হায়েযের অবস্থায় তালাক দিয়ো না এবং ঐ তোহরেও তালাক দিয়ো না যাতে স্ত্রীসহবাস করেছো, বরং ঐ সময় পর্যন্ত ছেড়ে রেখো যে, আবার তার হায়েয হবে এবং ঐ হায়েয হতে আবার পবিত্রতা লাভ করবে। ঐ পবিত্র অবস্থায় একটি তালাক দিয়ে দাও।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াইয়াতটিই ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। এটাও আরো বহু হাদীস গ্রন্থে বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে।
৩. সহীহ মুসলিমে এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ইদ্দত দ্বারা তোহর উদ্দেশ্য। কুরু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হায়েয। অথবা হামল বা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দাও, যখন হামল প্রকাশিত হয়ে যাবে। যে তোহরে সহবাস করেছো ঐ তোহরে তালাক দিয়ো না। কেননা, এর দ্বারা স্ত্রীর হামল হলো কি না তা জানা যায় না।

এখান হতেই বিজ্ঞ আলেমগণ তালাকের আহকাম গ্রহণ করেছেন এবং তালাকের দুই প্রকার করেছেন। তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদআত। তালাকে সুন্নাত তো এটাই যে, এমন তোহরে বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেনি অথবা হামলের অবস্থায় তালাক দিবে। আর তালাকে বিদআত এই যে, হায়েযের অবস্থায় তালাক দিবে অথবা এমন তোহরে তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেছে এবং হামল হয়েছে কি-না তা জানা যায়নি। তালাকের তৃতীয় প্রকারও রয়েছে যা তালাকে সুন্নাত নয় এবং তালাকে বিদআতও নয়। ওটা হচ্ছে নাবালেগা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের তালাক এবং ঐ স্ত্রী লোকের তালাক যার হায়েযই হয় না এবং ঐ নারীর তালাক যার সাথে মিলন হয়নি। এসবের আহকাম ও বিস্তারিত আলোচনার জায়গা হচ্ছে ফুরূর কিতাবগুলো, তাফসীর নয়। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইদ্দতের হিসাব রাখবে। এমন যেন না হয় যে, ইদ্দতের দীর্ঘতার কারণে স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর এই ব্যাপারে তোমরা প্রকৃত মা'বূদ আল্লাহকে ভয় করবে। ইদ্দতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর বসবাসের জায়গা দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকবে। স্বামী তাকে তার বাড়ী হতে বের করে দিবে না এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবে না। কেননা, সে স্বামীর অধিকারে আবদ্ধা রয়েছে।

فَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ব্যভিচারকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটাও এর মধ্যে শামিল যে, স্ত্রী স্বামীকে বিপদে ফেলবে, তার বিরোধিতা করবে, তাকে কষ্ট দিবে, তার সাথে দুর্ব্যবহার এবং স্বামীর পরিবারের লোকদেরকে কষ্ট দিবে। এরূপ অবস্থায় স্বামীর তার স্ত্রীকে বাড়ী হতে বের করে দেয়া জায়েয।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ এগুলো আল্লাহর বিধান অর্থাৎ তাঁর শরীয়ত ও সীমারেখা। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। আল্লাহ হয়তো এরপর কোন উপায় করে দিবেন। আল্লাহর ইচ্ছা

কেউই জানতে পারে না। ইদ্দতের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নারীর তার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা, এটা আল্লাহর হুকুম। এর মধ্যে এই যৌক্তিকতা রয়েছে যে, হয়তো এই ইদ্দতের মধ্যে তার স্বামীর মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে হয়তো তালাক দেয়ার কারণে লজ্জিত হবে। তার অন্তরে হয়তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার খেয়াল জেগে উঠবে এবং সে স্ত্রীকে রাজআত করেও নিবে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে থাকবে। নতুন কোন উপায় উদ্ভাবন করা দ্বারাও এই রাজআতকেই বুঝানো হয়েছে। এর ভিত্তিতেই কতক পূর্ব যুগীয় গুরুজন এবং তাঁদের অনুসারীদের যেমন হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রমুখের মাযহাব এই যে, مُبْتُوتَهٌ নারী অর্থাৎ ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর বাকী নেই, এর ইদ্দত পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত বসবাসের জায়গা দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয়। অনুরূপভাবে যে নারীর স্বামী মারা যাবে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত তাকে স্থান দেয়া স্বামীর ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলীল হলো হযরত ফাতিমা বিনতু ফাহরিয়্যাহ (রাঃ) সম্পর্কীয় হাদীসটি। তা এই যে, যখন তাঁর স্বামী হযরত আবূ আমর ইবনে হাফস (রাঃ) তাঁকে তৃতীয় ও সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট বিদ্যমান ছিলেন না। বরং ঐ সময় তিনি ইয়ামনে ছিলেন। সেখান হতেই তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। তখন তাঁর ওয়াকীল তাঁর স্ত্রীর নিকট সামান্য যব পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা তাঁকে খোরাক হিসেবে দেয়া হলো। এতে ঐ নারী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়াকীল তাঁকে বললেনঃ "অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন? তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব আমাদের নয়।" মহিলাটি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করে এটা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, ঠিকই বটে। তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব তোমার এই স্বামীর উপর নয়।" সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, তাঁকে তিনি বলেনঃ "তোমাকে বসবাসের জন্যে ঘর দেয়াও তোমার এ স্বামীর দায়িত্ব নয়।" অতঃপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন উম্মে শুরায়েক (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর ইদ্দতের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। তারপর বলেনঃ "সেখানে তো আমার অধিকাংশ সাহাবী যাতায়াত করে থাকে। তুমি বরং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর গৃহে ইদ্দত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ। তুমি সেখানে তোমার কাপড়ও রেখে দিতে পারবে (শেষ পর্যন্ত)।"

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, ঐ মহিলাটির স্বামীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখান হতেই তাঁর স্ত্রীকে তালাক পাঠিয়ে দেন।

তাঁর স্বামীর ভাই তখন তাঁকে তাঁর স্বামীর বাড়ী হতে চলে যেতে বলেন। মহিলাটি তখন তাঁর স্বামীর ভাইকে বলেনঃ "আমার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার পানাহার ও বাসস্থানের দায়িত্ব আমার স্বামীর।" তাঁর স্বামীর ভাই এটা অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত এ ঘটনাটির খবর নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছে যায়। তিনি ফাতিমা নাম্নী ঐ মহিলাটিকে বলেনঃ "তোমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব তোমার স্বামীর উপর ঐ সময় রয়েছে যখন তোমাকে রাজআত করার অধিকার তার আছে। এটা যখন নেই তখন ওটাও নেই। তুমি এখান হতে চলে যাও এবং অমুক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে তোমার ইদ্দত পালন কর।" অতঃপর বললেনঃ "সেখানে তো আমার সাহাবীরা যাতায়াত করে থাকে! তুমি বরং ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর বাড়ীতে তোমার ইদ্দতের দিনগুলো অতিবাহিত কর। সে অন্ধ মানুষ। সুতরাং সে তোমাকে দেখতে পাবে না (শেষ পর্যন্ত)।"

আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতিমা বিনতু কায়েস (রাঃ) হযরত যহ্হাক ইবনে কায়েস কারাশীর (রাঃ) ভগ্নী ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন হযরত আবূ আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরাহ আল মাখযূমী (রাঃ)। হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলেনঃ "আমার স্বামী সেনাবাহিনীর সাথে ইয়ামন গিয়েছেন। সেখান হতে তিনি আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। আমি তখন আমার স্বামীর ওলীদের কাছে আমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান প্রার্থনা করলে তাঁরা বলেনঃ "তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি এবং আমাদেরকে কোন অসিয়তও করেনি।" আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ আমার স্বামী আমর ইবনে হাফস (রাঃ) আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। আমি তখন তাঁর ওলীদের নিকট আমার বাসস্থান ও খাওয়া খরচ প্রার্থনা করলে তাঁরা বলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে কোন কিছু পাঠানওনি এবং তাঁদেরকে কোন অসিয়তও করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এমন স্ত্রীর জন্যে বাসস্থান ও খাওয়া খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর রয়েছে যাকে রাজআত করার অধিকার তার স্বামীর উপর রয়েছে। অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত যে স্ত্রী তার স্বামীর জন্যে হালাল নয় তার খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের দায়িত্বও তার স্বামীর নেই।"

২। তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে

٢- فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ

فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَّاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○

না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্যে সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।

٣- وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

৩। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ইদ্দত বিশিষ্টা নারীদের ইদ্দতের সময়কাল যখন পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদের স্বামীদের দুটো পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করা উচিত। হয় তাদেরকে যথাবিধি স্ত্রীরূপেই রেখে দিবে, অর্থাৎ যে তালাক তাদেরকে দিয়েছিল তা হতে রাজআত করে তাদেরকে যথা নিয়মে তাদের বিবাহ বন্ধনে রেখে দিয়ে তাদের সাথে স্ত্রীরূপে বসবাস করবে, না হয় তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। কিন্তু তাদেরকে গাল মন্দ দিবে না, শাসন গর্জন করবে না, বরং ভালভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে রাজআত করে নাও তবে তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। যেমন সুনানে আবি দাউদ

ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করেছে। অথচ না সে তালাকের উপর সাক্ষী রেখেছে, না রাজআতের উপর সাক্ষী রেখেছে। এর হুকুম কি হবে?" উত্তরে তিনি বলেন ঃ "সে সুন্নাতের বিপরীত তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীত রাজআত করেছে। তার উচিত ছিল তালাকের উপরও সাক্ষী রাখা এবং রাজআতের উপরও সাক্ষী রাখা। সে ভবিষ্যতে আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না করে।" হযরত আতা (রঃ) বলেন যে, বিবাহ, তালাক এবং রাজআত দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে। তবে নিরুপায়ভাবে হয়ে গেলে সেটা অন্য কথা।

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ সাক্ষী নির্ধারণ করার ও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে। যারা শরীয়তের পাবন্দ ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয়কারী।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর একটি উক্তি এই যে, রাজআতের উপর সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তাঁর মতে বিবাহেও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। অন্য একটি জামাআতেরও এটাই উক্তি। এই মাসআলাকে স্বীকারকারী উলামায়ে কিরামের এ দলটি একথাও বলেন যে, মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া রাজআত সাব্যস্ত হয় না। কেননা, সাক্ষী রাখা জরুরী। আর যে পর্যন্ত রাজআতের কথা মুখে উচ্চারণ না করবে সে পর্যন্ত কিভাবে সাক্ষী নির্ধারণ করা যাবে?

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম পালন করবে, আল্লাহর হারামকৃত জিনিস হতে দূরে থাকবে, তিনি তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন।

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا-وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ..... -এই আয়াত দুটি পাঠ করতে শুরু করেন। পাঠ শেষে তিনি বলেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)! যদি সমস্ত মানুষ শুধু এটা হতেই গ্রহণ করে তবে তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।" অতঃপর বারবার তিনি এগুলো পড়তে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আমার তন্দ্রা আসতে লাগলো। তারপর তিনি বললেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)! যখন তোমাকে মদীনা হতে বের করে দেয়া হবে তখন তুমি কি করবে?" আমি জবাবে বললামঃ

আমি আরো বেশী প্রশস্ততা ও রহমতের দিকে চলে যাবো। অর্থাৎ মক্কা শরীফে চলে যাবো এবং আমি মক্কার কবুতররূপে থাকবো। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাকে যখন মক্কা হতেও বের করে দেয়া হবে তখন তুমি কি করবে?" আমি উত্তর দিলামঃ তখন আমি সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে চলে যাবো। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "তোমাকে যখন সিরিয়া হতেও বের করে দেয়া হবে তখন তুমি কি করবে?" আমি উত্তরে বললামঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি তখন আমার তরবারী কাঁধে রেখে মুকাবিলায় নেমে পড়বো। তিনি বললেনঃ "আমি তোমাকে এরচেয়ে উত্তম পন্থা বলে দিবো কি?" আমি বললামঃ অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেনঃ "তুমি শুনবে, মানবে, যদিও হাবশী গোলামও (নেতা) হয়।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "কুরআন কারীমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত হলো اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (১৬ঃ ৯০)-এই আয়াতটি এবং প্রশস্ততম ওয়াদার আয়াত হলো وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا-এই আয়াতটি।

মুসনাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি খুব বেশী ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে তাকে আল্লাহ সর্বপ্রকারের চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং সর্বপ্রকারের সংকীর্ণতা হতে প্রশস্ততা দান করেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিয্ক দান করে থাকেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা হতে মুক্তি দান করবেন। হযরত রাবী (রঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছেঃ মানুষের উপর যে কাজ কঠিন হয়, আল্লাহ তা সহজ করে দেন। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেনঃ সে জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে দিবেন না। আর তিনি এমন জায়গা হতে দিবেন যা সে জানে না। হযরত কাতাদা বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আল্লাহ তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় ও মৃত্যুর সময়ের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয্ক দান করবেন যা তার কল্পনাতীত।

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে আল্লাহ হতে ভয় করার অর্থ হলো সুন্নাত অনুযায়ী তালাক দেয়া ও সুন্নাত অনুযায়ী রাজআত করা।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আউফ ইবনে মালিক আশযায়ী (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর একজন সাহাবীর এক ছেলেকে কাফিররা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং জেলখানায় বন্দী করে দেয়। এরপর হযরত আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসতেন এবং তাঁর পুত্রের অবস্থা, প্রয়োজন এবং বিপদ আপদ ও কষ্টের কথা বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতেন এবং বলতেনঃ "সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন।" অল্পদিন মাত্র অতিবাহিত হয়েছে, ইতিমধ্যে তাঁর পুত্র শত্রুদের মধ্য হতে পলায়ন করেন। পথে তিনি শত্রুদের ছাগলের পাল পেয়ে যান। ছাগলগুলো তিনি হাঁকিয়ে নিয়ে পিতার নিকট হাযির হন। ঐ সময় وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا-وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ-এই আয়াত নাযিল হয়।"[১]

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই বান্দা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিয্ক হতে বঞ্চিত হয়, দু'আ ছাড়া অন্য কিছু তকদীর ফিরায় না এবং নেক কাজ ও সদ্ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু হায়াত বৃদ্ধি করে না।"[২]

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মালিক আশযায়ীর (রাঃ) পুত্র হযরত আউফ (রাঃ) যখন কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন তখন তিনি (হযরত মালিক আশযায়ী রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আসেন (এবং তাঁকে এটা অবহিত করেন)। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি তাকে বলে পাঠাও যে, সে যেন খুব বেশী বেশী لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করতে থাকে।" কাফিররা হযরত আউফ (রাঃ)-কে বেঁধে রেখেছিল। একদা হঠাৎ করে তাঁর বন্ধন খুলে যায় এবং তিনি সেখান হতে পালাতে শুরু করেন। বাইরে এসে তিনি তাদের একটি উষ্ট্রী দেখতে পান এবং ওর উপর সওয়ার হয়ে বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। পথে তিনি কাফিরদের উটের পাল দেখে সবগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যান। কাফিররা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তখন তিনি তাদের নাগালের

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বাইরে। অবশেষে তিনি তাঁর বাড়ীর দরযার উপর এসে ডাক দেন। ডাক শুনে তাঁর পিতা বলেনঃ "কা'বার প্রতিপালকের শপথ! এটা তো আউফ (রাঃ)-এর কণ্ঠ।" এ কথা শুনে তাঁর মা বলেনঃ "হায় কপাল! এটা আউফ (রাঃ)-এর কণ্ঠ কি করে হতে পারে? সে তো কাফিরদের হাতে বন্দী! অতঃপর পিতা, মাতা এবং খাদেম বাইরে এসে দেখেন যে, সত্যিই তিনি আউফ (রাঃ)। গোটা প্রাঙ্গন উটে ভর্তি হয়ে যায়। পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এ উটগুলো কেমন?" উত্তরে তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। পিতা বলেনঃ "আচ্ছা, থামো। আমি এটা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে আসি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথা শুনে বললেনঃ "এগুলো সবই তোমার মাল। তোমার মনে যা চায় তাই করতে পার।" ঐ সময় وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ـ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।"[১]

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সব দিকের সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার সব কাঠিন্যে তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার ধারণাতীত উৎস হতে তাকে রিযিক দান করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ হতে সরে গিয়ে দুনিয়ার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার হাতেই সঁপে দেন।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমের হিফাযত করবে, তাহলে তুমি আল্লাহকে তোমার পাশে এমনকি তোমার সামনে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই করবে। সমস্ত উম্মত মিলিত হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায় এবং তা যদি আল্লাহ না চান তবে তারা তোমার সামান্যতম উপকারও করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তবে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। কলম উঠে গেছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে।"[৩]

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটাও ইমাম ইবনে আবি হাতিমই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে তিরমিযীতেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে পড়ে এবং সে তা জনগণের সামনে তুলে ধরে, খুব সম্ভব সে কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবে, তার কাজ হালকা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়, আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তার প্রয়োজন পুরো করে থাকেন এবং তার উদ্দেশ্য সফল করেন। হয়তো তাড়াতাড়ি এই দুনিয়াতেই পুরো করেন, না হয় মৃত্যুর পর আখিরাতে পুরো করাবেন।”[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ তিনি স্বীয় আহকাম যেমনভাবে চান তাঁর মাখলূকের মধ্যে পুরো করে থাকেন।

আল্লাহ সব কিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

অর্থাৎ “তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।”(১৩ঃ ৮)

٤- وَالِّٓئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ وَّالِّٓئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ○

৪। তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুমতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো রজস্বলা হয়নি তাদেরও এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।

٥- ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ○

৫। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

যেসব নারীর বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এখানে তাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস, যেমন ঋতুমতী নারীদের ইদ্দত হলো তিন হায়েয। যেমন সূরায়ে বাকারার আয়াত এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এখনো রজস্বলা হয়নি তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।

'যদি তোমরা সন্দেহ কর' এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। এক তো এই যে, তারা রক্ত দেখলো এবং এতে সন্দেহ থাকলো যে, এটা হায়েযের রক্ত, না ইসতাহাযা রোগের রক্ত। আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদ্দতের হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা যায় না। তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই দ্বিতীয় উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। এই রিওয়াইয়াতটিও এর দলীল যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বহু স্ত্রীলোকের ইদ্দত এখনো বর্ণনা করা হয়নি। যেমন নাবালেগ মেয়ে, বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের (ইদ্দতের বর্ণনা দেয়া হয়নি)।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর গর্ভবতীর ইদ্দত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হয় এটা তালাক, না হয় স্বামীর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই হোক। যেমন এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী (সঃ) দ্বারা প্রমাণিত। আর জমহূর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের উক্তি এটাই। তবে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে বাকারার আয়াত এবং এই আয়াতটি মিলিত করে তাঁদের ফতওয়া হলোঃ এই দুটোর মধ্যে যেটা বেশী দেরীতে শেষ হবে ঐ ইদ্দতই সে গণনা করবে। অর্থাৎ যদি সন্তান তিন মাসের পূর্বেই ভূমিষ্ট হয়ে যায় তবে তার ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যদি তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সন্তান ভূমিষ্ট না হয় তবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় ইদ্দত রূপে গণ্য হবে।

হযরত আবূ সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় হযরত আবূ হুরাইরাও (রাঃ) তাঁর নিকট বিদ্যমান ছিলেন। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তার ব্যাপারে আপনার ফতওয়া কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "দুটো ইদ্দতের মধ্যে শেষের ইদ্দতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই অবস্থায় তার ইদ্দত হবে তিন মাস।" হযরত আবূ সালমা (রাঃ) তখন বলেনঃ "কুরআন কারীমে তো রয়েছে যে,

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত?" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তখন বলেনঃ "আমিও আমার চাচাতো ভাই হযরত আবূ সালমা (রাঃ)-এর সাথে রয়েছি। অর্থাৎ আমার ফতওয়াও এটাই।" তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর গোলাম কুরাইব (রাঃ)-কে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট এই মাসআলা জানার জন্যে প্রেরণ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন যে, হযরত সুবাইআহ আসলামিয়্যাহ (রাঃ)-এর স্বামী যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। তখনই বাগদাতার আগমন ঘটে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন। বাগদানকারীদের মধ্যে হযরত আবুস সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন।"[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উৎবাহ (রাঃ) হযরত উমার ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন সুবাইআহ বিনতু হারিস আসলামিয়্যাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং তা জেনে নিয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন। তাঁর কথামত হযরত উমার ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হযরত সুবাইআহ (রাঃ)-এর কাছে গমন করেন এবং তাঁর নিকট হতে তাঁর ঘটনাটি জেনে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উৎবাহ (রাঃ)-এর কাছে পত্র লিখেন যে, হযরত সুবাইআহ (রাঃ)-এর স্বামী ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে খাওলাহ (রাঃ)। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। বিদায় হজ্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ সময় তাঁর স্ত্রী হযরত সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নিফাস হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় পরিহিতা হয়ে সাজ-সজ্জা করে বসে পড়েন। হযরত আবুস সানাবিল বা'কাফ যখন তাঁর নিকট আসেন তখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি যে এভাবে বসে রয়েছো, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পার না।" তিনি একথা শুনে চাদর গায়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হন এবং তাঁকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "সন্তান প্রসবের পরেই তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা কিছু দীর্ঘতার সাথে অন্যান্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ্ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে এই হাদীসটি আনয়ন করার পর এও রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। যেখানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলাও (রাঃ) ছিলেন, যাঁকে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খুবই সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের সময়কাল বলতে গিয়ে বলেন যে, ওটা দুই ইদ্দতের মধ্যে শেষটি। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) তখন তাঁকে সুবাইআহ বিনতু হারিস (রাঃ)-এর হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন তার কোন এক সাথী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-কে কিছু তিরস্কার করেন। ইবনে সীরীন তখন বলেনঃ "তাহলে তো যদি আমি আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিই তবে আমার তাঁর উপর বড়ই বাহাদুরী দেখানো হবে, অথচ তিনি এখনো কুফার এক প্রান্তে জীবিত বিদ্যমান রয়েছেন।" তখন তিনি কিছু লজ্জিত হলেন এবং বললেনঃ "কিন্তু তাঁর চাচা তো একথা বলেন না।" ইবনে সীরীন (রঃ) বলেনঃ "আমি তখন হযরত আবূ আতিয়্যাহ মালিক ইবনে আমির (রঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে সুবাইআহ (রাঃ)-এর হাদীসটি পূর্ণভাবে শুনালেন। আমি তাঁকে বললামঃ এ ব্যাপারে আপনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে কিছু শুনেছেন কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ আমরা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি বলেনঃ "তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছো এবং তাকে অবকাশ দিচ্ছ না?" তখন সূরায়ে নিসা অবতীর্ণ হয়। সূরায়ে কাসরা অর্থাৎ সূরায়ে তালাক সূরায়ে নিসা তূলার পরে অবতীর্ণ হয়। আর এতে বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "যে মুলাআনাহ (পরস্পর অভিশাপ) করতে চায়, আমি তার সাথে মুলাআনাহ করতে প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ আমার ফতওয়ার বিপরীত যে ফতওয়া দেয় সে যেন আমার সাথে মুকাবিলা করতে আসে এবং মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হওয়ার দু'আ করে। আমার ফতওয়া এই যে, গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। প্রথমে হুকুম ছিল এই যে, যেসব নারীর স্বামী মারা যাবে তারা যেন চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করে। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। সুতরাং এই নারীগুলো ঐ নারীগুলো হতে বিশিষ্টা হয়ে গেল। এখন মাসআলা এটাই থাকলো যে, যে নারীর স্বামী মারা যাবে সে গর্ভবতী হলে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে যাবে।"

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) একথা ঐ সময় বলেছিলেন যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর ফতওয়া হলোঃ গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল দুই ইদ্দতের শেষ ইদ্দত।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল যে সন্তান প্রসব পর্যন্ত, এটা কি তিন তালাক দেয়া হয়েছে এরূপ নারীদের ইদ্দতকাল, না যাদের স্বামী মারা গেছে তাদের ইদ্দতকাল?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "এটা উভয়েরই ইদ্দতকাল।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে থাকেন।

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার।

٦- اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দিয়ো; তাদেরকে উত্যক্ত করো না সংকটে ফেলার জন্যে, তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ

---

১. এ হাদীসটি খুবই গারীব, এমনকি মুনকারও বটে। কেননা, এর ইসনাদের মধ্যে মুসান্না ইবনে সাবাহ রয়েছে যার হাদীস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। কিন্তু এর অন্য সনদও রয়েছে।

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ○

করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

٧- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ○

৭। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, যখন তাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিবে তখন যেন তার ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তার বসবাসের জায়গা দেয়। এ জায়গা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। এমনকি হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, যদি সে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার লোক হয় তবে যেন তার ঘরের এক কোণাতেই তাকে স্থান দেয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করো না। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন সংকটময় অবস্থায় ফেলে দিয়ো না যে, তারা সহ্য করতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অথবা তোমাদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা তাদের প্রাপ্য মোহর ছেড়ে দেয়। কিংবা তোমরা তাদেরকে এমনভাবে তালাক দিবে না যে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দুই একদিন পূর্বে রাজআত করার ঘোষণা দিবে, এরপর আবার তালাক দিবে এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে রাজআত করে নিবে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার খাওয়া-খরচের দায়িত্ব তার স্বামীর। অধিকাংশ আলেমের মতে এই হুকুম ঐ মহিলাদের জন্যে খাস করে বর্ণনা করা হচ্ছে যাদেরকে শেষের তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাদেরকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর নেই। কেননা, যাকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর উপর রয়েছে তার খরচাদি বহন করার দায়িত্ব

তো স্বামীর উপর রয়েছেই। সে গর্ভবতী হোক আর না-ই হোক। অন্যান্য আলেমগণ বলেন যে, এটা ঐ নারীদেরও হুকুমের বর্ণনা যাদেরকে রাজআত করার অধিকার স্বামীদের রয়েছে। কেননা, উপরেও এদের বর্ণনা ছিল। এটাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ গর্ভবতীর ইদ্দত কাল দীর্ঘ হয়ে থাকে। সুতরাং কেউ যেন এটা ধারণা না করে যে, ইদ্দতের সময়কাল পর্যন্ত তো তার স্ত্রীর খরচ বহনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত, তার পরে নয়। এজন্যেই পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, রাজয়ী তালাক দেয়ার সময় যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তবে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার খরচ বহনের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত। এ ব্যাপারেও আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, এই খরচ তার জন্যে গর্ভের মাধ্যমে, না গর্ভের জন্যে? ইমাম শাফিয়ী (রঃ) প্রমুখ হতে দুটি উক্তিই বর্ণিত আছে এবং এর ভিত্তিতে বহু মাসআলাতেও মতানৈক্য প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন এই তালাকপ্রাপ্ত নারীরা গর্ভ হতে ফারেগ হবে তখন যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করায় তবে তাদেরকে দুধ পান করাতে দিতে হবে। তবে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বা না করানোর এখতেয়ার তাদের রয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের দুধ পান অবশ্য তাদেরকে করাতেই হবে। পরে না পান করাতেও পারে। কেননা, শিশুর জীবন সাধারণতঃ এই দুধের সাথেই জড়িত। অতঃপর সে যদি এর পরেও দুধ পান করাতে থাকে তবে পিতা-মাতার মধ্যে যে পারিশ্রমিক দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তোমরা পরস্পর যে কাজ করে থাকো তা কল্যাণের সাথে ও নিয়ম মাফিক হওয়া উচিত। এটা নয় যে, ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে। যেমন সূরায়ে বাকারায় রয়েছেঃ

لَاتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ -

অর্থাৎ "মাতাকে তার ছেলের ব্যাপারে কষ্ট দেয়া হবে না এবং পিতাকে তার ছেলের ব্যাপারে কষ্ট দেয়া হবে না।" (২ঃ ২৩৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন শিশুর পিতা কম দিতে চায় এবং মাতা তা স্বীকার করতে চায় না, অথবা মাতা বেশী দাবী করে এবং পিতার নিকট তা ভারী বোধ হয়, তারা কোনক্রমেই একমত হতে পারে না, তবে স্বামীর অন্য কোন ধাত্রী রাখার এখতেয়ার রয়েছে। হ্যাঁ, তবে ধাত্রীকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হবে সেটা নিতেই যদি মা সম্মতি প্রকাশ করে তবে মায়েরই অগ্রাধিকার থাকবে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ শিশুর পিতা অথবা অভিভাবক যে রয়েছে তার উচিত যে, সে যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুর উপর খরচ করে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।

তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করে থাকেন এবং হালকা খাবার খেয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রেরিত লোকটিকে বলে দেন যে, তিনি ঐ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে কি করেন তা যেন সে দেখে আসে। যখন তিনি এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হন। তখন মিহিন কাপড় পরতে এবং খুব উত্তম খাদ্য খেতে শুরু করেন। প্রেরিত দূত ফিরে এসে হযরত উমার (রাঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ)-এর উপর দয়া করুন! তিনি لِيُنفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ... -এই আয়াতের উপর আমল করেছেন।

হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) একটি গারীব হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "একটি লোকের নিকট দশটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। সে তা হতে একটি দীনার আল্লাহর পথে সাদকা করে। দ্বিতীয় এক ব্যক্তির নিকট দশ উকিয়া (এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম হয়) ছিল। তা হতে সে এক উকিয়া আল্লাহর পথে খরচ করে। তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নিকট একশ' উকিয়া ছিল। তা হতে সে আল্লাহর নামে দশ উকিয়া খরচ করে। এরা তিন জনই প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সমান। কেননা, প্রত্যেকেই তার মালের এক দশমাংশ আল্লাহর পথে খরচ করেছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - অর্থাৎ "অবশ্য কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে।" (৯৪ঃ ৬)

মুসনাদে আহমাদের হাদীসটি এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "পূর্ব যুগে এক স্বামী ও এক স্ত্রী বাস করতো। তারা অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করতো। তাদের কাছে জীবন ধারণের কিছুই ছিল না। একদা স্বামী সফর হতে ফিরে আসে। সে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির

হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলোঃ "কোন খাবার আছে কি?" স্ত্রী বললেনঃ "আপনি খুশী হন, আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।" স্বামী বললোঃ "তাহলে নিয়ে এসো। যা আছে তাই এনে দাও। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।" স্ত্রী বললোঃ "আরো একটু ধৈর্য ধারণ করুন! আমাদের আল্লাহর রহমতের বহু কিছু আশা রয়েছে।" যখন আরো কিছু বিলম্ব হয়ে গেল তখন স্বামী আবার বললোঃ "তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আস না কেন? আমি যে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।" স্ত্রী বললোঃ "এতো তাড়াতাড়ি করছেন কেন? এখনই আমি চুল্লী হতে হাঁড়ি নামিয়ে আনছি।" কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখলো যে, স্বামী আবার তাগাদা করতে উদ্যত হচ্ছে তখন সে নিজে নিজে বলতে লাগলোঃ "উঠে তন্দুর হতে হাঁড়ি উঠিয়ে দেখি তো!" উঠে দেখে যে, আল্লাহর অসীম কুদরতে তার ভরসার বিনিময়ে হাঁড়ি বকরীর গোশ্তে পূর্ণ হয়ে আছে এবং আরো দেখে যে, ঘরের যাঁতা ঘুরতে রয়েছে এবং আটা বের হতে আছে। সে হাঁড়ি হতে সমস্ত গোশ্ত বের করে নিলো এবং যাঁতা হতে আটা উঠিয়ে নিলো এবং যাঁতা ঝেড়ে ফেললো।" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "যাঁর হাতে আবুল কাসেম (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি সে যাঁতা না ঝাড়তো বরং শুধু আটা নিয়ে নিতো তবে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ যাঁতা ঘুরতে থাকতো'।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, একটি লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখে যে, ক্ষুধার জ্বালায় পরিবারস্থ লোকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এ দেখে সে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তার স্ত্রী যখন দেখলো যে, তার স্বামী অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের করুণ দৃশ্য দেখতে না পেরে বাড়ী হতে চলে গেছে; তখন সে তার যাঁতা ঠিকঠাক করলো এবং চুল্লীতে আগুন ধরিয়ে দিলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলোঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি রিয্ক দান করুন!" দু'আ শেষে উঠে দেখে যে, হাঁড়ি গোশ্তে পরিপূর্ণ রয়েছে এবং যাঁতা ঘুরতে রয়েছে ও আটা বের হতে আছে। ইতিমধ্যে স্বামী বাড়ীতে পৌঁছে গেল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলোঃ 'আমি বাড়ী হতে যাওয়ার পর কিছু পেয়েছো কি?" স্ত্রী উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ, মহান আল্লাহ আমাদেরকে বহু কিছু দান করেছেন।" সে গিয়ে যাঁতার পাট উঠিয়ে নিলো। নবী (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে তিনি বলেনঃ "যদি সে যাঁতার পাট না উঠাতো তবে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ যাঁতা ঘুরতে থাকতো।"

৮- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮। কত জনপদ তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।

৯- فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ○

৯। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করলো; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম।

১০- أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○

১০। আল্লাহ তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ–

১১- رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ○

১১। প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল (সঃ), যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্যে। যে কেউ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে না মানে এবং তাঁর শরীয়তের উপর না চলে তাদেরকে ধমকের সুরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ দেখো, পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যেও যারা তোমাদের নীতির উপর চলতো, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতো, আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতো, তাদেরকে কঠিনভাবে হিসাব দিতে হয়েছিল এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ক্ষতিই ছিল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম। ঐ সময় তারা লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু ঐ সময়ের লজ্জা ও অনুশোচনা তাদের কোন উপকারে আসেনি। দুনিয়ার এই শাস্তিই যদি শেষ শাস্তি হতো তাহলে তো একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তা নয়! বরং পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা তাদের মত হয়ো না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যিকর। এখানে যিক্‌র দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফাযতকারী।" (১৫ঃ ৯) কেউ কেউ বলেন যে, এখানে যিক্‌র দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উদ্দেশ্য। যেহেতু সাথে সাথেই বলা হয়েছেঃ رَسُوْلًا তাহলে এটা হবে بَدَلْ اِشْتِمَال, রাসূলুল্লাহ্ই (সঃ) কুরআনকে জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, এই সম্পর্কের কারণে তাঁকেই 'যিক্‌র' শব্দ দ্বারা স্মরণ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই ভাবার্থকে সঠিক বলেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে থাকেন, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোকের দিকে আনার জন্যে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থাৎ "এই কিতাব আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি জনগণকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে আস।" (১৪ঃ ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।" (২ঃ ২৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত অহীকে নূর বা জ্যোতি বলেছেন। কেননা, এর দ্বারা হিদায়াত ও সরল সঠিক পথ লাভ করা যায়। আর মহান আল্লাহ এর নাম রূহও রেখেছেন। কেননা, এর দ্বারা অন্তর জীবন লাভ করে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থাৎ "এভাবেই আমি তোমার প্রতি আমার হুকুমের রূহের অহী করেছি, তুমি জানতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি ওটাকে নূর করে দিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করে থাকি। নিশ্চয়ই তুমি সরল সঠিক পথের দিশারী।" (৪২ঃ ৫২)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এর তাফসীর ইতিপূর্বে কয়েকবার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

১২। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, ওগুলোর অনুরূপভাবে, ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

١٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাট সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন মাখলূক তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর ফরমানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার উপর আমল করতঃ তাঁকে খুশী করে। তাই তিনি বলেনঃ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ যেমন হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেনঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ـ

অর্থাৎ "তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?" (৭১ঃ ১৫) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ـ

অর্থাৎ "সপ্ত আকাশ ও যমীন এবং এগুলোর যতকিছু রয়েছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।" (১৭ঃ ৪৪)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ 'ওগুলোরই অনুরূপ যমীনও (অর্থাৎ যমীনও সাতটি)।' সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের সহীহ্ হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি যুলুম করে কারো কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত ভূমি দখল করে নিবে, তাকে সপ্ত আকাশের গলাবদ্ধ পরানো হবে।" সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আমি এর সমস্ত সনদ ও শব্দ বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ এর শুরুতে যমীন সৃষ্টির আলোচনায় বর্ণনা করে দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

যেসব লোক বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাতটি অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড, তাঁরা অযথা এ কথা বলেছেন এবং বিনা দলীলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। সূরায়ে হাদীদে هُوَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ -এই আয়াতের তাফসীরে সপ্ত আকাশ ও যমীনের এবং ওগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের এবং ওগুলোর পুরুত্ব, যা পাঁচশ বছরের পথ, পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ কথাই বলেছেন। অন্য একটি হাদীসেও সপ্ত আকাশ এবং যা কিছু ওগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং সপ্ত যমীন ও যা কিছু ওগুলোর মধ্যে রয়েছে, কুরসীর তুলনায় এমনই যেমন কোন এক বিরাট ও প্রশস্ত মাঠে একটি আংটি পড়ে থাকে।

তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "যদি আমি এ আয়াতের তাফসীর তোমাদের সামনে বর্ণনা করি তবে তোমরা তা স্বীকার করবে না এবং তোমাদের স্বীকার না করা হবে তোমাদের ওটাকে মিথ্যা মনে করা।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কোন একজন লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস

করলে তিনি বলেনঃ "আমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমি যা কিছু তোমাকে বলবো তা তুমি অস্বীকার করবে না?" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, প্রত্যেক যমীনে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মত এবং এই যমীনের মাখলূকের মত মাখলূক রয়েছে। হযরত ইবনে মুসান্না (রঃ) বর্ণিত রিওয়াইয়াতে এসেছে যে, প্রত্যেক আসমানে (হযরত ইবরাহীম আঃ -এর মত) হযরত ইবরাহীম (আঃ) রয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর 'কিতাবুল আসমা ওয়াসসিফাত' নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "সপ্ত যমীনের প্রত্যেকটিতে তোমাদের নবীর মত নবী রয়েছেন, আদম (আঃ)-এর মত আদম রয়েছেন, নূহ্ (আঃ)-এর মত নূহ্ রয়েছেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর মত ইবরাহীম রয়েছেন এবং ঈসা (আঃ)-এর মত ঈসা রয়েছেন।" অতঃপর ইমাম বায়হাকী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আর একটি রিওয়াইয়াত আনয়ন করে বলেন যে, এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু এটা অতি বিরল। এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন আবুয যুহা। ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর জানা মতে ঐ বর্ণনাকারীর অনুসরণ কেউই করেন না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

একটি মুরসাল এবং অত্যন্ত মুনকার হাদীস ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সমাবেশে আগমন করেন। তিনি দেখেন যে, তাঁরা কোন এক বিষয়ের চিন্তায় চুপচাপ বসে রয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যাপার কি?" উত্তরে তাঁরা বলেনঃ "আমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করছি।" তিনি তখন বলেনঃ "বেশ বেশ! খুব ভাল কথা। আল্লাহর মাখলূক সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করবে। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করবে না। জেনে রেখো যে, এই পশ্চিম দিকে একটি সাদা যমীন রয়েছে। ওর শুভ্রতা ওর নূর বা জ্যোতি অথবা বলেনঃ ওর নূর বা জ্যোতি হলো ওর শুভ্রতা। সূর্যের রাস্তা হলো চল্লিশ দিনের। সেখানে আল্লাহর এক মাখলূক রয়েছে যারা চোখের পলক ফেলার সমান সময়টুকুতেও কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেনি।" তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করেনঃ "তাহলে শয়তান তাদের হতে কোথায় রয়েছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "শয়তানকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে কি না এটাও তাদের জানা নেই।" তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "তারাও কি মানুষ?" জবাবে তিনি বলেনঃ "না। হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাদের কিছুই জানা নেই।"

সূরা ঃ তালাক এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ তাহ্‌রীম মাদানী
(আয়াত ঃ ১২, রুকূ' ঃ২)

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে নবী (সঃ)! আল্লাহ্ তোমার জন্যে যা বৈধ করেছে তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١- يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২। আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩। স্মরণ কর– নবী (সঃ) তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবী (সঃ)-কে তা জনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী (সঃ) এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো, যখন নবী (সঃ) তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বললোঃ কে আপনাকে এটা অবহিত করলো? নবী বললোঃ আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

٣- وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৪। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে (তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নবী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল (আঃ) ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণও তার সাহায্যকারী।

٤- اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

৫। যদি নবী (সঃ) তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী– যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যকারিণী, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।

٥- عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ○

এই সূরাটির প্রাথমিক আয়াতগুলোর শানে নুযূলের ব্যাপারে মুফাসসিরদের উক্তি নিম্নরূপঃ

কেউ কেউ বলেন যে, এটা হযরত মারিয়াহ্ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। সুনানে নাসাঈতে এই রিওয়াইয়াতটি বিদ্যমান রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘটেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এক দাসী সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন। ফলে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে উম্মে ইবরাহীম (রাঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন। তখন তাঁর ঐ স্ত্রী তাঁকে বলেনঃ "তোমার ঘরে ও আমার বিছানায় এ কাজ কারবার?" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম।" তখন তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! হালাল কিভাবে আপনার উপর হারাম হয়ে যাবে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি শপথ করছি যে, এখন হতে তার সাথে কোন প্রকারের কথাবার্তা বলবো না।" ঐ সময় এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। হযরত যায়েদ (রঃ) বলেনঃ এর দ্বারা জানা গেল যে, 'তুমি আমার উপর হারাম' এ কথা কেউ বললে তা বাজে বলে প্রমাণিত হবে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছিলেনঃ "তুমি আমার উপর হারাম। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাহচর্যে থাকবো না।"

হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন যে, হারাম করার ব্যাপারে তো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁকে তাঁর কসমের কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "এ দু'জন স্ত্রী কে ছিলেন?" উত্তরে হযরত উমার বলেনঃ "তাঁরা হলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)। উম্মে ইবরাহীম কিবতিয়্যাহ্ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করেই ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে তাঁর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত মারিয়াহ্ কিবতিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। এতে হযরত হাফসা (রাঃ) দুঃখিতা হন যে, তাঁর পালার দিনে তাঁরই ঘরে ও তাঁরই বিছানায় তিনি মারিয়াহ্ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেনঃ "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম। তুমি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো না।" এতদ্সত্ত্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই খবর স্বীয় নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দেন এবং এই আয়াতগুলো নাযিল করেন। নবী (সঃ) কাফ্ফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সঙ্গে মিলিত হন। এই ঘটনাটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ফতওয়া দেন যে, কেউ যদি বলেঃ "আমি অমুক জিনিস আমার উপর হারাম করে নিলাম" তবে তার উচিত কসম ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা। একটি লোক তাঁকে এই মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছে।

তখন তিনি তাকে বলেনঃ "তোমার স্ত্রী তোমার উপর হারাম নয় (তুমি কাফ্ফারা আদায় করে কসম ভেঙ্গে দাও)।" সবচেয়ে কঠিন কাফ্ফারা তো হলো আল্লাহ্র পথে গোলাম আযাদ করা। ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং বহু ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদের ফতওয়া এই যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, দাসী অথবা খাওয়া পরার কোন জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেয়, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, শুধু স্ত্রী বা দাসীকে নিজের উপর হারাম করে নিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, অন্য কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে নিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। যদি হারাম করা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে তবে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দাসীকে হারাম করার কথা দ্বারা যদি আযাদ করে দেয়ার নিয়ত করে তবে ঐ দাসী অবশ্যই আযাদ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ নারীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যিনি স্বীয় নফ্সকে নবী (সঃ)-এর নিকট হিবা বা দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা গারীব উক্তি। সম্পূর্ণ সঠিক কথা এই যে, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিজের উপর মধুকে হারাম করে নেয়া।

সহীহ্ বুখারীতে এই আয়াতের ক্ষেত্রে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাঃ)-এর ঘরে মধু পান করতেন এবং এই কারণে তিনি তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতেন। এই জন্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করেন যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই কাছে নবী (সঃ) আসবেন তিনি যেন তাঁকে বলেনঃ "আপনার মুখ হতে মাগাফীরের (গেঁদ বা আঠা জাতীয় জিনিস যাতে দুর্গন্ধ রয়েছে) গন্ধ আসছে, সম্ভবতঃ আপনি মাগাফীর খেয়েছেন!" সুতরাং তাঁরা এ কথাই বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "আমি যায়নাব (রাঃ)-এর ঘরে মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনো আমি মধু পান করবো না। সুতরাং তোমরা এ কথা কাউকেও বলবে না।" ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটিকে কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযূর-এর মধ্যেও কিছু বৃদ্ধি সহকারে আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এখানে দু'জন স্ত্রী দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর চুপে-চুপে কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'আমি মধু পান করেছি' এই উক্তিটি। তিনি কিতাবুত্ তালাকের মধ্যে এ হাদীসটি আনয়ন করে বলেন যে, মাগাফীর

হলো গঁদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে।

কিতাবুত্ তালাকে এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এই শব্দে বা ভাষায় বর্ণিত আছেঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন। আসরের নামাযের পর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং কাউকেও নিকটে করে নিতেন। একদা তিনি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং অন্যান্য দিন তাঁর কাছে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, সেই দিন তদপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান করেন। এতে আমার মনে নিজের মর্যাদাবোধ জেগে উঠলো। তত্ত্ব নিয়ে জানলাম যে, তাঁর কওমের একটি স্ত্রীলোক এক মশক মধু তাঁর কাছে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ঐ মধুর শরবত পান করিয়েছেন। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর ঘরে এতোটা বিলম্ব করেছেন। আমি মনে মনে বললাম যে, ঠিক আছে, কৌশল করে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এটা হতে ফিরিয়ে দিবো। সুতরাং আমি হযরত সাওদাহ্ বিনতু যামআহ্ (রাঃ)-কে বললামঃ তোমার ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আসবেন এবং তোমার নিকটবর্তী হবেন তখন তুমি তাঁকে বলবেঃ "আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?" তিনি জবাবে বলবেনঃ "না।" তখন তুমি বলবেঃ তাহলে এই গন্ধ কিসের?" তিনি তখন বলবেনঃ "হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।" তুমি তখন বলবেঃ "সম্ভবতঃ মৌমাছি 'আরফাত' নামক কণ্ঠকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।" আমার কাছে যখন আসবেন তখন আমিও তাই বলবো। হে সফিয়া (রাঃ)! তোমার কাছে যখন আসবেন তখন তুমিও তাই বলবে।" হযরত সাওদাহ্ (রাঃ) বলেনঃ "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার ঘরে আসলেন, তখনো তিনি দরজার উপরই ছিলেন, তখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাকে যা বলতে বলেছেন তাই বলে দিই, কেননা, আমি তাঁকে খুবই ভয় করতাম। কিন্তু ঐ সময় আমি নীরব থাকলাম। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন তখন আমি ঐ কথাই বলে দিলাম। তারপর তিনি হযরত সফিয়া (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনিও ঐ কথাই বলেন। এরপর হযরত হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মধু পান করাতে চাইলে তিনি বলেনঃ "আমার এর প্রয়োজন নেই।" হযরত সাওদা (রাঃ) তখন বলতে লাগলেনঃ "আফসোস! আমরা এটাকে হারাম করিয়ে দিলাম!" আমি (আয়েশা রাঃ) বললামঃ চুপ থাকো।

সহীহ্ মুসলিমে এটুকু বেশী রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) দুর্গন্ধকে খুবই ঘৃণা করতেন। এজন্যেই ঐ স্ত্রীগণ বলেছিলেনঃ "আপনি মাগাফীর খেয়েছেন কি?"

কেননা, মাগাফীরেও কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে। যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, না, তিনি মাগাফীর খাননি। বরং মধু খেয়েছেন, তখন তাঁরা বললেনঃ "তাহলে মৌমাছি 'আরফাত' গাছ হতে মধু আহরণ করে থাকবে, যার গাঁদের নাম হলো মাগাফীর এবং ওরই ক্রিয়ার প্রভাবে এই মধুতে মাগাফীরের গন্ধ রয়েছে।" এই রিওয়াইয়াতে جَرَسَتْ শব্দ রয়েছে, জাওহারী (রঃ) যার অর্থ করেছেন أَكَلَتْ। অর্থাৎ খেয়েছে। মৌমাছিকেও جَوَارِس বলা হয় এবং جَرْس হাল্কা শব্দকে বলা হয়। পাখী যখন চঞ্চু দ্বারা কোন খাদ্য খায় তখন তার চঞ্চুর শব্দ শোনা যায়, ঐ সময় আরবরা বলেঃ سَمِعْتُ جَرْسَ الطَّيْرِ অর্থাৎ "আমি পাখীর চঞ্চুর শব্দ শুনেছি।" একটি হাদীসে রয়েছেঃ "জান্নাতীরা পাখীর হাল্কা ও মিষ্টি শব্দ শুনতে পাবে।" এখানেও আরবী جَرْس শব্দ রয়েছে।

আসমাঈ' (রঃ) যিনি হযরত শু'বা (রাঃ) -এর মজলিসে ছিলেন, বলেন যে, হযরত শু'বা جَرْس শব্দটি جَرْش অর্থাৎ شِين দ্বারা পড়েন। তখন হযরত আসমাঈ' (রঃ) বলেন যে, ওটা سِين দ্বারা হবে। তখন হযরত শুবা (রঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেনঃ "এ ব্যক্তি এটা আমার চেয়ে বেশী জানেন। এটাই সঠিক হবে। তোমরা এটা সংশোধন করে নাও।" এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন। মোটকথা, মধু পান করানোর ঘটনায় দু'টি নাম বর্ণিত আছে। একটি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নাম এবং অপরটি হযরত যায়নাব (রাঃ)-এর নাম। এই ব্যাপারে যাঁরা একমত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)। তাহলে খুব সম্ভব ঘটনা দু'টো হবে। তবে এই দু'জনের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরস্পর এই প্রকারের পরামর্শ গ্রহণকারিণী ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)। এটা এ হাদীস দ্বারাও জানা যাচ্ছে যা মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি (হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ) বলেনঃ বহু দিন হতে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, إِنْ تَتُوبَا.... -এ আয়াতের মধ্যে যে দু'জন স্ত্রীর বর্ণনা রয়েছে তাঁদের নাম হযরত উমার (রাঃ)-এর কাছে জেনে নিবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এই খলীফা যখন হজ্বের সফরে বের হলেন তখন আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। পথে এক জায়গায় খলীফা উমার (রাঃ) রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন। আমি তখন পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে

ফিরে আসলেন। আমি পানি ঢেলে ঢেলে তাঁকে অযূ করালাম। সুযোগ পেয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! ....إِنْ تَتُوبَا এই আয়াতে যে দুই জনকে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁরা কারা? তিনি জবাবে বললেনঃ "হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! এটা বড়ই আফসোসের বিষয়!" যুহ্‌রী (রঃ) বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। কিন্তু ওটা গোপন করা বৈধ ছিল না বলে তিনি উত্তর দেনঃ "এর দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।" অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি বলেনঃ "আমরা কুরায়েশরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের আওতাধীনে রাখতাম। কিন্তু মদীনাবাসীদের উপর তাদের নারীরা আধিপত্য করতো। যখন আমরা হিজরত করে মদীনায় আসলাম তখন আমাদের নারীরাও তাদের দেখাদেখি আমাদের উপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা করে। আমি মদীনা শরীফের উপরের অংশে হযরত উমাইয়া ইবনে যায়েদের বাড়ীতে অবস্থান করতাম। একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বলতে লাগলাম। তখন সে উল্টিয়ে আমাকেও জবাব দিতে শুরু করলো। তার এই আচরণ আমার নিকট খুবই খারাপ বোধ হলো। আমি মনে মনে বললামঃ এই ধরনের নতুন আচরণ কেন? আমাকে বিস্মিত হতে দেখে সে বললোঃ "আপনি কি চিন্তা করছেন? আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর স্ত্রীরাও তাকে জবাব দিয়ে থাকে। কোন কোন সময় তো তারা সারা দিন ধরে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলাও বন্ধ রাখে।" তার এই কথা শুনে আমি অন্য এক সমস্যায় পড়লাম। সরাসরি আমি আমার কন্যা হাফসা (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জবাব দিয়ে থাকো এবং মাঝে মাঝে সারা দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখো এটা কি সত্য? সে উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ, এটা সত্য বটে।" আমি তখন বললামঃ যারা এরূপ করে তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণে এরূপ নারীর উপর স্বয়ং আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন? সাবধান! আগামীতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কোন জবাব দিবে না এবং তাঁর কাছে কিছুই চাইবে না। কিছু চাইতে হলে আমার কাছেই চাইবে। আয়েশা (রাঃ)-কে দেখে তুমি তার প্রতি লোভ বা হিংসা করবে না। সে তোমার চেয়ে ভাল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট অধিকতর প্রিয়।

হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! আমার প্রতিবেশী একজন আনসারী ছিলেন। আমরা উভয়ে পালা ভাগ করে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে আমি

একদিন হাযির হতাম এবং একদিন তিনি হাযির হতেন। আমি আমার পালার দিনের সমস্ত হাদীস, আয়াত ইত্যাদি শুনে তাঁকে এসে শুনাতাম এবং তিনি তাঁর পালার দিন সবকিছু আমাকে এসে শুনাতেন। আমাদের মধ্যে এ কথাটি ঐ সময় মশহূর হয়ে গিয়েছিল যে, গাস্‌সানী বাদশাহ্ আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। একদা আমার সঙ্গী তাঁর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গিয়েছিলেন! ইশার সময় এসে তিনি আমার দরযার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলেন। আমি উদ্বেগের সাথে বের হয়ে বললামঃ খবর ভাল তো? তিনি উত্তরে বললেনঃ "আজ তো একটা কঠিন ব্যাপার ঘটে গেছে।" আমি বললামঃ গাস্‌সানী বাদশাহ্ কি পৌঁছে গেছে? তিনি জবাবে বললেনঃ "এর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে।" আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কি হয়েছে, বলুন না? তিনি বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।" আমি তখন বললামঃ আফ্‌সোস! হাফসা (রাঃ) তো ধ্বংস হয়ে গেল! আমি পূর্ব হতেই এটার আশংকা করছিলাম। ফজরের নামায পড়েই কাপড়-চোপড় পরে আমি সরাসরি হাফসা (রাঃ)-এর বাড়ীতে হাযির হলাম। দেখলাম যে, সে কাঁদছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? সে জবাব দিলোঃ "এ খবর তো বলতে পারছি না। তবে তিনি আমাদের হতে পৃথক হয়ে নিজের কক্ষে অবস্থান করছেন।" আমি সেখানে গেলাম। দেখি যে, একজন হাবশী গোলাম পাহারা দিচ্ছে। আমি তাকে বললামঃ যাও, আমার জন্যে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বললোঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোন উত্তর দিলেন না।" আমি তখন সেখান হতে ফিরে এসে মসজিদে গেলাম। দেখলাম যে, মিম্বরের পাশে সাহাবীদের একটি দল বসে রয়েছেন এবং কারো কারো চক্ষু দিয়ে তো অশ্রু ঝরছে! আমি অল্পক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম। কিন্তু আমার মনে শান্তি কোথায়? আবার উঠে দাঁড়ালাম এবং ঐ গোলামের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইতে বললাম। গোলাম এবারও এসে খবর দিলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন উত্তর দেননি। আবার আমি মসজিদে চলে গেলাম। সেখান হতে আবার ফিরে আসলাম এবং পুনরায় গোলামকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে বললাম। গোলাম আবার গেল এবং ঐ একই জবাব দিলো। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় গোলাম আমাকে ডাক দিলো এবং বললোঃ "আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।" আমি প্রবেশ করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বস্তার উপর হেলান লাগিয়ে বসে আছেন যার দাগ তাঁর দেহ মুবারকে পড়ে গেছে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল

(সঃ)! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? তিনি মাথা উঠিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেনঃ "না।" আমি বললামঃ আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কথা এই যে, আমরা কুরায়েশরা আমাদের স্ত্রীদেরকে আমাদের আজ্ঞাধীনে রাখতাম। কিন্তু মদীনাবাসীদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে আছে। এখানে এসে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি তাদেরই আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর ঘটনাটিও বর্ণনা করলাম এবং তার একথাটিও বর্ণনা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীরাও এরূপ করে থাকেন। তারপর আমি আমার একথাটিও বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ যে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এ ভয় কি তাদের নেই? আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন। তারপর আমি আমার হাফসা (রাঃ)-এর কাছে যাওয়া, তাকে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি হিংসা পোষণ না করার উপদেশ দেয়ার কথা বর্ণনা করলাম। এবারও তিনি মুচকি হাসলেন। এরপর আমি বললামঃ অনুমতি হলে আরো কিছুক্ষণ আপনার এখানে অবস্থান করতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি বসে পড়লাম। অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে ঘরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনটি শুষ্ক চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। তাঁর খাস দরবারের এ অবস্থা দেখে আমার খুবই দুঃখ হলো। আমি আরয করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মতের উপর প্রশস্ততা দান করেন। দেখুন তো পারসিক ও রোমকরা আল্লাহর ইবাদত করে না, অথচ তারা দুনিয়ার কত বেশী নিয়ামতের মধ্যে ডুবে রয়েছে? আমার একথা শোনা মাত্রই তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেনঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি তো, সন্দেহের মধ্যে এখনো রয়ে গেছো। এই কওমের জন্যে দুনিয়ার এই নিয়ামতরাশি কল্যাণকর নয়। তাদেরকে এগুলো তাড়াতাড়ি করে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়েছে।" আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

ব্যাপারটা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে শপথ করেছিলেন যে, এক মাসকাল তিনি তাদের সাথে মিলিত হবেন না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাম্বীহ করেন।"[১]

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী এবং সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "বছর ধরে আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, হযরত উমার (রাঃ)-কে এই দুইজন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ)-এর অত্যন্ত প্রভাবের কারণে তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত হজ্ব পালন করে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।" তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হলো।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, তালাকের প্রসিদ্ধির ঘটনাটি পর্দার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল। তাতে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) যেমন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে এসেছিলেন, তেমনিভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও বুঝিয়েছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যে গোলামটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম ছিল আবূ রিবাহ (রাঃ)। তাতে এও আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এতো চিন্তিত হচ্ছেন কেন? যদি আপনি তাদেরকে তালাকও দিয়ে দেন তবে আপনার সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ), আমি, হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং সমস্ত মু'মিন।" হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা, আমি এই প্রকারের কথা যে বলছিলাম, আমি আশা করছিলাম যে, আমার কথার সত্যতায় তিনি আয়াত নাযিল করবেন। হলোও তাই। আল্লাহ তা'আলা عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ এই আয়াত এবং وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি তখন আমি মসজিদে গিয়ে দরযার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ শব্দে সকলকে জানিয়ে দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা .... اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ -এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ "যখন তাদের কাছে কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের খবর পৌঁছে তখন তারা তা প্রচার করতে শুরু করে দেয়। যদি তারা এই খবর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অথবা জ্ঞানী ও বিদ্বান মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতো তবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে যারা তাহ্কীককারী তারা ওটা বুঝতে পারতো।" হযরত উমার (রাঃ) আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করে বলেনঃ এই বিষয়ের তাহ্কীককারীদের মধ্যে আমিও একজন।"

আরো বহু বুযুর্গ মুফাসসির হতে বর্ণিত আছে যে, صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ হযরত উসমানেরও (রাঃ) নাম উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ আবার হযরত আলী (রাঃ)-এর নামও নিয়েছেন। একটি দুর্বল হাদীসে মারফূ'রূপে শুধু হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। কিন্তু এর সনদ দুর্বল এবং সম্পূর্ণরূপে মুনকার।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে মর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। আমি তখন তাদেরকে বললামঃ যদি নবী (সঃ) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার ভাষাতেই আল্লাহ পাক তা নাযিল করেন।"[১] এটা পূর্বেই গত হয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বহু ব্যাপারে কুরআনের আনুকূল্য করেছেন। যেমন পর্দার ব্যাপারে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে এবং মাকামে ইবরাহীমকে কিবলাহ নির্ধারণ করার ব্যাপারে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমি যখন উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে মন কষাকষির খবর পেলাম তখন আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে বললামঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আপোষ করে নাও, অন্যথায় তিনি যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাঁকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করবেন। অবশেষে আমি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের শেষ জনের কাছে গেলাম। তখন সে বললোঃ "হে উমার (রাঃ)! আমাদেরকে উপদেশ দানের জন্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি যথেষ্ট নন যে, আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিতে আসলেন?" আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ... عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ -এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।"[২] সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে স্ত্রীটি হযরত উমার (রাঃ)-কে এই উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلٰی بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِیْثًا আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন। যখন হাফসা (রাঃ)

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)।

দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মারিয়াহ (রাঃ)-এর সাথে মশগুল রয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ "তুমি এ খবর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জানাবে না। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। তা এই যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার খিলাফত হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পর তোমার আব্বা লাভ করবেন।" কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) এ খবর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জানিয়ে দেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "এ খবর আপনার কাছে কে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।" হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন বলেনঃ "আমি আপনার দিকে তাকাবো না যে পর্যন্ত না আপনি মারিয়াহ (রাঃ)-কে আপনার উপর হারাম করবেন।" তখন তিনি হযরত মারিয়াহ (রাঃ)-কে নিজের উপর হারাম করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা ... يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ -এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।"[১]

سَٰٓئِحَٰتٍ -এর একটি তাফসীর তো এই যে, তারা হবে রোযা পালনকারিণী। একটি মারফূ' হাদীসেও এই শব্দের এই তাফসীরই এসেছে যে হাদীসটি সূরায়ে বারাআতের এই শব্দের তাফসীরে গত হয়েছে যে, এই উম্মতের সিয়াহাত হলো রোযা রাখা। দ্বিতীয় তাফসীর এই যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিজরতকারিণীগণ। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের মধ্যে কেউ হবে অকুমারী এবং কেউ হবে কুমারী। যাতে মন খুশী থাকে।

মু'জামে তিবরানীতে রয়েছে যে, ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে স্বীয় নবী (সঃ)-কে যে ওয়াদা দিয়েছেন তাতে বেওয়া বা অকুমারী দ্বারা হযরত আসিয়া (রাঃ)কে বুঝানো হয়েছে যিনি ফিরাউনের স্ত্রী ছিলেন এবং কুমারী দ্বারা হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে যিনি হযরত ইমরানের কন্যা ছিলেন।

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। ঐ সময় হযরত খাদীজাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-কে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন,

১. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিবরানী (রঃ)।

তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে জান্নাতের একটি ঘরের, যেখানে না আছে গরম এবং না আছে কোন কষ্ট, আর না আছে কোন শোরগোল। যা ছিদ্রকৃত মুক্তা দ্বারা নির্মিত। যার ডানে-বামে মরিয়ম বিনতু ইমরান (রাঃ) এবং আসিয়া বিনতু মাযাহেম (রাঃ)-এর ঘর রয়েছে।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে খাদীজাহ (রাঃ)! তোমার সতীনদেরকে আমার সালাম জানিয়ে দিবে।" হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তখন বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পূর্বেও কি আপনি কাউকেও বিয়ে করেছিলেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মরিয়ম বিনতু ইমরান (রাঃ), ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর বোন কুলসুম (রাঃ) এই তিনজনকে আমার নিকাহতে দিয়ে রেখেছেন।"[১]

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছেনঃ "তুমি কি জান যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আমার বিবাহ ইমরানের কন্যা মরিয়ম (রাঃ), মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী কুলসুম (রাঃ), এবং ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার (রাঃ) সাথে দিয়ে রেখেছেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে মুবারকবাদ।"[২]

٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।

---

১. এ হাদীসটি দুর্বল।

২. এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটাও দুর্বল হাদীস এবং সাথে সাথে মুরসালও বটে।

٧- يَاَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ ع

৭। হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

٨- يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهٗ نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৮। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে, তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا -এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দাও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তোমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং অবাধ্যাচরণ করো না। পরিবারের লোকদেরকে আল্লাহর যিকরের তাগীদ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেন।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরিবারের লোকদেরকেও ভয় করতে বল।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, অর্থ হলোঃ তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের হুকুম কর এবং অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ কর। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম রাখো এবং তাদেরকে আল্লাহর আহকাম পালন করার তাগীদ করতে থাকো। সৎ কাজে তাদেরকে সাহায্য কর এবং অসৎ কাজে তাদেরকে শাসন-গর্জন কর।

(রঃ) ও মুকাতিল (রঃ) বলেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর নিজের পরিবারভুক্ত লোকদেরকে এবং দাস-দাসীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার ও তাঁর নাফরমানী হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকা ফরয।

আবদুল মালিক ইবনে রাবী' ইবনে সিববাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে নামাযের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদেরকে নামাযে অবহেলার কারণে প্রহার কর।"[১]

ফকীহ্দের ফরমান এই যে, অনুরূপভাবে শিশুদেরকে এই বয়স হতেই রোযার জন্যেও তাগীদ করা উচিত। যাতে প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত তারা নামায রোযায় পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যাতে তাদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করার এবং তাঁদের নাফরমানী হতে বিরত থাকার অভ্যাস পয়দা হয়।

মুমিনরা এ কাজ করলে তারাও তাদের পরিবার পরিজন জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা পাবে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। এদের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে। তাহলে আগুন কত কঠিন তেজ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রস্তর দ্বারা হয়তো ঐ প্রস্তর উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের মা'বূদরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।"(২১ঃ ৯৮) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), আবূ জা'ফর

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল বাকির (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ওটা হবে গন্ধকের পাথর যা হবে অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ ... -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ঐ সময় তাঁর খিদমতে কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জাহান্নামের পাথরটি দুনিয়ার পাথরের মত?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! জাহান্নামের একটি পাথর দুনিয়ার সমস্ত পাথর হতে বড়।" একথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বক্ষে হাত রেখে বুঝতে পারলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "হে বৃদ্ধ! বলঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" বৃদ্ধ তা পাঠ করলেন। তারপর তিনি ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ তখন বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্য হতে শুধু তাঁকেই এ সুসংবাদ দান করলেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ

অর্থাৎ "ওটা ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার শাস্তিকে।" (১৪ঃ ১৪)[১]

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এতে (এই শাস্তি দেয়ার কাজে) নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি কঠোর। কাফেরদের জন্যে তাদের অন্তরে কোন করুণা রাখা হয়নি। তারা নিকৃষ্ট পন্থায় কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকে। তাদেরকে দেখা মাত্রই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামীদের প্রথম দলটি যখন জাহান্নামের দিকে এগিয়ে চলবে তখন দেখবে যে, দরযার উপর চার লক্ষ ফেরেশতা শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন, যাঁদের চেহারা অত্যন্ত ভয়াবহ, রঙ অত্যন্ত কালো। দাঁতগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। তাঁরা অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর হৃদয়। তাঁদের অন্তরে অণুপরিমাণও দয়া রাখা হয়নি। তাঁরা এতো মোটা ও চওড়া যে, যদি পাখী তাঁদের এক স্কন্ধ হতে উড়তে শুরু করে তবে অন্য স্কন্ধে পৌঁছতে তার দুই মাস সময় লাগবে। তারপর তারা (জাহান্নামীরা) দ্বিতীয় দরজার উপর উনিশ জন ফেরেশতা দেখতে পাবে, যাঁদের বক্ষ এতো প্রশস্ত যে, তা সত্তর বছরের পথ।

১. এ হাদীসটি মুরসাল ও গারীব।

অতঃপর তাদেরকে এক দরজা হতে অন্য দরজার দিকে ধাক্কা দেয়া হবে। পাঁচ শত বছর পড়তে থাকার পর অন্য দরজার কাছে তারা তা দেখতে পাবে। এই ভাবে প্রতিটি দরজার উপর এই ফেরেশতামণ্ডলী আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন রয়েছেন। একদিকে আদেশ এবং অন্যদিকে তা প্রতিপালন। তাঁদেরকে যাবানিয়্যাহ বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের হাত হতে মুক্তি দান করুন!

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবেঃ আজকে তোমরা কোন ওযর পেশ করো না, কারণ আজ তোমাদের কোন ওযর কবূল করা হবে না। তোমাদেরকে আজকে তোমাদের কৃতকর্মেরই শুধু প্রতিফল দেয়া হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা। অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তাওবা কর যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জনা করা হবে। আর তোমাদের মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যাবে।

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে খুৎবায় বলতে শুনেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট এমন বিশুদ্ধ তাওবা কর যে, তোমার দ্বারা ঐ পাপকার্যের আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।"[১] অন্য রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ "অতঃপর ঐ পাপকার্য করার ইচ্ছাও করবে না।" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও প্রায় এরূপই বর্ণিত আছে। একটি মারফূ' হাদীসে এরূপই এসেছে যা দুর্বল এবং সঠিক কথা এটাই যে, এ হাদীসটিও মাওকুফ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পূর্বযুগীয় আলেমগণ বলেনঃ খাঁটি ও বিশুদ্ধ তাওবা এই যে, গুনাহ হয়ে গাওয়ার পরই তাওবা করবে ও লজ্জিত হবে এবং আগামীতে ঐ পাপকার্য আর না করার দৃঢ় সংকল্প করবে। আর যদি গুনাহ্তে কারো হক থাকে তবে চতুর্থ শর্ত এই যে, ঐ হক নিয়মিতভাবে আদায় করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "লজ্জিত হওয়াও হলো তাওবা করা।"[২]

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় এই উম্মতের শেষের লোকেরা কি কাজ করবে তা আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। একটি এই যে, মানুষ তার স্ত্রী বা দাসীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে। অথচ এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হারাম করেছেন। আর এ কাজে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) অসন্তুষ্ট হন। অনুরূপভাবে পুরুষের সাথে পুরুষ কুকাজে লিপ্ত হবে। যা হারাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ। এ লোকদের নামাযও আল্লাহর নিকট কবূল হয় না। যে পর্যন্ত না তারা তাওবা করে বিশুদ্ধ তাওবা।"

তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "বিশুদ্ধ তাওবা কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই প্রশ্নই করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেনঃ "ভুলক্রমে গুনাহ হয়ে গেছে, অতঃপর ওর উপর লজ্জিত হওয়া, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারপর ঐ গুনাহর দিকে আর ঝুঁকে না পড়া।"[১]

হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ বিশুদ্ধ তাওবা হলো এই যে, যেমন গুনাহর প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ ছিল ঐ রকমই ওর প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মে যাওয়া। যখন ঐ গুনাহর কথা স্মরণ হয় তখন ক্ষমা প্রার্থনা করা। যখন কোন বান্দা তাওবা করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করে নেয় এবং তাওবার উপর অটল থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম-পূর্ব যুগের সমস্ত গুনাহ্ ইসলাম মিটিয়ে দেয়। এখন থাকলো এই কথা যে, বিশুদ্ধ তাওবায় শর্ত হলো, তাওবাকারী মৃত্যু পর্যন্ত আর ঐ গুনাহ্‌র কাজ কখনো করবে না। যেমন হাদীস ও আসার এখনই বর্ণিত হলো যে, আর কখনো ঐ পাপের কাজে হাত দিবে না। অথবা শুধু এই দৃঢ় সংকল্প যথেষ্ট হবে যে, ঐ পাপকার্য আর কখনো করবে না, তারপর হয় তো মানবিক চাহিদা হিসেবে আবার পদস্খলন ঘটে যাবে। যেমন এখনই হাদীস গত হলো যে, তাওবা পূর্বের সমস্ত গুনাহ্‌কে মিটিয়ে দেয়। তাহলে শুধু কি তাওবার দ্বারাই গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, না মৃত্যু পর্যন্ত ঐ গুনাহ্‌র কাজ আর না করা শর্ত? প্রথমটির দলীল তো এই সহীহ্ হাদীসটি যে, যে ব্যক্তি ইসলামে সৎ কাজ করবে, সে তার অজ্ঞতার যুগের অসৎ কাজের কারণে গ্রেফতার হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরেও অসৎ কাজে জড়িয়ে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পড়বে তাকে তার ইসলাম ও জাহেলিয়াত উভয় যুগের অসৎ কাজের জন্যে পাকড়াও করা হবে। সুতরাং ইসলাম, যা পাপরাশিকে দূর করে দেয়ার ব্যাপারে তাওবার অপেক্ষাও অগ্রগণ্য, এর পরেও যখন তার অসৎকার্যের কারণে পাকড়াও করা হচ্ছে, তখন তাওবার পরেও অসৎ কাজ পুনরায় করলে তো আরো বেশী তাকে পাকড়াও করা উচিত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ নবী (সঃ) ও তার মুমিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে জ্যোতি দান করা হবে তা তাদের সামনে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। আর অন্যেরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। যেমন ইতিপূর্বে এটা সূরায়ে হাদীদের তাফসীরে গত হয়েছে। যখন মুমিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকরা যে জ্যোতি লাভ করেছিল, ঠিক প্রয়োজনের সময় তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন তারা (মু'মিনরা) দু'আ করবেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জ্যোতিতে আপনি পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন! আপনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

বানু কিনানাহ্ গোত্রের একজন লোক বলেনঃ "মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছিলাম। আমি তাঁকে দু'আয় বলতে শুনেছিলামঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনি আমাকে অপদস্ত করবেন না।"[১]

হযরত আবু যার (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজদার অনুমতি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম আমাকেই সিজদা হতে মস্তক উত্তোলনেরও অনুমতি দেয়া হবে। আমি আমার সামনে এবং ডানে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার উম্মতকে চিনে নিবো।" একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদেরকে আপনি কি করে চিনতে পারবেন? বহু উম্মত তো মিশ্রিতভাবে থাকবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমার উম্মতের লোকদের একটি চিহ্ন তো এই যে, তাদের অযুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে ও চমকিতে থাকবে। অন্য কোন উম্মতের লোকদের এরূপ হবে না। দ্বিতীয় পরিচয়

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

এই যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে থাকবে। তৃতীয় নিদর্শন এই যে, তাদের ললাটে সিজদার চিহ্ন থাকবে। চতুর্থ চিহ্ন এই যে, তাদের জ্যোতি তাদের আগে আগে থাকবে।"[১]

৯- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৯। হে নবী (সঃ)! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

১০- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

১০। আল্লাহ কাফিরদের জন্যে নূহ্ (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলো না এবং তাদেরকে বলা হলোঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রসহ জিহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আরো নির্দেশ দিচ্ছেন দুনিয়ায় তাদের প্রতি কঠোর হতে। আর পরকালেও তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

এরপর আল্লাহ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, কাফিরদের তাদের কুফরী সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে দুনিয়ায় মিলে মিশে থাকা কিয়ামতের দিন কোনই উপকারে

১. এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে নাসরুল মুরূযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আসবে না। যেমন দুই জন নবী, হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদ্বয়, যারা সদা-সর্বদা এই নবীদের সাহচর্যে থাকতো, তাঁদের সাথে সব সময় উঠা বসা করতো, এক সাথে পানাহার করতো এবং এক সাথে রাত্রি যাপনও করতো, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে ঈমান ছিল না, বরং তারা কুফরীর উপর কায়েম ছিল, সেই হেতু নবীদের অষ্ট প্রহরের সাহচর্য তাদের কোন কাজে আসলো না। নবীগণ তাদের পারলৌকিক কোন উপকার করতে পারলেন না এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। বরং তাদেরকেও জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এখানে খিয়ানত দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। নবীদের (আঃ) পবিত্রতা ও সততা এতো ঊর্ধ্বে যে, তাদের স্ত্রীদের মধ্যে ব্যভিচাররূপ জঘন্য পাপকার্য প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারে না। আমরা সূরায়ে নূরের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। বরং এখানেও উদ্দেশ্য দ্বীনের ব্যাপারে খিয়ানত করা। অর্থাৎ তারা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের স্বামীদের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দ্বীনের কাজে তাদের সঙ্গিনী হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যভিচার ছিল না। বরং এই ছিল যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর স্ত্রী বলতো যে, এই লোকটি অর্থাৎ হযরত নূহ্ (আঃ) একজন পাগল। আর হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এই ছিল যে, তাঁর বাড়ীতে কোন মেহ্মান আসলে সে কাফিরদেরকে খবর দিয়ে দিতো। হযরত নূহ্ (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁর গোপন তথ্য এবং গোপনে ঈমান আনয়নকারীদের নাম কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দিতো। অনুরূপভাবে হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীও তার স্বামী হযরত লূত (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং যাঁরা মেহমানরূপে তাঁর বাড়ীতে আসতেন তাঁদের খবর তার কওমকে দিয়ে দিতো, যাদের কু-কাজের অভ্যাস ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একথাও বর্ণিত আছে যে, কোন নবীরই স্ত্রী কখনো ব্যভিচার করেনি। হযরত যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও একথাই বলেন। এটাকে দলীলরূপে গ্রহণ করে কোন কোন আলেম বলেছেনঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হাদীসে আছেঃ যে ব্যক্তি এমন লোকের সাথে পানাহার করে যাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, ঐ লোকটিকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়, এটা খুবই দুর্বল হাদীস। আর প্রকৃত ব্যাপারও এটাই যে, এ হাদীসটি একেবারে ভিত্তিহীন। তবে হ্যাঁ, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'যাকে ক্ষমা করা হয়েছে তার সাথে যে থাকবে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে' একথা কি আপনি বলেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না, কিন্তু এখন আমি একথা বলছি।"

١١- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

১১। আল্লাহ মু'মিনদের জন্যে উপস্থিত করছেন ফিরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।

١٢- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ○ ع

১২। (আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান তনয়া মরিয়মের– যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেনঃ যদি মুসলমানরা প্রয়োজনবোধে কাফিরদের সাথে মিলে মিশে থাকে তবে তাদের কোন অপরাধ হবে না। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ـ

অর্থাৎ "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর।"(৩ ঃ ২৮)

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, সারা জগতের লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্ধত লোক ছিল ফিরাউন। কিন্তু তার কুফরীও তার স্ত্রীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা, তার স্ত্রী তাঁর যবরদস্ত ঈমানের উপর পূর্ণমাত্রায় কায়েম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক ও হাকিম। তিনি একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করেন না।

হযরত সালমান (রঃ) বলেন যে, ফিরাউন ঐ সতী-সাধ্বী নারীর উপর সর্বপ্রকারের নির্যাতন করতো। কঠিন গরমের সময় তাঁকে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে দিতো। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ ফেরেশতাদের পরের দ্বারা তাঁকে ছায়া করতেন এবং তাঁকে গরমের কষ্ট হতে রক্ষা করতেন। এমন কি তিনি তাঁকে তাঁর জান্নাতী ঘর দেখিয়ে দিতেন। ফলে তাঁর রূহ তাযা হয়ে উঠতো এবং ঈমান বৃদ্ধি পেতো। তিনি ফিরাউন ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকতেন যে, জয়লাভ কে করলো? সব সময় তিনি শুনতে পেতেন যে, হযরত মূসাই (আঃ) জয়লাভ করেছেন। তখন ওটাই তাঁর ঈমান আনয়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি ঘোষণা করেনঃ "আমি হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।"

ফিরাউন এ খবর জানতে পেরে তার লোকজনকে বললোঃ "সবচেয়ে বড় পাথর তোমরা খোঁজ করে নিয়ে এসো। অতঃপর তাকে চিত করে শুইয়ে দাও এবং তাকে বলোঃ "তুমি তোমার এই আকীদা হতে বিরত থাকো।" যদি বিরত থাকে তবে ভাল কথা, সে আমার স্ত্রী। তাকে মর্যাদা সহকারে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি না মানে তবে ঐ পাথর তার উপর নিক্ষেপ করবে এবং তার মাংস টুকরো টুকরো করে ফেলবে।" অতঃপর তার লোকেরা পাথর নিয়ে আসলো এবং তাঁকে নিয়ে গেল ও চিত করে শুইয়ে দিলো এবং তাঁর উপর ঐ পাথর নিক্ষেপ করার জন্যে উঠালো। ঐ সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁর চক্ষু উঠালেন। মহান আল্লাহ পর্দা সরিয়ে দিলেন এবং তিনি জান্নাত এবং সেখানে তাঁর জন্যে যে ঘর তৈরী করা হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখে নিলেন। ওতেই তাঁর রূহ বেরিয়ে পড়লো। যখন পাথর তাঁর উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁর মধ্যে রূহ

ছিলই না। তিনি শাহাদাতের সময় দু'আ করেছিলেনঃ 'হে আমার প্রতিপালক। আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন।" তাঁর দু'আর সূক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য করা যাক, প্রথমে তিনি আল্লাহর সন্নিধান কামনা করছেন, তারপর ঘরের প্রার্থনা করছেন। এই ঘটনার বর্ণনায় মারফূ' হাদীসও এসেছে। তারপর তিনি দু'আ করছেনঃ "আমাকে উদ্ধার করুন ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।"

ঐ পুণ্যবতী মহিলার নাম ছিল আসিয়া বেনতু মাযাহিম (রাঃ)। তার ঈমান আনয়নের ঘটনাটি হযরত আবুল আলিয়া নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

ফিরাউনের দারোগার স্ত্রীর ঈমান ছিল হযরত আসিয়ার (রাঃ) ঈমান আনয়নের কারণ। দারোগার স্ত্রী একদা ফিরাউনের কন্যার মাথার চুলে চিরুণী করে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে চিরুণী তাঁর হাত হতে পড়ে যায়। তখন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়ঃ "কাফিররা ধ্বংস হোক।" ফিরাউনের কন্যা তাঁর মুখে একথা শুনে বললোঃ "তুমি কি আমার পিতা ছাড়া অন্য কাউকেও প্রতিপালক বলে স্বীকার কর?" মহিলাটি উত্তরে বললেনঃ "আমার, তোমার পিতার এবং অন্যান্য সবারই প্রতিপালক হলেন আল্লাহ।" সে তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মহিলাটিকে খুবই মারপিট করলো। অতঃপর তার পিতাকে এ খবর দিয়ে দিলো। ফিরাউন মহিলাটিকে ডেকে নিয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কি আমার ছাড়া আর কারো ইবাদত কর?" মহিলাটি জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ, আমার, তোমার এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। আমি তাঁরই ইবাদত করি।" একথা শুনে ফিরাউন তার লোকদেরকে হুকুম করলোঃ "মহিলাটিকে চিৎ করে শুইয়ে দাও। তার হাতে পায়ে পেরেক মেরে দাও। আর সাপ ছেড়ে দাও যে তাকে কামড়াতে থাকবে।" মহিলাটি এই অবস্থাতেই থাকেন। আবার একদিন ফিরাউন তার কাছে এসে বললোঃ "এখনো কি তোমার চিন্তার পরিবর্তন হয়নি?" পুনরায় তিনি জবাব দিলেনঃ "তোমার আমার এবং সব জিনিসের প্রতিপালক হলেন একমাত্র আল্লাহ।" ফিরাউন বললোঃ "আচ্ছা, এখন আমি তোমার চোখের সামনে তোমার ছেলেকে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। সুতরাং এখনো তোমাকে বলছিঃ আমার কথা মেনে নাও এবং তোমার এই দ্বীন হতে ফিরে এসো।" মহিলাটি উত্তর দিলেনঃ "তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর।" ঐ অত্যাচারী তখন তাঁর পুত্রকে ধরে আনতে বললো এবং তাঁর সামনে মেরে ফেললো। ছেলেটির রূহ যখন বের হয় তখন সে বললোঃ "মা! তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আল্লাহ তোমার

জন্যে বড় বড় পুণ্য রেখেছেন এবং তুমি অমুক অমুক নিয়ামত লাভ করবে।" মহিলাটি তাঁর ছেলের রূহ এভাবে বের হতে স্বচক্ষে দেখলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করলেন এবং আল্লাহ্ পাকের ফায়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন। ফিরাউন আবার তাঁকে বেধে ফেলে রাখলো এবং সাপ ছেড়ে দিলো। পুনরায় একদিন এসে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলো। মহিলাটি এবারও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে একই জবাব দিলেন। ফিরাউন তাঁকে আবার ঐ হুমুকই দিলো এবং তাঁর আরেকটি ছেলে ধরে এনে তাঁর চোখের সামনে মেরে ফেললো। ছেলেটির রূহ অনুরূপভাবেই তার মাতাকে সুসংবাদ দিলো এবং তাঁকে ধৈর্যধারণে উৎসাহিত করলো।

ফিরাউনের স্ত্রী এই মহিলাটির বড় ছেলের রূহের সুসংবাদ শুনেছিলেন। এই ছোট ছেলেটিরও সুসংবাদ শুনলেন। সুতরাং তিনিও ঈমান আনয়ন করলেন। ওদিকে ঐ মহিলাটির রূহ আল্লাহ তা'আলা কবয করে নিলেন এবং তাঁর মনযিল ও মরতবা যা আল্লাহ তা'আলার নিকট ছিল তা পর্দা সরিয়ে ফিরাউনের স্ত্রীকে দেখিয়ে দেয়া হলো। সুতরাং তাঁর ঈমান বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের কানেও তাঁর ঈমানের কথা পৌঁছে গেল। সে একদা তার সভাষদবর্গকে বললোঃ "তোমরা আমার স্ত্রীর কোন খবর রাখো কি? তোমরা তাকে কিরূপ মনে কর?" তার এই প্রশ্নের উত্তরে সবাই তাঁর খুব প্রশংসা করলো এবং তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিলো। ফিরাউন তখন তাদেরকে বললোঃ "না, না, তোমরা তার খবর রাখো না। সে আমি ছাড়া অন্যকে উপাস্যরূপে মেনে থাকে।" তারপর তাদের মধ্যে পরামর্শ হলো যে, তাঁকে হত্যা করে ফেলা হবে। অতঃপর তাঁর হাতে পায়ে পেরেক মেরে শুইয়ে দেয়া হলো। ঐ সময় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং পর্দা সরিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁর জান্নাতী ঘর দেখিয়ে দেন। তা দেখে তিনি হেসে ওঠেন। ঠিক ঐ সময়েই তাঁর কাছে ফিরাউন এসে পড়ে এবং তাঁকে হাসির অবস্থায় দেখতে পায়। তখন সে তার লোকজনকে বলেঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা কি বিস্ময়বোধ করছো না যে, এরূপ কঠিন শাস্তির অবস্থাতেও এ মহিলা হাসতে রয়েছে? নিশ্চয়ই এর মাথা খারাপ হয়েছে।" মোটকথা ঐ শাস্তিতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা হলো হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরানের (আঃ) দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতী-সাধ্বী রমণী। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি আমার ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে মানুষের রূপ দিয়ে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর মুখ দিয়ে মরিয়ম (আঃ)-এর জামার ফাঁকে ফুঁকে দেন। তাতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে যান এবং হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।

এরপর মহান আল্লাহ হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর আরো প্রশংসা করে বলেনঃ সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাব সত্যি বলে গ্রহণ করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাটিতে চারটি রেখা টানেন এবং সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এগুলো কি তা তোমরা জান কি?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই ভাল জানেন।" তিনি তখন বললেনঃ "জেনে রেখো যে, জান্নাতী রমণীদের মধ্যে চারজন হলো সর্বোত্তম। তারা হলো খাদীজা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ (রাঃ), ফাতেমা বিন্‌তু মুহাম্মাদ (সঃ) (রাঃ), মরিয়ম বিনতু ইমরান (আঃ) এবং ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্‌তু মাযাহিম (রাঃ)।"[১]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "পুরুষ লোকদের মধ্যে তো পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বহু রয়েছে। কিন্তু রমণীদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্তা রমণী রয়েছে শুধুমাত্র ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ), মরিয়ম বিন্‌তু ইমরান (আঃ) ও খাদীজা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ (রাঃ)। আর সমস্ত রমণীর মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর ফযীলত এমনই যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে সারীদ নামক খাদ্যের ফযীলত।"[২]

আমরা আমাদের কিতাব আল বিদাইয়াহ্ ওয়ান নিহাইয়াহ এর মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনায় এই হাদীসের সনদ ও শব্দসমূহ বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে এই সূরারই আয়াতের শব্দ ثَيِّبَاتٍ وَّ اَبْكَارًا -এর তাফসীরের মধ্যে ঐ হাদীসটির বর্ণনা করে দিয়েছি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আসিয়া বিন্‌তু মাযাহিম (রাঃ)-ও একজন।

সূরা ঃ তাহ্‌রীম এবং অষ্টাবিংশতিতম পারা এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

পারাঃ ২৯

সূরা ঃ মূল্‌ক মাক্কা
سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৩০, রুকূ' ঃ ২) (اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কুরআন কারীমে ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা ওর পাঠকের জন্যে সুপারিশ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ওটা হলো تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -এই সূরাটি।"[১]

'তারীখে ইবনে আসাকির' গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একটি লোক মারা যায়। তার সাথে আল্লাহর কিতাবের মধ্য হতে সূরা 'তাবারাকা' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাকে সমাধিস্থ করা হলে ফেরেশতা এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে যান। এ দেখে এ সূরাটি ফেরেশতার মুখোমুখি হয়ে যায়। তখন ফেরেশতা সূরাটিকে বলেনঃ "তুমি আল্লাহর কিতাব। সুতরাং আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনে। তোমার জানা আছে যে, আমি তোমার এই মৃতের এবং আমার নিজের লাভ ক্ষতির কোন অধিকার রাখি না। সুতরাং তুমি যদি একে (কবরের আযাব হতে) রক্ষা করতে চাও তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট গমন কর এবং এর জন্যে সুপারিশ কর।" এ সূরাটি তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট গমন করলো এবং বললোঃ "হে আমার প্রতিপালক! অমুক ব্যক্তি আপনার কিতাবের মধ্য হতে আমাকে শিখেছে ও পাঠ করেছে। সুতরাং আমি তার বক্ষে রক্ষিত আছি এমতাবস্থায়ও কি আপনি তাকে আগুনে ফেলে শাস্তি দিবেন? যদি তাই করেন তবে আমাকে আপনার কিতাব হতে মুছে ফেলুন।" তার এই কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেনঃ "তোমাকে তো এ সময় খুবই রাগান্বিত দেখছি?" সে জবাবে বললোঃ "অসন্তুষ্টি প্রকাশের আমার অধিকার রয়েছে।" আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বললেনঃ "যাও, আমি ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সুপারিশ কবূল করলাম।" এই সূরাটি তখন ঐ লোকটির কাছে ফিরে গেলো এবং আযাবের ফেরেশতাকে সরিয়ে দিলো। অতঃপর ঐ মৃত ব্যক্তির মুখের সাথে নিজের মুখ মিলিয়ে দিয়ে বললোঃ "এ মুখকে ধন্যবাদ! এই মুখই তো আমাকে পাঠ করতো। এই বক্ষকে মুবারকবাদ!

১. এ হাদীসটি সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবি দাউদ, জামেউত তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাজাহতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

এই বক্ষই তো আমাকে মুখস্থ করে রেখেছিল। ধন্য এ পা দুটি! এ পা দুটিই তো আমাকে পাঠের সাথে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকতো।" এ সূরাটি কবরে তাকে কোন প্রকারের দুঃখ কষ্ট পৌঁছতে দিবে না।" বর্ণনাকারী বলেন যে, এ হাদীসটি শোনা মাত্রই ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম সবাই এই সূরাটি শিখে নিলো। এই সূরাটির নাম রাসূলুল্লাহ (সঃ) مُنْجِيَة রেখেছেন অর্থাৎ মুক্তিদাতা সূরা।[১] ইমাম বায়হাকী (রঃ) 'ইসতাতু আযাবিল কাবরি' নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে একটি মারফূ' এবং একটি মাওকূফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে যে বিষয়টি রয়েছে সেটাও এর সাক্ষীরূপে কাজে লাগতে পারে। আমরা এটাকে আহকামি কুবরার কিতাবুল জানায়েযের মধ্যে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা এবং আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কুরআন কারীমে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার সাথে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছে। ওটা হলো تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -এই সূরাটি।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-এর কোন একজন সাহাবী জঙ্গলের এমন এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন যেখানে একটি কবর ছিল। কিন্তু ওটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি শুনতে পান যে কে যেন সূরা মুল্ক পাঠ করছেন এবং পূর্ণ সূরাটি পাঠ করেন। ঐ সাহাবী এসে নবী (সঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটা শুনে নবী (সঃ) বলেনঃ "এ সূরাটি হলো বাধাদানকারী এবং মুক্তিদাতা। এটা কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।"[৩]

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শয়নের পূর্বে الٓمّٓ تَنْزِيْل এবং تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ সূরা দুটি পাঠ করতেন।[৪]

হযরত তাউস (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরা দুটি কুরআন কারামের অন্যান্য সূরাগুলোর উপর সত্তরটি পুণ্যের ফযীলত রাখে।

---

১. এ হাদীসটি মুনকার বা অস্বীকৃত। ফুরাত ইসায়েব নামক এর একজন বর্ণনাকারীকে ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবূ হাতিম (রঃ), ইমাম দারকুতনী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন দুর্বল বলেছেন। অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, এটা ইমাম যুহরী (রঃ)-এর উক্তি, মারফূ' হাদীস নয়।

২. এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ)-এবং হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব বা দুর্বল হাদীস

৪. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি চাই যে, এ সূরাটি যেন আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরেই থাকে।" অর্থাৎ تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ -এই সূরাটি।"[১]

মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একজন লোককে বলেনঃ "এসো, আমি তোমাকে এমন একটি উপহার দিই যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পার। (তা হলো এই যে,) তুমি تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ সূরাটি পাঠ করবে এবং পরিবারবর্গকে, সন্তান- সন্তুতিকে এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে এটা শিখিয়ে দিবে। এ সূরাটি মুক্তিদাতা এবং সুপারিশকারী। কিয়ামতের দিন এটা এই পাঠকের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করে তাকে আগুনের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিবে এবং কবরের আযাব হতেও রক্ষার ব্যবস্থা করবে।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরেই যেন এ সূরাটি থাকে।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ নামে (শুরু করছি)।

١- تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ۙ○

১। মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢- الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۙ○

২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্যে−কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

٣- الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ○

৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব হাদীস। এর ইবরাহীম নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। এ ধরনেরই বর্ণনা সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে গত হয়েছে।

৪। অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

٤- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

৫। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

٥- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করছেন এবং খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলূকের উপর তাঁরই আধিপত্য রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর হুকুমকে কেউ টলাতে পারে না। তাঁর শক্তি, হিকমত এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে কেউ তাঁর কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারে না। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর আল্লাহ পাক মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা ঐ লোকগুলো দলীল গ্রহণ করেছেন। যাঁরা বলেন যে, মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। কেননা, ওটাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বহীনতাকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন যাতে সৎকর্মশীলদের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন।" (২ঃ ২৮) সুতরাং প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতাকে এখানে মৃত বলা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে জীবন্ত বলা হয়েছে। এ জন্যেই এর পরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ

অর্থাৎ "আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন।" (২ঃ ২৮)

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ -এই উক্তি সম্পর্কে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে মৃত্যু দ্বারা লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি দুনিয়াকে জীবনের ঘর বানিয়ে দেন, তারপর বানিয়ে দেন মৃত্যুর ঘর। আর আখিরাতকে তিনি প্রতিফল ও প্রতিদানের ঘর বানিয়ে দেন, তারপর বানিয়ে দেন চিরস্থায়ী ঘর।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্যে-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? অধিক কর্মশীল নয়, বরং উত্তম কর্মশীল। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য ও উদ্ধত লোকেরা তাওবা করলে তাদের জন্যে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলও বটে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর নীচ করে সৃষ্টি করেছেন, একটির উপর অপরটিকে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি পর্যন্ত দূরত্ব রয়েছে। সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে। মি'রাজের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। বরং তুমি দেখবে যে, ওটা সমান রয়েছে। না তাতে আছে কোন হের-ফের, না কোন গরমিল। আবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখো তো, কোথাও কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ হয় তবে বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ বারবার দৃষ্টি ফিরালেও তুমি আকাশে কোন প্রকারের ত্রুটি দেখতে পাবে না এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে।

অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু চলাফেরা করে এবং কতকগুলো স্থির থাকে।

১. অন্য জায়গায় এই রিওয়াইয়াতটিই হযরত কাতাদাহ (রঃ)-এর নিজের উক্তি বলে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ঐ নক্ষত্রগুলোর আরো একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন যে, ওগুলোর দ্বারা শয়তানদেরকে মারা হয়। ওগুলো হতে অগ্নি শিখা বের হয়ে ঐ শয়তানদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, এ নয় যে, স্বয়ং তারকাই তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। শয়তানদের জন্যে তো দুনিয়ায় এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন সূরা সাফফাতের শুরুতে রয়েছেঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ـ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ـ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ـ

অর্থাৎ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে তারা উর্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে– বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।" (৩৭ঃ ৬-১০)

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শয়তানদের মার এবং (তিন) পথ প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে ফেলে আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে।"[১]

৬। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

٦- وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৭। যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা জাহান্নামের শব্দ শুনবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত।

٧- إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِيَ تَفُورُ ○

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٨- تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ○

৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেনি?

٩- قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ○

৯। তারা বলবেঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো।

١٠- وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

১০। এবং তারা আরো বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

١١- فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

১১। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্যে!

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল! এটা গাধার মত উচ্চ ও অপছন্দনীয় শব্দকারী ও উত্তেজনাপূর্ণ জাহান্নাম। এই জাহান্নামের আগুনে তারা জ্বলতে পুড়তে থাকবে। যখন তারা এই জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা ঐ জাহান্নামের শব্দ শুনবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত।

ঐ জাহান্নামীদেরকে অত্যধিক লাঞ্ছিত করা এবং তাদের উপর শেষ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেনঃ 'ওরে হতভাগ্যের দল! আল্লাহর রাসূলগণ কি তোমাদেরকে এটা হতে ভয় প্রদর্শন করেননি?' তখন

তারা হায়, হায় করতে করতে উত্তর দিবেঃ 'অবশ্যই আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূলগণ সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী রূপে গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, আপনারা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছেন। এখন আল্লাহর ইনসাফ পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং তাঁর ফরমান পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।' যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ "আমি শাস্তি প্রদান করি না যে পর্যন্ত না আমি রাসূল প্রেরণ করি।" (১৭ঃ ১৫) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতো এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতো? তারা বলবেঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।" (৩৯ঃ ৭১) এভাবে তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তবে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। অর্থাৎ আমরা বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতাম না এবং আমাদের মালিক ও খালিক আল্লাহকে অস্বীকার করতাম না। তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী জানতাম না এবং তাঁদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতাম না।

আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ তারা নিজেরাই তো তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্যে অভিশাপ!

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষ কখনো ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ দেখে

নিবে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে।” অন্য হাদীসে রয়েছেঃ “কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে জাহান্নামে যাবারই যোগ্য জান্নাতে নয়।”

১২। যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালকের ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার	١٢- إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ○
১৩। তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী।	١٣- وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○
১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবগত।	١٤- أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○
১৫। তিনিই তো তোমাদের জন্যে ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।	١٥- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ○

আল্লাহ্ ঐ লোকদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে ভয় করে। যদিও তারা নির্জনে অবস্থান করে, যেখানে কারো দৃষ্টি পড়বে না, তথাপিও তারা আল্লাহর ভয়ে তাঁর অবাধ্যতামূলক কাজ করে না এবং তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত হতে বিমুখ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছেঃ “সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়ায় এমন দিনে স্থান দিবেন যেই দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।” তাদের মধ্যে এক প্রকার হলো ঐ ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে উত্তরে বলেঃ “আমি আল্লাহকে ভয় করি (সুতরাং আমি তোমার সাথে এ কাজে লিপ্ত হতে পারি না)।” আর

এক প্রকার হলো ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না।”

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার সামনে আমাদের অন্তরের যে অবস্থা থাকে, আপনার সাহচর্য হতে পৃথক হওয়ার পর আমাদের অন্তরের ঐ অবস্থা আর থাকে না। (তাহলে কি আমরা মুনাফিকের মধ্যে গণ্য হবো?)।” তাঁদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ “তোমাদের প্রতিপালকের সাথে তোমাদের অবস্থা কি থাকে?” জবাবে তাঁরা বললেনঃ “প্রকাশ্যে ও গোপনে আমরা আল্লাহ্‌কেই আমাদের প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “(তা হলে নিশ্চিন্ত থাকো,) তোমাদের এটা নিফাক বা কপটতা নয়।”[১]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের খবরও তিনি জানেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টজীব হতে বে-খবর থাকবেন এটা তো অসম্ভব। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তো সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুই সম্যক অবগত।

মহামাহমান্বিত আল্লাহ এরপর স্বীয় নিয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ তিনিই তো তোমাদের জন্যে ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। এটা স্থিরতার সাথে বিছানো রয়েছে। এটা মোটেই হেলা-দোলা করছে না। ফলে তোমরা এর উপর শান্তিতে বিচরণ করছো। এটা যেন নড়া-চড়া করতে না পারে তজ্জন্যে আল্লাহ পাক পাহাড় পর্বতকে এতে পেরেক রূপে মেরে দিয়েছেন। এতে তিনি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের উপকার তিনি এতে রেখে দিয়েছেন। এটা হতে তিনি ফল ও শস্য উৎপন্ন করছেন। তোমরা এখানে যথেচ্ছা ভ্রমণ করতে রয়েছো। এখানে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতে রয়েছো। এভাবে তিনি তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা জীবিকা অর্জনের জন্যে চেষ্টা তদবীর করছো এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের চেষ্টাকে সফল করছেন।

এর দ্বারা জানা গেল যে, জীবনোপকরণ লাভ করার জন্যে চেষ্টা করা নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। যেমন মুসনাদে আহমাদে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

"তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে তবে তিনি তোমাদেরকে ঐভাবেই জীবিকা দান করতেন যেমনভাবে পাখীকে জীবিকা দান করে থাকেন, পাখী সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[১] সুতরাং পাখীর সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকার সন্ধানে গমনাগমন করাকেও নির্ভরশীলতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কেননা, উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং ওটাকে সহজকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বটে। কিয়ামতের দিন তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন مَنَاكِب -এর অর্থ নিয়েছেন প্রান্ত এবং এদিক ওদিকের স্থান। হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, مَنَاكِب দ্বারা পাহাড় পর্বতকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত বাশীর ইবনে কা'ব (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করার পর তাঁর ঐ দাসীকে, যার গর্ভে তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, বলেনঃ "তুমি যদি مَنَاكِب এর সঠিক তাফসীর বলতে পার তবে আমি তোমাকে আযাদ করে দিবো।" তখন ঐ দাসীটি বলে যে, এর দ্বারা পাহাড় উদ্দেশ্য। হযরত বাশীর (রঃ) তখন হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন যে, এটা সঠিক তাফসীরই বটে।

১৬। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিতে দিবেন না আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

١٦- ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ○

১৭। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!

١٧- اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

١٨- وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

১৮। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার শাস্তি!

١٩- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۝

১৯। তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

এই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ-মমতা ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষের কুফরী ও শিরকের ভিত্তিতে তিনি নানা প্রকারের পার্থিব শাস্তির উপরও পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা তাঁর সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতারই পরিচায়ক যে, তিনি শাস্তি দেন না। যেমন তিনি বলেনঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا -

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃত পাপের কারণে পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারীদের কাউকেও তিনি ছাড়তেন না, কিন্তু এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখনই ঐ নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে তখন তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নিবেন।" (৩৫ঃ ৪৫)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না আর ওটা আকস্মিকভাবে কাঁপতে থাকবে?' অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? যেমন মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا -

অর্থাৎ "তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না।" (১৭ঃ ৬৮)

অনুরূপভাবে এখানেও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ধমকের সুরে ও ভীতি প্রদর্শন রূপে বলেনঃ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! তোমরা দেখে নাও যে, যারা আমার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করে না তাদের পরিণতি কি হয়ে থাকে! তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদেরকে শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তারা কি তাদের ঊর্ধদেশে পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। এটা তাঁর করুণা যে, তিনি বায়ুকে ওদের অধীন করে দিয়েছেন। সৃষ্টজীবের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণকারী এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাদের সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ـ

অর্থাৎ "তারা কি ঐ পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না যেগুলো আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে স্থির রয়েছে? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন, নিশ্চয়ই এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (১৬ঃ ৭৯)

২০। দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্য বাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

٢٠- أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝

২১। এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি

٢١- أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ

أَمْسَكَ رِزْقَهٗ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ○

জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

٢٢- أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ أَهْدٰى أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২২। যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে?

٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

২৩। বলঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।

٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪। বলঃ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

٢٥- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৫। তারা বলেঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?

٢٦- قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২৬। বলঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٢٧- فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○

২৭। যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে।

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা ধারণা করতো যে, তারা যে বুযুর্গদের ইবাদত করছে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাদেরকে আহার্য দান করতে তারা সক্ষম। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া না কেউ সাহায্য করতে পারে, না আহার্য দান করতে পারে। কাফিরদের বিশ্বাস প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? অর্থাৎ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনোপকরণ বন্ধ করে দিলে কেউ তা চালু করতে পারে না। দেয়া-নেয়ার উপর, সৃষ্টি করার উপর, ধ্বংস করার উপর, জীবিকা দানের উপর এবং সাহায্য দানের উপর একমাত্র এক ও লা-শাতরীক আল্লাহই ক্ষমতাবান। এ লোকগুলো নিজেরাও এটা জানে, তথাপি কাজকর্মে তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই কাফিররা নিজেদের ভ্রান্তি, পাপ এবং ঔদ্ধত্যের মধ্যে ভেসে চলেছে। তাদের স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা, অহংকার, সত্যের অস্বীকৃতি এবং হকের বিরুদ্ধাচরণ বাসা বেঁধেছে। এমন কি ভাল কথা শুনতেও তাদের মনে চায় না, আমল করা তো দূরের কথা। এরপর আল্লাহ পাক মুমিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে, দৃষ্টি নিম্নমুখী করে চলতে রয়েছে, না সে পথ দেখছে, না তার জানা আছে যে, সে কোথায় চলছে, বরং উদ্বিগ্ন অবস্থায় পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর মুমিনের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক সরল সোজা পথে চলতে রয়েছে। রাস্তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে সোজা, ওতে কোন বক্রতা নেই। ঐ লোকটির কাছে ওটা খুবই পরিচিত পথ। সে বরাবর সঠিকভাবে উত্তম চলনে চলতে আছে। কিয়ামতের দিন তাদের এই অবস্থাই হবে। কাফিরদেরকে উল্টোমুখে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর মুসলমানরা সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ - مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ “ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদত করতো তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।” (৩৭ঃ ২২-২৩)

মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিভাবে লোকদেরকে মুখের ভরে চালিত করা হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যিনি পায়ের ভরে চালিত করেছেন তিনি মুখের ভরে চালিত করতেও সক্ষম।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। অর্থাৎ তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি। কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত তোমাদের এ শক্তিগুলোকে তাঁর নির্দেশ পালনে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে বেঁচে থাকার কাজে তোমরা অল্পই ব্যয় করে থাকো।

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তোমাদের ভাষা করেছেন পৃথক, বর্ণ ও আকৃতি করেছেন পৃথক পৃথক এবং তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ তোমাদের এই বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত করা হবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐ ভাবেই তিনি একদিকে গুটিয়ে নিবেন। আর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তিনি তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন যে, কাফিররা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে না বলে এই পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বর্ণনা শুনে প্রতিবাদ করে বলেঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে যে পুনরুত্থানের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা যদি সত্য হয় তবে হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমাদেরকে বলে দাও, এটা কখন সংঘটিত হবে?

তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। হ্যাঁ, আমাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই ঐ সময় আসবে। আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাদেরকে ঐ দিনের

১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু তোমাদের নিকট এসব খবর পৌঁছিয়ে দেয়া, যা আমি পালন করেছি। সুতরাং আল্লাহ পাকেরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ যখন কিয়ামত সংঘটিত হতে শুরু করবে এবং কাফিররা তা স্বচক্ষে দেখে নিবে এবং জেনে নিবে যে, ওটা এখন নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কেননা আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের আগমন ঘটবেই, তা সত্বরই হোক অথবা বিলম্বেই হোক, যখন তারা এটাকে সংঘটিত অবস্থায় পেয়ে নিবে যেটাকে তারা এ পর্যন্ত মিথ্যা মনে করছিল, তখন এটা তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হবে। কেননা তারা নিজেদের উদাসীনতার প্রতিফল সামনে দেখতে পাবে। তখন তাদেরকে ধমকের সুরে এবং লাঞ্ছিত করার লক্ষ্যে বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে!

২৮। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো কি– যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন (তাতে কাফিরদের কি?)' তাদেরকে কে রক্ষা করবে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে?

٢٨- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৯। বলঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

٢٩- قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩০। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি?

٣٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○ ع

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজিকে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও– তোমরা এটা কামনা করছো যে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহলে মনে কর যে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তই করেন অথবা তিনি আমার উপর এবং আমার সঙ্গীদের উপর দয়াপরবশ হন তবে তোমাদের তাতে কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি নেই। তোমাদের মুক্তির উপায় তো এটা নয়! মুক্তি তো নির্ভর করে তাওবার উপর, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ার উপর এবং তাঁর দ্বীনকে মেনে নেয়ার উপর। আমাদের রক্ষা বা ধ্বংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করে না। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমাদের সমস্ত কাজ কারবারে আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ "তোমরা তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই উপর ভরসা কর।" (১১ঃ ১২৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি মুশরিকদেরকে আরো বলে দাও– শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে মুশরিকরা! তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কে পরিত্রাণ লাভ করে আর কে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। হিদায়াতের উপর কে রয়েছে, আর কার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং মন্দ পথে আছে কে?

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ যে পানির উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল এই পানি যদি যমীন শোষণ করে নেয় অর্থাৎ এই পানি যদি ভূগর্ভ হতে বেরই না হয় এবং তা বের করার জন্যে তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি অসমর্থ হও তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে কি যে এই প্রবহমান পানি তোমাদেরকে এনে দিতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউই তোমাদেরকে এ পানি এনে দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহই এর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর ফযল ও করমে পবিত্র ও স্বচ্ছ পানি ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত করে থাকেন যা এদিক হতে ওদিকে চলাচল করে এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে নদী প্রবাহিত করে থাকেন।

সূরা ঃ মূলক -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ কলম, মাক্কী

(আয়াতঃ ৫২, রুকূ'ঃ ২)

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নূন-শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার,

١- نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ○

২। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।

٢- مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ○

৩। তোমার জন্যে অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ○

৪। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

٤- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

৫। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে–

٥- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ○

৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

٦- بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ○

৭। তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

'নূন' প্রভৃতি হুরূফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরায়ে বাকারার শুরুতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কথিত আছে যে, এখানে ن দ্বারা ঐ বড় মাছকে বুঝানো হয়েছে যা এক জগত পরিবেষ্টনকারী পানির উপর রয়েছে যা সপ্ত আকাশকে উঠিয়ে নিয়ে আছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেনঃ "লিখো।" কলম বলেঃ "কি লিখবো?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তকদীর লিখে নাও।" সুতরাং ঐ দিন থেকে

নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবার আছে সবগুলোই কলম লিখে ফেলে। তারপর আল্লাহ পাক মাছ সৃষ্টি করেন এবং পানির বাষ্প উত্থিত করেন যার দ্বারা আকাশ নির্মিত হয় এবং যমীনকে ঐ মাছের পিঠের উপর রাখা হয়। মাছ নড়ে ওঠে, ফলে যমীনও হেলতে দুলতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা যমীনে পাহাড় গেড়ে দেন। ফলে যমীন মযবূত হয়ে যায় এবং ওর নড়াচড়া করা বন্ধ হয়ে যায়।" অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[১] ভাবার্থ এই যে, এখানে نٓ দ্বারা এই মাছকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও মাছ সৃষ্টি করেন। কলম জিজ্ঞেস করেঃ "কি লিখবো?" উত্তরে বলা হয়ঃ "কিয়ামত পর্যন্ত যতকিছু হবে সবই লিখে নাও।" অতঃপর তিনি نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।"[২] সুতরাং نٓ দ্বারা উদ্দেশ্য মাছ এবং قلم দ্বারা উদ্দেশ্য এই কলম।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। তারপর নূন অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কলমকে বলেনঃ "লিখো।" কলম বলেঃ "কি লিখবো?" উত্তরে আল্লাহ বলেনঃ "যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু হবে যেমন আমল, রিযিক, বয়স, মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছুই লিখে নাও।" তখন কলম ওগুলো লিখে নেয়।"[৩] এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। অতঃপর কলমের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত ওটা আর চলবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান বা বিবেক সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেনঃ "আমার মর্যাদার শপথ! আমার বন্ধুদের মধ্যে আমি তোমাকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিবো এবং আমার শত্রুদের মধ্যে তোমাকে অপূর্ণ রাখবো।"

মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এটা মশহূর ছিল যে, নূন দ্বারা ঐ মাছকে বুঝানো হয়েছে যা সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে। বাগাভী (রঃ) প্রমুখ তাফসীরকার বলেন যে, এই মাছের পিঠের উপর এক কংকরময় ভূমি রয়েছে যার পুরুত্ব আকাশ ও পৃথিবীর সমান। ওর উপর একটি বলদ রয়েছে যার চল্লিশ হাজার শিং রয়েছে।

---

১. ইমাম ইবনে আবি হাতিম ও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেন।
৩. এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ওর পিঠের উপর সাতটি যমীন এবং ওগুলোর সমস্ত মাখলূক আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কতক মুফাসসির এই হাদীসকেও এই অর্থের উপরই স্থাপন করেছেন যা মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। তা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের সংবাদ অবগত হন তখন তিনি তাঁর নিকট হাযির হন এবং কতকগুলো প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁকে বলেনঃ "আমি আপনাকে এমন কতকগুলো প্রশ্ন করবো যেগুলো নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।" অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেনঃ "কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি? কি কারণে সন্তান কখনো পিতার দিকে আকর্ষিত হয় এবং কখনো মাতার দিকে আকর্ষিত হয়?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "এই কথাগুলো এখনই হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গেলেন।" তখন হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) বলে উঠলেনঃ " ফেরেশতাদের মধ্যেই তিনি এমন একজন ফেরেশতা যিনি ইয়াহূদীদের দুশমন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো এমন এক আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ততা। পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে পুত্র সন্তান হয় এবং যখন স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন কন্যা সন্তান হয়।"

অন্য হাদীসে এটুকু বেশী আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রশ্ন করেনঃ "এই খাদ্যের পরে জান্নাতীদেরকে কি খেতে দেয়া হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জান্নাতী বলদ যবেহ করা হবে যা জান্নাতে চরে বেড়াতো।" তারপর জিজ্ঞেস করেনঃ "তাদেরকে কোন পানি পান করানো হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বলেন ঃ "'সালসাবীল' নামক নহর হতে তাদেরকে পান করানো হবে।" একথাও বলা হয়েছে যে, ن দ্বারা আলোর তক্তা উদ্দেশ্য। একটি মুরসাল গারীব হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নূরের তক্তা এবং নূরের কলম যা চালিত হয়েছে এমন সব জিনিসের উপর যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।"

ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেনঃ আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, ওটা এমন একটি নূরানী কলম যার দৈর্ঘ্য একশ বছরের পথ। একথাও বলা হয়েছে যে, نٓ দ্বারা দোয়াত এবং قَلَم দ্বারা কলম কে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রঃ) এবং

কাতাদাহও (রঃ) একথাই বলেছেন। একটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল মারফূ হাদীসেও এটা বর্ণিত হয়েছে। যা মুসনাদে ইবনে হাতিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ن অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ দোয়াত ও কলম সৃষ্টি করেন। তারপর কলমকে বলেনঃ "লিখো।" কলম প্রশ্ন করেঃ "কি লিখবো?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেনঃ "কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে ওগুলো লিখো। যেমন আমল সমূহ, ভালই হোক আর মন্দই হোক, রিযিক, তা হালালই হোক অথবা হারামই হোক। তারপর এও লিখোঃ কোন জিনিস দুনিয়ায় কখন আসবে, কতদিন থাকবে এবং কখন বের হবে? আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর রক্ষক ফেরেশতাদেরকে নিয়োগ করেছেন এবং কিতাবের জন্যে দারোগা নিযুক্ত করেছেন। রক্ষক ফেরেশতাগণ প্রতিদিনের আমল সম্পর্কে দারোগাকে জিজ্ঞেস করে লিখে নেন। যখন রিযিক শেষ হয়ে যায়, আয়ু পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর সময় এসে পড়ে তখন রক্ষক ফেরেশতাগণ দারোগা ফেরেশতাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করেনঃ "বলুন, আজকের আমল কি আছে?" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "এই ব্যক্তির জন্যে এখন আমাদের কাছে কিছুই নেই।" একথা শুনে এই ফেরেশতাগণ নীচে নেমে আসেন এবং দেখেন যে, ঐ ব্যক্তি মারা গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটা বর্ণনা করার পর বলেন, তোমরা তো আরব সম্প্রদায়, তোমরা কি কুরআন কারীমে রক্ষক ফেরেশতাদের সম্পর্কে পড় নি? বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিখে রাখতাম।" ভাবার্থ হচ্ছেঃ তোমাদের আমলগুলো আমরা মূল হতে লিখে নিতাম। (৪৫ঃ ২৯)

এতো হলো نٓ শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা। এখন قَلَم শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহ্যতঃ এখানে قَلَم দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা লিখা হয়। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ـ

অর্থাৎ "পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।" (৯৬ঃ ৩-৫)

এই কলমের কসম খেয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এটা অবহিত করছেন যে, তিনি মানুষকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা ইলম বা

জ্ঞান অর্জন করছে, এটাও তাঁর একটা বড় নিয়ামত। এজন্যেই এরপরই তিনি বলেনঃ এবং কসম তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ শপথ ঐ জিনিসের যা তারা লিখে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ শপথ ঐ জিনিসের যা তারা জানে। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ফেরেশতাদের লিখনকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা বান্দাদের আমল লিখে থাকেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর দ্বারা ঐ কলমকে বুঝানো হয়েছে যা কুদরতীরূপে চালিত হয়েছে এবং আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। তাঁরা এর অনুকূলে ঐ হাদীস দুটি পেশ করেছেন যা কলমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ কলম উদ্দেশ্য যার দ্বারা যিকির লিখিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও, যেমন তোমার সম্প্রদায়ের মূর্খ ও সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলে থাকে। বরং তোমার জন্যে অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। কেননা, তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছো এবং আমার পথে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছো। তাই আমি তোমাকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করবো। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, خُلُقٍ عَظِيْمٍ -এর অর্থ হলো دِيْنٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ মহান দ্বীন এবং তা হলো দ্বীন ইসলাম। মুজাহিদ (রঃ), আবূ মালিক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং রবী ইবনে আনাস (রঃ) একথাই বলেছেন। যহ্হাক (রঃ) এবং ইবনে যায়েদও (রঃ) এরূপই বলেছেন। আতিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, خُلُقٍ عَظِيْمٍ দ্বারা اَدَبٍ عَظِيْمٍ বা উত্তম শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ "তাঁর চরিত্র হলো কুরআন (অর্থাৎ কুরআনেই তাঁর চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে)।"

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "তুমি কি কুরআন পড়নি?" প্রশ্নকারী হযরত সাঈদ ইবনে হিশাম (রাঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, পড়েছি।" তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "কুরআন কারীমই তাঁর চরিত্র ছিল।" সহীহ্ মুসলিমে এ হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে যা আমরা ইন্শাআল্লাহ্ সূরা মুয্যাম্মিলের তাফসীরে বর্ণনা করবো। বানু সাওয়াদ গোত্রের

একটি লোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত উত্তর দেন এবং إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ-এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন ঐ লোকটি তাঁকে বলেনঃ "দু' একটি ঘটনা বর্ণনা করুন!" তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "তাহলে শুনো! একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে আমি এবং হযরত হাফসা (রাঃ) উভয়েই খাদ্য রান্না করি। আমি আমার দাসীকে বলিঃ দেখো, যদি আমার খাদ্যের পূর্বে হাফসা (রাঃ)-এর খাদ্য এসে পড়ে তবে তুমি তা ফেলে দিবে। আমার দাসী তাই করে এবং খাদ্যের পাত্রটিও ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছড়িয়ে পড়া বিক্ষিপ্ত খাদ্যগুলো একত্রিত করেন এবং বলেনঃ "এই পাত্রের পরিবর্তে একটি ভাল পাত্র তাকে তুমি দাও।" আল্লাহর শপথ! এ ছাড়া আর কোন শাসন গর্জন ও তিরস্কার ভর্ৎসনা তিনি আমাকে করেননি।"[১]

এ হাদীসটি যে কয়েক ধারায় বিভিন্ন শব্দে কয়েকটি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার একটি ভাবার্থ তো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা পছন্দনীয় চরিত্র, উত্তম স্বভাব এবং পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। সুতরাং এভাবেই কুরআন কারীমের উপর তাঁর আমল এমনই ছিল যে, তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আহকামের মূর্তিমান আমলী নমুনা। প্রত্যেকটি হুকুম পালনে এবং প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকাতে তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তাঁরই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের বর্ণনা। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "দশ বছর ধরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে থেকেছি কিন্তু তিনি কোন এক দিনের তরেও আমাকে উহ (যন্ত্রণা প্রকাশক ধ্বনি) পর্যন্ত বলেননি। কোন করণীয় কাজ না করলেও এবং যা করণীয় নয় তা করে বসলেও তিনি আমাকে কোন শাসন গর্জন করা এবং ধমক দেয়া তো দূরের কথা 'এরূপ কেন হলো?' এ কথাটিও বলেননি। তিনি সবারই চেয়ে বেশী চরিত্রবান ছিলেন। তাঁর হাতের তালুর চেয়ে বেশী নরম আমি কোন রেশম অথবা অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করিনি। আর তাঁর ঘর্ম অপেক্ষা বেশী সুগন্ধময় জিনিস আমি শুঁকিনি। মিশ্ক আম্বরও না এবং আতরও না।"[২]

হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চেহারায় সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে চরিত্রবান। তাঁর পবিত্র দেহ খুব লম্বাও ছিল না

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এবং খুব খাটোও ছিল না।[১] এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) তাঁর কিতাবুশ শামায়েলে এ সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো তাঁর হাত দ্বারা না তাঁর কোন দাসকে প্রহার করেছেন, না প্রহার করেছেন তাঁর কোন স্ত্রীকে এবং না প্রহার করেছেন অন্য কাউকেও। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন (এবং ঐ জিহাদে কাউকে মেরেছেন) সেটা অন্য কথা। যখন তাঁকে দুটি কাজের যে কোন একটিকে অবলম্বন করার অধিকার দেয়া হতো তখন তিনি সহজটি অবলম্বন করতেন। তবে সেটা গুনাহর কাজ হলে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। কখনো তিনি কারো নিকট হতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।, তবে কেউ আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করলে তিনি আল্লাহর আহ্কাম জারি করার জন্যে অবশ্যই তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন, কাজেই এটা ভিন্ন কথা।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আমি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র পরিপূর্ণ বা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি)।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ) শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ـ

অর্থাৎ "আগামীকল্য তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" (৫৪ ঃ ২৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "আমরা অথবা তোমরা অবশ্যই হিদায়াতের উপর কিংবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি।" (৩৪ঃ ২৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ এই হকীকত বা তত্ত্ব কিয়ামতের দিন খুলে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই এটাও বর্ণিত আছে যে, مَفْتُوْنٌ বলা হয় مَجْنُوْنٌ বা পাগলকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষীও একথাই বলেন। হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ

১. সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি বর্ণিত।

গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে কে বেশী শয়তানের নিকটবর্তী। مَفْتُوْنٌ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য হতে সরে পড়ে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। بِاَيِّكُمُ-এর উপর بَاء আনয়নের কারণ এই যে, যেন তা تَضْمِيْنُ فِعْل প্রমাণ করে। অর্থাৎ এর প্রকৃতরূপ ছিলঃ فَسَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'শীঘ্রই তুমি জানবে এবং তারাও জানবে' অথবা এইরূপ ছিলঃ فَسَتُخْبِرُ وَيُخْبِرُوْنَ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থাৎ ' তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত তা শীঘ্রই তুমিও খবর দিবে এবং তারাও খবর দিবে।' এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত। অর্থাৎ কারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কাদের পদস্খলন ঘটেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত।

৮- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না।

৯- وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

৯। তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে,

১০- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

১০। এবং অনুসরণ করো না তার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,

১১- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ○

১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়,

১২- مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○

১২। যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

১৩- عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ○

১৩। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত;

১৪। সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।	١٤- اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ ○
১৫। তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলেঃ এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র।	١٥- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○
১৬। আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দিবো।	١٦- سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ○

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তো তোমাকে বহু নিয়ামত, সরল-সঠিক পথ মহান চরিত্র দান করেছি, সুতরাং তোমার জন্যে এখন উচিত যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে তুমি তাদের অনুসরণ করবে না। তারা তো চায় যে, তুমি নমনীয় হবে, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। ভাবার্থ এই যে, তুমি তাদের বাতিল মা'বূদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ হতে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে। এরূপ করলে তারা খুশী হবে।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি অধিক শপথকারী ইতর প্রকৃতির লোকদেরও অনুসরণ করবে না। যারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাদের লাঞ্ছনা ও মিথ্যা বর্ণনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সদা ভয় থাকে। তাই তারা মিথ্যা শপথ করে করে অন্যদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মাতে চায়। তারা নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা কসম খেতে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নামগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَهِيْن -এর অর্থ হলো মিথ্যাবাদী। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দুর্বল চিত্ত লোক। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, حَلَّاف -এর অর্থ 'মুকাবির' এবং – مَهِيْن এর অর্থ দুর্বল। هَمَّاز এর অর্থ গীবতকারী, চুগলখোর, যে বিবাদ লাগাবার জন্যে এর কথা ওকে এবং ওর কথা একে লাগিয়ে থাকে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) দুটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় বলেনঃ "এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর এদেরকে খুব বড় (পাপের) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রস্রাব করার সময় পর্দা করতো না এবং অপরজন ছিল চুগলখোর।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) এ হাদীসটি ঐ সময় শুনিয়েছিলেন যখন তাঁকে বলা হয় যে, এ লোকটি আমীর-উমারার নিকট (গোয়েন্দারূপে) কথা পৌঁছিয়ে থাকে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনে সাকন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক কারা এ খবর কি আমি তোমাদেরকে দিবো না?" সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে এ খবর দিন!" তিনি তখন বললেন ঃ "তারা হলো ঐ সব লোক যাদেরকে দেখলে মহামহিমান্বিত আল্লাহকে স্মরণ হয়।" তারপর তিনি বললেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের নিকৃষ্ট লোকদের সংবাদ দিবো না? তারা হলো চুগলখোর, যারা বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে থাকে এবং সৎ ও পবিত্র লোকদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের আরো বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, তারা সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে, হালাল জিনিস ও হালাল কাজ হতে সরে গিয়ে হারাম ভক্ষণে ও হারাম কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পাপী, দুষ্কর্মপরায়ণ ও হারাম ভক্ষণকারী। তারা দুশ্চরিত্র, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। তারা শুধু সম্পদ জমা করে এবং কাউকেও কিছুই দেয় না।

মুসনাদে আহমাদে হযরত হারিসাহ ইবনে অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের পরিচয় দিবো না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি, যাকে দুর্বল মনে করা হয় (সে'ই জান্নাতী)। যদি সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে তবে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীর সংবাদ দিবো না? প্রত্যেক অত্যাচারী, যালিম ও অহংকারী (জাহান্নামী)।"[২] অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "প্রত্যেক জমাকারী ও বাধাদানকারী, অশ্লীলভাষী এবং রূঢ় স্বভাব ব্যক্তি (জাহান্নামী)।

---

[১] ইমাম ইবন মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ عُتُلٍ زَنِيْمٍ কে?" উত্তরে তিনি বলেন ঃ "দুশ্চরিত্র, রূঢ় স্বভাব, অত্যধিক পানাহারকারী, লোকদের উপর অত্যাচারকারী এবং বড় পেটুক ব্যক্তি।"[৩]

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আকাশ কাঁদে যাকে আল্লাহ তা'আলা শারীরিক সুস্থতা দান করেছেন, পেট পুরে খেতে দিয়েছেন এবং জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ (অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু সবকিছুই) দান করেছেন এতদসত্ত্বেও সে জনগণের উপর অত্যাচার করে থাকে।"[৪]

মোটকথা عُتُلٍ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার দেহ সুস্থ ও সবল, বেশী পানাহারকারী এবং খুবই শক্তিশালী। আর زَنِيْمٍ হলো ঐ ব্যক্তি যে বদনামী কুখ্যাত। আরবদের পরিভাষায় زَنِيْمٍ ঐ লোককে বলা হয় যাকে কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করা হয়, আসলে কিন্তু সে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। আরব কবিরাও এটাকে এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ যার নসবনামা সঠিক নয়। কথিত আছে যে, এর দ্বারা আখনাস ইবনে শুরায়েক সাকাফীকে বুঝানো হয়েছে, যে বানু যাহ্রা গোত্রের মিত্র ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আসওয়াদ ইবনে আবদি ইয়াগুস যুহরীদের বুঝানো হয়েছে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, জারজ সন্তান উদ্দেশ্য।

এটাও বর্ণিত আছে যে, কর্তিত কান বিশিষ্ট বকরী, যে কান তার গলদেশে ঝুলতে থাকে, এরূপ বকরীকে যেমন পালের মধ্যে সহজেই চেনা যায় ঠিক তেমনই মুমিনকে কাফির হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এ ধরনের আরো বহু উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলোরই সারমর্ম হলো এই যে, زَنِيْمٍ হলো ঐ ব্যক্তি যে কুখ্যাত এবং যার সঠিক নসবনামা এবং প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা যায় না। এ ধরনের লোকদের উপর শয়তান খুব বেশী জয়যুক্ত হয় এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ "জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "জারজ সন্তান তিনজন মন্দ লোকের একজন, যদি সেও তার পিতা-মাতার মত আমল করে।"

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তাদের দুষ্কর্মের কারণ এই যে, তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। আমার নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় তো দূরের কথা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

---

[৩] এ হাদীসটি বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

[৪] এ হাদীসটিও দুই মুরসাল পন্থায় বর্ণিত হয়েছে।

করে এবং ঘৃণার স্বরে বলে ঃ এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالاً مَّمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّآ إِنَّهُۥ كَانَ لِءَايَـٰتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا. إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

অর্থাৎ "আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো। সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো! সে আবার চেয়ে দেখলো। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করলো ও মুখ বিকৃত করলো। অতঃপর সে পিছনে ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো, এবং ঘোষণা করলো ঃ 'এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এটা তো মানুষেরই কথা।' আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারে। তুমি কি জান সাকার কি? ওটা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে না। এটা তো গাত্র চর্ম দগ্ধ করবে! সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশ জন প্রহরী।" (৭৪ ঃ ১১-৩০)

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ আমি তার নাক দাগিয়ে দিবো। অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করবো যে, তার লাঞ্ছনা কারো কাছে গোপন থাকবে না। সবাই তার পরিচয় জেনে নিবে। যেমন দাগযুক্ত নাক বিশিষ্ট লোককে এক নযর দেখলেই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও চিনতে অসুবিধা হয় না এবং সে তার নাকের দাগ গোপন করতে চাইলেও গোপন করতে

পারে না, অনুরূপভাবে ঐ লাঞ্ছিত ও অপমানিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অপমান কারো অজানা থাকবে না। এটাও কথিত আছে যে, বদরের দিন তার নাকে তরবারীর আঘাত লাগবে। এটাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নাকে জাহান্নামের মোহর লেগে যাবে, অর্থাৎ মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। তাহলে নাক দ্বারা মুখমণ্ডল উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) এই সমুদয় উক্তি বর্ণনা করে বলেন ঃ এই উক্তিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এই ভাবে হতে পারে যে, এসবই ঐ ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হবে। এটাও হবে এবং ওটাও হবে। দুনিয়াতেও সে অপমানিত হবে, সত্য সত্যই তার নাকে দাগ দেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিনেও সে দাগযুক্ত অপরাধী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকতমও বটে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "বহু বছর ধরে বান্দা আল্লাহর নিকট মুমিন রূপে লিখিত হয়, কিন্তু সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে বান্দা আল্লাহর নিকট বহু বছর ধরে কাফির রূপে লিখিত হয়, কিন্তু সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি মানুষের দোষারোপকারী এবং চুগলখোর অবস্থায় মারা যাবে, কিয়ামতের দিন তার নাকের উপর তার দুই ওষ্ঠের দিক হতে দাগ দিয়ে দেয়া হবে, যা পাপীর নিদর্শনরূপে গণ্য হবে।"

১৭। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল,	(١٧) إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
১৮। এবং তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি।	(١٨) وَلَا يَسْتَثْنُونَ
১৯। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত।	(١٩) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ

২০। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো।	(٢٠) فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ
২১। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বললো ঃ	(٢١) فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ
২২। তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চলো।	(٢٢) أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ
২৩। অতঃপর তারা চললো নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে,	(٢٣) فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ
২৪। অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।	(٢٤) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ
২৫। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম – এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করলো।	(٢٥) وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ
২৬। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলো, তারা বললো ঃ আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি।	(٢٦) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ
২৭। না, আমরা তো বঞ্চিত!	(٢٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
২৮। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেন?	(٢٨) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
২৯। তখন তারা বললো ঃ আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।	(٢٩) قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

৩০। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো।	(٣٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَـٰوَمُونَ
৩১। তারা বললো ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।	(٣١) قَالُواْ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ
৩২। আমরা আশা রাখি– আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।	(٣٢) عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ
৩৩। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানতো!	(٣٣) كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

যেসব কাফির রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করতো, এখানে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন ঐ বাগানের মালিকরা আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল এবং নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবে নিক্ষেপ করেছিল, এই কাফিরদেরও অবস্থা অনুরূপ যে, তাদের আল্লাহর নিয়ামত অর্থাৎ তাঁর রাসূল (সঃ)-এর রিসালাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ অস্বীকৃতি তাদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের মধ্যে পতিত করে। তাই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। ঐ বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফল ছিল। ঐ লোকগুলো পরস্পর শপথ করে বলেছিল যে, অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত কিছুটা বাকী থাকতেই তারা গাছের ফল আহরণ করবে, যাতে দরিদ্র, মিসকীন এবং ভিক্ষুকরা বাগানে হাযির হওয়ার সুযোগ না পায় ও তাদের হাতে কিছু দিতে না হয়, বরং সমস্ত ফল তারা বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। তারা

তাদের এ কৌশলে কৃতকার্য হবে ভেবে খুব আনন্দ বোধ করলো। তারা আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ থেকেও বিস্মরণ হয়ে গেল। তাই ইন্‌শাআল্লাহ কথাটিও তাদের মুখ দিয়ে বের হলো না। এ জন্যেই তাদের এ শপথ পূর্ণ হলো না। রাতারাতিই তাদের পৌঁছার পূর্বেই আসমানী বিপদ তাদের সারা বাগানকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলো। তাদের বাগানটি এমন হয়ে গেল যে, যেন তা কালো ছাই ও কর্তিত শস্য।

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকো। জেনে রেখো যে, পাপের কারণে বান্দাকে ঐ রিযিক হতে বঞ্চিত রাখা হয় যা তার জন্যে তৈরী করে রাখা হয়েছিল।" অতঃপর তিনি فَطَافَ عَلَيْهَا হতে فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ পর্যন্ত আয়াত দুটি পাঠ করেন। ঐ লোকগুলো তাদের পাপের কারণে তাদের বাগানের ফল ও শস্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়েছিল। সকালে তারা একে অপরকে ডাক দিয়ে বলে ঃ ফল আহরণের ইচ্ছা থাকলে আর দেরী করা চলবে না, চলো এখনই বের হয়ে পড়ি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা আঙ্গুরের বাগান ছিল। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে চললো যাতে কেউ শুনতে না পায় এবং গরীব মিসকীনরা কোন টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা ঐ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারে না সেই হেতু তিনি বলেন, তাদের এ গোপনীয় কথা ছিল ঃ 'তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরীব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবে না।' এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করলো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, স্বয়ং তাদের গ্রামের নামই ছিল হারদ। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়ীতে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। দেখে যে, সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা পয়সারও মূল্য নেই। গাছগুলোর জ্বলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ

আকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ তারা মনে করলো যে, ভুল করে তারা অন্য কোন বাগানে এসে পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা বললো ঃ 'আমাদের কাজের পন্থাই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই দাঁড়ালো।' যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বললোঃ 'আমাদের বাগান তো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।' তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থী ছিল সে তাদেরকে বললো ঃ 'দেখো, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম ঃ তোমরা ইন্শাআল্লাহ্ বলছো না কেন?' সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদের যুগে সুবহানাল্লাহ্ বলাও ইনশাআল্লাহ্ বলার স্থলবর্তী ছিল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থই হলো ইন্শাআল্লাহ্ বলা। এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তি তাদেরকে বলে ঃ 'দেখো, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং প্রশংসা করছো না?' এ কথা শুনে তারা বললো ঃ 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি।' যখন শাস্তি পৌঁছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করলো, যখন আযাব এসে পড়লো তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিলো। অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো এবং বলতে থাকলো ঃ 'আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি।' তারপর তারা সবাই বললো ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে।' অতঃপর তারা বললো ঃ 'সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।' অর্থাৎ দুনিয়াতেই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, এটা ইয়ামনবাসীর ঘটনা। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিল যারওয়ানের অধিবাসী যা (তৎকালীন ইয়ামনের রাজধানী) সানাআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল হাবশের অধিবাসী।

মাযহাবের দিক দিয়ে তারা আহলে কিতাব ছিল। ঐ বাগানটি তারা তাদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। তাদের পিতার নীতি এই ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলো আল্লাহ্‌র নামে সাদ্‌কা করে দিতেন। পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বললো ঃ "আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতোগুলো ফল ও শস্য প্রতি বছর এদিক-ওদিক দিয়ে দিতেন না। আমরা যদি এগুলো ফকীর মিসকীনদেরকে প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তবে অতি সত্বর আমরা ধনী হয়ে যাবো।" তারা তাদের এ সংকল্প দৃঢ় করে নিলো। ফলে তাদের উপর ঐ শাস্তি এসে পড়লো যা তাদের মূল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিলো। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কেউই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর নিয়ামতের মধ্যে কার্পণ্য করতঃ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের হক আদায় করে না, বরং তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি আপতিত হয়ে থাকে। এটা তো হলো পার্থিব শাস্তি, আখিরাতের শাস্তি তো এখনো বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও নিকৃষ্টতর। ইমাম বায়হাকী (রঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে ফসল কাটতে এবং বাগানের ফল আহরণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪। মুত্তাকীদের জন্যে অবশ্যই রয়েছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাদের প্রতিপালকের নিকট।	(٣٤) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৩৫। আমি কি আত্মসমর্পণ কারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করবো।	(٣٥) أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ
৩৬। তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?	(٣٦) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

৩৭। তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর -	(٣٧) أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
৩৮। যে, তোমাদের জন্যে ওতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?	(٣٨) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
৩৯। আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্যে যা স্থির করবে তা পাবে?	(٣٩) أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
৪০। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর– তাদের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?	(٤٠) سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
৪১। তাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকলে তারা তাদের দেব-দেবীগুলোকে উপস্থিত করুক– যদি তারা সত্যবাদী হয়।	(٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ

উপরে পার্থিব বাগানের মালিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করার কারণে তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এখানে ঐ আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা আখিরাতে এমন জান্নাত লাভ করবে যার নিয়ামত শেষও হবে না এবং হ্রাসও পাবে না। আর তা পঁচে গলেও যাবে না।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করবো? অর্থাৎ মুসলিম ও পাপীরা কি কখনো সমান হতে পারে? যমীন ও আসমানের শপথ! এটা কখনো হতে পারে না।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? তোমাদের হাতে কি আল্লাহর [illegible] অবতারিত এমন কোন

কিতাব রয়েছে যা তোমাদের কাছে রক্ষিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের নিকট হতে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছো? আর তাতে তা-ই রয়েছে যা তোমরা চাচ্ছ ও বলছো? অথবা তোমাদের সাথে কি আমার কোন দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা যা কিছু বলছো তা হবেই? এবং তোমাদের এই বাজে ও ঘৃণ্য বাসনা পূর্ণ হয়েই যাবে?

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেন ঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদের মধ্যের এই দাবীর যিম্মাদার কে? তাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকলে তারা তাদের ঐ দেব-দেবীদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২। স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্যে, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।

(٤٢) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

৪৩। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।

(٤٣) خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ

৪৪। যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরবো যে, তারা জানতে পারবে না।

(٤٤) فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

৪৫। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

(٤٥) وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ

৪৬। তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে

(٤٦) أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم

একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করবে!

مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

৪৭। তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে!

(٤٧) أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

উপরে যেহেতু বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহভীরুদের জন্যে নিয়ামত বিশিষ্ট জান্নাতসমূহ রয়েছে, সেই হেতু এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই নিয়ামতরাশি তারা ঐ দিন লাভ করবে যেই দিন পদনালী খুলে দেয়া হবে, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যেই দিন হবে চরম সংকটপূর্ণ, বড়ই ভয়াবহ, কম্পনযুক্ত এবং বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশিত হওয়ার দিন। এখানে সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "আমাদের প্রতিপালক তাঁর পদনালী খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর ও নারী সিজদায় পতিত হবে। হ্যাঁ, তবে দুনিয়ায় যারা লোক দেখানোর জন্যে সিজদা করতো সেও সিজদা করতে চাইবে। কিন্তু তার কোমর তক্তার মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে সিজদা করতে পারবে না।"[1]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই 'কাশফে সাক' অর্থাৎ পদনালী খুলে যাওয়ার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, ঐ দিন বিপদ, কষ্ট ও কাঠিন্যের দিন হবে, যেটাকে এখানে প্রচলিত অর্থে বলা হয়েছে।[2]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে অন্য সনদে সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ -এর তাফসীরে এক বিরাট বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন কবি বলেন ঃ شَالَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ "যুদ্ধ তার পদনালী খুলে দিয়েছে।" এখানেও যুদ্ধের বিরাটত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন এই সময়টা হবে অত্যন্ত কঠিন। তিনি আরো বলেন যে, এ বিষয়টি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ

[1] এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও আছে যা কয়েকটি সনদে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হয়েছে। এটি সুদীর্ঘ ও মাশহুর হাদীস।

[2] এটি ইমাম ইব্‌ন জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হচ্ছে ঃ যে সময় বিষয় খুলে যাবে এবং আমলসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর এটা খুলে যাওয়া হলো আখিরাত এসে পড়া এবং কর্ম প্রকাশিত হওয়া উদ্দেশ্য। এ রিওয়াইয়াতগুলো ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন। এরপর এ হাদীসটি রয়েছে যে, এর তাফসীরে নবী (সঃ) বলেছেন ঃ "এর দ্বারা খুব বড় নূর বা জ্যোতিকে বুঝানো হয়েছে। ওর সামনে মানুষ সিজদায় পড়ে যাবে।"[১]

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে উঠবে না, তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা, তারা দুনিয়ায় বড়ই উদ্ধত ও অহংকারী ছিল। সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় যখন তাদেরকে সিজদার জন্যে আহ্বান করা হতো তখন তারা সিজদা করা হতে বিরত থাকতো, যার শাস্তি এই হলো যে, আজ তারা সিজদা করতে চাচ্ছে, কিন্তু করতে পারছে না। পক্ষান্তরে, পূর্বে সিজদা করতে পারতো কিন্তু করতো না। আল্লাহর দ্যুতি বা তাজাল্লী দেখে সমস্ত মু'মিন সিজদায় পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু কাফিররা ও মুনাফিকরা সিজদা করতে পারবে না। তাদের কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ঝুঁকতেই পারবে না, বরং পিঠের ভরে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। দুনিয়াতেও তাদের অবস্থা মু'মিনদের বিপরীত, পরকালেও তাদের অবস্থা হবে মু'মিনদের বিপরীত।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আমাকে এবং আমার এই হাদীস অর্থাৎ কুরআনকে অবিশ্বাসকারীদের ছেড়ে দাও। এতে বড়ই ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি থামো, আমি এদেরকে দেখে নিচ্ছি। তুমি দেখতে পাবে, কিভাবে আমি এদেরকে ধীর ধীরে পাকড়াও করবো। এরা ঔদ্ধত্য ও অহংকারে বেড়ে চলবে, আমার অবকাশ প্রদানের রহস্য এরা উপলব্ধি করতে পারবে না, হঠাৎ করে আমি এদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবো। আমি এদেরকে বাড়াতে থাকবো। এরা মদমত্ত হয়ে যাবে। এরা এটাকে সম্মান মনে করবে, কিন্তু মূলে এটা হবে অপমান ও লাঞ্ছনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালায়ও বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদে অস্পষ্টতা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অর্থাৎ “আমি যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করছি, এর মাধ্যমে আমি তাদের কল্যাণ সাধন করছি এটাই কি তারা ধারণা করছে? (এটা কখনো নয়) বরং তারা বুঝে না।” (২৩ ঃ ৫৫-৫৬) আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অর্থাৎ “যখন তারা আমার ওয়ায ও নসীহত ভুলে বসে তখন আমি তাদের জন্যে সব জিনিসের দরযা উন্মুক্ত করে দিই, অতঃপর যখন তারা এজন্যে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করতে থাকে তখন অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করি, ফলে তাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।” (৬ ঃ ৪৪) আর এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ “আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন, অতঃপর যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেন না।” তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই। যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে।” (১১ ঃ ১০২)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ না যা তাদের উপর খুবই ভারী বোধ হচ্ছে? যার ভার বহন করতে তারা একেবারে ঝুঁকে পড়ছে? তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! এ দুটি বাক্যের তাফসীর সূরা তুরে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তো তাদেরকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে আহ্বান করছো বিনা পারিশ্রমিকে! তাদের কাছে তো তুমি এর বিনিময়ে কোন ধন-সম্পদ যাচঞা করছো না! পুণ্য লাভ করা ছাড়া তোমার তো অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই! তথাপিও এ লোকগুলো তোমাকে অবিশ্বাস করতে রয়েছে! এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপনা।

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের | (٤٨) فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا

تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।

(٤٩) لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ

৪৯। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে।

(٥٠) فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

৫০। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

(٥١) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ

৫১। কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দিবে এবং বলে ঃ এতো এক পাগল।

(٥٢) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَمِينَ

৫২। কুরআনতো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে নবী (সঃ)! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অবিশ্বাস করছে এর উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর। অচিরেই আমি ফায়সালা করে দিবো। পরিশেষে তুমি এবং তোমার অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়ো না।' এর দ্বারা হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যা হওয়ার তা-ই হয় অর্থাৎ তাঁর নৌযানে সওয়ার হওয়া, মাছের তাঁকে গিলে

ফেলা, মাছের সমুদ্রের গভীর তলদেশে চলে যাওয়া, সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে তাঁর لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আপনি মহান ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি) (২১ ঃ ৮৭) এই কালেমা পাঠ করা, আর তাঁর দু'আ কবূল হওয়া এবং তাঁর মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ "এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" আরো বলেন ঃ "যদি সে তাসবীহ পাঠ না করতো। তবে কিয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই পড়ে থাকতো।"

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।' পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত কালেমাটি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মুখ দিয়ে বের হওয়া মাত্রই তা আরশের উপর পৌঁছে যায়। তখন ফেরেশতাগণ বলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুর্বল শব্দ তো আমাদের নিকট পরিচিত বলে মনে হচ্ছে!" আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে বলেন ঃ "এটা কার শব্দ তা কি তোমরা বুঝতে পারছো না?" ফেরেশতারা উত্তরে বললেন ঃ "জ্বী, না।" আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ঃ "এটা (আমার বান্দা ও নবী) ইউনুস (আঃ)-এর শব্দ।" এ কথা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! ইনি কি আপনার ঐ বান্দা যাঁর সৎ আমলসমূহ প্রতি দিন আসমানের উপর উঠতো এবং যাঁর প্রার্থনা সব সময় কবূল হতো?" জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ "হ্যাঁ, তোমরা সত্য কথাই বলছো।" ফেরেশতাগণ তখন বললেন ঃ "তাহলে হে পরম করুণাময় আল্লাহ! তাঁর সুসময়ের সৎকার্যাবলীর ভিত্তিতে তাঁকে এই কঠিন অবস্থা হতে মুক্তি দান করুন!" তখন মহান আল্লাহ মাছকে আদেশ করলেন ঃ "তুমি তাকে উগলিয়ে দাও।" মাছ তখন তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে উগলিয়ে দিলো।

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কারো জন্যে এটা উচিত নয় যে, সে বলে ঃ 'আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম'।"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দিবে। অর্থাৎ হে নবী !

[১] এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

তোমার প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাফিররা তোমাকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আছড়িয়ে ফেলতে চায়। তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে করুণা বর্ষিত না হলে অবশ্যই তারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতো।

এই আয়াতে ঐ বিষয়ের উপর দলীল রয়েছে যে, নযর লাগা এবং আল্লাহর হুকুমে ওর প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য। যেমন বহু হাদীসেও রয়েছে, যা কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুনানে আবী দাঊদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঝাড়-ফুঁক করা শুধু বদ নযরের জন্যে, বিষাক্ত জন্তুর কামড়ের জন্যে এবং অনবরত প্রবাহমান রক্তের জন্যে।" কোন কোন সনদে নযর শব্দটি নেই।[১]

মুসনাদে আবি ইয়ালার একটি দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর হুকুমে (বদ) নযর মানুষকে পতিত করে থাকে।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত হাবিস নামীমী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "'হাম' ও নযরের মধ্যে কোনই সত্যতা নেই। সবচেয়ে বেশী সত্যতা রয়েছে লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যৎ কথনের মধ্যে।"[২]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "'হাম' ও (বদ) নযরের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই এবং লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যৎ কথনই হলো সবচেয়ে সত্য।

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(বদ) নযর সত্য, (বদ) নযর সত্য। এটা সমুন্নত ব্যক্তিকেও নীচে নামিয়ে দেয়।"[৩]

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "নযর সত্য, তকদীরের উপর কোন কিছু জয়যুক্ত হলে তা এই নযরই হতো। তোমাদেরকে গোসল করানো হলে তোমরা গোসল করে নিবে।"

১. এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ মুসলিম এবং জামে তিরমিযীতেও রয়েছে।
২. এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বা দুর্বল বলেছেন।
৩. এটা গারীব বা দুর্বল।

মুসনাদে আবদির রায্যাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্ন লিখিত কালেমা দ্বারা হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ

اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ ـ

অর্থাৎ "আমি তোমাদের দু'জনের জন্যে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা প্রত্যেক শয়তান হতে এবং প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক (বদ) নযর হতে যা লেগে যায়।" তিনি বলতেনঃ হযরত ইবরাহীমও (আঃ) এ শব্দগুলো দ্বারা হযরত ইসহাক (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[১]

সুনানে ইবনে মাজাহ্তে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ) গোসল করছিলেন। হযরত আমির ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলে উঠলেনঃ "আমি তো আজ পর্যন্ত কোন পর্দানশীঠ মহিলারও এরূপ (সুন্দর) পদনালী দেখিনি!" একথার অল্পক্ষণ পরেই হযরত সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জনগণ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সাহল (রাঃ)-এর একটু খবর নিন, তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "তোমাদের কারো উপর সন্দেহ আছে কি?" তাঁরা জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ, আমির ইবনে রাবীআহ্র (রাঃ) উপর সন্দেহ আছে।" তিনি তখন বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ কেন তার ভাইকে হত্যা করে? যখন তোমাদের কেউ তার ভাই এর কোন এমন জিনিস দেখবে যা তাকে খুব ভাল লাগবে তখন তার উচিত হবে তার জন্যে বরকতের দু'আ করা।" তারপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমীর (রাঃ)-কে বললেনঃ "তুমি অযু কর এবং মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, হাঁটু এবং লুঙ্গীর মধ্যস্থিত দেহের অংশ ধৌত কর এবং ঐ পানি তার উপর ঢেলে দাও।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ বরতনকে তার পৃষ্ঠের পিছনে উল্টিয়ে দাও।'[২]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দানব ও মানবের বদ নযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হলো তখন এ দুটোকে গ্রহণ করে অন্যান্য সবগুলোকে ছেড়ে দিলেন।[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) এবং আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সুনানে নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ, জামে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি কি অসুস্থ?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ" তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ

بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَّعَيْنٍ تَشْنِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ -

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি প্রত্যেক জিনিস হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক নফস ও চক্ষুর অনিষ্ট হতে যে আপনার ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড় ফুঁক করছি।"[১] কোন কোন রিওয়াইয়াতে শব্দের কিছু হের ফেরও রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই নযর লেগে যাওয়া সত্য।" মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীসে এরপরে এও রয়েছেঃ "এর কারণ হচ্ছে শয়তান এবং ইবনে আদমের হিংসা।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ "ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন ঘর, ঘোড়া ও স্ত্রীলোক এ তিনটির মধ্যে রয়েছে এটা কি আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন?" উত্তরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "আমি যদি শুনেছি বলি তবে তো আমার এমন কথা বলা হবে যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেননি। হ্যাঁ, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "সর্বাপেক্ষা বড় সত্য হলো লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যত কথন এবং নযর লেগে যাওয়াও সত্য।"

হযরত উবায়েদ ইবনে রিফাআহ যারকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জা'ফর (রাঃ)-এর সন্তানদেরকে (বদ) নযর লেগে থাকে, সুতরাং আমি কোন ঝাড়-ফুঁক করাবো কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, যদি কোন জিনিস তকদীরের উপর জয়যুক্ত হতো তবে তা হতো এই (বদ) নযর।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বদ নযর হতে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে নযর লাগাতো তাকে অযূ করার নির্দেশ দেয়া হতো, আর যার উপর নযর লাগানো হতো তাকে ঐ পানি দ্বারা গোসল করানো হতো।[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বিষাক্ত জন্তু ও (বদ) নযর সত্য। আর সবচেয়ে বড় সত্য হলো লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যৎ কথন।"[৩]

মুসনাদে আহমাদে হযরত সাহল (রাঃ) ও হযরত আমির (রাঃ) সম্বলিত হাদীসটি, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, কিছুটা বিস্তারিতভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন রিওয়াইয়াতে এও বর্ণিত আছে যে, এ দুজন মহান ব্যক্তি গোসলের উদ্দেশ্যে গমন করেন। হযরত আমির (রাঃ) প্রথমে পানিতে অবতরণ করেন। তাঁর উন্মোচিত দেহের উপর হযরত সাহল (রাঃ)-এর নযর লেগে যায়। হযরত আমির (রাঃ) তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানভাবে শব্দ করতে থাকেন। এ দেখে হযরত সাহল (রাঃ) তাঁকে তিনবার ডাক দেন, কিন্তু তাঁর কোন সাড়া না পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হন এবং তাঁর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন স্বয়ং সেখানে গমন করেন এবং লুঙ্গী কিছুটা উঠিয়ে নিয়ে পানিতে নেমে পড়েন, এমন কি হযরত সাহল (রাঃ) তাঁর পদনালীর শুভ্রাংশ দেখতে পান। অতঃপর তিনি হযরত আমির (রাঃ)-এর বক্ষের উপর হাত মেরে দু'আ করেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِصْرِفْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ـ

আল্লাহ! আপনি তার উষ্ণতা, শৈত্যতা ও কষ্ট দূর করে দিন!" এরপর হযরত আমির (রাঃ)-এর জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি উঠে দাঁড়ান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলমান) ভাই এর কোন কিছু দেখে চমৎকৃত হবে তখন যেন সে তার বরকতের জন্যে দু'আ করে। কেননা নযর লেগে যাওয়া সত্য।"

---

১. এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ফায়সালা ও তকদীরের পর আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক (বদ) নযরের ফলে মারা যাবে।"[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(বদ) নযর (এর ক্রিয়া) সত্য। এটা মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, আর উটকে পৌঁছিয়ে দেয় ডেগচী পর্যন্ত। আমার উম্মতের অধিকাংশের ধ্বংস এতেই রয়েছে।[২]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "একের রোগ অপরকে হয় না, 'হাম' এর কারণে ধ্বংস সাধিত হওয়াকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, আর হিংসাও কিছু নয় (হিংসা করে কারো কোন ক্ষতি করা যায় না এবং (বদ) নযর (এর ক্রিয়া) সত্য।"

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে চিন্তিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-কে বদ নযর লেগে গেছে।" একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এটা সত্য বটে। নযর সত্যিই লেগে থাকে। আপনি এ কালেমাগুলো পড়ে তাদের জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি কেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "ঐ কালেমাগুলো কি?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন যে, কালেমাগুলো হলোঃ

اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ذَا الْمَنِّ الْقَدِيْمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِىَّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعْوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَافِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে বড় রাজত্বের মালিক! হে যবরদস্ত ইহসানকারী। হে বুযুর্গ চেহারার অধিকারী। হে পরিপূর্ণ কালেমার মালিক! হে প্রার্থনা কবূলকারী! আপনি হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-কে জ্বিনদের সমস্ত কুমন্ত্রণা হতে এবং মানুষের বদ নযর হতে আশ্রয় দান করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ আবদির রহমান বর্ণনা করেছেন। আর একটি সহীহ সনদের মাধ্যমেও এ রিওয়াইয়াতটি বর্ণিত আছে।

কালেমাগুলো পাঠ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সামনে খেলা করতে শুরু করলেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে বললেনঃ "হে লোক সকল! এই কালেমাগুলোর মাধ্যমে তোমাদের জন্তুগুলো এবং স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা কর। জেনে রেখো যে, আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে এর মত দু'আ আর নেই।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ এতো এক পাগল! আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ "কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ।"

সূরাঃ কলম -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি হাফিজ ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ হাক্কাহ্, মাক্কী

(আয়াতঃ ৫২, রুকূঃ ২)

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- اَلْحَاقَّةُ ○

১। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

٢- مَا الْحَاقَّةُ ○

২। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

٣- وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ○

৩। কিসে তোমাকে জানাবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○

৪। আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়।

٥- فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○

৫। আর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।

٦- وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ○

৬। আর আ'দ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।

٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ○

৭। যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে, তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কান্ডের ন্যায়।

٨- فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ○

৮। অতঃপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?

٩- وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ○

৯। আর ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

١٠- فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

১০। তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন, কঠোর শাস্তি।

١١- اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ○لا

১১। যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে।

١٢- لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

১২। আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।

'হাক্কাহ্' কিয়ামতের একটি নাম। আর এ নামের কারণ এই যে, জান্নাতে শান্তি দানের অঙ্গীকার এবং জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও যথার্থতার দিন এটাই। এ জন্যেই এ দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই হাক্কাহর সঠিক অবস্থা অবগত নও।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা এই কিয়ামতকে অবিশ্বাস করার ফলে প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেনঃ সামূদ সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখো, একদিকে ফেরেশ্তাদের প্রলয়ংকারী শব্দ আসে, আর অপরদিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, ফলে সব নীচ-উপর হয়ে যায়। সুতরাং হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে طَاغِيَة শব্দের অর্থ হলো ভীষণ চীৎকার। আর হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গুনাহ্ বা পাপ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ) ও হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এর দ্বারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা উদ্দেশ্য। ইবনে যায়েদ (রঃ)-এর প্রমাণ হিসেবে কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেনঃ

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا অর্থাৎ "সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য বশতঃ অবিশ্বাস করেছিল।"(৯১ ঃ ১১) অর্থাৎ উষ্ট্রীকে কেটে ফেলেছিল। আর আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু কল্যাণ ও বরকত শূন্য ছিল এবং ফেরেশতাদের হস্ত দ্বারা বের করা হচ্ছিল। ওটা পর্যায়ক্রমে সাত রাত ও আট দিন ধরে প্রবাহিত হয়েছিল। এতে তাদের জন্যে অমঙ্গল ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ঃ فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ অর্থাৎ "অমঙ্গলজনক দিনগুলোতে।" হযরত রাবী (রঃ) বলেন যে, এই ঝঞ্ঝা বায়ু শুক্রবার হতে বইতে শুরু করে। কারো কারো মতে বুধবার হতে শুরু হয়। আরবরা এই বায়ুকে اَعْجَازْ এ জন্যেও বলে থাকে যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছেঃ আ'দ সম্প্রদায়ের অবস্থা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, সাধারণতঃ এই বায়ু শীতের শেষে প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর عَجُزْ বলা হয় শেষকে। এ কারণও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আ'দ সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধা মহিলা একটি গুহায় ঢুকে পড়ে এবং অষ্টম দিবসে এই ঝঞ্ঝা বায়ু তাকে ধ্বংস করে দেয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

خَاوِيَةٌ শব্দের অর্থ হলো খারাপ, সড়া ও ফাঁপা বা সারশূন্য। ভাবার্থ এই যে, এ ঝঞ্ঝাবায়ু তাদেরকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে নীচে ফেলে দেয়। তাদের মস্তক ফেটে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর দেহের বাকী অংশ এরূপ হয়ে যায় যে, তা যেন সারশূন্য খর্জুর-খাণ্ড। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে 'সাবা' অর্থাৎ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা।"

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্যে বায়ুর ভাণ্ডারের মধ্য হতে শুধুমাত্র আংটি পরিমাণ স্থান খুলে দেয়া হয়, যেখান দিয়ে বাতাস বের হতে থাকে। প্রথমে ঐ বায়ু গ্রাম ও পল্লীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং গ্রামবাসী ছোট, বড়, নারী, পুরুষ সবকে তাদের মালধন ও জীব-জন্তুসহ উঠিয়ে নিয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে লটকিয়ে দেয়। এগুলো খুবই উঁচুতে ছিল বলে শহরবাসীদের কাছে কালো রঙএর মেঘ বলে মনে হয়। তারা খুবই খুশী হয় এই মনে করে যে, অত্যাধিক গরমের কারণে তাদের অবস্থা অত্যন্ত

খারাপ হয়ে গেছে, সুতরাং এই মেঘ হতে পানি বর্ষিত হলে তারা শান্তি লাভ করবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে বাতাস ঐগুলোকে শহরবাসীর উপর নিক্ষেপ করে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ঐ বাতাসের পালক এবং লেজ ছিল।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ এরপর বলেনঃ বলতো, এরপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেউই মুক্তি পায়নি, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন– কঠোর শাস্তি।

قَبْلَهُ -এর দ্বিতীয় কিরআত قِبَلَهُ ও রয়েছে অর্থাৎ قَاف -এর নীচে যের দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবেঃ ফিরাউন এবং তার পাশের ও তার যুগের তার অনুসারী কাফির কিবতী সবাই। مُؤْتَفِكَات দ্বারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে বুঝানো হয়েছে।

خَاطِئَة -এর অর্থ হলো অবাধ্যতা ও অপরাধ। সুতরাং অর্থ হলোঃ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ـ

অর্থাৎ "তারা সবাই রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে, ফলে তাদের উপর শাস্তি এসে পড়ে।"(৫০ঃ১৪) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

অর্থাৎ "নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল।"(২৬ঃ ১০৫)

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ

অর্থাৎ "আ'দ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।"(২৬ঃ ১২৩)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

অর্থাৎ "সামূদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল।"(২৬ঃ ১৪১) অথচ সকলের নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূলই এসেছিলেন।

এখানেও অর্থ এটাই যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন।

এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ দেখো, যখন নূহ (আঃ)-এর দু'আর কারণে ভূ-পৃষ্ঠে তূফান আসলো ও পানি সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিক প্লাবিত করলো এবং আশ্রয় লাভের কোন স্থান থাকলো না তখন আমি নূহ্ (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে নৌযানে আরোহণ করালাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করলো, বিরোধিতা শুরু করলো এবং উৎপীড়ন করতে লাগলো তখন অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্যে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন এবং ভয়াবহ তূফান নাযিল করলেন। হযরত নূহ (আঃ) এবং যারা তাঁর নৌযানে আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের একটি লোকও বাঁচেনি, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং এখনকার সমস্ত মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর এবং তাঁর সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, পানির এক একটি ফোঁটা আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে পানির রক্ষক ফেরেশতার মাপের মাধ্যমে বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে বাতাসের একটা হালকা প্রবাহও বিনা মাপে প্রবাহিত হয় না। কিন্তু আ'দ সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে যে বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের উপর যে পারি বর্ষিত ও উত্থিত হয়েছিল তা বিনা মাপেই ছিল। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে পানি ও বাতাস এতো জোরে চলেছিল যে, রক্ষক ফেরেশতাদের তা আওতার বাইরে ছিল। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলেনঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ

অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ (পূর্ব পুরুষদেরকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। যাতে এ নৌযান তোমাদের জন্যে একটা নমুনারূপে থেকে যায় এবং শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। আজও তোমরা ঐ রকমই নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রের লম্বা-চওড়া সফর করে থাকো। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ - لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ "আমি তোমাদের আরোহণের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছি, যাতে তোমরা ওগুলোর উপর আরোহণ করে তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামত স্মরণ করতে পারো।" (৪৩ঃ১২-১৩) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ -

অর্থাৎ "তাদের জন্যে এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।" (৩৬ঃ ৪১-৪২)

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) উপরের এ আয়াতের এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর ঐ নৌযানটিই বাকী ছিল, যেটাকে এই উম্মতের পূর্ববর্তী লোকেরাও দেখেছিল। কিন্তু সঠিক ভাবার্থ প্রথমটিই বটে।

মহান আল্লাহ বলেন যে, আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ তারা যেন এই নিয়ামতকে ভুলে না যায়। অর্থাৎ যাদের সঠিক বোধ ও স্থির জ্ঞান রয়েছে, যারা আল্লাহ্র কথা ও তাঁর নিয়ামতের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে না, তাদের উপদেশ ও শিক্ষার এটাও একটা মাধ্যম হয়ে গেল।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাকহূল (রঃ) বলেনঃ যখন এ শব্দগুলো অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন হযরত আলী (রাঃ)-কে এরূপও করে দেন।" হযরত আলী (রাঃ) বলতেনঃ "এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে কিছু শ্রবণ করার পর আমি তা ভুলিনি।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত বুরাইদাহ্ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাকে নিকটে রাখি, দূরে না রাখি, তোমাকে

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা মুরসাল।

শিক্ষাদান করি ও তুমি তা মুখস্থ রাখো এবং মুখস্থ রাখা তোমার জন্যে উচিতও বটে।" তখন وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ (শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

১৩। যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে– একটি মাত্র ফুৎকার।

১৩– فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○

১৪। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় ওগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

١٤– وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○

১৫। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়।

١٥– فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।

١٦– وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

১৭। ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেই দিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে।

١٧– وَّالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○

১৮। সেই দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।

١٨– يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্ব প্রথম ভয়ের কারণ হবে শিংগায় ফুৎকার দেয়া। এতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। তারপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে আসমান ও যমীনের সমস্ত মাখলূক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ্ যাঁকে চাইবেন তিনি অজ্ঞান হবেন না। এরপর সূরে ফুৎকার দেয়া হবে, যার শব্দের কারণে সমস্ত মাখলূক তাদের

১. এ রিওয়াইয়াতটি অন্য সনদেও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটাও সঠিক নয়।

প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। এখানে ঐ প্রথম ফুৎকারেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আরোপের জন্যে একথাও বলে দিয়েছেন যে, এই উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফুৎকার মাত্র একটি। কেননা, যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হয়ে গেছে তখন না এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে, না তা টলতে পারে, না দ্বিতীয়বার আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, না তাগীদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। ইমাম রাবী' (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শেষ ফুৎকারকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকাশমান উক্তি ওটাই যা আমরা বলেছি। এ জন্যে এর পরেই বলেছেনঃ পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চামড়ার মত ছড়িয়ে দেয়া হবে। যমীন পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আসমান প্রত্যেক খোলার জায়গা হতে ফেটে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ـ

অর্থাৎ "আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।" (৭৮ঃ১৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশে ছিদ্র ও গর্ত হয়ে যাবে এবং ওটা ফেটে যাবে। আরশ্ ওর সামনে থাকবে এবং ফেরেশ্তাগণ ওর প্রান্তদেশে থাকবেন, যে প্রান্তদেশ তখন পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েনি। তাঁরা দরযার উপর থাকবেন এবং আকাশের দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। এর দ্বারা হয় তো আরশে আযীমকে উঠানো উদ্দেশ্য অথবা ঐ আরশকে উঠানো উদ্দেশ্য যার উপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা লোকদের ফায়সালার জন্যে অধিষ্ঠিত থাকবেন। সঠিকতার কথা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন যে, এ ফেরেশতাগণ পাহাড়ী বকরীর আকৃতি ধারণ করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, তাঁদের চক্ষুর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের ব্যবধান হবে একশ বছরের পথ।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা সম্পর্কে সংবাদ

প্রদান করবো। ঐ ফেরেশতার স্কন্ধ ও কানের নিম্ন ভাগের মধ্যকার ব্যবধান এতোটা যে ওর মধ্যে উড়ন্ত পাখী সাতশ বছর পর্যন্ত উড়তে থাকবে।[১]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, আটজন ফেরেশতা দ্বারা ফেরেশতাদের আটটি সারিকে বুঝানো হয়েছে। আরো বহু গুরুজন হতে এটা বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সমুন্নত ফেরেশতাদের আটটি অংশ রয়েছে। প্রতিটি অংশের সংখ্যা সমস্ত মানুষ, জ্বিন, শয়তান এবং ফেরেশতার সমান।

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছেঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি প্রকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ জন্যেই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ সেই দিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এর পূর্বেই নিজেরাই নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও। আর তোমাদের আমলসমূহ ওযন করা হবে। এর পূর্বেই তোমরা তোমাদের আমলসমূহ অনুমান করে নাও, যাতে কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়, যেই দিন তোমাদের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে এবং তোমাদেরকে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হবে।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন জনগণকে তিনবার আল্লাহ্ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। প্রথম দু'বার তো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তি চলবে। কিন্তু তৃতীয়বারে আমলনামা উড়ানো হবে। ঐ আমলনামা কারো ডান হাতে আসবে এবং কারো বাম হাতে আসবে।"[২]

---

১. এ হাদীসের সনদ খুবই উত্তম এবং সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। এটাকে ইমাম আবূ দাউদ (রঃ)-ও স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরূপই বলেছেন।

২. এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ্তেও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর মাধ্যমেও এই রিওয়াইয়াতটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) হতেও মুরসালরূপে এরকমই রিওয়াইয়াত।

১৯। তখন যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো;	١٩- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ
২০। আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।	٢٠- إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝
২১। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন;	٢١- فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝
২২। সুমহান জান্নাতে	٢٢- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
২৩। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।	٢٣- قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝
২৪। (তাদেরকে বলা হবেঃ) পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।	٢٤- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيـًٔا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ভাগ্যবান লোকদেরকে কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা অত্যন্ত খুশী হবে এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা প্রত্যেককে বলবেঃ তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো! এটা এজন্যে যে, মানবীয় স্বভাবের কারণে তাদের দ্বারা যা কিছু গুনাহ্র কাজ হয়েছিল সেগুলোও তাদের তাওবার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি, বরং ঐগুলোর পরিবর্তে পুণ্য লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা শুধু নেকীর আমলনামা আনন্দের সাথে সকলকে দেখাতে থাকবে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, هَا এর পরে وُمْ বেশী করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশমান কথা এই যে, هَاكُمْ-هَاؤُمُ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ উসমান (রঃ) বলেনঃ মু'মিনকে গোপনে পর্দার মধ্যে তার দক্ষিণ হস্তে আমলনামা দেয়া হবে। তাতে সে তার গুনাহ্গুলো পড়তে থাকবে। এতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তার দৃষ্টি তার পুণ্যগুলোর উপর পড়বে

এবং সে ওগুলো পড়তে থাকবে। এতে সে মনে শান্তি পাবে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। আবার সে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখবে এবং পড়তে থাকবে। তখন দেখবে যে, তার পাপগুলোও পুণ্যের সাথে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পাপের স্থলে পুণ্য লিখিত হয়েছে। এতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাকেই সামনে পাবে তাকেই বলবেঃ আমার আমলনামাটা একটু পড়ে দেখো!

যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হানযালা (রাঃ)-কে ফেরেশ্তাগণ তাঁর শাহাদাতের পর গোসল দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন এবং তার আমলনামার পৃষ্ঠে তার মন্দ আমল লিখিত থাকবে, যেগুলো তার কাছে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "বল তো, তুমি এ আমল করেছিলে?" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ, আমি এটা করেছিলাম।" আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বলবেনঃ "দেখো, আমি দুনিয়াতেও তোমাকে অপদস্থ করিনি, এখন এখানেও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমার সমস্ত গুনাহ্ মা'ফ করলাম।" মহান আল্লাহর এ বাণী শুনে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার আমলনামা সবাইকে দেখাতে থাকবে।

হযরত উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পূর্বেই গত হয়েছে, যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে নিজের কাছে ডেকে নিবেন এবং তাকে তার গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি বলবেনঃ "তুমি কি অমুক অমুক গুনাহ করেছিলে?" সে স্বীকার করতে থাকবে, এমন কি সে ধারণা করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ "হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার গুনাহ্গুলোর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছিলাম। আজকেও আমি তোমাকে লজ্জিত করবো না। যাও, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।" অতঃপর তাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, যাতে শুধু পুণ্যই লিখিত থাকবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীগণ বলবেনঃ "এরা ওরাই, যারা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রেখো যে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ!"

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে বলবেঃ দুনিয়াতেই তো আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ -

অর্থাৎ "যারা বিশ্বাস করতো যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারী।"(২ ঃ ৪৬)

মহান আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং তাদের প্রতিদান এই যে, তারা যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। তারা সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অট্টালিকাগুলো হবে উঁচু উঁচু। ঐ জান্নাতের হূরগুলো হবে অত্যন্ত সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। ওর ঘরগুলো নিয়ামতে পরিপূর্ণ থাকবে। এই নিয়ামত রাশি কখনো শেষও হবে না এবং কমেও যাবে না, বরং এগুলো হবে চিরস্থায়ী।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন) জান্নাতীরা কি একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলবেনঃ "হ্যাঁ। উঁচুতে অবস্থানকারী জান্নাতীরা নিম্নে অবস্থানকারী জান্নাতীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নীচে নেমে আসবে এবং খুবই ভালবাসা ও হৃদ্যতার সাথে তাদেরকে সালাম জানাবে। হ্যাঁ, তবে নিম্নে অবস্থানকারী জান্নাতীরা তাদের আমলের স্বল্পতার কারণে উপরে উঠবে না।"

অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, জান্নাতে একশটি শ্রেণী রয়েছে। এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ব হলো আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ জান্নাতের ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। হযরত ইবনে আযিব (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেনঃ জান্নাতের গাছের ফল এতো অবনমিত থাকবে যে, জান্নাতীরা ছাপর খাটে শুয়ে শুয়েই ফল ভাঙ্গতে পারবে।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না তাকে একটা লিখিত সমন দেয়া হবে। তাতে লিখিত থাকবেঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের নামে পত্র। তাকে তোমরা (ফেরেশতারা) সুমহান জান্নাতে প্রবিষ্ট করো, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।"[১] কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই পরওয়ানা বা সমন পুলসিরাতের উপর প্রদান করা হবে।

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন যে, জান্নাতীদেরকে অনুগ্রহ ও অধিক মেহেরবানীর ভিত্তিতে মুখেও পানাহারের অনুমতি দেয়া হবে এবং বলা হবেঃ এটা তোমাদের অতীত দিনের ভাল কৃতকর্মের বিনিময়। ভাল কর্মের বিনিময় বলা হয়েছে শুধুমাত্র স্নেহ ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমল করতে থাকো, পরস্পর কোমল ব্যবহার কর এবং মধ্য পন্থা অবলম্বন কর, আর জেনে রেখো যে, তোমাদের কাউকেও তার আমল জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে না। অর্থাৎ কাউকেও জান্নাতে প্রবিষ্ট করার জন্যে শুধু তার আমল যথেষ্ট নয়।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আপনাকেও কি নয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমাকেও নয়। তবে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ আমাকে ঢেকে ফেলেছে (সুতরাং এটা স্বতন্ত্র কথা)।"

২৫। কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হতো আমার আমলনামা।

২৫- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۚ

২৬। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।

২৬- وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۚ

২৭। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো!

২৭- يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ

২৮। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না।

২৮- مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۚ

২৯। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

২৯- هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۚ

৩০। ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ তাকে ধর। অতঃপর তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।

৩০- خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ

৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

৩১- ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ

৩২। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে।	٣٢- ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ○
৩৩। সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না,	٣٣- إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ○
৩৪। এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না,	٣٤- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ○
৩৫। অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না,	٣٥- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ○
৩৬। এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত,	٣٦- وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ○
৩৭। যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ খাবে না।	٣٧- لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ○

এখানে পাপীদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামতের মাঠে যখন তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ। তারা ঐ সময় বলবেঃ 'হায়! যদি আমাদেরকে আমাদের আমলনামা দেয়াই না হতো তবে কতইনা ভাল হতো! যদি আমাদেরকে আমাদের হিসাব অবহিতই না করা হতো! হায়! যদি মৃত্যুই আমাদের সবকিছু শেষ করে দিতো তবে কতই না আনন্দের কথা হতো! যদি আমরা এই দ্বিতীয় জীবনই লাভ না করতাম।' দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত ভয় করতো, সেই দিন ঐ মৃত্যুই তারা কামনা করবে। তারা আরো বলবেঃ আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের কোন কাজেই আসলো না। অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর হতে আল্লাহর আযাব সরাতে পারলো না। কোন সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসলো না। আজ আমরা আমাদের বাঁচার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না।

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেনঃ তাদেরকে ধর ও তাদের গলদেশে বেড়ি পড়িয়ে দাও। তাদেরকে এ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

হযরত মিনহাল ইবনে আমর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম শোনা মাত্রই সত্তর হাজার ফেরেশতা এরূপ একজন পাপীর দিকে বেগে ধাবিত

হবে, অথচ এই ফেরেশতাদের মাত্র একজনকে যদি আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন তবে একজনকে তো দূরের কথা, সত্তর হাজার লোককে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন যে, চার লক্ষ ফেরেশতা তার দিকে ধাবিত হবেন। সে তাঁদেরকে বলবেঃ আমার সাথে তোমাদের সম্পর্ক কি? তাঁরা উত্তরে বলবেনঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমার প্রতি রাগান্বিত বলে সবাই তোমার প্রতি রাগান্বিত।

হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই ফরমান জারী হওয়া মাত্রই সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তার দিকে দৌড়িয়ে যাবেন। প্রত্যেকেই একে অপরের আগে যেতে চাইবেন এবং সর্বাগ্রে তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করবেন। তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। অতঃপর পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। এই শৃঙ্খলের একটি কড়া হযরত কা'ব আহবার (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে সারা পৃথিবী-পূর্ণ লোহার সমান হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, এটা হবে ফেরেশতাদের হাতের মাপে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই শৃঙ্খল তার দেহে পরিয়ে দেয়া হবে। পায়খানার দ্বার দিয়ে ভরে মুখ দিয়ে বের করে নেয়া হবে। তাকে এমনিভাবে আগুনে ভাজা হবে যেমনভাবে কাবাব ভাজা হয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার দেহের পিছন দিয়ে এই শৃঙ্খল পরানো হবে এবং নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে তা বের করে নেয়া হবে, ফলে সে পায়ের ভরে দাঁড়াতে পারবে না।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি আকাশ হতে একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করা হয় তবে তা এক রাত্রে পৃথিবীতে এসে পড়বে। কিন্তু ওটাকেও যদি জাহান্নামীকে বাঁধবার শৃংখলের এক মাথা হতে নিক্ষেপ করা হয় তবে তা অন্য মাথায় পড়তে চল্লিশ বছর লেগে যাবে।"[১]

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না। অর্থাৎ না সে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতো, না তাঁর মাখলূকের হক আদায় করে তাদের উপকার করতো।

১. এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী এটাকে 'হাসান' বলেছেন।

মাখলূকের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তাঁর, একত্ববাদে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। আর বান্দাদের একের অপরের উপর হক এই যে, একে অপরের সাথে সদাচরণ করবে এবং সহানুভূতি দেখাবে। ভাল কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে। এ জন্যেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ দুটো হককে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ "তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও।" নবী করীম (সঃ) ইন্তেকালের সময় এ দুটোকে এক সাথে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "তোমরা নামাযের হিফাজত করবে ও অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করবে।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতএব এই দিন তাদের কোন সুহৃদ থাকবে না। এমন কোন নিকটতম আত্মীয় ও সুপারিশকারী থাকবে না যে তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। আর তার জন্যে ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, غِسْلِيْن হলো জাহান্নামীদের নিকৃষ্ট খাদ্য। রাবী (রঃ) ও যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। সম্ভবতঃ এরই আর একটি নাম হচ্ছে যাক্কূম। আর غِسْلِيْن-এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, ওটা হলো জাহান্নামীদের দেহ হতে প্রবাহিত রক্ত ও পানি। হযরত আলী ইবনে আবী তালহা (রাঃ) বলেছেন যে, غِسْلِيْن হলো জাহান্নামীদের (ক্ষত নিঃসৃত) পূঁজ।

٣٨- فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ

৩৮। আমি কসম করছি ওর যা তোমরা দেখতে পাও,

٣٩- وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ

৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।

٤٠- اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۚۙ

৪০। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা,

٤١- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ

৪১। এটা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর,

٤٢- وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ

৪২। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

৪৩। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

٤٣- تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্য হতে তাঁর ঐ সব নিদর্শনের শপথ করছেন যেগুলো মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং ঐগুলোরও কসম খাচ্ছেন যেগুলো মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তিনি এর উপর শপথ করছেন যে, কুরআন কারীম তাঁর বাণী ও তাঁর অহী, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, যাঁকে তিনি আমানত আদায় ও রিসালাতের প্রচারের জন্যে পছন্দ ও মনোনীত করেছেন। رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এর সম্বন্ধ তাঁর সাথে লাগানোর কারণ এই যে, এর প্রচারক ও উপস্থাপক তো তিনিই। এ জন্যে رَسُوْل শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন। ভাষা তাঁর হলেও উক্তি হলো তাঁকে যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর। এ কারণেই সূরা তাকভীরে এর সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে ফেরেশতা-দূতের সাথে (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈলের আঃ) সাথে। ঘোষিত হয়েছেঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ـ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।"(৮১ ঃ ১৯-২১) আর ইনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। এ জন্যেই এর পরেই বলেনঃ

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের সাথী (হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পাগল নয়।"(৮১ঃ ২২) তারপর বলেনঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই মুহাম্মাদ (সঃ) তাকে জিবরাঈলকে (আঃ) তার প্রকৃত আকৃতিতে স্পষ্ট প্রান্তে দেখেছে।"(৮১ঃ ২৩) এরপর বলেনঃ

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়।"(৮১ ঃ ২৪)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ـ

অর্থাৎ "এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।"(৮১ ঃ ২৫)

অনুরূপভাবে এখানেও বলেনঃ "এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস করে থাকো। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাকো।" সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কোন সময় নিজের বাণীর সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মানব দূতের দিকে, আবার কখনো কখনো সম্বন্ধ লাগিয়েছেন ফেরেশতা দূতের দিকে। কেননা, তাঁরা উভয়েই আল্লাহর বাণীর প্রচারক এবং তাঁরা বিশ্বাস ভাজন। হ্যাঁ, তবে প্রকৃতপক্ষে বাণী কার? এটাও সাথে সাথে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে বের হই। দেখি যে, তিনি আমার পূর্বেই মসজিদে হারামে হাযির হয়ে গেছেন। আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি সূরা হাককাহ পাঠ করতে শুরু করেন। কুরআনের অলংকারপূর্ণ ভাষা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি মনে মনে বলি যে, কুরায়েশরা যে এঁকে কবি বলেছে তা সঠিকই বটে। আমার মনে এ খেয়াল জেগেই আছে, ইতিমধ্যে তিনি পাঠ করলেনঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস করে থাকো।" তখন আমার মনে খেয়াল জাগলো যে, ইনি কবি না হলে অবশ্যই যাদুকর। তখন তিনি পাঠ করলেনঃ

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ـ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ـ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

অর্থাৎ "এটা কোন যাদুকর বা গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাকো। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। সে যদি

আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, তবে অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে (শেষ আয়াত পর্যন্ত)।" এটা ছিল প্রথম ঘটনা, যার ফলে ইসলাম আমার অন্তরে পূর্ণভাবে ঘর করে বসে এবং প্রতিটি লোমকূপে ওর সত্যতা প্রবেশ করে।" সুতরাং যেসব কারণ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে সুপথ প্রদর্শনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল তন্মধ্যে এটাও ছিল একটি বিশেষ কারণ। আমরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘটনাটি 'সীরাতে উমার' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। আল্লাহরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা এবং আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

٤٤- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ

৪৪। সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো,

٤٥- لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ

৪৫। তবে অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম,

٤٦- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ

৪৬। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী

٤٧- فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ

৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।

٤٨- وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

৪৮। এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্যে অবশ্যই এক উপদেশ।

٤٩- وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ

৪৯। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।

٥٠- وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

৫০। এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে,

٥١- وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ

৫১। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য।

৫২। অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

٥٢- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমাদের কথা হিসেবে সত্যিই যদি আমার রাসূল (সঃ) এরূপই হতো, অর্থাৎ আমার রিসালাতের মধ্যে কিছু কম বেশী করতো বা আমি যে কথা বলিনি সেই কথা আমার নামে চালিয়ে দিতো তবে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতাম অর্থাৎ আমার ডান হাত দ্বারা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার ঐ শিরা কেটে ফেলতাম যার উপর হৃদয় লটকানো রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার এবং তার মাঝে এমন কেউ আসতে পারতো না যে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতো। সুতরাং ভাবার্থ এই দাঁড়ালো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্যবাদী, পবিত্র ও সুপথগামী ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাবলীগের এ মহান দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। আর নিজের পক্ষ হতে বহু মু'জিযা এবং তাঁর সত্যবাদিতার বড় বড় নিদর্শন তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই কুরআন অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্যে এক উপদেশ। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ـ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও যে, এই কুরআন মুমিনদের জন্যে হিদায়াত ও শিফা (অন্তর রোগের প্রতিষেধক), আর বে-ঈমানদের কর্ণে তো বধিরতা ও চক্ষে অন্ধত্ব রয়েছে (তারা দেখেও দেখে না এবং শুনেও শুনে না)।"(৪১ ঃ ৪৪)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। অর্থাৎ এভাবে স্পষ্ট বর্ণনার পরেও এমন কতকগুলো লোক রয়েছে যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করেই চলেছে। এই অবিশ্বাস ঐ লোকদের জন্যে কিয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হবে। অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ এই কুরআনই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

অর্থাৎ “এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরে এটা অবতীর্ণ করি যে, তারা ওর উপর ঈমান আনয়ন করে না।”(২৬ ঃ ২০০-২০১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ ـ

অর্থাৎ “তাদের মাঝে ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে।”(৩৪ ঃ ৫৪)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য খবর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ অতএব, হে নবী (সঃ)! এই কুরআন অবতীর্ণকারী মহান প্রতিপালকের নামের তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরাঃ হাক্কাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ মা'আরিজ, মাক্কী

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৪৪, রুকূ ঃ ২)

اٰيَاتُهَا : ٤٤، رُكُوْعَاتُهَا :٢

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত−

١- سَاَلَ سَائِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝

২। কাফিরদের জন্যে, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই।

٢- لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝

৩। এটা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

٣- مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝

৪। ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

٤- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর পরম ধৈর্য।

٥- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

৬। তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর,

٦- اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝

৭। কিন্তু আমি দেখছি এটাকে আসন্ন।

٧- وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

এখানে بِعَذَابٍ-এর মধ্যে যে, ب রয়েছে তা এটাই বলে দিচ্ছে যে, এ জায়গায় فِعْل-এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে যেন فِعْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই কাফিররা শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ـ

অর্থাৎ "তারা তোমার কাছে আযাব চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে, আর আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদার বিপরীত করবেন না।"(২২ঃ ৪৭) অর্থাৎ তাঁর আযাব ওর নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে।

সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাফিররা আল্লাহর আযাব চেয়েছে যা অবশ্যই তাদের উপর আসবে, অর্থাৎ আখিরাতে। তাদের এই আযাব চাওয়ার শব্দগুলোও কুরআন কারীমে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে আসুন।"(৮ঃ ৩২)

হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ দ্বারা ঐ শাস্তির উপত্যকা উদ্দেশ্য যা হতে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রবাহিত হবে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি এবং প্রকৃত ভাবার্থ হতে বহু দূরে। প্রথমটিই সঠিক উক্তি। বচন ভঙ্গী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এ শাস্তি কাফিরদের জন্যে অবধারিত, এটা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অনুসারে ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ হলো শ্রেণী বিশিষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বিশিষ্ট। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, مَعَارِجِ -এর অর্থ হলো আকাশের সোপানসমূহ। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ ফযল, করম, নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী। অর্থাৎ এই আযাব ঐ প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত যিনি এসব গুণ বিশিষ্ট। ফেরেশতা এবং রূহ তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

'রূহ' শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে হযরত আবূ সালিহ (রঃ) বলেন যে, এটা এক প্রকারের সৃষ্টজীব যা মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত। আমি বলি যে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে এবং এটা হবে خَاص -এর সংযোগ عَام -এর উপর। আর এও হতে পারে যে, এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের রূহ উদ্দেশ্য। কেননা, এটাও কবয হওয়ার পর আকাশের দিকে উঠে যায়। যেমন হযরত বারা (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন ফেরেশতা পবিত্র রূহ বের করেন তখন ওটাকে নিয়ে

এক আকাশ হতে অন্য আকাশে উঠে যান। শেষ পর্যন্ত সপ্ত আকাশের উপর উঠে যান।[১]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এতে চারটি উক্তি রয়েছে। প্রথম হচ্ছেঃ এর দ্বারা ঐ দূরত্ব উদ্দেশ্য যা আসফালুস সাফিলীন হতে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত রয়েছে। আর এরূপই আরশের নীচ হতে উপর পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব। আরশে মুআল্লা হলো লাল রঙ এর ইয়াকূত পাথর দ্বারা নির্মিত। যেমন ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ (রঃ) স্বীয় কিতাব 'সিফাতুল আরশ,-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর হুকুমের শেষ সীমা নীচের যমীন হতে আকাশ সমূহের উপর পর্যন্ত জায়গার পঞ্চাশ হাজার বছর। আর এক দিন এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ আসমান হতে যমীন পর্যন্ত এবং যমীন হতে আসমান পর্যন্ত একদিন, যা এক হাজার বছরের সমান। কেননা, যমীন ও আসমানের মধ্যে ব্যবধান হলো পাঁচ শ বছরের পথ। এই রিওয়াইয়াতটিই অন্য ধারায় হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিতে নয়। মুসনাদে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক যমীনের পুরুত্ব পাঁচশ বছরের ব্যবধান। আর এক যমীন হতে দ্বিতীয় যমীনের ব্যবধান হলো পাঁচশ বছর। তাহলে সাত হাজার বছর হয়ে গেল। অনুরূপভাবে আসমানগুলোর মাঝে হলো চৌদ্দ হাজার বছরের দূরত্ব। আর সপ্তম আকাশ হতে আরশে আযীমের ব্যবধান হলো ছত্রিশ হাজার বছর। আল্লাহ তা'আলার উক্তির তাৎপর্য এটাই যে, ফেরেশতারা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

দ্বিতীয় উক্তি হলোঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল হলো পঞ্চাশ

১. এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হলেও এটা মাশহূর হাদীস। এ হাদীসটির সাক্ষী হিসেবে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিও রয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে গত হয়েছে। এ হাদীসের সনদের বর্ণনাকারী একটি জামাআতের শর্তের উপর রয়েছেন। প্রথম হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ এবং সুনানে ইবনে মাজাহতেও রয়েছে। আমরা এর শব্দগুলো এবং এর ধারাগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ... يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (১৪ ঃ ২৭) -এ আয়াতের তাফসীরে করে দিয়েছি।

হাজার বছর। যেমন হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার মোট বয়সকাল হলো পঞ্চাশ হাজার বছর। আর এটাই এক দিন যা এই আয়াতের ভাবার্থ নেয়া হয়েছে। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার পুরো সময়কাল এটাই বটে, কিন্তু এর কতকাল অতীত হলো এবং কতকাল অবশিষ্ট রয়েছে, তা কারো জানা নেই। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

তৃতীয় উক্তি এই যে, এটা হলো ঐ দিন যা দুনিয়ার ও আখিরাতের মধ্যে ব্যবধান। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) একথাই বলেন। কিন্তু এ উক্তিটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল।

চতুর্থ এই যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইকরামাও (রঃ) একথাই বলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনকে কাফিরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর করে দিবেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হলোঃ "যেদিন পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, ওটা তো তাহলে খুবই বড় ও দীর্ঘ দিন হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ মুমিনের উপর এই দিনকে এতো হালকা করে দিবেন যে, দুনিয়ায় তার এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করতে যে টুকু সময় লাগতো, ঐদিনকে ঐটুকু সময়ের কম বলে তার কাছে অনুভূত হবে।"[১]

মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি হাদীসে আছে যে, বানু আমির গোত্রের একটি লোক হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। জনগণ বলেঃ জনাব! এ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে একজন বড় ধনী লোক। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তখন লোকটিকে ডাকলেন এবং বললেনঃ "সত্যিই কি তুমি সবচেয়ে বড় সম্পদশালী?" লোকটি উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ, আমার কাছে আছে রঙ বেরঙ এর বহু উট, বিভিন্ন প্রকারের দাস-দাসী এবং উন্নতমানের ঘোড়া ইত্যাদি।" তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তাকে বললেনঃ "সাবধান! এরূপ যেন না হয় যে, তোমার জন্তুগুলো তোমাকে পদদলিত করে এবং শিং দিয়ে গুঁতো মারে।" তিনি একথা বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমিরী

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী দাররাজ ও তাঁর শায়েখ আবুল হাইসাম দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সে বলেঃ "জনাব, এটা কেন হবে?" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "যে তার উটের হক আদায় করবে না (অর্থাৎ ওগুলোর যাকাত প্রদান করবে না) স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়, তাকে আল্লাহ তা'আলা লম্বা চওড়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ময়দানে চিৎ করে শুইয়ে দিবেন এবং সমস্ত জন্তুকে মোটা তাজা করে নির্দেশ দিবেন যে, তারা যেন তাকে পদদলিত করে। তখন ঐ জন্তুগুলো এক এক করে তাকে পদদলিত করতে করতে চলে যাবে। যখন দলের শেষ ভাগটি অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথম ভাগটি আবার ফিরে আসবে। এই ভাবে শাস্তি হতেই থাকবে। এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে ফায়সালা করা হবে। তারপর তারা নিজ নিজ পথ দেখে নিবে। অনুরূপভাবে গরু, ঘোড়া, বকরী ইত্যাদি শিং বিশিষ্ট জন্তুগুলোও শিং দ্বারা তাকে মারতে থাকবে। ওগুলোর মধ্যে কোনটিও শিং বিহীন ও শিং ভাঙ্গা থাকবে না।" তখন ঐ আমেরী লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! উটের মধ্যে আল্লাহর হক কি?" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "দরিদ্রদেরকে সওয়ারীর জন্যে উপহার স্বরূপ দেয়া, অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ করা, দুধপানের জন্যে জন্তু দান করা, মাদীর জন্যে প্রয়োজনে বিনা মূল্যে নর (এঁড়ে) ছেড়ে দেয়া।"[১]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূতকারী যে ব্যক্তি ওগুলোর হক আদায় করে না ওগুলোকে ফালি করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হবে ও তা দ্বারা তার ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর সে তার পথ দেখে নিবে, জান্নাতের পথ অথবা জাহান্নামের পথ।" এরপর উটের ও বকরীর বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে গত হয়েছে। আর এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়া তিন ব্যক্তির জন্যে (তিন রকম)। এক ব্যক্তির জন্যে ওটা পুরস্কার, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যে ওটা পর্দা এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে ওটা বোঝা।" এ হাদীসটি পুরোপুরিভাবে সহীহ্ মুসলিমেও রয়েছে। এই রিওয়াইয়াতগুলোকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করার ও সনদ এবং শব্দাবলী পূর্ণরূপে বর্ণনার জায়গা হলো আহকামের কিতাবুয যাকাত। এখানে

১. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদ ও সুনানে নাসাঈতেও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

শুধুমাত্র এ শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আমাদের এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

ইবনে আবী মুলাইকা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "যে দিনটি পার্থিব এক হাজার বছরের সমান ওটা কোন দিন?" এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) লোকটিকে উলটিয়ে প্রশ্ন করেনঃ "যে দিনটি পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান ওটা কোন দিন?" লোকটি তখন বললোঃ "জনাব! আমি নিজেই তো প্রশ্ন করতে এসেছি!" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে বলেনঃ "এটা ঐ দিন যার বর্ণনা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় কিতাবে দিয়েছেন। এর প্রকৃত তত্ত্ব একমাত্র তিনিই জানেন। আমি না জানা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে কিছু বলবো এটা আমি পছন্দ করি না।"[১]

এরপর মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আযাব তাদের উপর আপতিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে ওর জন্যে যে তাড়াহুড়া করছে, এতে তুমি ধৈর্যহারা হয়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ـ

অর্থাৎ "যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না তারা কিয়ামত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হোক এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, পক্ষান্তরে মুমিনরা এটাকে সত্য জেনে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে।"(৪২ঃ ১৮) এ জন্যেই মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ এখানে বলেনঃ তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর, কিন্তু আমি দেখছি এটাকে আসন্ন। অর্থাৎ মুমিন তো এর আগমন সত্য জানছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। না জানি আকস্মিকভাবে কখন কিয়ামত এসে পড়বে এবং আযাব আপতিত হয়ে যাবে। কেননা, এর সঠিক সময়ের কথা তো আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই! সুতরাং যার আগমনে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই তার আগমন নিকটবর্তীই মনে করা হয়ে থাকে এবং ওটা এসে পড়ার ব্যাপারে সদা ভয় ও সন্ত্রাস লেগেই থাকে।

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত	٨- يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝
৯। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত,	٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝
১০। আর সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না,	١٠- وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝
১১। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে সন্তান-সন্ততিকে,	١١- يُبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ۝
১২। তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,	١٢- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝
১৩। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো	١٣ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُئْوِيْهِ ۝
১৪। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।	١٤- وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝
১৫। না, কখনই নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি,	١٥- كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى ۝
২৬। যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে।	١٦- نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝
১৭। জাহান্নাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।	١٧- تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝
১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল।	١٨- وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে শাস্তি তলব করছে ঐ শাস্তি ঐ তলবকারী কাফিরদের উপর ঐ দিনে আসবে যেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত অথবা তেলের গাদের মত হয়ে যাবে এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ـ

অর্থাৎ "এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত।" (১০১ ঃ ৫)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না। অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোন নিকট আত্মীয় তার নিকট আত্মীয়ের কোন খবর নিবে না। অথচ একে অপরকে মন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু নিজে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার খেয়ালই তার থাকবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একে অপরকে দেখবে এবং চিনতেও পারবে, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ـ

অর্থাৎ "সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।" (৮০ ঃ ৩৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ـ

অর্থাৎ "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং এমন দিনকে ভয় কর যেই দিন পিতা পুত্রের কোন উপকার করবে না এবং পুত্রও পিতার কোন উপকার করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য।" (৩১ ঃ ৩৩) আরো বলেনঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

অর্থাৎ "কেউ কাউকেও তার বোঝা উঠাবার জন্যে আহ্বান করলে সে তার বোঝার কিছুই উঠাতে আসবে না, যদিও সে তার নিকটতম আত্মীয় হয়।" (৩৫ঃ ১৮) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।" (২৩ ঃ ১০১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ـ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ـ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ـ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ـ

অর্থাৎ "সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।" (৮০ ঃ ৩৪-৩৭)

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ 'অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না, কখনই নয়।' হায়! এটা কতই না মর্মান্তিক দৃশ্য! সেই দিন মানুষ তার কলিজার টুকরা এবং নিজের শাখা ও মূলকে এবং সবকিছুকেই মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন সে নিজে বেঁচে যায়! فَصِيلَةٌ -এর একটি অর্থ ধন-সম্পদও করা হয়েছে। মোটকথা, সেই দিন মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে প্রিয় হতে প্রিয়তম জিনিসকেও মুক্তিপণ হিসেবে আন্তরিকভাবে দিতে চাইবে। কিন্তু কোন জিনিসই উপকারে আসবে না। কোন বিনিময় ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। বরং ঐ আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে যা হবে লেলিহান শিখাযুক্ত এবং ভীষণভাবে প্রজ্বলিত। তা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। অস্থিকে করে দিবে মাংস শূন্য। শিরাগুলোকে করে দিবে নিষ্কাষিত, পদনালী হয়ে যাবে কর্তিত, চেহারাকে করে দিবে কুৎসিত ও বিবর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দিবে, অস্থি হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। এই আগুন সুন্দর ভাষায় ও উচ্চস্বরে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। যে মুখেও অস্বীকার করতো এবং দৈহিক দিক থেকেও আমল পরিত্যাগ করতো। যে মাল শুধু জমা করেই রাখতো এবং আল্লাহ তা'আলার জরুরী নির্দেশের ক্ষেত্রে তা খরচ করতো না। এমনকি যাকাতও আদায় করতো না।

হাদীসে রয়েছেঃ "মাল পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখো না, অন্যথায় আল্লাহ্ও (পাপ) পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রাখবেন।" হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উকায়েম (রঃ) এই হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে থলের মুখ বন্ধই করতেন না। ইমাম বসরী (রঃ) বলেনঃ "হে আদম সন্তান! আল্লাহ্ তা'আলার ভীতি-প্রদর্শনমূলক কথা শোনার পরেও মাল পুঞ্জীভূত করে রাখছো? হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) وَجَمَعَ فَاَوْعٰى -এর অর্থ করেনঃ মাল পুঞ্জীভূত করার ব্যাপারে সে হালাল হারামের কোন পরোয়া করতো না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ সত্ত্বেও খরচ করতো না।

১৯। মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে	١٩- إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ○
২০। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় হা-হুতাশকারী।	٢٠- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ○
২১। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ;	٢١- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ○
২২। তবে নামাযীরা ব্যতীত,	٢٢- إِلَّا الْمُصَلِّينَ ○
২৩। যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান,	٢٣- الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ○
২৪। আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে	٢٤- وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ○
২৫। প্রার্থী ও বঞ্চিতের,	٢٥- لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ○
২৬। এবং কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।	٢٦- وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ○
২৭। আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত	٢٧- وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ○
২৮। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না–	٢٨- إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ○
২৯। এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,	٢٩- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ○
৩০। তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না–	٣٠- إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ○

৩১। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী,	٣١- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ○
৩২। এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,	٣٢- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ○
৩৩। আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল,	٣٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۙ○
৩৪। এবং নিজেদের নামাযে যত্নবান–	٣٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ؕ○
৩৫। তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে।	٣٥- اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ؕ○ ع

এখানে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা বড়ই অসহিষ্ণু ও অস্থির চিত্ত। যখন কোন বিপদে পড়ে তখন বড়ই হা-হুতাশ করতে থাকে এবং নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে, যখন কোন কল্যাণ লাভ করে ও অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ। আল্লাহ তা'আলার হকের কথাও তখন সে ভুলে যায়।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষের নিকৃষ্টতম জিনিস হলো অত্যন্ত কৃপণতা ও চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা।"[১]

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ তবে হ্যাঁ, এই নিন্দনীয় স্বভাব হতে তারাই দূরে রয়েছে যাদের উপর আল্লাহ্র বিশেষ রহমত রয়েছে এবং যারা চিরন্তনভাবে কল্যাণের তাওফীক লাভ করেছে। যাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি বড় গুণ এই যে, তারা পুরোপুরিভাবে নামায কায়েম করে থাকে। তারা নামাযের সময়ের প্রতি যত্নবান থাকে। ফরয নামায তারা ভালভাবে আদায় করে। নিজেদের নামাযে তারা নম্রতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি সুনানে আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে।" (২৩ ঃ ১-২) আরবরা বদ্ধ ও হরকতবিহীন পানিকেও مَاءٌ دَائِمٌ বলে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে ইতমীনান বা স্থিরতা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ধীরে সুস্থে ও স্থিরতার সাথে রুকূ'-সিজদাহ্ আদায় করে না সে তার নামাযে সদা নিষ্ঠাবান নয়। কেননা, সে নামাযে স্থিরতা প্রকাশ করে না, বরং কাকের মত ঠোকর মারে। সুতরাং তার নামায তাকে মুক্ত করাবে না বা পরিত্রাণ লাভে সহায়তা করবে না। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ভাল আমলকে বুঝানো হয়েছে যা স্থায়ী হয়। যেমন সহীহ্ হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্র নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা চিরস্থায়ী হয়, যদিও তা অল্প হয়।" অন্য শব্দে রয়েছেঃ "যার উপর আমলকারী স্থায়ীভাবে থাকে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন আমল করতেন তখন তার উপর চিরস্থায়ী থাকতেন (অর্থাৎ কখনো ঐ আমল পরিত্যাগ করতেন না।)

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ -এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত দানইয়াল (আঃ) উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ "তারা এমন নামায পড়বে যে, যদি হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এরূপ নামায পড়তো তবে তারা ডুবে মরতো না। আ'দ সম্প্রদায়ের এরূপ নামায হলে তাদের উপর দিয়ে অকল্যাণকর বায়ু প্রবাহিত হতো না। সামূদ সম্প্রদায় এরূপ নামায পড়লে তাদেরকে ভীষণ চীৎকারের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হতো না। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা ভালভাবে নামাযের পাবন্দ হয়ে যাও। এটা মু'মিনদের জন্যে উত্তম চরিত্র (গত গুণ)।"

মহান আল্লাহ্ এরপর বলেনঃ যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের। سَائِل ও مَحْرُوْم এর পূর্ণ তাফসীর সূরা যারিয়াতে গত হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ এ লোকগুলো কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে। এ কারণেই তারা এমন সব আমল করে যাতে পুরস্কার লাভ করবে এবং আযাব হতেও পরিত্রাণ পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আরো গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে, যে শাস্তি হতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ভয় থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নিরাপত্তা দান করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা।

আর এ লোকগুলো নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের পত্নী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। এ দু'টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -এর মধ্যে গত হয়েছে।

এরা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আত্মসাৎ করে না ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। এগুলো হলো মু'মিনদের গুণাবলী। আর যারা এদের বিপরীত আমল করে তারা মুনাফিক। যেমন সহীহ্ হাদীসে এসেছেঃ "মুনাফিকের লক্ষণ বা নিদর্শন তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানত রাখা হলে তা আত্মসাৎ করে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কখনও কোন অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। আর ঝগড়া করলে গালি দেয়।

তারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল। অর্থাৎ তাতে কম বেশী করে না ও সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে পালিয়েও যায় না। তারা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কিছুই গোপন করে না। যারা তা গোপন করে তাদের অন্তর পাপী।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তারা তাদের নামাযে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ সময় মত ওয়াজিব ও মুসতাহাব পূর্ণভাবে বজায় রেখে নামায পড়ে। এ কথাটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই জান্নাতীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক শুরুতেও নামাযের উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দ্বীনের কার্যসমূহে নামাযের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটা আদায় করা অত্যন্ত জরুরী এবং এর হিফাযত করা একান্ত কর্তব্য। সূরা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -এর মধ্যে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। ওখানে আল্লাহ্ পাক এসব বিশেষণ বর্ণনা করার পর বলেছেনঃ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ـ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে।" (২৩ ঃ ১০-১১) আর এখানে বলেছেনঃ তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যবস্তু পেয়ে তারা আনন্দিত হবে এবং মহাসম্মান লাভ করবে।

৩৬। কাফিরদের হলো কি যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে

٣٦- فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

৩৭। দক্ষিণ ও বাম দিক হতে, দলে দলে?

٣٧- عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

٣٨- اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

৩৯। না, তা হবে না, আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

٣٩- كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪০। আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি সক্ষম—

٤٠- فَلَاۤ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝

৪১। তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে এবং এতে আমি অক্ষম নই।

٤١- عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

৪২। অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

٤٢- فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

৪৩। সে দিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে যে, তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে—

٤٣- يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۝

৪৪। অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

٤٤- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ○

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ ঐ কাফিরদের উপর অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল, স্বয়ং তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল এবং তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের সামনেই ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁকে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে তাঁর দিকে ছুটে আসছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ـ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ـ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ـ

অর্থাৎ "তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত ত্রস্ত গর্দভ– যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।"(৭৪ ঃ ৪৯-৫১) অনুরূপভাবে এখানেও বলেনঃ এই কাফিরদের কি হলো যে, তারা ঘৃণা ভরে তোমার নিকট হতে সরে যাচ্ছে? কেন তারা ডানে বামে ছুটে চলছে? তারা বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে এর কারণ কি? হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রবৃত্তির উপর আমলকারীদের সম্পর্কে এ কথাই বলেন যে, তারা আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণকারী হয়ে থাকে এবং তারা পরস্পরও একে অপরের বিরোধী হয়ে থাকে। হ্যাঁ, তবে কিতাবুল্লাহ্র বিরোধিতায় তারা সব একমত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আওফীক (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তারা বেপরোয়া ভাবে ডানে-বামে হয়ে তোমাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, অর্থ হলোঃ তারা ডানে-বামে হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেঃ এ লোকটি কি বলেছে? হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, তারা দলবদ্ধভাবে ডানে-বামে হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চতুর্দিকে ফিরতে থাকে। না তাদের কিতাবুল্লাহ্র উপর চাহিদা আছে, না রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি কোন আগ্রহ আছে।

হযরত জাবির ইবনে সামরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জনগণকে বিচ্ছিন্নভাবে দলে দলে আসতে দেখে বলেনঃ "আমার কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে এভাবে দলে দলে আসতে দেখছি?"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? না, তা হবে না। অর্থাৎ তাদের অবস্থা যখন এই যে, তারা আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (সঃ) হতে ডানে-বামে বক্র হয়ে চলছে তখন তাদের এ চাহিদা কখনো পুরো হতে পারে না। বরং তারা জাহান্নামী দল।

এখন তারা যেটাকে অসম্ভব মনে করছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ তাদের নিজেদেরই অবগতি ও স্বীকারুক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছেঃ আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে। তা এই যে, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি দুর্বল পানি হতে। তাহলে তিনি কি তাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারবেন না? যেমন তিনি বলেনঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ

অর্থাৎ "আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট পানি হতে সৃষ্টি করিনি?"(৭৭ঃ ২০)

আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ - اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ - يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ - فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ -

অর্থাৎ "সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক যে, তাকে কি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে। নিশ্চয়ই তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান। যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে সেই দিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।" (৮৬ ঃ ৭-১০)

এখানে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ শপথ ঐ সত্তার যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম নির্ধারণ করেছেন এবং তারকারাজির গোপন হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যা ধারণা করছো ব্যাপার তা নয় যে, হিসাব-কিতাব হবে না এবং হাশর-নশরও হবে না। এসব অবশ্যই সংঘটিত হবে। এজন্যেই কসমের পূর্বে তাদের বাতিল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং এটাকে এমনভাবে সাব্যস্ত করেন যে, নিজের পূর্ণ শক্তির বিভিন্ন নমুনা তাদের সামনে পেশ করেন। যেমন

আসমান ও যমীনের প্রাথমিক সৃষ্টি এবং এই দু'টির মধ্যে প্রাণীসমূহ, জড় পদার্থ এবং বিভিন্ন নিয়ামতের বিদ্যমানতা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ "অবশ্যই মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করাই বড় ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।"(৪০ ঃ ৫৭)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বৃহৎ হতে বৃহত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টি করতে কেন সক্ষম হবেন না? অবশ্যই তিনি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেনঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন না? হ্যাঁ অবশ্যই তিনি সব কিছুরই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (৪৬ ঃ ৩৩)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ـ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

অর্থাৎ "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি ওকে বলেনঃ 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।"(৩৬ ঃ ৮১-৮২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি তাদের এই দেহকে, যেমন এখন এটা রয়েছে, এর চেয়েও উত্তম আকারে পরিবর্তিত করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান কোন জিনিস, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ـ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ـ

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবো না? বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পূনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।"(৭৫ঃ ৩-৪) আরো বলেনঃ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ـ عَلَى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমার স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না।" (৫৬ঃ ৬০-৬১)

সুতরাং عَلَى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ -এর একটি ভাবার্থ তো এটাই যা উপরে বর্ণিত হলো। আর দ্বিতীয় ভাবার্থ, যা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন তা হলোঃ নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে, যারা হবে আমার পূর্ণ অনুগত, যারা আমার অবধ্যাচরণ করবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ـ

অর্থাৎ "যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।"(৪৭ ঃ ৩৮) তবে প্রথম ভাবার্থটিই বেশী প্রকাশমান। কেননা এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে যে, তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে অবনত নেত্রে। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। এটা হলো দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য হতে সরে পড়া ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ফল। আর এটা হলো ঐ দিন যা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে এবং নবী (সঃ)-কে, শরীয়তকে ও আল্লাহর কালামকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উপহাসের ছলে বলা হচ্ছেঃ কিয়ামত কেন সংঘটিত হচ্ছে না? আর কেনই বা আমাদের উপর শাস্তি আপতিত হয় না?

সূরাঃ মা'আরিজ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ নূহ্, মাক্কী
(আয়াত ঃ ২৮, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا : ٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নূহ (আঃ)-কে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশসহঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে।

١- اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২। সে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়। আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী–

٢- قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৩। এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর;

٣- اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

৪। (তাহলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা এটা জানতে!

٤- يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি হযরত নূহ (আঃ)-কে স্বীয় রাসূল রূপে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, শাস্তি আসার পূর্বেই তিনি যেন তাঁর কওমকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, যদি তারা তাওবা করে ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আল্লাহ তাদের উপর হতে আযাব উঠিয়ে নিবেন। হযরত নূহ (আঃ) তখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর এই পয়গাম

পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিলেনঃ জেনে রেখো যে, আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করছি। আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলছি যে, তোমাদের অবশ্যকরণীয় কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁকে ভয় করে চলা এবং আমার আনুগত্য করা। আর যে কাজ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে অবৈধ করেছেন সে কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। পাপের কাজ হতে তোমরা দূরে থাকবে। যে কাজ আমি তোমাদেরকে করতে বলবো তা করবে এবং যে কাজ হতে আমি বিরত থাকতে বলবো তা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। আর তোমরা আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিবে। এসব কাজ যদি তোমরা কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিবাচকের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো مِنْ অতিরিক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরবদের قَدْ كَانَ مِنْ مَّطَرٍ এই উক্তির মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটা عَنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এ উক্তিও রয়েছে যে, مِنْ এখানে تَبْعِيض বা 'কতক' বুঝাবার জন্যে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কতক গুনাহ মাফ করে দিবেন। অর্থাৎ ঐ গুনাহ যার উপর শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। যদি তোমরা এ তিনটি কাজ কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের এসব বড় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের যেসব পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন ঐ ধ্বংসাত্মক শাস্তি তিনি সরিয়ে দিবেন। আর তিনি তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য, সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে প্রকৃতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিতকরণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ভাল কাজ কর আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই। কেননা, আযাব এসে পড়লে কেউ তা সরাতে পারবে না এবং স্থগিত রাখতেও পারবে না। ঐ মহান এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবকিছুকেই অধীনস্থ করে রেখেছে। তাঁর ইযযত ও মর্যাদার সামনে সমস্ত সৃষ্টজীব অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

৫। সে বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র আহ্বান করছি,

٥- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّ نَهَارًا ۙ

৬। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

٦- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْۤ اِلَّا فِرَارًا

৭। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও যিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

٧- وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ

৮। অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে,

٨- ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

৯। পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।

٩- ثُمَّ اِنِّىْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ

১০। বলেছিঃ তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল,

١٠- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ

১১। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

١١- يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ

১২। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদীনালা।

١٢- وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ

١٣- مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ○

১৩। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না?

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ○

১৪। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে,

١٥- اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○

১৫। তোমরা লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

١٦- وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○

১৬। এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে?

١٧- وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ○

১৭। তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে

١٨- ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ○

১৮। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন,

١٩- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ○

১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত–

٢٠- لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○ ع

২০। যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তাঁর সম্প্রদায় কিভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় এবং কিভাবে নিজেদের যিদের উপর আঁকড়ে থাকে! হযরত নূহ (আঃ) অভিযোগের সূরে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে আরয করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আদেশকে পুরোপুরিভাবে পালন করে চলেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আপনার পথে

আহ্বান করছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যতই আমি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে পুণ্যের দিকে আহ্বান করছি, ততই তারা আমার নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয় যাতে আমার কথা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। আর তারা আমা হতে বিমুখ হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও যিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরায়েশ কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ "কাফিররা বলেঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং এটা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।"(৪১ঃ২৬) হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম তাদের কানে অঙ্গুলীও দেয় এবং সাথে সাথে বস্ত্র দ্বারা নিজেদের চেহারা আবৃত করে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তারা কিছু যেন শুনতেও না পায়। তারা হঠকারিতা করে কুফরী ও শিরকের উপর কায়েম থাকে এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি, বরং তা হতে বেপরোয়া হয়ে অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতঃ বিমুখ হয়ে যায়।

হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে সাধারণ মজলিসেও প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক এক করে পৃথক পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি। মোটকথা, তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্যে আমি কোন কৌশলই ছাড়িনি, এই আশায় যে, হয় তো তারা সত্যের পথে আসবে। তাদেরকে আমি বলেছিঃ কমপক্ষে তোমরা পাপকার্য হতে তাওবা কর, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি তাওবাকারীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, বরং দুনিয়াতেও তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যখনই ইসতিসকার নামাযের জন্যে বের হবে তখন ঐ নামাযে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্তাহাব। এর একটি দলীল হলো এই আয়াতটিই। দ্বিতীয় দলীল হলো এই যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর আমলও এটাই ছিল। তিনি একবার বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ

করেন এবং খুব বেশী বেশী ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইস্তিগফারের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন। ওগুলোর মধ্যে فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا - يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا - এই আয়াতগুলোও ছিল। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আকাশে বৃষ্টির যতগুলো পথ আছে সবগুলো হতে আমি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি অর্থাৎ ঐ সব হুকুম পালন করেছি যা হতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন।"

হযরত নূহ (আঃ) আরো বলেনঃ হে আমার কওমের লোক সকল! যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর নিকট তাওবা কর ও তাঁর আনুগত্য কর তবে তিনি অধিক পরিমাণে জীবিকা দান করবেন, আকাশের বরকত হতে তোমাদের জন্যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। আর তোমাদের জন্তুগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাদেরকে সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধ করে দেয়া হবে এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। তোমাদের জন্যে স্থাপন করা হবে উদ্যান, যার বৃক্ষগুলো হবে ফলে ভরপুর। আর তিনি প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্যে নদী-নালা।

এই ভোগ্যবস্তুর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর হযরত নূহ (আঃ) তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেনঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? তাঁর আযাব হতে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকছো কেন? তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য করছো না? প্রথমে শূক্র, তারপর জমাট রক্ত, এরপর গোশতের টুকরা, এরপর অস্থি-পঞ্জর, তারপর অন্য আকার এবং অন্য অবস্থা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলোর আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে যে, গতিশীল বড় বড় সাতটি নক্ষত্র বা গ্রহ রয়েছে, যেগুলোর একটি অপরটিকে আলোহীন করে দেয়। দুনিয়ার আকাশে সবচেয়ে নিকটে রয়েছে চন্দ্র, যা অন্যগুলোকে জ্যোতিহীন করে থাকে।

দ্বিতীয় আকাশে রয়েছে 'আতারিদ'। তৃতীয় আকাশে আছে যুহরা। চতুর্থ আকাশে সূর্য রয়েছে। পঞ্চম আকাশে রয়েছে মিররীখ। ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে 'মুশতারী' এবং সপ্তম আকাশে যাহ্ল রয়েছে। আর অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলো, যেগুলো হলো 'সাওয়াবিত' বা স্থির, অষ্টম আকাশে রয়েছে যেটাকে মানুষ 'ফালাকে সাওয়াবিত বলে থাকে। ওগুলোর মধ্যে যেগুলো শারাবিশিষ্ট ওগুলোকে 'কুরসী' বলে থাকে। আর নবম ফালাক হলো তাদের নিকট ইতাস বা আসীর। তাদের নিকট এর গতি অন্যান্য ফালাকের বিপরীত। কেননা, এর গতি অন্যান্য গতির সূচনাকারী। এটা পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে চলতে থাকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ফালাক চলে পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিকে। এগুলোর সাথে নক্ষত্রগুলোও চলাফেরা করে। কিন্তু গতিশীলগুলোর গতি ফালাকগুলোর গতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ওগুলো সবই পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে চলে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি স্বীয় শক্তি অনুযায়ী স্বীয় আকাশকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। চন্দ্র প্রতি মাসে একবার প্রদক্ষিণ করে, সূর্য প্রদক্ষিণ করে বছরে একবার, যাহল প্রতি ত্রিশ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। সময়ের কমবেশী হয় আকাশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুপাতে। তাছাড়া প্রত্যেকটির গতিবেগও সমান নয়। এ হলো তাঁদের সমস্ত কথার সারমর্ম যাতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বহু কিছু মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলো এখানে বর্ণনা করতেও চাই না, এবং এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ্ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো একটির উপর আরেকটি, এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দুটোর ঔজ্জ্বল্য ও কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাত্রির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট মনযিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন এক সময়ও আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনিই যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে উজ্জ্বল ও আলোকময় করেছেন এবং চন্দ্রের মনযিল ও কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার, আল্লাহ্ এটাকে সত্যসহই সৃষ্টি করেছেন, তিনি জ্ঞানী ও বিবেকবানদের জন্যে স্বীয় নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকেন।" (১০ঃ ৫)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে। এখানে نَبَاتًا এ مَصْدَر এনে বাক্যটিকে খুবই সুন্দর করে দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ পাক বলেনঃ অতঃপর ওতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা হতেই বের করবেন যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। এটা যেন হেলা-দোলা না করে এ জন্যে এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন। এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফেরা করতে রয়েছো। এদিক হতে ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছো।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হযরত নূহ (আঃ)-এর এটাই যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর ক্ষমতার নমুনা তাঁর কওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ কথাই বুঝাতে চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বরকত দানকারী, সমস্ত জিনিস সৃষ্টিকারী, ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, আহার্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি তাদের উপর এটুকু হক নেই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে? এবং তাঁর কথামত তাঁর নবী (আঃ)-কে সত্য বলে মেনে নিবে? হ্যাঁ, তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করা, তাঁর সমকক্ষ কাউকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তাঁর স্ত্রী নেই, সন্তান সন্ততি নেই, মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। বরং তিনি সুউচ্চ ও মহান।

২১। নূহ (আঃ) বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

٢١- قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

২২। আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে।

٢٢- وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ○

২৩। এবং বলেছিলঃ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব দেবীকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়াআ', ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসরকে।

٢٣- وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ○

২৪। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।

٢٤- وَقَدْ اَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِينَ اِلَّا ضَلٰلًا ○

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর অতীতের অভিযোগের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলার সামনে স্বীয় সম্প্রদায়ের আরেকটি আচরণের কথাও তুলে ধরে বলেছিলেনঃ আমার আহ্বান যেন তাদের কানেও না পৌঁছে এ জন্যে তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়েছিল, অথচ এটা ছিল তাদের জন্যে খুবই উপকারী। তারা আমার অনুসরণ না করে অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। কেননা, এই ধন-মাল ও সন্তান সন্ততির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা আল্লাহকেও ভুলে বসেছিল এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল। وَلَدُهٗ -এর অন্য পঠন وَلَدُهٗ রয়েছে।

কাফিরদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ছিল তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল। كُبَّار ও كِبَار দুটোই كَبِيْر -এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ খুব বড়। কিয়ামতের দিনও তারা এ কথাই বলবেঃ

بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَامُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا ـ

অর্থাৎ "বরং দিন রাত তোমাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ ছিল এই যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর সাথে কুফরী করার ও তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করার নির্দেশ দিতে।" (৩৪ঃ ৩৩) তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলেঃ তোমরা তোমাদের যে দেব-দেবীগুলোর পূজা করতে রয়েছো ওগুলোকে কখনও পরিত্যাগ করো না।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের প্রতিমাগুলোকে আরবের কাফিররা গ্রহণ করে। দুমাতুল জানদালে কালব গোত্র ওয়াদ প্রতিমার পূজা করতো। হুযায়েল গোত্র পূজা করতো সূওয়া নামক প্রতিমার। মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অধিবাসী বানু গাতীফ গোত্র ইয়াগূস নামক প্রতিমার উপাসনা করতো। হামাদান গোত্র ইয়াউক নামক প্রতিমার পূজারী ছিল এবং যীকিলার গোত্র হুমায়ের নাসর নামক প্রতিমার পূজা করতো। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুললো যে, ঐ সৎ লোকদের উপাসনালয়ে তাঁদের স্মারক হিসেবে কোন নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা তথায় কয়েকটি নিশান স্থাপন করে ও প্রত্যেকের নামে নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে। তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ সৎলোকদের পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইলম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ ঐ জায়গাগুলোর ও ঐ নামগুলোর নিদর্শন সমূহের পূজা শুরু করে দেয়। হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত ইবনে ইসহাকও (রঃ) একথাই বলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো ছিলেন আল্লাহর ইবাদতকারী, দ্বীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ। তাঁরা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর ছিলেন সত্য অনুসারী, যাঁদের অনুসরণ অন্য লোকেরাও করতো। যখন তাঁরা মারা গেলেন তখন তাঁদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করলোঃ 'যদি আমরা এঁদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে নিই তবে ইবাদতে আমাদের ভালভাবে মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।' সুতরাং তারা তাই করলো। অতঃপর যখন এ লোকগুলোও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটলো তখন শয়তান তাদের কাছে এসে বললোঃ 'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির পূজা করতো এবং তাদের কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্যে প্রার্থনা করতো। সুতরাং তোমরাও তাই করো!' তারা তখন নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো।

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) হযরত শীষ (আঃ)-এর ঘটনার বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হযরত আদম (আঃ)-এর চল্লিশটি সন্তান ছিল। বিশটি ছিল পুত্র এবং বিশটি ছিল কন্যা। তাদের মধ্যে যারা বেশী বয়স পেয়েছিল তারা হলো হাবীল, কাবীল, সালিহ এবং আব্দুর

রহমান, যাঁর প্রথম নাম ছিল আবদুর হারিস এবং ওয়াদ। তাঁকে শীষ ও হিব্বাতুল্লাহও বলা হতো। সমস্ত ভাই তাঁকেই নেতৃত্ব দান করেছিল। সুওয়াআ, ইয়াগূস, ইয়াঊক এবং নাসার এই চারজন ছিলেন তাঁরই পুত্র।

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর রোগের সময় তাঁর পাঁচটি ছেলে ছিলেন। তাঁরা হলেন ওয়াদ, ইয়াঊক, ইয়াগূস, সূওয়াআ এবং নাসর। এঁদের মধ্যে ওয়াদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় ও সবচেয়ে সৎ।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, আবূ জা'ফর (রঃ) নামায পড়ছিলেন এবং জনগণ ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লিবের সম্পর্কে আলোচনা করে। নামায শেষ করার পর তিনি বলেনঃ তোমরা ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব সম্পর্কে আলোচনা করছো? সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে এমন জায়গায় হত্যা করা হয় যেখানে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর ইবাদত করা হয়। অতঃপর একজন মুসলমান সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যিনি তাঁর কওমের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন। যখন তিনি মারা গেলেন তখন জনগণ তাঁর কবরের চারদিকে বসে পড়লো এবং তাদের মধ্যে কান্নার রোল উঠলো। তাঁর মৃত্যু তাদের কাছে বড়ই বিপদের কারণ হয়ে গেল। অভিশপ্ত শয়তান তাদের এই অবস্থা দেখে মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট আগমন করে এবং তাদেরকে বলেঃ "এই বুযুর্গ ব্যক্তির কোন স্মারক স্থাপন করছো না কেন? যা সদা-সর্বদা তোমাদের সামনে থাকবে এবং তোমরা তাঁকে ভুলবে না?" সবাই এই প্রস্তাব পছন্দ করলো। অতঃপর শয়তান ঐ বুযুর্গ লোকটির প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো। ঐ প্রতিমূর্তি দেখে দেখে ঐ লোকগুলো তাঁকে স্মরণ করতে থাকলো। যখন তারা তাতে মগ্ন হয়ে পড়লো তখন শয়তান তাদেরকে বললোঃ "তোমাদের সকলকেই এখানে আসতে হচ্ছে। এটা তোমাদের জন্যে বড়ই অসুবিধাজনক। কাজেই এটা খুব ভাল হবে যে, আমি তোমাদের জন্যে তাঁর অনেকগুলো মূর্তি তৈরী করে দিচ্ছি। তোমরা ওগুলো নিয়ে গিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে রেখে দিবে।" ঐ লোকগুলো এতেও সম্মত হয়ে গেল এবং ওটা কার্যেও পরিণত হলো। এ পর্যন্ত ঐ মূর্তিগুলো শুধু স্মারক হিসেবেই ছিল। কিন্তু ঐ লোকদের উত্তরসূরীরা সরাসরিভাবে ঐ মূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো। প্রকৃত ব্যাপারটি তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেল এবং নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকেও এর পূজারী মনে করে নিজেরাও এর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির নাম ছিল ওয়াদ এবং ওটাই ছিল প্রথম প্রতিমূর্তি আল্লাহ ছাড়া যার পূজা করা হয়েছিল।

তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। ঐ সময় হতে নিয়ে আজ পর্যন্ত আরব ও অনারবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। হযরত (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা হতে রক্ষা করুন! হে আমার প্রতিপালক! তারা অধিকাংশ লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।"

এরপর হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমের উপর বদ দু'আ করেন। কেননা তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং শত্রুতা চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউন ও তার লোকদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেনঃ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মাল-ধনকে আপনি ধ্বংস করে দিন ও তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিন, সুতরাং তারা যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনয়ন না করে।"(১০ঃ ৮৮)

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রার্থনা কবূল হয়ে যায় এবং তাঁর কওমকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় অগ্নিতে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেনঃ

২৫। তাদের অপরাধের জন্যে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী।

٢٥- مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ○

২৬। নূহ (আঃ) আরো বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক!

٢٦- وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ

পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না।	عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○
২৭। আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।	٢٧- اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○
২৮। হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদেরকে, আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।	٢٨- رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ○

خطيئتهم এর অন্য কিরআত خطاياهم ও রয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ পাপের আধিক্যের কারণে হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর এই আযাব হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেউ এগিয়ে আসেনি এবং তারা তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারীও পায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ)-এর ঐ উক্তি উদ্ধৃত করেন যে উক্তি তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি করেছিলেনঃ

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ

অর্থাৎ "আজ আল্লাহর বিধান হতে রক্ষা করবার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ব্যতীত।"(১১ঃ ৪৩)

হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতাবান ও মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে ঐ হতভাগ্যদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে

কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না। হলো তাই, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এমনকি হযরত নূহ (আঃ)-এর নিজের পুত্র, যে তাঁর থেকে পৃথক ছিল, সেও রক্ষা পায়নি। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর ঐ পুত্রকে অনেক কিছু বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। সে মনে করেছিল যে, পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সে কোন এক উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু ওটা ছিল আল্লাহর আযাব ও গযব এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর বদ দু'আর ফল। কাজেই তা হতে রক্ষা করতে পারবে কে? পানি তাকে ওখানেই ধরে ফেলছে এবং সে তার পিতার চোখের সামনে কথা বলতে বলতে ডুবে মরছে।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি হযরত নূহ এর তূফানের সময় আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি দয়া করতেন তবে তিনি ঐ মহিলাটির উপর দয়া করতেন যে উনানে পানি উথলিয়ে উঠতে দেখে নিজের শিশু সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গিয়েছিল। পানি যখন ওখানেও উঠে গেল তখন সে তার শিশুটিকে কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলো। পানি যখন তার কাঁধ পর্যন্তও উঠে গেল তখন শিশুটিকে সে তার মাথার উপর বসিয়ে নিলো। মাথার উপরেও যখন পানি উঠে গেল তখন সে ছেলেকে হাতে উঠিয়ে নিয়ে মাথার ঊর্ধ্বে উঠালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পানি সেখানেও পৌঁছে গেল এবং মাতা ও সন্তান উভয়েই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। সুতরাং ঐদিন যদি আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের কাফিরদের মধ্য হতে কারো প্রতি দয়া করতেন তবে অবশ্যই ঐ মহিলাটির উপর দয়া করতেন।"[১] মোটকথা যমীনের সমস্ত কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। শুধু ঐ ঈমানদার লোকদেরকে রক্ষা করা হয় যাঁরা হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথে তাঁর নৌকায় ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যাঁদেরকে তাঁর নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত নূহ (আঃ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তাই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার চাহিদা এই যে, সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। যদি আপনি তাদের মধ্য হতে কাউকেও অব্যাহতি দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফিরদের। তাদের পরবর্তী বংশধরগণ তাদের

১. এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল কিন্তু এর বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য।

মতই বদকার ও কাফির হবে। সাথে সাথে তিনি নিজের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে।

ঘর দ্বারা এখানে মসজিদকেও বুঝানো হয়েছে। তবে সাধারণ অর্থ ঘরই বটে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "তুমি মুমিন ছাড়া কারো সঙ্গী হয়ো না এবং আল্লাহভীরু ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়।"[১]

এরপর হযরত নূহ (আঃ) তাঁর দু'আকে সাধারণ করেন এবং বলেনঃ হে আল্লাহ! সমস্ত ঈমানদার নারী পুরুষকেও আপনি ক্ষমা করে দিন, জীবিতই হোক বা মৃতই হোক। এ জন্যেই মুস্তাহাব এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ তার দু'আতে অন্য মু'মিনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। তাহলে হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসরণও করা হবে এবং সাথে সাথে এ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসগুলোর উপর আমলও করা হবে।

এরপর দু'আর শেষে হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন!

সূরাঃ নূহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন, শুধু এই সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাঃ জ্বিন মাক্কী

(আয়াত ঃ ২৮, রুকূ' ঃ ২)

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○

১। বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।

٢- يَّهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ○

২। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করবো না।

٣- وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○

৩। এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

٤- وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ○

৪। এবং যে আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করতো।

٥- وَّأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ○

৫। অথচ আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না।

٦- وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ

৬। আর যে কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো,

يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ○

ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো।

٧- وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ○

৭। আর জ্বিনেরা বলেছিলঃ তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার কওমকে ঐ ঘটনাটি অবহিত কর যে, জ্বিনেরা কুরআন কারীম শুনেছে, সত্য জেনেছে, ওর উপর ঈমান এনেছে এবং ওর অনুগত হয়েছে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলঃ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কুরআন কারীম শুনে নিজেদের কওমের মধ্যে গিয়ে বলেঃ আজ আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করবো। এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতের মতঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ -

অর্থাৎ "যখন আমি জ্বিনদের একটি দলকে তোমার নিকট প্রেরণ করেছিলাম, যেন তারা কুরআন শ্রবণ করে।" (৪৬-২৯) এর তাফসীর হাদীস সমূহের মাধ্যমে আমরা সেখানে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

জ্বিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলেঃ আমাদের প্রতিপালকের কার্য, ক্ষমতা ও নির্দেশ উচ্চ মানের ও বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর নিয়ামতরাজি, শক্তি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উচ্চাঙ্গের। তাঁর মহত্ব ও সম্মান অতি উন্নত। তাঁর যিকর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর মাহাত্ম্য খুবই উন্নত মানের।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ جَدٌّ বলা হয় পিতাকেও। যদি জ্বিনেরা জানতো যে, মানুষের মধ্যেও جَدٌّ রয়েছে তবে তারা আল্লাহর সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করতো না।[১]

১. এ উক্তিটি সনদের দিক দিয়ে সবল হলেও এর অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। সম্ভবতঃ এতে কোন একটা কিছু ছুটে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ঐ জ্বিনেরা তাদের কওমকে আরো বলেঃ আল্লাহ গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান। এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

তারা আরো বলেঃ আমাদের নির্বোধরা অর্থাৎ শয়তানরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ও অপবাদ দেয়। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণও হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর জন্যে স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করে সে নির্বোধ এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে বাতিল আকীদা রাখে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক কথা মুখ থেকে বের করে।

ঐ জ্বিনেরা আরো বলতে থাকেঃ আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারে না। কিন্তু কুরআন পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম যে, এ দু'টি জাতি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

এরপর বলা হচ্ছেঃ জ্বিনদের খুব বেশী বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা দেখতো যে, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেতো তখনই সে বলতোঃ আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জ্বিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা বলার পর সে মনে করতো যে, সে সমস্ত জ্বিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন তারা যখন কোন শহরে যেতো তখন ঐ শহরের বড় নেতার শরণাপন্ন হতো। ফলে ঐ শহরের অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতো না, যদিও তারা তার শত্রু হতো। যখন জ্বিনেরা দেখলো যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে থাকে তখন তাদের ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তারা আরো বেশী বেশী মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠলো। আর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, জ্বিনেরা মানুষের এ অবস্থা দেখে তাদেরকে আরো ভয় দেখাতে শুরু করলো ও তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। প্রকৃতপক্ষে দানবরা মানবদেরকে ভয় করতো, যেমন মানব দানবদেরকে ভয় করতো এবং তার চেয়েও বেশী। এমনকি যে জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে মানব যেতো সেখান থেকে দানবরা পালিয়ে যেতো। কিন্তু যখন থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপন্ন হতে শুরু করলো এবং বলতে লাগলোঃ 'এই উপত্যকার জ্বিন-সরদারের আমরা শরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবে না' তখন থেকে জ্বিনদের সাহস বেড়ে গেল। কারণ তারা মনে করলো যে, মানুষই তো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং তারা নানা প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগলো।

কারদাম ইবনে আবী সায়েব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার সাথে কোন কার্য উপলক্ষে মদীনা হতে বাইরের দিকে যাত্রা শুরু করি। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মক্কায় রাসূলরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। রাত্রিকালে আমরা জঙ্গলে এক রাখালের নিকট অবস্থান করি। অর্ধ রাত্রে একটি নেকড়ে বাঘ এসে ঐ রাখালের একটি বকরী ধরে নিয়ে যায়। রাখালটি বাঘটির পিছনে দৌড় দেয় এবং চীৎকার করে বলতে লাগেঃ "হে এই উপত্যকার আবাদকারী! আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি।" সাথে সাথে একটি শব্দ শোনা গেল, অথচ আমরা কোন লোককে দেখতে পেলাম না। শব্দটি হলোঃ "হে নেকড়ে বাঘ! এ বকরীকে ছেড়ে দাও।" অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, ঐ বকরীটিই পালিয়ে আসলো এবং যুথে এসে মিলিত হয়ে গেল। সে একটু যখমও হয়নি। এটার পরিপেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেনঃ কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় গ্রহণ করতো, ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো।[১]

হতে পারে যে, নেকড়ে বাঘের রূপ ধরে জ্বিনই এসেছিল, যে বকরীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং এদিকে ঐ রাখালটির দোহাইতে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে রাখালের এবং তার মুখে শুনে অন্যান্য লোকদেরও এ বিশ্বাস জন্মে যে, জ্বিনদের আশ্রয়ে আসলে বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। এভাবে জ্বিন মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দ্বীন হতে সরিয়ে দিতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসলমান জ্বিনগুলো তাদের কওমকে আরো বললোঃ হে জ্বিনদের দল! তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না। অথবা এই অর্থ হবেঃ তোমাদের মত মানুষও মনে করতো যে, আল্লাহ্ কাউকেও রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন না।

৮। এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

٨- وَّاَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰهَا مُلِئَتۡ حَرَسًا شَدِیۡدًا وَّ شُهُبًا ۙ○

---

১. এটা ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৯। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্যে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

৯- وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

১০। আমরা জানি না যে, জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।

١٠- وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَـــرٌّ اُرِيْدَ بِـمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِـهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বি'সাতের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন জায়গায় বসে পড়তো এবং কান লাগিয়ে এবং একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদেরকে বলতো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পয়গম্বর রূপে পাঠানো হলো এবং তাঁর উপর কুরআন কারীম নাযিল হতে শুরু হলো তখন আকাশের উপর কঠোর প্রহরী বসিয়ে দেয়া হলো ঐ শয়তানদের পূর্বের মত সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলো না। যাতে কুরআন কারীম ও গণকদের কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে যায় এবং সত্যের সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়।

ঐ মুসলমান জ্বিনগুলো তাদের সম্প্রদায়কে বলেঃ পূর্বে তো আমরা আকাশের উপর বসে পড়তাম। কিন্তু এখন তো দেখা যায় যে, তথায় কঠোর প্রহরী বসে রয়েছে! তারা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে! এর প্রকৃত রহস্য যে কি তা আমাদের জানা নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ জগদ্বাসীর মঙ্গলই চান, না তাদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত তা আমরা বলতে পারি না।

ঐ মুসলমান জ্বিনদের আদব-কায়দা লক্ষ্যণীয় যে, তারা অমঙ্গলের সম্বন্ধের জন্যে কোন কর্তা উল্লেখ করেনি, কিন্তু মঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সাথে লাগিয়েছে এবং বলেছেঃ এই প্রহরী নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা জানি না। অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এসেছেঃ "অমঙ্গল ও অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।" ইতিপূর্বেও মাঝে মাঝে তারকা নিক্ষিপ্ত হতো, কিন্তু এতো

অধিকভাবে নয়। যেমন হাদীসে হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে একটি তারা নিক্ষিপ্ত হলো এবং আলো বিচ্ছুরিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা এটা সম্পর্কে কি বলতে?" আমরা উত্তরে বললামঃ আমরা বলতাম যে, কোন মহান ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে এরূপ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "না, তা নয়। বরং যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফায়সালা করেন (তখন এরূপ হয়ে থাকে)।" সূরা সাবার তাফসীরে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারকা খুববেশী নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হলো ওগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে ধ্বংস করা ও আকাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেন তারা আকাশের খবর নেয়া হতে বঞ্চিত হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জ্বিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করলো যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং তাদের একটি দল আরবে আসলো এবং সেখানে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফজরের নামাযে কুরআন কারীম পাঠরত অবস্থায় পেলো। তারা তখন বুঝতে পারলো যে, এই নবী (সঃ)-এর বি'সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের আকাশে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ। অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান জ্বিনগুলো তো মুসলমান হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট জ্বিনদের ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ হলো না। সূরা আহকাফের وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ - (৪৬ ঃ ২৯) এই আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছে।

নক্ষত্ররাজির ঝরে পড়া এবং আকাশ সুরক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র জ্বিনদের জন্যেই নয়, বরং মানুষের জন্যেও এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল এবং অপেক্ষমান ছিল যে, দেখা যাক কি ফল হয়। আর সাধারণতঃ নবীদের (আঃ) আগমন এবং আল্লাহর দ্বীন জয়যুক্ত হওয়ার সময় এরূপ হয়েও থাকতো।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, শয়তানরা ইতিপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলোচনা শুনতো। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন এক রাত্রে শয়তানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হলো, যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়লো যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। তারা লক্ষ্য করলো যে, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলো ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামগুলো

আযাদ করতে এবং পশু আল্লাহর পথে চেড়ে দিতে শুরু করলো। পরিশেষে আবদে ইয়ালীল ইনে আমর ইবনে উমায়ের তাদেরকে বললোঃ "হে তায়েফবাসী! তোমাদের মালগুলো তোমরা ধ্বংস করছো কেন? তোমরা নক্ষত্রগুলোকে গণে পড়ে দেখো। যদি তারকাগুলোকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তবে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইবনে আবী কাবশা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্যেই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তবে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।" তারা তখন নক্ষত্রগুলো গণে পড়ে দেখলো এবং দেখতে পেলো যে, তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হলো এবং শয়তানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি শুনালো। ইবলীস তখন তাদেরকে বললোঃ তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট মাটি নিয়ে এসো।" তারা তার নিকট মাটি নিয়ে আসলো। সে মাটি শুঁকলো এবং বললোঃ "এর হেতু মক্কায় রয়েছে।" নাসীবাইনের সাতজন জ্বিন মক্কায় পৌঁছলো। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে হারামে নামায পড়াচ্ছিলেন এবং কুরআন কারীম পাঠ করছিলেন। কুরআন শুনে ঐ জ্বিনদের অন্তর কোমল হয়ে যায়। আরো নিকটে গিয়ে তারা শুনতে থাকে এবং এতে মুগ্ধ হয়ে তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজেদের কওমকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়।

আমরা এই পূর্ণ ঘটনাটি পুরোপুরিভাবে 'কিতাবুসসীরাত'-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের সূচনার বর্ণনায় লিখে দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

১১- وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ○

১১। এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।

১২- وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ○

১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না।

১৩- وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى

১৩। আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে

امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ○

আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না।

١٤- وانا منا المسلمون ومنا القسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا ○

১৪। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিত ভাবে সত্যপথ বেছে নেয়।

١٥- واما القسطون فكانوا لجهنم حطبا ○

১৫। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

١٦- وان لو استقاموا على الطريقة لاسقينهم ماء غدقا ○

১৬। তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে তাদেরকে আমি অবশ্যই প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।

١٧- لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ○

১৭। যদদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জ্বিনেরা নিজেদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেঃ আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক রয়েছে দুষ্কৃতিকারী। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।

হযরত আ'মাশ (রঃ) বলেনঃ "একটি জ্বিন আমাদের কাছে আসতো। আমি একদা তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে উত্তরে বললোঃ "চাউল।" আমি তাকে চাউল এনে দিলাম। তখন দেখলাম যে, খাদ্যগ্রাস ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কাউকেও দেখা

যাচ্ছে না। আমি তাকে প্রশ্ন করলামঃ আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিলোঃ "হ্যাঁ, রয়েছে।" আমি তাকে আবার প্রশ্ন করলামঃ রাফেযী সম্প্রদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে বললোঃ "তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হয়।"[১]

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্বাস ইবনে আহমাদ দামেশকী (রঃ) বলেনঃ আমি রাত্রিকালে একটি জ্বিনকে নিম্নলিখত শ্লোকগুলো পড়তে শুনেছিঃ

قُلُوْبٌ بَرَاهَا الْحُبُّ حَتّٰى تَعَلَّقَتْ * مَذَاهِبُهَا فِىْ كُلِّ غَرْبٍ وَّشَارِقٍ

تَهِيْمُ بِحُبِّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَبُّهَا * مُعَلَّقَةٌ بِاللّٰهِ دُوْنَ الْخَلَائِقِ

অর্থাৎ "অন্তর আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণ হয়ে গেছে, এমনকি পূর্বে ও পশ্চিমে ওর মূল বা ঝড় গেড়ে বসেছে। সে উদ্বিগ্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে আল্লাহর প্রেমে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে, যে আল্লাহ তার প্রতিপালক। সে সৃষ্টজীব হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।"

এরপর জ্বিনদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না। কোনক্রমেই তাঁকে অপারগ করা সম্ভব নয়।

অতঃপর গৌরব প্রকাশ করে জ্বিনগুলো বলেঃ আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর এটা গৌরব প্রকাশেরই স্থান বটে। এর চেয়ে বড় ফযীলত ও মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর কালাম শোনা মাত্রই তা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং সাথে সাথেই তারা ঈমান আনলো?

এরপর তারা বলেঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ـ

অর্থাৎ "সৎকর্মপরায়ণ ও মুমিন ব্যক্তির কোন যুলুম ও ক্ষতির আশংকা থাকবে না।"(২০ ঃ ১১২)

১. হাফিজ আবুল হাজ্জাজ মুযানী (রঃ) বলেন যে, এর সনদ বিশুদ্ধ।

তারপর ঐ জ্বিনেরা আরো বলেঃ আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী তারা তো হবে জাহান্নামেরই ইন্ধন।

وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا - لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ -

এর দুটি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলোঃ যদি সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর, সোজা-সঠিক পথের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো তবে আমি তাদের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করতাম এবং তাদের জীবিকায় প্রশস্ততা ও স্বচ্ছলতা দান করতাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

অর্থাৎ "যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, সঠিকভাবে কায়েম করতো এবং ভালভাবে মেনে চলতো তবে তারা তাদের উপর হতে ও নীচ হতে অর্থাৎ আসমান হতে ও যমীন হতে জীবিকা লাভ করতো।"(৫ঃ ৬৬) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ "যদি গ্রামবাসী ঈমান আনতো ও ভয় করতো তবে আমি তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত খুলে দিতাম।"(৭ ঃ ৯৬)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ যদদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, কে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত মক্কার কুরায়েশ কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, তখন তারা দীর্ঘ সাত বছরের দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ যদি তারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো তবে আমি তাদের উপর জীবিকার দরযা খুলে দিতাম, যাতে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شئ حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنهم بغتة فاذا هم مبلسون ـ

অর্থাৎ "যখন তারা ভুলে বসলো, যে নসীহত তাদেরকে করা হয়েছিল, তখন আমি তাদের উপর সবকিছুরই দরযা খুলে দিলাত, শেষ পর্যন্ত যখন তারা আনন্দে বিভোর হয়ে পড়লো তাদেরকে দেয়া সুখ সামগ্রীর কারণে তখন আকস্মিকভাবে আমি তাদের পাকড়াও করলাম, ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়লো।"(৬ ঃ ৪৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ـ نسارع لهم في الخيرت بل لا يشعرون ـ

অর্থাৎ "তারা কি ধারণা করে যে, আমি যে তাদের মাল ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করছি, এটা তাদের কল্যাণ সাধন করছি? (না, তা কখনো নয়) বরং তারা বুঝে না।"(২৩ ঃ ৫৫-৫৬)

এরপর বলা হচ্ছেঃ যে কেউ তার প্রতিপালকের যিকির হতে বিমুখ হয়, তার প্রতিপালক তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, صعد হলো জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। আর হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

১৮। এবং এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্যে। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না।

١٨- وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ○

১৯। আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকবার জন্যে দণ্ডায়মান হলো তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।

١٩- وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ○ ع

২০। বলঃ আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং

٢٠- قل انما ادعوا ربي

তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না।	وَلَا اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ○
২১। বলঃ আমি তোমাদের ইষ্ট অনিষ্টের মালিক নই।	٢١- قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ○
২২। বলঃ আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাবো না।	٢٢- قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○
২৩। শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।	٢٣- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ○
২৪। যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।	٢٤- حَتّٰۤی اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদতের জায়গাকে শির্ক হতে পবিত্র রাখে, সেখানে যেন অন্য কাউকেও না ডাকে। কাউকেও যেন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শরীক না করে। ইয়াহূদ ও খৃষ্টানরা তাদের গীর্জা ও মন্দিরে গিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করতো। তাই এই উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন এরূপ না করে, বরং নবী (সঃ) এবং উম্মত সবাই যেন একত্ববাদী হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় শুধু মসজিদে আকসা ও মসজিদে হারামই বিদ্যমান ছিল। হযরত আ'মাশ (রঃ)

এই আয়াতের তাফসীরে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, জ্বিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তাঁর মসজিদে মানবের সাথে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং তাদেরকে যেন বলা হচ্ছেঃ তোমরা নামায পড়তে পার, কিন্তু তাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যেয়ো না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, জ্বিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আরয করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো দূর দূরান্তে থাকি, সুতরাং আপনার মসজিদে নামায পড়তে আসতে পারি কি করে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "উদ্দেশ্য হলো নামায আদায় করা এবং আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাকা, তা যেখানেই হোক না কেন।" হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি সাধারণ এটা সমস্ত মসজিদকেই অন্তর্ভুক্ত করে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি সিজদার অঙ্গগুলোর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ভাবার্থ হলোঃ যে অঙ্গগুলোর উপর তোমরা সিজদা কর ওগুলো সবই আল্লাহর। সুতরাং তোমাদের এই অঙ্গগুলোর দ্বারা অন্যদেরকে সিজদা করা হারাম।

সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। ওগুলো হলোঃ কপাল, (হাত দ্বারা ইশারা করে তিনি নাককেও কপালের অন্তর্ভুক্ত করেন), দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের পাতা।"

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا -এ আয়াতের একটি ভাবার্থ হলো এই যে, জ্বিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে যখন কুরআন পাঠ শুনলো তখন তারা এমনভাবে আগে আগে বেড়ে চললো যে, যেন একে অপরের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ জ্বিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বললোঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) তার প্রতি আনুগত্যের অবস্থা এই যে, যখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে থাকেন তখন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ও অনুকরণে এমনভাবে লেগে থাকেন যে, যেন একটা বৃত্ত। তৃতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন জনগণের মধ্যে একত্ববাদ ঘোষণা করেন তখন কাফিররা দাঁত কটমট হয়ে এই দ্বীন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং এর আলোকে নির্বাপিত করে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এর বিপরীত, তিনি এই দ্বীনকে সমুন্নত করতে চান। এই তৃতীয় উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। কেননা এর পরেই রয়েছেঃ তুমি বল- আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না।

অর্থাৎ সত্যের আহ্বান ও একত্ববাদের শব্দ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে যার প্রতি তারা বহুদিন হতেই মনঃক্ষুণ্ন ছিল তখন তারা কষ্ট প্রদানে, বিরুদ্ধাচরণে এবং অবিশ্বাসকরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। আর সত্যকে মিটিয়ে দিতে চায় ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শত্রুতার উপর একতাবদ্ধ হয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ আমি আমার এক শরীকবিহীন প্রতিপালকের ইবাদতে মগ্ন রয়েছি। আমি তাঁরই আশ্রয়ে আছি। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি। তিনিই আমার আশ্রয়দানস্থল। তোমরা কখনো আমার নিকট হতে এ আশা করো না যে, আমি অন্য কারো সামনে মাথা নত করবো এবং তার ইবাদত করবো। আমি তোমাদের মতই মানুষ। তোমাদের লাভ-ক্ষতির আমি মালিক নই। আমি তো আল্লাহর এক দাস মাত্র। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আমিও এক বান্দা। তোমাদেরকে হিদায়াত করা বা পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা আমি রাখি না। সবকিছুই আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আমি তো শুধু একজন প্রচারক। আমি নিজেই যদি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি তবে অবশ্যই তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন এবং আমাকে বাঁচাবার কারো ক্ষমতা হবে না। আল্লাহ ছাড়া আমি কোন আশ্রয় স্থল দেখি না। আমার পদমর্যাদা শুধু প্রচারক ও রাসূল হিসেবেই রয়েছে।

কারো কারো মতে اِلَّا শব্দের ইসতিসনা বা স্বাতন্ত্র্য لَا اَمْلِكُ -এর সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমি লাভ ক্ষতি এবং হিদায়াত ও যালালাতের মালিক নই। আমি তো শুধু তাবলীগ করি ও আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি। আবার এই ইসতিসনা لَنْ يُّجِيْرَنِيْ -এর সাথেও হতে পারে। অর্থাৎ আমাকে শুধু আমার রিসালাতের পালনই আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "হে রাসূল (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি (জনগণের কাছে) পৌঁছিয়ে দাও, আর যদি তুমি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিলে না, আর আল্লাহ তোমাকে লোকদের (অনিষ্ট) হতে রক্ষা করবেন।"(৫ ঃ৬৭)

ইরশাদ হচ্ছেঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। যখন এই মুশরিক দানব ও মানবরা কিয়ামতের দিন ভয়াবহ আযাব দেখতে পাবে তখন তারা বুঝতে পারবে কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প। অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন না তাতে অবিশ্বাসী মুশরিক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঐদিন মুশরিকদের শুধু নাম হিসেবেও কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য।

٢٥- قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا ○

২৫। বলঃ আমি জানি না তোমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্যে কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?

٢٦- عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ○

২৬। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না,

٢٧- اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ○

২৭। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল (সঃ)-এর অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

٢٨- لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ○ ع

২৮। রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছে কি না তা জানবার জন্যে; রাসূলদের নিকট যা আছে তা তার জ্ঞান গোচর এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণকে বলে দাওঃ কিয়ামত কখন হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এমন কি ওর সময় নিকটবর্তী কি দূরবর্তী এটাও আমার জানা নেই। অধিকাংশ মূর্খ ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যমীনের ভিতরের জিনিসেরও খবর রাখেন, এটা যে সম্পূর্ণ ভুল কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো এই আয়াতে কারীমাটি। এই রিওয়াইয়াতের কোন মূল ভিত্তিই নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। আমরা এটা কোন কিতাবে পাইনি। হ্যাঁ, এর বিপরীতটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি তাঁর না জানার কথা প্রকাশ করতেন। হযরত জিবরাঈলও (আঃ) গ্রাম্য লোকের রূপ ধরে তাঁর নিকট এসে তাঁকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি তাঁকে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এর জ্ঞান যেমন জিজ্ঞেসকারীর নেই তেমনই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরও নেই।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন গ্রাম্য লোক উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামত কখন হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "কিয়ামত তো অবশ্যই হবে, এখন তুমি এর জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো তা বল দেখি?" লোকটি বললোঃ "আমার কাছে রোযা নামাযের আধিক্য নেই, তবে এটা সত্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে ভালবাসী।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি থাকবে।" হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলমানরা এ হাদীস শুনে যতো বেশী খুশী হয়েছিল অন্য হাদীস শুনে ততো বেশী খুশী হয়নি। এ হাদীস দ্বারাও জানা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জানা ছিল না।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এই উম্মতকে আল্লাহ অর্ধদিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে এটুকু বেশী রয়েছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ "অর্ধদিন দ্বারা উদ্দেশ্য কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাঁচশ বছর।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ -

অর্থাৎ "যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না।"(২ ঃ ২৫৫) মানুষের মধ্য থেকেই হোক বা দানবের মধ্য থেকেই হোক, যাকে আল্লাহ যেটুকু চান অবহিত করে থাকেন। আবার এর আরো বিশেষত্ব এই যে, তার হিফাজত এবং সাথে সাথে এই ইলমের প্রসারের জন্যে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তার আশেপাশে সদা রক্ষক ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন।

لِيَعْلَمَ-এর ضَمِير বা সর্বনামটি কারো কারো মতে নবী (সঃ)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সামনে ও পিছনে চারজন ফেরেশতা থাকতেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের পয়গাম সঠিকভাবে তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আবার কারো কারো মতে, এর ضَمِير টি আহলে শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতারা আল্লাহর নবী (সঃ)-কে শয়তান হতে ও তাঁর অনিষ্ঠ হতে রক্ষা করেন, যাতে আহলে শিরক জানতে পারে যে, রাসূলগণ আল্লাহর রিসালাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারীরাও যেন তাঁদের রিসালাতকে জেনে নেয়। কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। ইয়াকূব (রঃ)-এর কিরআত পেশের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ জনগণ যেন জেনে নেয় যে, রাসূলগণ তাবলীগ করেছেন। আর সম্ভবতঃ ভাবার্থ এও হবে যে, যেন আল্লাহ জেনে নেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে তাঁর রাসূলদের হিফাযত করে থাকেন, যেন তাঁরা রিসালাত আদায় করতে পারেন ও অহীর হিফাজত করতে পারেন। আর যেন আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন যে, তাঁরা রিসালাত আদায় করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ -

অর্থাৎ "তুমি এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলে ওকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়?" (২ঃ ১৪৩) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন ঈমানদারদেরকে এবং মুনাফিকদেরকে।"(২৯ ঃ ১১) এই ধরনের আরো আয়াতসমূহ রয়েছে। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তো প্রথম হতেই জানেন, কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করেও জেনে নেন। এই জন্যেই এখানে এর পরেই বলেন যে, তিনি সবকিছুরই বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

সূরাঃ জ্বিন-এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ মুয্‌যাম্মিল মাক্কী

(আয়াত ঃ ২০, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلُ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

মুসনাদে বাযযারে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরায়েশরা দারুণ নদুওয়াতে একত্রিত হয়ে পরস্পর বলাবলি করলোঃ এসো, আমরা এই ব্যক্তির (হযরত মুহাম্মাদ সঃ)-এর এমন এক নাম স্থির করি যে, সবারই মুখ দিয়ে এই নামই বের হবে, যাতে বাইরের লোকেরা একই আওয়ায শুনে যায়। তখন কেউ কেউ বললো যে, তার নাম 'কাহিন' বা গণক রাখা হোক। একথা শুনে অন্যেরা বললো যে, প্রকৃতপক্ষে সে তো 'কাহিন' বা গণক নয়। আর একটি প্রস্তাব উঠলো যে, তাহলে এর নাম 'মাজনূন' বা পাগল রাখা হোক। এর উপরও অন্যেরা আপত্তি উঠালো যে, সে পাগলও নয়। এরপর প্রস্তাব রাখা হলো যে, এর নাম 'সাহির বা যাদুকর রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হলো। কারণ বলা হলো যে, সে 'সাহির' বা যাদুকরও নয়। মোটকথা তারা তাঁর এমন কোন খারাপ নাম স্থির করতে পারলো না যাতে সবাই একমত হতে পারে। এভাবেই ঐ মজলিস ভেঙ্গে গেল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আসলেন এবং 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে তাঁকে সম্বোধন করলেন।[১]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে বস্ত্রাবৃত!

২। রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত,

৩। অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প

৪। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে,

١- يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ

٢- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

٣- نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ

٤- اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۗ

১. এই বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী মুআল্লা ইবনে আবদির রহমানের নিকট হতে যদিও আহলে ইলমের একটি দল রিওয়াইয়াত নিয়ে থাকেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁর রিওয়াইয়াত সমূহের মধ্যে এমন বহু হাদীস রয়েছে যেগুলোর উপর তাঁর অনুসরণ করা যায় না।

৫। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী।

٥- اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

৬। অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।

٦- اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ○

৭। দিবাভাগে তোমার জন্যে রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

٧- اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ○

৮। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।

٨- وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○

৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে।

٩- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন রাত্রিকালে কাপড় জড়িয়ে শয়ন করা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কাজ অবলম্বন করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।" (৩২ঃ ১৬) রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবন এ হুকুম পালন করে গেছেন। তাহাজ্জুদের নামায শুধু তাঁর উপর ফরয ছিল। অর্থাৎ এ নামায তাঁর উম্মতের উপর ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

অর্থাৎ "এবং তুমি রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে

প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।" (১৭ঃ ৭৯) এই হুকুমের সাথে সাথে পরিমাণও বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি বা কিছু কম-বেশী।

مُزَّمِّل বলা হয় শয়নকারী ও বস্ত্রাবৃত ব্যক্তিকে। আবার এ অর্থও করা হয়েছেঃ হে কুরআনকে উত্তম রূপে গ্রহণকারী! তুমি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে মগ্ন থাকো। অথবা কিছু কম বেশী করো। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হুকুম ও বরাবর পালন করে এসেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীম খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন। ফলে খুব দেরীতে সূরা শেষ হতো। ছোট সূরাও যেন বড় হয়ে যেতো। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত আনাস (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব টেনে টেনে পাঠ করতেন।" তারপর তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে তিনি اَللّٰه, رَحْمٰن এবং رَحِيْم শব্দের উপর মদ করেন অর্থাৎ ওগুলো দীর্ঘ করে পড়েন।

ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেকটি আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াক্ফ করতেন বা থামতেন। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - পড়ে থামতেন اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর উপর ওয়াক্ফ করতেন এবং مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - পড়ে থামতেন।"[১]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কুরআনের পাঠককে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ 'পড়তে থাকো এবং ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে পড়তে থাকো যেমন দুনিয়ায় পড়তে। তোমার মনযিল ও মরতবা হলো ওটা যেখানে তোমার আখিরী আয়াত শেষ হয়।"[২] আমরা এই তাফসীরের শুরুতে ঐ সব হাদীস আনয়ন করেছি যেগুলো ধীরে ধীরে পাঠ মুস্তাহাব হওয়া এবং ভাল ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করার কথা বলে দেয়। যেমন এ হাদীসটি, যাতে রয়েছেঃ কুরআনকে স্বীয় সুর

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবী দাউদ এবং 'জামে' তিরমিযীতেও রয়েছে।
২. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদ, জামে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কর এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করে না। আর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ কথা বলাঃ "তাকে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বংশধর এর মধুর সুর দান করা হয়েছে" এবং হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর একথা বলাঃ "আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছেন তবে আমি আরো উত্তম ও মধুর সুরে পড়তাম।"

আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর এ কথা বলাঃ "বালুকার মত কুরআনকে ছড়িয়ে দিয়ো না এবং কবিতার মত কুরআনকে অভদ্রতার সাথে পড়ো না, ওর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখো এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল করো। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়ো না।"[১]

একটি লোক এসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বললোঃ "আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা আজ রাত্রে একই রাকআতে পাঠ করে ফেলেছি।" তার একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ "তা হলে সম্ভবতঃ তুমি কবিতার মত তাড়াতাড়ি করে পাঠ করে থাকবে। ঐ সূরাগুলো আমার বেশ মুখস্থ আছে যেগুলি রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিলিয়ে পড়তেন।" তারপর তিনি মুফাসসাল সূরাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম লিখেন যেগুলোর দুটি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক এক রাকআতে পাঠ করতেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। অর্থাৎ তা আমল করতেও ভারী হবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃহত্তের কারণে অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও খুবই কষ্টদায়ক হবে। যেমন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল। তখন অহীর বোঝা আমার উপর এমন ভারীবোধ হলো যে, আমার ভয় হলো না জানি হয়তো আমার উরু ভেঙ্গেই যাবে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আপনি কিছু অনুভব করেন কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন কোন জিঞ্জীরের শব্দ হয়। আমি নিঃশব্দ হয়ে পড়ি। যখনই অহী অবতীর্ণ হয় তখন তা আমার উপর এমন বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যে, আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণই বেরিয়ে পড়বে।"

---

১. এটা ইমাম বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিস ইবনে হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "কখনো কখনো খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে অহী আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে আগমন করে ও অহী অবতীর্ণ করেন। তিনি কথা বলতে থাকেন এবং আমি তা মুখস্থ করতে থাকি।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমি একবার নবী (সঃ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তখন শীতকাল ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ঘর্ম টপ টপ করে পড়ছিল।"[১]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সময় উষ্ট্রীর উপর সওয়ার থাকতেন এবং ঐ অবস্থাতেই তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতো। তখন উষ্ট্রী অহীর ভারে ঝুঁকে পড়তো। তাফসীরে ইবনে জারীরে এও রয়েছে যে, অতঃপর যে পর্যন্ত অহী বন্ধ না হতো উষ্ট্রী নড়তে পারতো না এবং তার গর্দান উঁচু হতো না। ভাবার্থ এই যে, স্বয়ং অহীর ভার বহন করা কঠিন ছিল। এবং আহকাম পালন করাও ছিল অনুরূপ কঠিন। হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এটাই। হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াতে যেমন এটা ভারী কাজ, তেমনই আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কার ভারী হবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক। আবিসিনীয় ভাষায় نَشَأَ শব্দের অর্থ হলো দাঁড়িয়ে থাকা। সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকলে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।

তাহাজ্জুদের নামাযের উৎকৃষ্টতা এই যে, এর ফলে অন্তর ও রসনা এক হয়ে যায়। তিলাওয়াতের যে শব্দগুলো মুখ দিয়ে বের হয় তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দিনের তুলনায় রাত্রির নির্জনতায় অর্থ ও ভাব অন্তরে ভালভাবে গেঁথে যায়। কেননা দিবস হলো কোলাহল ও অর্থোপার্জনের সময়।

হযরত আনাস (রাঃ) اَقْوَمُ قِيْلًا কে اَصْوَبُ قِيْلًا পড়লে জনগণ বলে ওঠেঃ আমরাতো اَقْوَمُ পড়ে اَقْوَمُ, اَصْوَبُ থাকি? উত্তরে তিনি বলেনঃ اَهْيَأُ এবং একই অর্থবোধক শব্দ।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ (হে নবী সঃ)! দিবাভাগে তোমার জন্যে রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তুমি শুয়ে-বসে থাকতে পার, বিশ্রাম করতে পার, বেশী বেশী নফল আদায় করতে পার এবং তোমার পার্থিব কাজ-কাম সম্পন্ন করতে পার। অতএব রাত্রিকে তুমি তোমার আখিরাতের কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নাও। এ হুকুম ঐ সময় ছিল যখন রাত্রির নামায ফরয ছিল। তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং হালকাকরণের জন্যে রাত্রির কিয়ামের সময় হ্রাস করে দেন এবং বলেনঃ তোমরা রাত্রির অল্প সময় কিয়াম কর। এই ফরমানের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ হতে فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তাঁর এ উক্তিটি সঠিকও বটে।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে হিশাম (রঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর সেখানকার ঘরবাড়ী বিক্রি করে ফেলবেন এবং ওর মূল্য দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি রোমকদের সাথে লড়াই করতে থাকবেন। অতঃপর হয় রোম বিজিত হবে, না হয় তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি তাঁর কওমের লোকদের সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। তাঁর এই সংকল্পের কথা শুনে তাঁরা বললেনঃ তাহলে শুনুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় আপনারই কওমের ছয়জন লোক এটাই সংকল্প করেছিল যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিবে এবং ঘরবাড়ী ইত্যাদি বেচে দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর পেয়ে তাদেরকে ডেকে বললেনঃ "আমি কি তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ নই? খবরদার! এ কাজ করো না।" এভাবে তিনি তাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এ হাদীস শুনে হযরত সাঈদ (রাঃ) তাঁর ঐ সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁর কওমের লোকদেরকে বললেনঃ "তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম।" তারপর তিনি সেখান হতে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে চলে আসলেন। স্বীয় জামাআতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি তাদেরকে বললেনঃ আমি এখান থেকে যাওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিতর নামায পড়ার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেনঃ এ মাসআলাটি হযরত আয়েশা (রাঃ) সবচেয়ে ভাল

বলতে পারবেন। সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞেস করো। তুমি তাঁর কাছে যা শুনবে তা আমাকেও বলে যেয়ো। আমি তখন হযরত হাকীম ইব্‌নে আফলাহ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললামঃ আমাকে একটু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে চলুন। তিনি প্রথমে যেতে অস্বীকার করলেও আমার পীড়াপীড়িতে শেষে যেতে সম্মত হলেন। সুতরাং আমরা উভয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাকীম (রাঃ)-এর গলার স্বর শুনেই তাঁকে চিনতে পারলেন এবং বললেন "কে, হাকীম?" তিনি জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ, আমি হাকীম ইবনে আফলাহ (রাঃ)।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার সাথে ওটা কে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "এটা সাঈদ ইবনে হিশাম (রাঃ)।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "কোন হিশাম? আমিরের ছেলে হিশাম কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, আমিরের ছেলে হিশামই বটে।" এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হযরত আমির (রাঃ)-এর জন্যে রহমতের দু'আ করলেন এবং বললেনঃ "আমির (রাঃ) খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।" আমি তখন আরয করলামঃ হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "তুমি কি কুরআন পড়নি?" আমি উত্তর দিলাম ঃ হ্যাঁ, পড়েছি বটে। তিনি তখন বললেনঃ "কুরআনই তাঁর চরিত্র।" আমি তখন তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি চাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রাত্রির নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা দরকার। আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ "তুমি কি সূরা মুযযাম্মিল পড়নি?" আমি জবাব দিলামঃ হ্যাঁ অবশ্যই পড়েছি। তিনি বললেনঃ 'তাহলে শুনো। সূরার এই প্রথম ভাগে রাত্রির কিয়াম (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়া) ফরয করা হয় এবং এক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)এবং তাঁর সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের নামায ফরয হিসেবে আদায় করতেন। এমন কি তাঁদের পা ফুলে যেতো। বারো মাস পরে এই সূরার শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ ভার লাঘব করে দেন। তাহাজ্জুদের নামাযকে তিনি ফরয হিসেবে না রেখে নফল হিসেবে রেখে দেন।" এবার আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু বিতর নামাযের মাসআলাটি জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি বললামঃ হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিতর নামাযের পদ্ধতিও আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি তখন বললেনঃ শুনো, (রাত্রে) আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে মিসওয়াক,

অযুর পানি ইত্যাদি ঠিক করে একদিকে রেখে দিতাম। যখনই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তিনি চক্ষু খুলতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও অযু করতেন এবং আট রাকআত নামায পড়তেন। মধ্যে তাশাহহুদে মোটেই বসতেন না। আট রাকআত পূর্ণ করার পর তিনি আত্তাহিয়্যাতুতে বসতেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিকির করতেন, দু'আ করতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন। আর নবম রাকআত পড়ে যিকির ও দুআ করতেন এবং উচ্চ শব্দে সালাম ফিরাতেন।, এ শব্দ আমরাও শুনতে পেতাম। তারপর বসে বসেই দুই রাকআত নামায পড়তেন। হে আমার প্রিয় পুত্র! সব মিলিয়ে মোট এগারো রাকআত হলো। অতঃপর যখন তাঁর বয়স বেশী হয় এবং দেহ ভারী হয়ে যায় তখন থেকে তিনি সাত রাকআত বিতর পড়ে সালাম ফিরাতেন এবং পরে বসে বসে দুই রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং হে প্রিয় বৎস! এটা নয় রাকআত হলো। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন নামায পড়তে শুরু করতেন তখন তা চিরস্থায়ীভাবে পড়তে থাকতেন। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যবস্থা বা ঘুম অথবা দুঃখ কষ্টের কারণে কিংবা রোগের কারণে রাত্রে ঐ নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলায় বারো রাকআত পড়ে নিতেন। আমার জানা নেই যে, তিনি গোটা কুরআন রাত থেকে নিয়ে সকাল পর্যন্ত পড়ে শেষ করেছেন এবং রমযান ছাড়া অন্য কোন পুরো মাসই রোযা রেখেছেন।" অতঃপর আমি উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁর সামনে সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি সবটারই সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেনঃ "আমিও যদি তাঁর কাছে যাতায়াত করতে পারতাম তবে আমি নিজের কানে শুনে আসতাম।"[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে মাদুরও বিছিয়ে রাখতাম যার উপর তিনি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। লোকেরা এ খবর জানতে পেরে রাত্রির নামাযেও তাঁর ইকতিদা করার জন্যে এসে পড়ে। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। উম্মতের প্রতি তিনি বড়ই মেহেরবান ছিলেন এবং সাথে সাথে এ ভয়ও করতেন যে, হয়তো এ নামায ফরয হয়ে যাবে, তাই তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে লোক সকল! ঐ সব আমলের

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

উপরই কষ্ট স্বীকার কর যেগুলো পালনের তোমাদের শক্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পুণ্যদানে অপারগ হবেন না। বরং তোমরাই আমলে অপারগ হয়ে যাবে। ঐ আমলই সর্বাপেক্ষা উত্তম যার উপর চিরস্থায়ীভাবে থাকা হয়।" এদিকে কুরআন কারীমে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং সাহাবীগণ রাত্রির কিয়াম শুরু করে দেন এবং ঘুম যেন না আসে এ জন্যে তাঁরা রশি বেঁধে লটকিতে লাগলেন। আট মাস এই ভাবেই কেটে গেল। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের এ চেষ্টা দেখে আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করলেন এবং রাত্রির কিয়ামকে এশার ফরয নামাযের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। আর রাত্রির কিয়াম ছেড়ে দিলেন।[১] এই হাদীসের শব্দাবলীর ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে এ রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, আট মাস পরে এর শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এই উক্তিটিও দুর্বল। সহীহ ওটাই যা মুসনাদের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক বছর পরে শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, সূরা মুযযাম্মিলের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রমযান শরীফের রাত্রির কিয়ামের মতই কিয়াম করতে শুরু করেন। আর এ সূরার প্রাথমিক ও শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার মাঝে প্রায় এক বছরের ব্যবধান ছিল। তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ আবদির রহমান (রঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত কিয়াম করেন, এমন কি তাঁদের পা ও পদনালী ফুলে যায়। অতঃপর فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা শান্তি পান। হযরত হাসান বসরী (রঃ) হযরত সুদ্দীরও (রঃ) উক্তি এটাই। মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে এ রিওয়াইয়াতটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে ষোল মাসের সময়কালের সাথে বর্ণিত আছে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর বা দু'বছর পর্যন্ত কিয়াম করতে থাকেন। তাঁদের পা ও পদনালী ফুলে যায়। তারপর সূরার শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদের ভার লাঘব হয়ে যায়। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) দশ বছরের মেয়াদের কথা বলেন।[২] হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাথমিক

১. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমেও রয়েছে। কিন্তু এর বর্ণনাকারী মূসা ইবনে উবাইদাহ যুবাইদী দুর্বল। আসল হাদীস সূরা মুযযাম্মিলের নাযিল হওয়ার উল্লেখ ছাড়া সহীহ গ্রন্থেও রয়েছে।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আয়াতগুলোর হুকুম অনুযায়ী মুমিনগণ রাত্রির কিয়াম শুরু করেন, কিন্তু তাঁদের খুবই কষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়া করেন এবং عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى হতে مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন এভাবে তাঁদের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং সংকীর্ণতা দূরীভূত করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কারবার হতে অবসর লাভ করে প্রশান্তির সাথে খুব বেশী বেশী তাঁর যিকির করতে থাকো, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ অর্থাৎ "অতএব যখনই অবসর পাও সাবধান করো।" একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) تَبَتُّلْ অর্থাৎ স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং দুনিয়া ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন।

এখানে ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! পার্থিব সৃষ্টিকূল হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করার একটা সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট করে নাও।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই হলেন মালিক ও ব্যবস্থাপক। পূর্ব ও পশ্চিম সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি যেমন এই আল্লাহরই ইবাদত করছো, তেমনই একমাত্র তাঁর উপরই নির্ভরশীল হয়ে যাও। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ـ অর্থাৎ "তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপর ভরসা কর।" এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতেও রয়েছেঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ অর্থাৎ "আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" এই অর্থের আরো বহু আয়াত রয়েছে যে, ইবাদত, আনুগত্য এবং ভরসা করার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

১০। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল।	١٠- وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○
১১। ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য	١١- وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى

النَّعمةِ ومهِّلهم قليلاً ○

প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছুকালের জন্যে তাদেরকে অবকাশ দাও,

١٢- اِنَّ لَدينا انكالاً وَّجحيمًا ○

১২। আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি,

١٣- وَّطعامًا ذا غُصَّةٍ وَّعذابًا اَليمًا ○

১৩। আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٤- يومَ ترجفُ الارضُ والجبالُ وكانتِ الجبالُ كثيبًا مَّهيلاً ○

১৪। সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

١٥- اِنَّا ارسلنا اِليكم رسولاً شاهدًا عليكم كما ارسلنا اِلى فرعونَ رسولاً ○

১৫। আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট,

١٦- فعصى فرعونُ الرَّسولَ فاخذنه اخذًا وَّبيلاً ○

১৬। কিন্তু ফিরাউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

١٧- فكيف تتقون اِن كفرتم يومًا يَّجعل الولدانَ شيبًا ○

১৭। অতএব যদি তোমরা কুফরী কর তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেইদিন যেই দিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে,

١٨- السَّمآءُ منفطرٌ بهٖ كان وعده مفعولاً ○

১৮। যেই দিন আকাশ হবে বিদীর্ণ; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে কাফিরদের বিদ্রূপাত্মক কথার উপর ধৈর্য ধারণের হিদায়াত করছেন এবং বলছেনঃ তাদেরকে কোন তিরস্কার ধমক ছাড়াই তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমি স্বয়ং তাদেরকে দেখে নিবো। আমার গজব ও ক্রোধের সময় দেখবো কি করে তারা মুক্তি পেতে পারে! তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী ও স্বচ্ছল লোক, যারা তোমাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিচ্ছে, যাদের উপর দ্বিগুণ প্রাপ্য রয়েছে, এক জানের আর এক মালের, আর তারা কোনটাই আদায় করছে না, তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও, তারপর দেখে নিয়ো, আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করি। অল্প দিন তারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকুক, পরিণামে তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। কেমন আযাব? এমন কঠিন আযাব যে, তাদেরকে শৃংখল পরিয়ে জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাদেরকে এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে যা কণ্ঠ নালীতে আটকে যাবে। নীচেও নামবে না এবং উপরেও উঠবে না। আরো নানা প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। এমন এক সময়ও হবে যখন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে। পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হয়ে যাবে। যে বালুকারাশিকে বাতাস এদিক-ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কারো কোন নাম-নিশানাও বাকী থাকবে না। যমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যেখানে কোন উঁচু-নীচু পরিলক্ষিত হবে না।

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ হে লোক সকল এবং বিশেষ করে হে কাফিরদের দল! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ এক রাসূল (সঃ) পাঠিয়েছি, যে রাসূল সত্যবাদী ও সত্যায়িত, যেমন আমি ফিরাউনের নিকট আমার আহকাম পৌঁছাবার জন্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরাউন যখন তাকে অমান্য করলো তখন আমি তাকে কিরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তা তো তোমাদের জানা আছে। সুতরাং আমার এই নবী (সঃ)-কে যদি তোমরা অমান্য কর তবে তোমাদেরও পরিণাম ভাল হবে না। তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং তোমাদেরকে তচনচ করে দেয়া হবে। কেন না এই রাসূল (সঃ) সমস্ত রাসূলের নেতা। সুতরাং তাকে অমান্য করার শাস্তিও হবে অন্যান্য শাস্তি অপেক্ষা বড়।

এর পরবর্তী আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলোঃ যদি তোমরা কুফরী কর তবে বল তো ঐ দিনের শাস্তি হতে তোমরা কিরূপে মুক্তি পেতে পার যে দিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে? দ্বিতীয় অর্থ হলো ঃ

তোমরা যদি এতো বড় ভয়াবহ দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস কর তবে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় কিরূপে লাভ করতে পার? এই উভয় অর্থই উত্তম হলেও প্রথম অর্থটিই বেশী উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "এটা হলো কিয়ামতের দিন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেনঃ 'উঠো এবং তোমার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর।' তখন হযরত আদম (আঃ) বলবেনঃ 'হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে কতজন?' আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ প্রতি হাজারের মধ্য হতে নয়শ নিরানব্বই জনকে।' এ কথা শুনে মুসলমানদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও তাঁদের চেহারা দেখে তা বুঝে নিলেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে সান্ত্বনার সুরে বললেনঃ জেনে রেখো যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান অনেক। ইয়াজূজ ও মাজূজও হযরত আদম (আঃ)-এরই সন্তান। তারা এক একজন নিজের পিছনে এক হাজার করে সন্তান ছেড়ে যায়। সুতরাং তারা এবং তাদের মত লোক মিলে এই সংখ্যা দাঁড়াবে। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছুই নেই। জান্নাত তোমাদের জন্যে এবং তোমরা জান্নাতের জন্যে।"[১] সূরা হজ্বের শুরুতে এরকম হাদীস সমূহের বর্ণনা গত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঐ দিনের ভয়াবহতার কারণে আকাশও বিদীর্ণ হয়ে যাবে। কেউ কেউ بِهٖ -এর ه সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরিয়েছেন। কিন্তু এটা সবল নয়। কেননা এখানে তাঁর যিকিরই নেই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ ঐদিনের ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য। ওটা সংঘটিত হবেই। ঐ দিনের আগমনে কোন সন্দেহই নেই।

১৯। এটা এক উপদেশ, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।	١٩- اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

১. ইমাম তিবরানী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা গারীব হাদীস।

২০। তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর, আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কাজেই কুরআন হতে যতুটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্যে ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। ওটা

٢٠- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ
أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ
وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن
سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ
وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সূরাটি জ্ঞানীদের জন্যে সরাসরি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়। যে কেউ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই প্রতিপালকের মর্জি হিসেবে হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়ার ওয়াসীলা লাভ করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেনঃ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -

অর্থাৎ "তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"(৭৬ ঃ ৩০)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এবং তোমার সাহাবীদের একটি দল যে কখনো কখনো দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম কর, কখনো কখনো অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত এবং কখনো কখনো এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করে থাকো এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কাটিয়ে দাও তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। অবশ্য তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। কেননা এটা খুবই কঠিন কাজ। দিবস ও রজনীর সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে থাকেন। কারণ কখনো দিন ও রাত উভয়ই সমান সমান হয়ে থাকে, কখনো রাত ছোট হয় ও দিন বড় হয় এবং কখনো দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জানেন যে, এটা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং এখন থেকে তোমরা রাত্রির নামায ততটাই পড় যতটা তোমাদের জন্যে সহজ। কোন সময় নির্দিষ্ট থাকলো না যে, এতোটা সময় কাটানো ফরয। এখানে কিরআত দ্বারা নামায অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বানী ইসরাইল রয়েছেঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا -

অর্থাৎ "তুমি তোমার কিরআত খুব উচ্চ স্বরেও পড়ো না এবং খুব নিম্ন স্বরেও না।" এখানে صَلَاة দ্বারা কিরআতকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর সাথীগণ এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া বাধ্যতামূলক নয়। সূরা ফাতিহাকে পড়া যাবে

এবং অন্য কোন জায়গা হতেও পড়া চলবে। একটি আয়াত পড়াও যথেষ্ট হবে। আবার এই মাসআলার দৃঢ়তা ঐ হাদীস দ্বারা করেছেন যাতে রয়েছে যে, তাড়াতাড়ি করে নামায আদায়কারীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "কুরআনের যে অংশ তোমার নিকট সহজ তা দ্বারা নামায পড়।"[১] এ মাযহাব জমহূরের বিপরীত। জমহূর তাঁদেরকে এ জবাব দেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার নামায হলো না।"

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ নামায, যাতে উম্মুল কুরআন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) পাঠ করা হয় না তা অকেজো, তা অকেজো, তা অকেজো ও অসম্পূর্ণ।"

ইবনে খুযাইমার (রঃ) সহীহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছেঃ "ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে নামাযে উম্মুল কুরআন পাঠ করে না।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এ আয়াতটি, বরং পুরো সূরাটি মাক্কী। এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সময় জিহাদ ছিল না, বরং মুসলমানরা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। এরপরও গায়েবের এ খবর দেয়া এবং কার্যতঃ ওটা প্রকাশ পাওয়া যে, মুসলমানরা পরবর্তীকালে পুরোপুরিভাবে জিহাদে লিপ্ত হয়েছেন, সুতরাং এটা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুওয়াতের একটা বড় ও স্পষ্ট নির্দশন। উপরোক্ত ওযরগুলোর কারণে মুসলমানরা রাত্রির কিয়ামের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়।

হযরত আবূ রাজা' মুহাম্মাদ (রঃ) হযরত হাসান (রঃ)-কে প্রশ্ন করেনঃ "হে আবূ সাঈদ (রঃ)! যে ব্যক্তি পূর্ণ কুরআনের হাফিয্ হয়েও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে না, শুধু ফরয নামায আদায় করে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "সে তো কুরআনকে বালিশ বানিয়ে নিয়েছে। তার উপর আল্লাহর অভিশাপ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে বলেনঃ সে ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল যে, আমি তাকে শিখিয়ে ছিলাম।' আরো বলেনঃ তোমাদেরকে ওটা

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

শিখানো হয়েছে যা তোমরা নিজেরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ দাদারাও জানতো না।" তখন আবূ রাজা' (রঃ) তাঁকে আবার বলেনঃ "হে আবূ সাঈদ (রঃ)! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেনঃ কুরআন হতে তোমরা যা সহজভাবে পড়তে পার পড়।" হযরত হাসান (রঃ) উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। পাঁচটি আয়াত হলেও পড়।" সুতরাং বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, কুরআনের হাফিযের রাত্রের নামাযে কিছু না কিছু কিয়াম করা হযরত ইমাম হাসান বসরী (রঃ)-এর মাযহাবে ওয়াজিব ছিল। একটি হাদীসও এর প্রমাণ দিচ্ছে, যাতে রয়েছে যে, সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে এমন একটি লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হলো ঐ ব্যক্তি যার কারণে শয়তান প্রস্রাব করে থাকে।" এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এশার ফরয নামাযও পড়ে না। এটাও বলা হয়েছে যে, রাত্রে নফল হিসেবে কিয়াম করে না।

সুনানে রয়েছেঃ "হে কুরআন ওয়ালাগণ! তোমরা বিতর পড়তে থাকো।" অন্য এক হাদীসে আছেঃ "যে ব্যক্তি বিতর পড়ে না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।" হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি হতেও বেশী গরীব হলো আবূ বকর ইবনে আবদিল আযীয হাম্বেলীর (রঃ) উক্তি, যিনি বলেন যে, রমযান মাসের কিয়াম ফরয। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মু'জামে তিবরানীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেনঃ "ওটা একশটি আয়াত।"[১]

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা ফরয নামাযের হিফাজত কর এবং ফরয যাকাত আদায় কর। এ আয়াতটি ঐ গুরুজনদের দলীল যাঁরা বলেন যে, মক্কা শরীফেই যাকাত ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। তবে কি পরিমাণ বের করা হবে, নেসাব কি ইত্যাদির বর্ণনা মদীনা শরীফে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় মনীষীদের উক্তি এই যে, এই আয়াত পূর্ববর্তী রাত্রির কিয়ামের হুকুম সম্বলিত আয়াতকে মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছে।

---

১. এটা অত্যন্ত গারীব হাদীস। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ আমি শুধু এটা মু'জামে তিবরানীতেই পেয়েছি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে বলেনঃ "দিন-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয।" লোকটি প্রশ্ন করেঃ "এ ছাড়া কি অন্য কোন নামায আমার উপর ফরয আছে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "না, তবে তুমি নফল হিসেবে পড়তে পার।"

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে দান-খয়রাত করতে থাকো, যার উপর আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই উত্তম ও পুরোপুরি বিনিময় প্রদান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

অর্থাৎ "কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্যে এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।"(২ ঃ ২৪৫) আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا -

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্যে ভাল কাজ যা কিছু অগ্রীম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। ওটা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশী ভালবাসে?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশী ভালবাসে।" তিনি বললেনঃ "যা বলছো চিন্তা করে বল।" তাঁরা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো এটা ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যে ব্যক্তি যা (আল্লাহর পথে) খরচ করবে তাই শুধু তার নিজের সম্পদ, আর যা সে রেখে যাবে তাই তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।"[১]

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। অর্থাৎ খুব বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তোমাদের সমস্ত কার্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ঐ ব্যক্তির উপর যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরাঃ মুয্যাম্মিল -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূল ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সুনানে নাসাঈতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

সূরাঃ মুদ্দাস্সির মাক্কী
سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৫৬, রুকূ' ঃ ২) (اٰيَاتُهَا : ٥٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত।	١- يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝
২। উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর,	٢- قُمْ فَاَنْذِرْ ۝
৩। এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।	٣- وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝
৪। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো,	٤- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
৫। অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো,	٥- وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝
৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না।	٦- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝
৭। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।	٧- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝
৮। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে	٨- فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ۝
৯। সেই দিন হবে এক সংকটের দিন	٩- فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝
১০। যা কাফিরদের জন্যে সহজ নয়।	١٠- عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআন কারীমের يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ -এ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। কিন্তু জমহূরের উক্তি এই যে, সর্বপ্রথম অহী হলো اِقْـرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (৯৬ঃ ১)এ আয়াতটি। যেমন এই সূরার তাফসীরে আসবে ইনশা আল্লাহ।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদির রহমান (রাঃ)-কে কুরআন কারীমের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি

উত্তরে বলেনঃ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ -এই আয়াতটি।" ইয়াহইয়া (রঃ) তাঁকে পুনরায় বলেনঃ "লোকেরা তো বলছে যে, ... اِقْرَأْ بِاسْمِ -এ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে?" উত্তরে হযরত আবূ সালমা (রাঃ) বলেনঃ হযরত জাবির (রাঃ)-কে আমি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম এবং তিনি আমাকে ঐ জবাবই দিয়েছিলেন যা আমি তোমাকে দিলাম। তারপর আমি আবার তাঁকে ঐ প্রশ্নই করেছিলাম যা তুমি আমাকে করলে। আমার এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত জাবির (রাঃ) বলেছিলেনঃ আমি তোমাকে ঐ কথাই বললাম যে কথা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "আমি হেরা পর্বতের গুহায় আমার প্রতিপালকের ধ্যান করছিলাম। সেখান হতে অবতরণ করে আমি শুনতে পেলাম যে, কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি আমার সামনে পিছনে ডানে এবং বামে তাকালাম, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। আমি তখন মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকালাম তখন কিছু একটা দেখতে পেলাম। আমি তখন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে আসলাম এবং তাকে বললামঃ আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকো। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাই করলো এবং ঐ সময় يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ قُمْ فَاَنْذِرْ ـ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ـ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ "একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক হতে আমার কানে একটা শব্দ পৌঁছলো! চক্ষু উঠিয়ে দেখলাম যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। আমি ভয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং বাড়ী এসেই বলিঃ আমাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে দাও। আমার কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ قُمْ فَاَنْذِرْ ـ হতে فَاهْجُرْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।"

হযরত আবূ সালমা (রাঃ) বলেন যে, رُجْز -এর অর্থ হলো মূর্তি। তারপর ক্রমান্বয়ে অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। এটা সহীহ বুখারীর শব্দ এবং এই হিসাবই রক্ষিত আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, এর পূর্বেও কোন অহী এসেছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছেঃ "ইনি ঐ ফেরেশতা যিনি হেরা পর্বতের গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন।" অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ), যিনি তাঁকে সূরা আলাকের নিম্নের আয়াতগুলো গুহার মধ্যে পড়িয়েছিলেনঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ـ

এরপর কিছু দিনের জন্যে তাঁর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন তাঁর যাতায়াত আবার শুরু হয় তখন প্রথম অহী ছিল সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো। এইভাবে এদুটি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যাচ্ছে যে, আসলে সর্বপ্রথম অহী হচ্ছে সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো। তারপর অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম অহী হলো এই সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো। এর স্বপক্ষে রয়েছে মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীসগুলো, যেগুলোতে রয়েছে যে, অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম অহী হলো সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা কুরায়েশদেরকে যিয়াফত দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ "আচ্ছা, তোমরা এই লোকটিকে [হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে] কি বলতে পার?" কেউ কেউ বললো যে, তিনি যাদুকর। অন্য কেউ বললো যে, না, তিনি যাদুকর নন। কেউ কেউ তাঁকে গণক বললো। আবার অন্য কেউ বললো যে, না তিনি গণকও নন। কেউ কেউ তাঁকে কবি বলে মন্তব্য করলো, কিন্তু অন্য কেউ বললো যে, তিনি কবিও নন, তাদের কেউ কেউ এই মন্তব্য করলো যে, তিনি এমন যাদুকর যে যাদু তিনি লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছেন। পরিশেষে তারা এতেই একমত হলো যে, তাঁকে এরূপ যাদুকরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত হলেন এবং তিনি কাপড় দ্বারা মাথা ঢেকে নেন এবং গোটা দেহকেও বস্ত্রাবৃত্ত করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেনঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ قُمْ فَاَنْذِرْ ـ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ـ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ـ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ـ এর শানে নুযূল এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।"[১]

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ উঠো, সতর্ক বাণী প্রচার কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং জনগণকে আমার সত্তা হতে, জাহান্নাম হতে এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর।

১. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রথম অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নবী রূপে মনোনীত করা হয়েছে। আর এই অহী দ্বারা তাঁকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। অর্থাৎ অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাত করা হতে দূরে থাকো। যেমন কবি গাইলান ইবনে সালমা সাকাফী বলেনঃ

فَإِنِّى بِحَمْدِ اللّٰهِ لَا ثَوْبَ فَاجِرٍ * لَبِسْتُ وَلَا مِنْ غَدْرَةٍ اتَقَنَّعُ

অর্থাৎ "আল্লাহর প্রশংসা যে, আমি পাপাচারের পোষাক ও বিশ্বাসঘাতকতার চাদর হতে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছি।" স্বীয় কাপড় পবিত্র রাখো অর্থাৎ পাপকার্য ছেড়ে দাও এবং আমলকে সংশোধন করে নাও, এরূপ ব্যবহার আরবী পরিভাষায়ও বহু দেখা যায়। ভাবার্থ এও হতে পারেঃ হে নবী (সঃ)! তুমি গণকও নও এবং যাদুকরও নও, সুতরাং মানুষ তোমাকে যাই বলুক না কেন তুমি কোন পরোয়া করবে না।

যে ব্যক্তি ওয়াদা অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তাকে আরবরা ময়লা ও অপরিষ্কার কাপড় ওয়ালা বলে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে, বিশ্বাসঘাতকতা করে না তাকে পবিত্র কাপড় ওয়ালা বলে থাকে। কবি বলেনঃ

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضُهُ * فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيْهِ جَمِيْلُ

অর্থাৎ "মানুষ যখন দুষ্কার্য ও মলিনতা দ্বারা নিজের মর্যাদাকে কলুষিত ও অপবিত্র করবে না, তখন সে যে কাপড়ই পরিধান করবে তাতেই তাকে সুন্দর দেখাবে।" ভাবার্থ এও হবেঃ অপ্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করো না, নিজের কাপড়কে পাপ মলিন করো না, কাপড়কে পাক-সাফ রাখো, ময়লা ধুয়ে ফেলো, মুশরিকদের মত নিজের পোষাককে অপবিত্র রেখো না। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবার্থগুলো সবই ঠিক। এটাও হবে, ওটাও হবে। সাথে সাথে অন্তরও পবিত্র এবং কলুষমুক্ত হতে হবে। অন্তরের উপর কাপড়ের প্রয়োগ আরবদের কথায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন কবি ইমরুল কায়েস বলেনঃ

أَفَاطِمَ مَهْلًا بَعْضَ هٰذَا التَّدَلُّلِ * وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ هَجْرِى فَاَجْمِلِى

وَإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّى خَلِيْقَةٌ * فَسُلِّى ثِيَابِى مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِى

অর্থাৎ “হে ফাতিমা (কবির প্রেমিকা)! তুমি তোমার এসব চলনভঙ্গী ছেড়ে দাও, আর যদি তুমি আমা হতে পৃথক হয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে থাকো তবে উত্তমরূপে পৃথক হয়ে যাও। আমার কোন ব্যবহার ও চরিত্র যদি তোমার কাছে খারাপ লেগে থাকে তবে আমার কাপড়কে তোমার কাপড় হতে পৃথক করে দাও, তাহলে তা পৃথক হয়ে যাবে।”

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ নিজের অন্তরকে ও নিয়তকে পরিষ্কার রাখো। মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব কারাযী (রঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ তোমার চরিত্রকে ভাল ও সুন্দর কর।

আল্লাহ তা’আলার উক্তি وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অর্থাৎ অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ প্রতিমা বা মূর্তি হতে দূরে থাকো। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদও (রঃ) বলেন যে, رُجْز-এর অর্থ হলো প্রতিমা বা মূর্তি। হযরত ইবরাহীম (রঃ) ও হযরত যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ নাফরমানী পরিত্যাগ কর। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না।”(৩৩ ঃ ১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ “এবং মূসা (আঃ) তার ভাই হারূনকে বলেছিলঃ আমার পরে তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।” (৭ঃ ১৪২)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে وَلَا تَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرْ রয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ অধিক চাওয়ার সাথে আল্লাহর উপর নিজের ভাল আমলের ইহসান প্রকাশ করো না। রবী ইবনে

আনাসেরও (রঃ) এটাই উক্তি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা পছন্দ করেছেন। হযরত খাসীফ (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ কল্যাণ প্রার্থনার আধিক্য দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ করো না। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ নবুওয়াতের ইহসানের বোঝা মানুষের উপর রেখে ওর বিনিময়ে দুনিয়া তলব করো না। সুতরাং চারটি উক্তি হলো। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সর্বোত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ হতে তোমাকে যে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধৈর্য অবলম্বন কর। আল্লাহ তোমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাতে সদা লেগে থাকো।

نَاقُوْر শব্দ দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ -এ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ "আমি কি করে শান্তিতে থাকতে পারি? অথচ শিংগাধারণকারী ফেরেশতা নিজের মুখে শিংগা ধরে রেখেছেন এবং ললাট ঝুঁকিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন হুকুম হয়ে যাবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন।" সাহাবীগণ (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমাদেরকে আপনি কি করতে বলছেন?" জবাবে তিনি বলেনঃ "তোমরা নিম্নের কালেমাটি বলতে থাকবেঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ "আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি।"[১]

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন হবে এক সংকটের দিন অর্থাৎ কঠিন দিন, যা কাফিরদের জন্যে সহজ নয়। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ـ

অর্থাৎ "কাফিররা বলবেঃ এটা কঠিন দিন।"(৫৪ ঃ ৮)

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত যারারাহ ইবনে আওফা (রঃ) বসরার কাযী ছিলেন। একদা তিনি তাঁর মুক্তাদীদেরকে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং নামাযে তিনি এই সূরাটিই তিলাওয়াত করছিলেন। পড়তে পড়তে যখন তিনি فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ـ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ـ عَلَى الْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ـ এই আয়াতগুলো পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠেন এবং সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যান। দেখা যায় যে, তাঁর প্রাণ পাখী তাঁর দেহ পিঞ্জিরা থেকে বেরিয়ে গেছে! আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন!

١١- ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝

১১। আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে।

١٢- وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝

১২। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ

١٣- وَبَنِينَ شُهُودًا ۝

১৩। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ

١٤- وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ۝

১৪। এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের বহু উপকরণ,

١٥- ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝

১৫। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই।

١٦- كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝

১৬। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।

١٧- سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝

১৭। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো।

١٨- إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝

১৮। সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো;

١٩- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

১৯। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো!

٢٠- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ○

২০। আরো অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো!

٢١- ثُمَّ نَظَرَ ○

২১। সে আবার চেয়ে দেখলো।

٢٢- ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ○

২২। অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো।

٢٣- ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ○

২৩। অতঃপর সে পিছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো।

٢٤- فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ○

২৪। এবং ঘোষণা করলোঃ এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়,

٢٥- إِنْ هٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ○

২৫। এটা তো মানুষেরই কথা।

٢٦- سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ ○

২৬। আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকার-এ,

٢٧- وَمَآ أَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ○

২৭। তুমি কি জান সাকার কী?

٢٨- لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ○

২৮। ওটা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে না

٢٩- لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ○

২৯। এটা তো গাত্র-চর্ম দগ্ধ করবে,

٣٠- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ○

৩০। সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিস জন প্রহরী।

যে কলুষিত ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং পবিত্র কুরআনকে মানুষের কথা বলে আখ্যায়িত করেছে, এখানে তার শাস্তির বর্ণনা হচ্ছে। যে নিয়ামতরাশি তাকে দেয়া হয়েছে, প্রথমে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে একাকী মায়ের পেট হতে বের হয়েছে। তার না ছিল কোন মাল-ধন ও না ছিল কোন সন্তান সন্ততি। সঙ্গে তার কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মালদার বানিয়েছেন। তাকে প্রচুর মাল দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে,

হাজার দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, কারো কারো মতে লক্ষ দীনার, আবার কেউ কেউ বলেন যে, জমি-জমা ইত্যাদি দান করেছেন। সন্তান দান করার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন যে, তেরোটি সন্তান এবং অন্য কেউ বলেন যে, দশটি সন্তান দান করেছেন, যারা সবাই তার পাশে বসে থাকতো। চাকর-বাকর, দাস-দাসী তার জন্যে কাজ-কর্ম করতো এবং সে মজা করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন যাপন করতো। মোট কথা, তার ধন-দৌলত, দাস-দাসী এবং আরাম-আয়েশ সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। তবুও প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ হতো না। সে আরো বেশী কামনা করতো। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এখন কিন্তু আর এরূপ হবে না। সে তো আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। অর্থাৎ সে জ্ঞান লাভের পরেও আমার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "'অয়েল' হলো জাহান্নামের একটা উপত্যকার নাম, যার মধ্যে কাফিরকে নিক্ষেপ করা হবে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে নীচের দিকে যেতেই থাকবে তবুও ওর তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আর 'সাঊদ' হলো জাহান্নামের একটি অগ্নি পাহাড়ের নাম যার উপর কাফিরকে চড়ানো হবে। সত্তর বছর পর্যন্ত সে উপরে উঠতেই থাকবে। তারপর সেখান থেকে নীচে ফেলে দেয়া হবে। সত্তর বছর পর্যন্ত নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তেই থাকবে এবং চিরস্থায়ীভাবে সে এই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "সাঊদ হলো জাহান্নামের একটি আগুনের পাহাড়ের নাম। জাহান্নামীকে এর উপর চড়তে বাধ্য করা হবে। তাতে হাত রাখা মাত্রই তা গলে যাবে এবং উঠানো মাত্রই স্বাভাবিক হাত হয়ে যাবে। পায়ের অবস্থাও তাই হবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাঊদ হলো জাহান্নামের এক কংকরময় ভূমির নাম, যার উপর দিয়ে কাফিরকে মুখের ভরে টেনে আনা হবে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, সাঊদ হলো জাহান্নামের এক শক্ত পিচ্ছিল পাথর যার উপর জাহান্নামীকে উঠানো হবে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আয়াতের ভাবার্থ

১. এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বা দুর্বল বলেছেন। সাথে সাথে এতে অস্বীকৃতিও রয়েছে।

হলোঃ আমি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করবো। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এমন শাস্তি যা হতে কখনো শান্তি লাভ করা যাবে না। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তাকে এই কষ্ট ও শাস্তির নিকটবর্তী এ জন্যেই করেছি যে, সে ঈমান হতে বহু দূরে ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা করে এটা গড়ে নিচ্ছিল যে, কুরআন কারীম সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য করবে!

অতঃপর তার উপর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হচ্ছেঃ অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো! আরবদের পরিভাষা অনুযায়ী তার ধ্বংসের শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে যে, সে ধ্বংস হোক! সে কতই না জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! সে কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে! বারবার চিন্তা-ভাবনা করার পর ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর সে পিছন ফিরেছে ও দম্ভ প্রকাশ করেছে। তারপর ঘোষণা করেছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, বরং মুহাম্মাদ (সঃ) তার পূর্ববর্তী লোকদের যাদুমন্ত্র বর্ণনা করছে এবং ওটাই মানুষকে শুনাচ্ছে। সে বলছেঃ এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।

ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম হলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী, যে কুরায়েশদের নেতা ছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঘটনাটি হলোঃ একদা এই অপবিত্র ওয়ালীদ হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে আসলো এবং তাঁর নিকট হতে কুরআন কারীমের কিছু অংশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন তাকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। এখান থেকে বের হয়ে সে কুরায়েশদের সমাবেশে গিয়ে হাযির হলো এবং বলতে লাগলোঃ "হে জনমন্ডলী! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) যে কুরআন পাঠ করে থাকেন, আল্লাহর কসম! ওটা কবিতাও নয়, যাদু-মন্ত্রও নয় এবং পাগলের কথাও নয়। বরং খাস আল্লাহর কথা! এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।" কুরায়েশরা তার একথা শুনে নিজেদের মাথা ধরে নেয় এবং বলেঃ "এ যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে কুরায়েশদের একজনও মুসলমান হতে বাকী থাকবে না।" আবূ জেহেল খবর পেয়ে বললোঃ "তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। দেখো, আমি কৌশলে তাকে ইসলাম হতে বিমুখ করে দিচ্ছি।" একথা বলে সে মাথায় এক বুদ্ধি এঁটে নিয়ে ওয়ালীদের বাড়ীতে গেল এবং তাকে বললোঃ "আপনার কওম আপনার জন্যে চাঁদা ধরে বহু অর্থ

জমা করেছে এবং ওগুলো তারা আপনাকে দান করতে চায়।” এ কথা শুনে ওয়ালীদ বললোঃ “বাঃ! কি মজার ব্যাপার! আমার তাদের চাঁদা ও দানের কি প্রয়োজন? দুনিয়ার সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। আমার সন্তান-সন্ততিও বহু রয়েছে।” আবূ জেহেল বললোঃ “হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। কিন্তু লোকদের মধ্যে এই আলোচনা চলছে যে, আপনি যে আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে যাতায়াত করছেন তা শুধু কিছু লাভের আশায়।” এ কথা শুনে ওয়ালীদ বললোঃ “আমার বংশের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে এসব গুজব রটেছে তা তো আমার মোটেই জানা ছিল না? আচ্ছা, এখন আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আর কখনো আমি আবূ বকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে যাবো না। মুহাম্মাদ (সঃ) যা কিছু বলে তা তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।” এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا হতে لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, ওয়ালীদ কুরআন কারীম সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলঃ “কুরআনের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই ফলাফলে পৌঁছেছে যে, ওটা কবিতা নয়, ওতে মধুরতা রয়েছে, ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এটা বিজয়ী, বিজিত নয়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যাদু।” এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। নবী (সঃ) তাকে কুরআন পাঠ করে শুনান। কুরআন শুনে তার অন্তর নরম হয়ে যায় এবং পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আবূ জেহেল এ খবর পেয়ে বড় ঘাবড়ে যায় এবং ভয় করে যে, না জানি হয়তো সে মুসলমান হয়েই যাবে। তাই, সে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে পড়ে এবং একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে তাকে বলেঃ “আপনার কওম আপনার জন্যে মাল জমা করতে চায়।” সে জিজ্ঞেস করেঃ “কেন?” সে উত্তরে বলেঃ “আপনাকে দেয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট আপনার যাতায়াত বন্ধ করা। কেননা, আপনি সেখানে শুধু মাল লাভ করার উদ্দেশ্যেই গমন করে থাকেন।” এ কথা শুনে ওয়ালীদ ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং বলেঃ “আমার কওমের মধ্যে আমি যে সবচেয়ে বড় মালদার এটা কি তারা জানে না?” আবূ জেহেল উত্তর দিলোঃ “হ্যাঁ, জানে বটে। কিন্তু এখন তো মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনি শুধু

মাল লাভের আশাতেই তাঁর হয়ে গেছেন। আপনি যদি এই বিশ্বাস মানুষের অন্তর হতে মুছে ফেলতে চান তাহলে আপনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ব্যাপারে একটি কঠোর উক্তি করুন। যাতে লোক বুঝতে পারে যে, আপনি তার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আপনি তার কথাকে মোটেই পছন্দ করেন না।" সে বললোঃ "আমি তাঁর ব্যাপারে কি বলবো? প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, সে যে কুরআন আমাকে শুনিয়েছে, আল্লাহ্র কসম! ওটা কবিতা নয়, কাসীদা নয়, ছন্দ নয় এবং জ্বিনের কথাও নয়। তোমাদের তো খুব ভাল জানা আছে যে, দানব ও মানবের কথা আমার খুবই ভাল স্মরণ আছে এবং আমি একজন খ্যাতনামা কবিও বটে। ভাষার ভালমন্দ গুণ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কালাম এগুলোর কোনটিই নয়। তাঁর কালামের মধ্যে এমন মধুরতা ও লালিত্য রয়েছে যে, ওটা সমস্ত কালামের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাঁর কালামের মধ্যে বড়ই আকর্ষণ রয়েছে। সুতরাং তুমিই বল, আমি তাঁর কালামের বিরুদ্ধে কি বলতে পারি?" আবূ জেহেল তখন বললোঃ "দেখুন, আপনি এর বিরুদ্ধে কিছু একটা না বলা পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আপনার কওমের মনে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে তা দূর হতে পারে না।" সে তখন বললোঃ "আচ্ছা, তাহলে আমাকে কিছু অবকাশ দাও, আমি চিন্তা করে এর সম্পর্কে কিছু একটা উক্তি করবো।" সুতরাং সে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার খাতিরে শেষে বলে ফেললোঃ "এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।" তখন ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।[১]

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, দারুন নুদওয়াতে বসে কাফিররা পরামর্শ করলো যে, হজ্বের মৌসুমে জনগণ চতুর্দিক থেকে আসবে। সুতরাং এই লোকটি (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) সম্বন্ধে কি উক্তি করা যেতে পারে? তার সম্পর্কে এমন একটা উক্তি করা যাক যা সবাই এক বাক্যে বলবে, যাতে তা আরবে এবং আরো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন কেউ কবি বললো, কেউ বললো যাদুকর, কেউ বললো গণক, কেউ জ্যোতির্বিদ বললো এবং কেউ পাগল বললো। ওয়ালীদ বসে বসে চিন্তা করছিল। বহুক্ষণ চিন্তা করার পর সে বড় রকমের ভঙ্গিমা করে বললোঃ "দেখো, এ লোকটির কথা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন কিছুই নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।" আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا -

অর্থাৎ দেখো, তারা তোমার কি উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।"(১৭ ঃ ৪৮)

এরপর আল্লাহ্ তার শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিবো যা অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির আগুন।

যা গোশত, অস্থি, চর্ম সবই খেয়ে ফেলবে। আবার এগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এ শাস্তি না তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে, না মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে। এই জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়। তাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র থাকবে না।

হযরত বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি عليها تسعة عشر আল্লাহ্ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবী (রাঃ)-এর একজন লোককে জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করে। তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।" তখন একজন লোক এসে নবী (সঃ)-কে এ খবর দেন। ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা عليها تسعة عشر -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদেরকে এ খবর দিয়ে দেন এবং তাঁদেরকে বলেনঃ "তোমরা তাদেরকে (ইয়াহূদীদেরকে) আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে, জান্নাতের মাটি কেমন? আর তোমরা জেনে রেখো যে, জান্নাতের মাটি হলো সাদা ময়দার মত।" তারপর ইয়াহূদীরা তাঁর কাছে আসলো এবং তাঁকে জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করলো। তিনি স্বীয় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলো দু'বার উত্তোলন করলেন এবং দ্বিতীয়বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ রাখলেন (অর্থাৎ অঙ্গুলির ইশারায় তিনি তাদেরকে জানালেন যে, তাঁরা সংখ্যায় উনিশ জন)। অতঃপর তিনি ঐ ইয়াহূদীদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ "জান্নাতের মাটি কেমন?" তারা তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললোঃ "হে ইবনে সালাম (রাঃ)! আপনিই এঁদেরকে এ খবরটি দিয়ে দিন!" তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বললেনঃ "যেন ওটা সাদা রুটী।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন বললেনঃ "জেনে রোখো যে, ওটা ঐ সাদা রুটীর মত যা নির্ভেজাল ময়দা দ্বারা তৈরী।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আজ তো আপনার সাহাবীগণ হেরে গেছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কি ভাবে।" সে উত্তর দিলোঃ "ইয়াহূদীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তাদের নবী কি তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন? উত্তরে তারা বলেছে যে, তারা তাদের নবীকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এর উত্তর দানে অক্ষম।" এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেনঃ "এমন কওমকে কি করে পরাজিত বলা যেতে পারে যাদেরকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যা তাদের জানা নেই। তখন তারা বলে যে, তারা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না যে পর্যন্ত না তারা তাদের নবীকে জিজ্ঞেস করে? আল্লাহ্র ঐ দুশমনদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো যারা তাদের নবীর কাছে আবেদন করেছিল যে, তিনি যেন তাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। তখন তাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আপতিত হয়।" অতঃপর ঐ ইয়াহূদীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ডেকে আনা হলে তারা বললোঃ "হে আবুল কাসিম (সঃ)! জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা কত?" উত্তরে নবী (সঃ) তাঁর হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলো খুলে দিয়ে দু'বার দেখান এবং দ্বিতীয় বারে এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ রাখেন অর্থাৎ অঙ্গুলির ইশারায় তিনি জানান যে, জাহান্নামের রক্ষীরা হলেন সংখ্যায় ঊনিশ জন। আর তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে বললেনঃ "তোমাদেরকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তোমরা বলবে যে, ওটা সাদা ময়দার মত।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইয়াহূদীদের প্রশ্নের উত্তরে জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা বলে দেয়ার পর তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ "বলতো, জান্নাতের মাটি কেমন?" তখন তারা একে অপরের দিকে তাকালো এবং শেষে বললোঃ "হে আবুল কাসিম (সঃ)! ওটা রুটির মত।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "সাদা ময়দার রুটির মত।"[১]

৩১। আমি ফেরেশ্তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ়

৩১- وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা জামে' তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে।

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ○

প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা এবং কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবেঃ আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এইভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

৩২- كَلَّا وَالْقَمَرِ ○

৩২। কখনই না, তারা এতে কর্ণপাত করবে না, চন্দ্রের শপথ,

৩৩- وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ○

৩৩। শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে,

৩৪- وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ○

৩৪। শপথ প্রভাতকালের, যখন ওটা হয় আলোকোজ্জ্বল–

৩৫- إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ○

৩৫। এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

৩৬- نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ○

৩৬। মানুষের জন্যে সতর্ককারী

৩৭- لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ○

৩৭। তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্যে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ শাস্তির কাজের উপর এবং জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের উপর আমি ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করেছি, যারা নির্দয় ও কঠোর ভাষী। এ কথার দ্বারা কুরায়েশদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন আবূ জেহেল বলেঃ "হে কুরায়েশদের দল! তোমাদের দশ জন কি তাদের এক জনের উপর জয় লাভ করতে পারবে না?" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি জাহান্নামের প্রহরী করেছি ফেরেশতাদেরকে। তারা মানুষ নয়। সুতরাং তাদেরকে পরাজিত করাও যাবে না এবং ক্লান্ত করাও যাবে না।

এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল আশদাইন, যার নাম ছিল কালদাহ ইবনে উসায়েদ ইবনে খালফ, বলেঃ "হে কুরায়েশদের দল! তোমরা (জাহান্নামের উনিশ জন প্রহরীদের) দু'জনকে প্রতিহত কর, বাকী সতেরো জনকে প্রতিহত করার জন্যে আমি একাই যথেষ্ট।" সে ছিল বড় আত্মগর্বী এবং সে বড় শক্তিশালীও ছিল। তার শক্তি এতো বেশী ছিল যে, সে গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াতো। তখন দশজন লোক তার পায়ের নীচ হতে ঐ চামড়াকে বের করার জন্যে এতো জোরে টান দিতো যে, চামড়া ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো, তথাপি তার পা একটুও নড়তো না। এ ছিল ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে বলেছিলঃ "আসুন, আমরা দু'জন মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হই। যদি আপনি আমাকে ভূপাতিত করতে পারেন তবে আমি আপনার নবুওয়াতকে স্বীকার করে নিবো।" তার কথামত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার সাথে মল্লযুদ্ধ করে কয়েকবার তাকে ভূপাতিত করেন, কিন্তু এর পরও ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য সে লাভ করেনি। ইমাম ইবনে ইসহাক (রঃ) মল্লযুদ্ধ সম্বলিত ঘটনাটি রাকানাহ্ ইবনে আব্দি ইয়াযীদ ইবনে হাশিম ইবনে আবদিল মুত্তালিবের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। আমি (ইবনে কাসীর রঃ) বলি যে, এই দু'জনের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। সম্ভবতঃ ওর এবং এর, উভয়ের সাথেই মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ এই সংখ্যার উল্লেখ পরীক্ষা স্বরূপই ছিল। এক দিকে কাফিরদের কুফরী খুলে যায় এবং অপরদিকে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই রাসূল (সঃ)-এর রিসালাত সত্য। কেননা, তাদের কিতাবেও এই সংখ্যাই ছিল। তৃতীয়তঃ এর ফলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। মুমিন ও কিতাবীদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং কাফিররা বলে উঠলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এখানে এটা উল্লেখ করার মধ্যে কি

হিকমত রয়েছে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, এ ধরনের কথা দ্বারা আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। আল্লাহ্র এ সমুদয় কাজ হিকমত ও রহস্যে পরিপূর্ণ।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ওয়াকিফহাল। তাদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যার আধিক্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে। এটা মনে করো না যে, তাদের সংখ্যা মাত্র ঊনিশই। যেমন গ্রীক দার্শনিকরা এবং তাদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা অজ্ঞতা বশতঃ বুঝে নিয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'উকূলে আশারাহ্' এবং 'নুফূসে তিসআহ্'। কিন্তু এটা তাদের এমন একটা দাবী যার উপর দলীল কায়েম করতে তারা সম্পূর্ণরূপে অপারগ। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই আয়াতের প্রথম অংশের উপর তো তাদের দৃষ্টি পড়েছে বটে, কিন্তু এর শেষাংশের সাথে তারা কুফরী করতে রয়েছে! যেখানে সুস্পষ্ট শব্দ বিদ্যমান রয়েছেঃ তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। সুতরাং শুধু ঊনিশের কি অর্থ হতে পারে? সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বায়তুল মা'মূরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ "ওটা সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে। ওর মধ্যে প্রত্যহ পালাক্রমে সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে থাকেন। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে তাঁরা তাতে প্রবেশ করতেই থাকবেন। কিন্তু ফেরেশ্তাদের সংখ্যা এতো অধিক যে, একদিন যে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আর তাঁদের ওর মধ্যে প্রবেশ করার পালা পড়বে না।"

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখো না এবং আমি এমন কিছু শুনছি যা তোমরা শুনো না। আকাশ চড়্ চড়্ শব্দ করছে এবং চড়্ চড়্ শব্দ করার তার অধিকার রয়েছে। এমন চার অঙ্গুলী পরিমাণ জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশ্তা সিজদায় পতিত থাকেন না। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। আর তোমরা বিছানায় তোমাদের স্ত্রীদের সাথে প্রেমালাপ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতে পারতে না, বরং ক্রন্দন ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে জঙ্গলের দিকে চলে যেতে!" এ কথা শুনে হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ "আমি যদি গাছ হতাম এবং আমাকে কেটে ফেলা হতো (তবে কতই না ভাল হতো)!"[১]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "সপ্ত আকাশে পা পরিমিত, কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত এবং হস্ততালু পরিমিত এমন জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশ্তা কিয়াম, রুকূ' অথবা সিজদার অবস্থায় না রয়েছেন। অতঃপর কাল কিয়ামতের দিন তাঁরা সবাই বলবেনঃ "(হে আল্লাহ্!) আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি। তবে (এ কথা সত্য যে,) আমরা আপনার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করিনি।"[১]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মরূযীর (রঃ) 'কিতাবুস সলাত' নামক পুস্তকে হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ "আমি যা শুনছি তা তোমরাও শুনছো কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমি আকাশের চড়চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর আকাশকে তার এই চড়চড় শব্দের জন্য তিরস্কার করা যায় না। কেননা ফেরেশতা এতো বেশী রয়েছেন যে, আকাশের মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত এমন জায়গাও ফাঁকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা রুকূ' বা সিজদা অবস্থায় না আছেন।"

উক্ত পুস্তকেই হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়ার আকাশে পা রাখা পরিমাণ এমন জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে কোন একজন ফেরেশতা সিজদা অথবা কিয়ামের অবস্থায় না আছেন।" এ জন্যেই কুরআন কারীমের মধ্যে ফেরেশতাদের নিম্নলিখিত উক্তি বিদ্যমান রয়েছেঃ

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ - وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ - وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ -

অর্থাৎ "আমাদের প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। আমরা সারিবদ্ধভাবে (দণ্ডায়মান) থাকি এবং আমরা (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর) তাসবীহ পাঠকারী।"(৩৭ ঃ ১৬৪-১৬৬)[২]

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটির মারফূ' হওয়া খুবই গারীব বা দুর্বল। অন্য রিওয়াইয়াতে এ উক্তিটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্য সনদে হযরত আলা ইবনে সা'দ (রাঃ) হতেও মারফূ'রূপে এটা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে এটাও গারীব বা দুর্বল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উমার (রাঃ) এমন সময় (মসজিদে) আগমন করেন যে, ঐ সময় নামায শুরু হয়ে গেছে। দেখেন যে, তিনজন লোক (নামাযে না দাঁড়িয়ে) বসে আছে। তাদের একজন ছিল আবূ জাহশ লায়সী। তিনি তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা উঠো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায পড়?" তখন দু'জন উঠলো এবং আবূ জাহশ উঠতে অস্বীকার করে বললোঃ "যদি এমন কোন লোক আসে যে আমার চেয়ে শক্তিশালী এবং আমাকে সে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে ফেলে দিতে পারে ও আমার চেহারাকে মাটিতে মিলিয়ে দিতে পারে তবে আমি উঠবো, অন্যথায় উঠবো না।" তার একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "এসো, আমিই তোমার সাথে মল্লযুদ্ধ করি।" অতঃপর তিনি তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তার চেহারাকে মাটিতে মিলিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) আসলেন এবং আবূ জাহশকে তাঁর নিকট হতে ছাড়িয়ে নিলেন। এতে হযরত উমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ঐ ক্রোধের অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আবূ হাফস! তোমার হয়েছে কি?" হযরত উমার (রাঃ) তখন তাঁর কাছে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হযরত উমার (রাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট থাকলে অবশ্যই তার প্রতি দয়া করতো। হে উমার (রাঃ)! আল্লাহর কসম! তুমি ঐ দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মাথা আমার কাছে আনতে পারলে আমি বড়ই খুশী হতাম।" একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) তার দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ নরাধম দূরে চলে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ডেকে নিয়ে বললেনঃ "হে উমার (রাঃ) তুমি এখানে বসে পড়। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আবূ জাহশের নামায হতে সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। দুনিয়ার আকাশে বিনয় প্রকাশকারী অসংখ্য ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে রয়েছেন। তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত মাথা উঠাবেন না এবং তাঁরা একথা বলতে বলতে হাযির হবেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি।" দ্বিতীয় আকাশেও এই একই অবস্থা।" হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাঁরা কোন্ তাসবীহ পাঠ করে থাকেন?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, দুনিয়ার আকাশবাসীরা পাঠ করেনঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ -

অর্থাৎ "আমরা রাজত্বও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি।" দ্বিতীয় আকাশবাসীরা বলেনঃ

سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ

অর্থাৎ “আমরা মর্যাদা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারীর মহিমা ঘোষণা করছি।” আর তৃতীয় আকাশবাসী ফেরেশতারা পাঠ করেনঃ

سُبْحَانَ ذِى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ـ

অর্থাৎ “আমরা চিরঞ্জীব যিনি এবং যিনি মৃত্যুবরণ করেন না তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হে উমার (রাঃ)! তুমি তোমার নামাযে এগুলো পাঠ করো।” হযরত উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ইতিপূর্বে যা আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং আমার নামাযে যা পড়তে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার কি হবে?” জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “কখনো এটা পড়বে এবং কখনো ওটা পড়বে।” প্রথমে তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে যা পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপঃ

اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ ـ

অর্থাৎ “(হে আল্লাহ!) আমি আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনার হতে আমি আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার চেহারা মর্যাদাপূর্ণ।”[১]

১. এ হাদীসটি ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ফারাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীস, এমন কি মুনকার বা অস্বীকৃতও বটে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইসহাক ফারাভী (রঃ) হতে হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করে থাকেন এবং ইমাম ইবনু হিব্বানও (রঃ) তাঁকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম আকীলী (রঃ) এবং ইমাম দারকুতনী (রঃ) তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম রাযী (রঃ) বলেন যে, তিনি সত্যবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কখনো কখনো তিনি তালকীন কবুল করতেন তবে তাঁর কিতাবগুলো বিশুদ্ধ। ইমাম আবূ হাতিম রাযী (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, ইসহাক ফারাভী (রঃ) বর্ণনাকারী মুযতারাব এবং তাঁর শায়েখ আবদুল মালিক ইবনে কুদামাহ আবূ কাতাদাহ জামহীর (রঃ) ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর (রঃ) তাঁর এই হাদীসকে কি করে রিওয়াইয়াত করলেন। না তিনি তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বললেন, না তার অবস্থা জানলেন এবং না এই হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর দুর্বলতা বর্ণনা করলেন! হ্যাঁ তবে এটুকু করেছেন যে, ওটাকে অন্য সনদে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং মুরসালের দুটি সনদ এনেছেন। একটি হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে এবং অপরটি হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে।

হযরত আদী ইবনে ইরতাত (রঃ) মাদায়েনের জামে মসজিদে তাঁর ভাষণে বলেনঃ আমি একজন সাহাবী হতে শুনেছি যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলার এমন বহু ফেরেশতা রয়েছেন যারা আল্লাহর ভয়ে সদা প্রকম্পিত থাকেন। তাঁদের চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ঐ অশ্রু ঐ ফেরেশতাদের উপর পতিত হয় যাঁরা নামাযে নিমগ্ন থাকেন। তাঁদের মধ্যে এমন ফেরেশতাও রয়েছেন যাঁরা দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে রুকুতেই রয়েছেন এবং অনেকে সিজদাতেই রয়েছেন। কিয়ামতের দিন তাঁরা তাদের পিঠ ও মাথা উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করবেনঃ 'আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি।"[১]

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্যে সাবধান বাণী।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চন্দ্রের অবসান ঘটা রাত্রির এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাতকালের শপথ করে বলেনঃ এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদ সমূহের অন্যতম। এর দ্বারা যে জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে তা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রঃ), যহ্হাক (রঃ) এবং পূর্ব যুগীয় আরো বহু মনীষীর উক্তি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা মানুষের জন্যে সতর্ককারী, তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্যে। অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে এই সতর্ক বাণীকে কবুল করে নিয়ে সত্যের পথে এসে যাবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে এর পরেও এটা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে থাকবে, এখান হতে দূরে সরে থাকবে এবং এটাকে প্রতিরোধ করতে থাকবে। সবারই জন্যে এটা সতর্ক বাণী।

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,	٣٨- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝
৩৯। তবে দক্ষিণপার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা নয়,	٣٩- إِلَّا أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ۝
৪০। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে--	٤٠- فِي جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝
৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে,	٤١- عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝

---

১. এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে নসর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদে কোন ত্রুটি নেই।

٤٢- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ○

৪২। তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?

٤٣- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ○

৪৩। তারা বলবেঃ আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

٤٤- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ○

৪৪। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে আহার্য দান করতাম না,

٤٥- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ○

৪৫। এবং আমরা আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম।

٤٦- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ○

৪৬। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম,

٤٧- حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ○

৪৭। আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।

٤٨- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ○

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।

٤٩- فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ○

৪৯। তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?

٥٠- كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ○

৫০। তারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ–

٥١- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ○

৫১। যারা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।

٥٢- بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ○

৫২। বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক।

٥٣- كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ○

৫৩। না, এটা হবার নয়, বরং তারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।

٥٤- كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ○

৫৪। না, এটা হবার নয়, কুরআনই সকলের জন্যে উপদেশ বাণী।

٥٥- فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ○

৫৫। অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

٥٦- وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ○

৫৬। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার আমলের উপর পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা স্বর্গোদ্যানে শান্তিতে বসে থাকবে। তারা জাহান্নামীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির মধ্যে দেখে তাদেরকে বলবেঃ কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা উত্তরে বলবেঃ আমরা আমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করিনি এবং তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে সদ্ব্যবহার করিনি। অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মুখে যা এসেছে তা-ই বলেছি। যেখানেই কাউকেও প্রতিবাদ করতে দেখেছি সেখানেই আমরা তাদের সঙ্গে হয়ে গেছি এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করেছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। এখানে يَقِيْن দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের আয়াতেও মৃত্যু অর্থে يَقِيْن শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছেঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

অর্থাৎ "মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকবে।" (১৫ঃ ৯৯) হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কীয় হাদীসেও يَقِيْن শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ مِنْ رَّبِّهِ ـ

অর্থাৎ "তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার নিকট মৃত্যু এসে গেছে।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। কেননা, শাফাআতের পাত্রের ব্যাপারেই শুধু শাফাআত

ফলদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু যার প্রাণটিও কুফরীর উপরই বের হয়েছে তার জন্যে সুপারিশ কি করে ফলদায়ক হতে পারে? সে চিরতরে হাবিয়াহ জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেমন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। ফারসী ভাষায় যাকে شِيْر বলে, আরবী ভাষায় তাকে اَسَد বা সিংহ বলে। আর হাবশী ভাষায় তাকে قَسْوَرَةٍ বলা হয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ ـ

অর্থাৎ “যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলেঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন।”(৬ ঃ ১২৪)

হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ এও হতে পারেঃ তারা চায় যে, তাদেরকে বিনা আমলেই ছেড়ে দেয়া হোক।

মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আখিরাতের ভয় পোষণ করে না। কারণ কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এ বিশ্বাসই তাদের নেই। সুতরাং যেটাকে তারা বিশ্বাসই করে না সেটাকে ভয় করবে কি করে?

মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রকৃত কথা এই যে, কুরআনই সকলের জন্যে উপদেশ বাণী। অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ “তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।” (৭৬ঃ ৩০) অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ একমাত্র তিনিই (আল্লাহই) ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ -এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "একমাত্র আমিই ভয়ের যোগ্য, সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করতে হবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা চলবে না। যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা হতে বেঁচে গেল সে আমার ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে গেল।"[১]

সূরাঃ মুদ্দাস্সির-এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

সূরাঃ কিয়ামাহ্ মাক্কী

(আয়াত ঃ ৪০, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٤٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের,

١- لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ○

২। আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

٢- وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ○

৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না?

٣- اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ○

৪। বস্তুতঃ আমি ওর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

٤- بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ○

৫। তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়;

٥- بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ج○

৬। সে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত দিবস আসবে?

٦- يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۗ○

৭। যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে,

٧- فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ○

৮। এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিবিহীন,

٨- وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ○

৯। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে,

٩- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ○

১০। সেদিন মানুষ বলবেঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়?

١٠- يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ج○

১১। না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

١١- كَلَّا لَا وَزَرَ ۗ○

১২। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

١٢- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ۝

১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।

١٣- يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝

১৪। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,

١٤- بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝

১৫। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

١٥- وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝

এটা কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসের উপর শপথ করা হয় ওটা যদি প্রত্যাখ্যান করার জিনিস হয় তবে ওর পূর্বে لا এ কালেমাটি নেতিবাচকের গুরুত্বের জন্যে আনয়ন করা বৈধ। এখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার উপর এবং অজ্ঞ লোকদের এর প্রত্যাখ্যানের উপর যে, কিয়ামত হবে না, শপথ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাই বলছেনঃ আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের এবং আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের কসম, এবং তিরস্কারকারী আত্মার কসম নয়। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, দুটোরই কসম। হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত আ'রাজ (রঃ)-এর কিরআতে لَاُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ রয়েছে। এর দ্বারাও হযরত হাসান (রঃ)-এর উক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে। কেননা, তাঁর মতে প্রথমটির শপথ এবং দ্বিতীয়টির শপথ নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, আল্লাহ পাক দুটোরই শপথ করেছেন। যেমন হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এবং হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সবাই অবহিত। نَفْس لَوَّامَة -এর তাফসীরে হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুমিনের নফ্স উদ্দেশ্য এটা সব সময় নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে যে, এটা কেন করলে? কেন এটা খেলে? কেন এই ধারণা মনে এলো? হ্যাঁ, তবে ফাসিকের নফ্স সদা উদাসীন থাকে। তার কি দায় পড়েছে যে, সে নিজের নফ্সকে তিরস্কার করবে?

এটাও বর্ণিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত মাখলূক কিয়ামতের দিন নিজেই নিজেকে তিরস্কার করবে। সৎকর্মশীল নফস সৎকর্মের স্বল্পতার জন্যে এবং অসৎকর্মশীল নফস অসৎকর্মের আবির্ভাবের কারণে নিজে নিজেকে ভর্ৎসনা করবে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা নিন্দনীয় নফ্সকে বুঝানো হয়েছে, যা অবাধ্য নফ্স। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ নফস উদ্দেশ্য যা ছুটে যাওয়া জিনিসের উপর লজ্জিত হয় এবং তজ্জন্যে নিজেকে ভর্ৎসনা করে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ উক্তিগুলো ভাবার্থের দিক দিয়ে প্রায় একই ভাবার্থ এই যে, এটা ঐ নফ্স যা পুণ্যের স্বল্পতার জন্যে এবং দুষ্কার্য হয়ে যাওয়ার জন্যে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবো না? এটা তো তাদের বড়ই ভুল ধারণা। আমি ওগুলোকে বিভিন্ন জায়গা হতে একত্রিত করে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিবো এবং ওকে পূর্ণভাবে গঠিত করবো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আমি ওকে উট বা ঘোড়ার পায়ের পাতার মত বা খুরের মত বানিয়ে দিতে সক্ষম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ দুনিয়াতেও ইচ্ছা করলে আমি তাকে এরূপ করে দিতে পারতাম। শব্দ দ্বারা তো বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, قَادِرِيْنَ শব্দটি نَجْمَعُ হতে حَال হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কি ধারণা করে যে, আমি তার অস্থিগুলো একত্রিত করবো না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্বরই আমি ওগুলো একত্রিত করবো। আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। আমি ইচ্ছা করলে সে পূর্বে যা ছিল তার চেয়েও কিছু বেশী করে দিয়ে তাকে পুনরুত্থিত করতে পারবো। ইবনে কুতাইবাহ (রঃ) ও যাজ্জাজ (রঃ)-এর উক্তির অর্থ এটাই।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মানুষ তার সামনে পাপকর্মে লিপ্ত হতে চায়। অর্থাৎ পদে পদে সে এগিয়ে চলেছে। বুকে আশা বেঁধে রয়েছে এবং বলছেঃ পাপকর্ম করে তো যাই, পরে তাওবা করে নিবো। তারা কিয়ামত দিবসকে, যা তাদের সামনে রয়েছে, অস্বীকার করছে। যেন সে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে আগে বেড়ে চলেছে। সদা-সর্বদা তাকে এ অবস্থাতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, সে পদে পদে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তবে যার উপর আল্লাহ পাক দয়া করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা।

এই আয়াতের তাফসীরে পূর্ব যুগীয় অধিকাংশ মনীষীর উক্তি এটাই যে, সে পাপকার্যে তাড়াতাড়ি করছে এবং তাওবা করতে বিলম্ব করছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অর্থ হলোঃ সে হিসাবের দিনকে অস্বীকার করছে। ইবনে যায়েদেরও (রঃ) এটাই উক্তি। এটাই বেশী প্রকাশমান ভাবার্থও বটে। কেননা, এরপরেই রয়েছেঃ সে প্রশ্ন করেঃ কখন কিয়ামত দিবস আসবে? তার এ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। তার বিশ্বাস তো এটাই যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ قُلْ لَكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّاتَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ “তারা বলে– যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলঃ কিয়ামত কখন হবে? তুমি তাদেরকে বলে দাও – ওর জন্যে একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে যা হতে তোমরা এক ঘন্টা আগেও বাড়তে পার না এবং পিছনেও সরতে পার না।” (৩৪ ঃ ২৯-৩০)

এখানেও মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ لَايَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ “নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না।” (১৪ঃ ৪৩) তারা ভয়ে ও সন্ত্রাসে চক্ষু ফেড়ে ফেড়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকবে। بَرِقَ শব্দটি অন্য পঠনে بَرَقَ রয়েছে। দুটোর অর্থ প্রায় একই।

আল্লাহ্ পাকের উক্তিঃ চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ দুটোকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে। ইবনে যায়েদ (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেছেনঃ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ـ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ

অর্থাৎ “সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।” (৮১ঃ ১-২) হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে وَجُمِعَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ রয়েছে।

মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবেঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হবেঃ না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। এই দিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতইঃ

مَالَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ

অর্থাৎ “আজ না আছে তোমাদের জন্যে কোন আশ্রয়স্থল এবং না আছে এমন জায়গা যেখানে গিয়ে তোমরা অচেনা ও অপরিচিত হয়ে যাবে।” (৪২ঃ ৪৭)

ঘোষিত হচ্ছেঃ সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থাৎ “তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না।”

মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

অর্থাৎ “তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট।” (১৭ঃ ১৪) তার চক্ষু-কর্ণ, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, সে অন্যদের দোষ-ত্রুটি দেখতে রয়েছে, আর নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা হয় যে, তাওরাতে লিখিত রয়েছেঃ “হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ভাই এর চোখের খড়-কুটা দেখতে পাচ্ছ, অথচ তোমার নিজের চোখের তীরটিও দেখতে পাচ্ছ না?”

কিয়ামতের দিন মানুষ বাজে বাহানা, মিথ্যা প্রমাণ এবং নিরর্থক ওযর পেশ করবে, কিন্তু তার একটি ওযরও গৃহীত হবে না।

وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ -এর আর একটি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলোঃ যদিও সে পর্দা ফেলে দেয়। ইয়ামনবাসী পর্দাকে عِذَار বলে থাকে। কিন্তু উপরের অর্থটিই সঠিকতর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ “কোন জ্ঞান সম্মত ওযর পেশ করতে না পেরে তার নিজেদের শির্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলবেঃ আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিকই ছিলাম না।” (৬ঃ ২৩) আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেনঃ

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكذبون ـ

অর্থাৎ "যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন তখন তারা তাঁর সামনে শপথ করে করে নিজেদেরকে সত্যবাদী বানাতে চাইবে, যেমন আজ দুনিয়ায় তোমাদের সামনে মিথ্যা কসম খাচ্ছে, তারা নিজেদেরকে কিছু একটা মনে করছে, কিন্তু আল্লাহ্ নিশ্চিতরূপে জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।" মোটকথা, কিয়ামতের দিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

لا ينفع الظلمين معذرتهم

অর্থাৎ "সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না।" (৪০ঃ ৫২) তারা তো শির্কের সাথে সাথে নিজেদের সমস্ত দুষ্কর্মকেই অস্বীকার করে ফেলবে, কিন্তু সবই বৃথা হবে। তাদের ঐ অস্বীকৃতি তাদের কোনই উপকারে আসবে না।

১৬। তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ব করার জন্যে তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না।

১৭। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।

১৮। সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।

১৯। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।

২০। না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস;

২১। এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।

١٦- لا تحرك به لسانك لتعجل به ○

١٧- ان علينا جمعه وقرانه ○

١٨- فاذا قرانه فاتبع قرانه ○

١٩- ثم ان علينا بيانه ○

٢٠- كلا بل تحبون العاجلة ○

٢١- وتذرون الاخرة ○

২২। সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,	٢٢- وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ○
২৩। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।	٢٣- اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○
২৪। কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ	٢٤- وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ۙ○
২৫। এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।	٢٥- تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ○

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি ফেরেশতার নিকট হতে কিভাবে অহী গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) অহী গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই তাড়াতাড়ি করতেন। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ যখন ফেরেশতা অহী নিয়ে আসবে তখন তুমি শুনতে থাকবে। অতঃপর যে ভয়ে তিনি এরূপ করতেন সেই ব্যাপারে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার বক্ষে ওটা জমা করে দেয়া এবং তোমার ভাষায় তা পড়িয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমার। অনুরূপভাবে তোমার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার। সুতরাং প্রথম অবস্থা হলো মুখস্থ করানো, দ্বিতীয় অবস্থা হলো পড়িয়ে নেয়া এবং তৃতীয় অবস্থা হলো বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়ে নেয়া। তিনটিরই দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজে গ্রহণ করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۘ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অর্থাৎ “তোমার প্রতি আল্লাহর অহীর সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করো না এবং বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করুন।” (২০-১১৪)

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি অর্থাৎ আমার নাযিলকৃত ফেরেশতা ওটা পাঠ করে তখন তুমি ঐ পাঠের অনুসরণ কর অর্থাৎ শুনতে থাকো এবং তার পাঠ শেষ হলে পর পাঠ করো। আমার মেহেরবানীতে তুমি পূর্ণরূপে মুখস্থ রাখতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, বরং এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই। মুখস্থ ও পাঠ করিয়ে নেয়ার পর এটাকে ব্যাখ্যা করে তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া

হবে, যাতে তুমি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং স্পষ্ট শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত হতে পার।

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইতিপূর্বে অহী গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট বোধ হতো। এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই তিনি ফেরেশতার সাথে সাথে পড়তে থাকতেন এবং স্বীয় ওষ্ঠ মুবারক হেলাতে থাকতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় ওষ্ঠ নড়িয়ে দেখিয়ে দেন এবং তাঁর শিষ্য হযরত সাঈদ (রঃ)-ও নিজের উস্তাদের মত নিজের ওষ্ঠ নড়িয়ে তাঁর শিষ্যকে দেখান। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তাড়াতাড়ি অহীর আয়ত্ত্ব করার জন্যে তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন জিবরাঈল (আঃ) এটা পাঠ করে তখন তুমি নীরবে তা শ্রবণ করবে। তার চলে যাওয়ার পর তার মত করেই তোমাকে পড়ানোর দায়িত্ব আমার।[১]

এও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সদা-সর্বদা তিলাওয়াত করতে থাকতেন এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রঃ) বলেন যে, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ-এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার দায়িত্ব আমারই। হযরত কাতাদারও (রঃ) এটাই উক্তি।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ এই কাফিরদেরকে কিয়ামতকে অস্বীকার করতে, আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে অমান্য করতে এবং তাঁর প্রসিদ্ধ রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য না করতে উদ্বুদ্ধকারী হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম এবং আখিরাত বর্জন। অথচ আখিরাতের দিন হলো বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দিন।

১. সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমেও এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে এও রয়েছে যে, যখন অহী অবতীর্ণ হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) চক্ষু নীচু করে নিতেন এবং ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর তিনি তা পাঠ করতেন মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমেও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্বযুগীয় বহু মুফাস্সির গুরুজনও এটাই বলেছেন।

ঐ দিন বহু লোক এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যেমন সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছেঃ "শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে। বহু হাদীসে মুতাওয়াতির সনদে, যেগুলো হাদীসের ইমামগণ নিজেদের কিতাবসমূহে আনয়ন করেছেন, এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। এ হাদীসগুলোকে কেউ সরাতেও পারবে না এবং অস্বীকারও করতে পারবে না। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো?" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট ও অসুবিধা হয় কি?" উত্তরে তাঁরা বললেনঃ "জ্বী, না।" তখন তিনি বললেনঃ "এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।"

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমেই হযরত জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার) চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই চন্দ্রকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং তোমরা সক্ষম হলে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের নামাযে (অর্থাৎ ফজরের নামাযে) এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বের নামাযে (অর্থাৎ আসরের নামাযে) কোন প্রকার অবহেলা করো না।

এই বিশুদ্ধ কিতাব দু'টিতেই হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুটি জান্নাত রয়েছে স্বর্ণের, তথাকার পাত্র এবং প্রত্যেক জিনিসই স্বর্ণ নির্মিত, আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রৌপ্যের, তথাকার পাত্র, বাসন এবং সব কিছুই রৌপ্য নির্মিত। এই জান্নাতগুলোর অধিবাসীদের এবং আল্লাহ্র দীদারের (দর্শনের) মাঝে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের চাদর ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এটা জান্নাতে আদনের বর্ণনা।"

সহীহ্ মুসলিমে হযরত সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "তোমাদের জন্যে আমি আরো কিছু বৃদ্ধি করে দিই তা তোমরা চাও কি?" তারা উত্তরে বলবেঃ "আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদের জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে

রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কোন্ জিনিসের প্রয়োজন থাকতে পারে?" তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে। তখন ঐ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ ও মজা পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না। এই দীদারে বারী তা'আলাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই زِيَادَة বলা হয়েছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ـ

অর্থাৎ "সৎ কর্মশীলদের জন্যে রয়েছে জান্নাত এবং তারা মহান আল্লাহ্র দীদার বা দর্শনও লাভ করবে।" (১০ ঃ ২৬)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে মুমিনদের উপর হাসিযুক্ত তাজাল্লী নিক্ষেপ করবেন।

এসব হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী তার রাজ্য ও রাজত্ব দু'হাজার বছর দেখতে থাকবে। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বস্তু সমান দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। সব জায়গাতেই তারই স্ত্রী ও খাদেম দেখতে পাবে। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের জান্নাতী প্রত্যহ দুই বার করে আল্লাহ্ পাকের চেহারা অবলোকন করবে।[১]

আল্লাহ্র শুকর যে, এই মাসআলায় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার কিয়ামতের দিন মুমিনদের লাভ হওয়া সম্পর্কে সাহাবা, তাবেঈন এবং পূর্বযুগীয় গুরুজনদের ইত্তেফাক ও ইজমা রয়েছে। ইসলামের ইমামগণ ও মানব জাতির হাদীগণও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। যাঁরা এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত রাশিকে দেখা বুঝানো হয়েছে, যেমন হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত আবূ সালিহ্ (রঃ) হতে তাফসীরে ইবনে জারীরে

১. এ হাদীসটি জামে' তিরমিযীতেও রয়েছে। আমরা ভয় করছি যে, যদি এই প্রকারের সমস্ত হাদীস ও রিওয়াইয়াত এবং এগুলোর সনদসমূহ ও বিভিন্ন শব্দ এখানে জমা করি তবে বিষয় খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। বহু সহীহ্ ও হাসান হাদীস, বহু সনদ অন্যান্য সুনানের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই আমাদের এই তাফসীরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এসেও গেছে। অবশ্য তাওফীক প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের এ উক্তি সত্য হতে বহু দূরে এবং এটা কৃত্রিমতাপূর্ণ। তাঁদের কাছে এ আয়াতের জবাব কোথায়? যেখানে পাপীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

অর্থাৎ "কখনই (তাদের ধারণা সত্য) নয়, নিশ্চয়ই সেই দিন তাদের প্রতিপালক হতে তাদেরকে পর্দার মধ্যে রেখে দেয়া হবে (অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হবে)।" (৮৩ঃ ১৫) হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, পাপী ও অপরাধীদের দীদারে ইলাহী হতে বঞ্চিত হওয়া দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সৎ লোকেরা দীদারে ইলাহী লাভ করে ধন্য হবে। মুতাওয়াতির হাদীস সমূহ দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -এ আয়াতের শব্দের ধারাও এটাই প্রমাণ করছে যে, মুমিনরা মহান প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে।

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, 'সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে' এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ কতকগুলো চেহারা সেদিন অতি সুন্দর দেখাবে। কেননা, দীদারে রবের উপর তাদের দৃষ্টি পড়তে থাকবে, তাহলে কেন তাদের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে না? পক্ষান্তরে, বহু মুখমণ্ডল সেদিন হয়ে পড়বে বিবর্ণ, এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে, সত্বরই তাঁদের উপর আল্লাহ্র পাকড়াও আসছে এবং অচিরেই তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হচ্ছে। এ বিষয়টি আল্লাহ্ পাকের নিম্নের উক্তির মতঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

অর্থাৎ "সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হবে।" (৩ ঃ ১০৬) মহান আল্লাহ্র নিম্নের উক্তিগুলোও অনুরূপঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ - وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ -

অর্থাৎ "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল। আর বহু মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। এরাই কাফির ও পাপাচারী।" (৮০ ঃ ৩৮-৪২)

মহিমান্বিত আল্লাহ্র এ উক্তিগুলোও ঐ রূপঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ـ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ـ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ـ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ـ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ـ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ـ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ـ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ـ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ـ

অর্থাৎ "সেই দিন বহু মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে। তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। তাদের জন্যে খাদ্য থাকবে না যারী' (এক প্রকার কন্টকময় গুল্ম) ব্যতীত, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না। বহু মুখমণ্ডল সেই দিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত, সুমহান জান্নাতে।" (৮৮ঃ ২-১০) এই বিষয়েরই আরো বহু আয়াত রয়েছে।

২৬। কখনই (তোমাদের ধারণা ঠিক) না, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে,

٢٦- كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝

২৭। এবং বলা হবেঃ কে তাকে রক্ষা করবে?

٢٧- وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۝

২৮। তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।

٢٨- وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝

২৯। এবং পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে।

٢٩- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

৩০। সেই দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে।

٣٠- إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

৩১। সে বিশ্বাস করিনি এবং নামায পড়েনি।

٣١- فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝

৩২। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

٣٢- وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

৩৩। অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে,

৩৩- ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۝

৩৪। দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ!

৩৪- اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝

৩৫। আবার দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ!

৩৫- ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝

৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?

৩৬- اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝

৩৭। সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

৩৭- اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝

৩৮। অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন।

৩৮- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝

৩৯। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী।

৩৯- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

৪০। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

৪০- اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِ َ الْمَوْتٰى ۝ ع

এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু-যাতনার খবর দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে ঐ কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর স্থির থাকার তাওফীক দান করুন! كَلَّا শব্দটিকে এখানে ধমকের অর্থে নেয়া হলে অর্থ হবেঃ হে আদম সন্তান! তুমি যে আমার খবরকে অবিশ্বাস করছো তা ঠিক ও উচিত নয়, বরং তাঁর কাজ-কারবার তো তুমি দৈনন্দিন প্রকাশ্যভাবে দেখতে রয়েছো। আর যদি এটা حَقًّا অর্থে নেয়া হয় তবে তো ভাবার্থ বেশী প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ যখন তোমার রূহ্ তোমার দেহ থেকে বের হতে লাগবে এবং তোমার কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। تَرَاقِيَ শব্দটি تَرْقُوَةٌ শব্দের বহু বচন। এটা ঐ অস্থিগুলোকে বলা হয় যেগুলো বক্ষ এবং কাঁধের মাঝে থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

فلولا إذا بلغت الحلقوم ـ وانتم حينئذ تنظرون ـ ونحن اقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون ـ فلولا إن كنتم غير مدينين ـ ترجعونها إن كنتم صدقين ـ

অর্থাৎ “পরন্তু কেন নয়– প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাকো, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!” (৫৬ ঃ ৮৩-৮৭)

এখানে ঐ হাদীসটিও লক্ষ্যণীয় যা বিশ্‌র ইবনে হাজ্জাজ (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে গত হয়েছে। تَرَاقِى যা تَرْقُوَة -এর বহুবচন, ঐ হাড় যা হলকূমের কাছে রয়েছে। বলা হবেঃ কে তাকে রক্ষা করবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি? আবূ কালাবা (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ কোন ডাক্তার ইত্যাদির দ্বারা কি আরোগ্য দান করা যেতে পারে? হযরত কাতাদাহ্ (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ) এবং ইবনে যায়েদ (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ফেরেশতাদের উক্তি। অর্থাৎ এই রূহকে নিয়ে কোন্ ফেরেশতারা আকাশের উপর উঠে যাবে, রহমতের ফেরেশতারা, না আযাবের ফেরেশতারা?

মহান আল্লাহ্র উক্তিঃ পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। এর একটি ভাবার্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাত তার উপর জমা হয়ে যাবে। ওটা দুনিয়ার শেষ দিন হয় এবং আখিরাতের প্রথম দিন হয়। সুতরাং সে কঠিন হতে কঠিনতম অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে কারো উপর আল্লাহ্ রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হযরত ইকরামা (রঃ) হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক বড় ব্যাপার অন্য এক বড় ব্যাপারের সাথে মিলিত হয়। বিপদের উপর বিপদ এসে পড়ে।

তৃতীয় ভাবার্থ হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ মনীষী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং মরণোন্মুখ ব্যক্তির কঠিন যন্ত্রণার কারণে তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। পূর্বে সে তো এই পায়ের উপর চলাফেরা করতো, কিন্তু এখন এতে জীবন কোথায়? আবার এও বর্ণিত হয়েছে যে, কাফন পরানোর সময় পদনালীর সাথে পদনালী মিলে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। হযরত যহ্হাক (রঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, দু'টি কাজ দু'দিকে জমা হয়ে যায়। এক দিকে তো

মানুষ তার মৃতদেহ ধুয়ে-মুছে মাটিকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, অপরদিকে ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যেতে ব্যস্ত। নেককার হলে তো ভাল প্রস্তুতি ও ধুমধামের সাথে নিয়ে যান এবং বদকার হলে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থার সাথে নিয়ে যান।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ সেই দিন আল্লাহ্র নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে। রূহ্ আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেনঃ তোমরা এই রূহকে পুনরায় যমীনেই নিয়ে যাও। কারণ আমি তাদের সবকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং তা হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো। যেমন এটা হযরত বারা (রাঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টিই অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছেঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ - ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ -

অর্থাৎ "তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর বিজয়ী, তিনিই তোমাদের হিফাযতের জন্যে তোমাদের নিকট ফেরেশ্তা পাঠিয়ে থাকেন, শেষ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করে না। তারপর তাদের সকলকেই তাদের সত্য মাওলা আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জেনে রেখো যে, হুকুম তাঁরই এবং তিনিই সত্বরই হিসাব গ্রহণকারী।" (৬ঃ ৬১-৬২)

এরপর ঐ কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, নিজের আকীদায় সত্যকে অবিশ্বাসকারী এবং স্বীয় আমলে সত্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ছিল। কোন মঙ্গলই তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। না সে আল্লাহ্র কথাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো, না শারীরিকভাবে তাঁর ইবাদত করতো, এমনকি সে নামাযও কায়েম করতো না। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ

অর্থাৎ "যখন তারা তাদের আপন জনের নিকট ফিরে আসতো তখন তারা ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে।" (৮৩ঃ ৩১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا - اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ -

অর্থাৎ "সে তার পরিজনের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই ফিরে যাবে না।" (৮৪ঃ ১৩-১৪) এর পরেই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

بَلٰىٓ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا -

অর্থাৎ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।" (৮৪ঃ ১৫)

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনের সুরে বলেনঃ দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ! আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরী করেও তুমি দম্ভ প্রকাশ করছো! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "(বলা হবেঃ) আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।" এটা তাকে ঘৃণা ও ধমকের সুরে কিয়ামতের দিন বলা হবে। আরো বলেনঃ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা অল্প কিছুদিন খাও ও সুখ ভোগ করে নাও, নিশ্চয়ই তোমরা তো অপরাধী।" (৭৭ ঃ ৪৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ -

অর্থাৎ "যাও, আল্লাহ্ ছাড়া যার ইচ্ছা ইবাদত করতে থাকো।" (৩৯ ঃ ১৫) এ সমুদয় স্থানে এসব কথা ধমকের সুরেই বলা হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ)- কে اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى - ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى –এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, নবী পাক (সঃ) আবূ জেহেলকে এই কথাগুলো বলেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে হুবহু এই শব্দগুলো অবতীর্ণ করেন। সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও প্রায় এরূপই বর্ণিত আছে।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এই ফরমানের পর আল্লাহ্র ঐ দুশমন বলেছিলঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? জেনে রেখো যে, তুমি ও তোমার প্রতিপালক আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এই দুই পাহাড়ের মাঝে চলাচলকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি আমিই।"

মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ এরপর বলেনঃ মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? অর্থাৎ সে কি এটা ধারণা করে যে, তাকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা হবে না? তাকে কোন হুকুম ও কোন কিছু হতে নিষেধ করা হবে না? এরূপ কখনো নয়, বরং দুনিয়াতেও তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হবে এবং পরকালেও তার কৃতকর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। এখানে উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতকে সাব্যস্ত করা এবং কিয়ামত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা। এ জন্যেই এর দলীল হিসেবে বলা হচ্ছেঃ মানুষ তো প্রকৃত পক্ষে শুক্রের আকারে প্রাণহীন ও ভিত্তিহীন পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফোঁটা ছাড়া কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেন, তারপর তা গোশতের টুকরায় পরিণত হয়, এরপর মহান আল্লাহ্ ওকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর নারী। যে আল্লাহ্ এই তুচ্ছ শুক্রকে সুস্থ ও সবল মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি তাকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না? অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরো বেশী সক্ষম হবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার ওকে ফিরিয়ে আনবেন (মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন) এবং এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।" (৩০ ঃ ২৭) এই আয়াতের ভাবার্থের ব্যাপারেও দু'টি উক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রসিদ্ধ। যেমন সূরা রূমের তাফসীরে এর বর্ণনা ও আলোচনা গত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত মূসা ইবনে আবী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক স্বীয় ঘরের ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই সূরার اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন তখন তিনি سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ فَبَلٰى পাঠ করেন অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র ও মহান। হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই এতে সক্ষম।" জনগণ তাঁকে এটা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এটা পাঠ করতে শুনেছি।"[১]

১. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদেও রয়েছে। কিন্তু দু'টি কিতাবেই ঐ সাহাবী (রাঃ) -এর নাম উল্লেখ করা হলেও কোন ক্ষতি নেই।

সুনানে আবু দাউদেই হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করবে এবং اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (৯৫ ঃ ৮) এই আয়াত পর্যন্ত পড়বে সে যেন পাঠ করেঃ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ অর্থাৎ "হ্যাঁ, (আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক) এবং সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন সাক্ষী।" (৯৫ ঃ ১) আর যে, ব্যক্তি لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এ সূরাটি পাঠ করবে এবং اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যেন সে بَلٰى (হ্যাঁ) পাঠ করে। আর যে ব্যক্তি وَالْمُرْسَلٰتِ-এ সূরাটি পাঠ করবে এবং فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (অর্থাৎ "সুতরাং তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে!") (৭৭ ঃ ৫০) এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যেন সে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি) বলে। এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ এবং জামে' তিরমিযীতেও রয়েছে।

তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) এই সূরা কিয়ামাহ্র শেষ আয়াতের পরে سُبْحَانَكَ وَبَلٰى বলতেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى পাঠ করার পর سُبْحَانَكَ فَبَلٰى বলেছেন।

সূরাঃ কিয়ামাহ্-এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ দাহ্‌র মাদানী

(আয়াত ঃ ৩১, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সহীহ্ মুসলিমের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতিপূর্বে গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জুমআর দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ-লাম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন। একটি মুরসাল গারীব হাদীসে রয়েছে যে, যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তা পাঠ করেন তখন তাঁর নিকট একটি কালো বর্ণের সাহাবী (রাঃ) বসেছিলেন। যখন জান্নাতের গুণাবলীর বর্ণনা আসে তখন হঠাৎ তাঁর মুখ হতে একটা ভীষণ চীৎকার বের হয় এবং সাথে সাথে তাঁর দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যায়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমাদের সাথী এবং তোমাদের ভাই-এর প্রাণ জান্নাতের আগ্রহে বেরিয়ে গেছে।"

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

١- هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـئًا مَّذْكُوْرًا ○

২। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে, এই জন্যে আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

٢- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।

٣- اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ○

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মানুষকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং

বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا-

অর্থাৎ "তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্যে যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?" (৬৭ ঃ ২) সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন যাতে আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করতে পার।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমার সরল সোজা পথ তোমার কাছে খুলে দিয়েছি।

যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى -

অর্থাৎ "সামূদ সম্প্রদায়কে আমি পথের নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা অন্ধত্বকে হিদায়াতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল।" (৪১ঃ ১৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ অর্থাৎ "আমি তাকে দু'টি পথই দেখিয়েছি।" (৯০ঃ ১০) অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথই প্রদর্শন করেছি। اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ-এই আয়াতের তাফসীরে হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত আবূ সালিহ্ (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ) এবং হযরত সুদ্দী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পথ দেখানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ আমি তাকে মায়ের পেট হতে বের হবার পথ দেখিয়েছি। কিন্তু এটা গারীব উক্তি। প্রথম উক্তিটিই সঠিক।

اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا এখানে حَال হওয়ার কারণে شَاكِرًا এবং كَفُوْرًا -এর উপর نَصَب বা যবর হয়েছে। এর ذُوالْحَال হলো هَدَيْنٰهُ এর 'هٗ' সর্বনামটি। অর্থাৎ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি এমন অবস্থায় যে সে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান। যেমন সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল বেলায় স্বীয় নফ্সকে বিক্রিকারী হয়ে থাকে, হয় সে ওকে মুক্তকারী হয়, না হয় ওকে ধ্বংসকারী হয়।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রাঃ)-কে বলেনঃ "আল্লাহ তোমাকে

নির্বোধদের নেতৃত্ব হতে রক্ষা করুন!” হযরত কাব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নির্বোধদের নেতৃত্ব কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “তারা ঐ সব নেতা যারা আমার পরে নেতৃত্ব লাভ করবে। তারা না আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে, না আমার তরীকার উপর চলবে। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং উৎপীড়নমূলক কার্যে সাহায্য করবে তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। জেনে রেখো যে, তারা আমার হাউযে কাওসারের উপরও আসতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাদের অত্যাচারমূলক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবে না তারা আমার এবং আমি তাদের। তারা আমার হাউযে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে। হে কা’ব (রাঃ)! রোযা ঢাল স্বরূপ, সাদকা বা দান-খয়রাত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয় এবং নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ অথবা বলেছেনঃ মুক্তির দলীল। হে কাব (রাঃ)! (দেহের) ঐ গোশত জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ওটা জাহান্নামেরই যোগ্য। হে কা’ব (রাঃ)! মানুষ সকাল বেলায় নিজের নফ্সকে বিক্রী করে থাকে। কেউ ওকে আযাদকারী হয় এবং কেউ হয় ওকে ধ্বংসকারী।” সূরা রূমের فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْـهَا আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (৩০ঃ ৩০) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত জাবির (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের উক্তিটি গত হয়েছেঃ “প্রত্যেক সন্তান ইসলামের ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার জিহ্বা চলতে থাকে, হয় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।”

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তিই (বাড়ী হতে) বের হয় তারই দরযার উপর দুটি পতাকা থাকে, একটি থাকে ফেরেশতার হাতে এবং অপরটি থাকে শয়তানের হাতে। যদি সে এমন কাজের জন্যে বের হয়ে থাকে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট, তবে ফেরেশতা তাঁর পতাকা নিয়ে তার সাথী হয়ে যান এবং তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে ফেরেশতার পতাকার নীচেই থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে বের হয়, শয়তান তার পতাকা নিয়ে তার সাথে হয়ে যায় এবং তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকা তলেই থাকে।”

৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

٤- إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفِرِينَ سَلْسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ○

৫। সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফূর (কর্পুর)

٥- إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ○

৬। এমন একটি প্রস্রবণের যা হতে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

٦- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ○

৭। তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেইদিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।

٧- يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○

৮। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে,

٨- وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○

৯। এবং বলেঃ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

٩- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ○

১০। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।

١٠- إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ○

১১। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ,

١١- فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ○

১২। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।	١٢- وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ٥

এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর মাখলূকের মধ্যে যে কেউই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

اِذِ الاغلل فِى اعناقِهِمْ والسَّلسِلُ يسحبون - فِى الحمِيمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يسجرون

অর্থাৎ "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।" (৪০-৭১-৭২)

হতভাগ্যদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ ও ভাগ্যবানদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পান করানো হবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফূর। কাফূর একটি নহরের নাম যা হতে আল্লাহর খাস বান্দারা পানি পান করবে এবং শুধু ওর দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করবে। এ জন্যেই এখানে এটাকে بِ দ্বারা مُتَعدِّى করা হয়েছে এবং تَمِيز হিসেবে عَيْنًا -এর উপর نَصَب বা যবর দেয়া হয়েছে। কিংবা এই পানি সুগন্ধির দিক দিয়ে কর্পূরের মত অথবা ওটা আসলই কর্পূর। আর عَيْنًا -এর উপর যবর হয়েছে يَشْرَب ক্রিয়াটির কারণে। এই নহর পর্যন্ত যাওয়াও তাদের প্রয়োজন হবে না। তারা তাদের বাগানে, মহলে, মজলিসে, বৈঠকে যেখানেই ইচ্ছা করবে তাদের কাছে ঐ পানি পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

تَفْجِير -এর অর্থ হলো প্রবাহিত করা বা উৎসারিত করা যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من الارض ينبوعا -

অর্থাৎ "তারা বলে – আমরা কখনো তোমাতে ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে।" (১৭ ঃ ৯০) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وفجرنا خللهما نهرا

অর্থাৎ "এবং আমি উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।" (১৮ঃ ৩৩)

এখন এই লোকদের পুণ্যময় কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ইবাদতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর ছিল তা তো তারা যথাযথভাবে পালন করতোই, এমন কি তারা যেসব দায়িত্ব নিজেরাই নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোও তারা পুরোপুরিভাবে পালন করতো। অর্থাৎ তারা তাদের নযরও পুরো করতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর মানবে বা প্রতিজ্ঞা করবে তা যেন সে পুরো করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার নযর মানবে সে যেন তা পুরো না করে (অর্থাৎ যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না করে)।"[১]

আর তারা কিয়ামত দিবসের ভয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিত্যাগ করে, যে দিবসের সন্ত্রাস সাধারণভাবে সবকেই পরিবেষ্টন করবে। সেই দিন সবাই ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তবে আল্লাহ পাক কারো প্রতি রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ঐদিন সন্ত্রাস আকাশ ও পৃথিবী পর্যন্ত ছেয়ে যাবে।

اِسْتِطَار -এর অর্থ হলো ব্যাপকভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া বা চতুর্দিক পরিবেষ্টন করা।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই সৎকর্মশীল লোকগুলো আল্লাহর মহব্বতে হকদার লোকদের উপর সাধ্যমত খরচ করে থাকে। কারো কারো মতে ه সর্বনামটি طَعَام -এর দিকে ফিরেছে। শব্দের দিক দিয়ে এটাই বেশী প্রকাশমানও বটে। অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ওর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা তা আল্লাহর পথে খরচ করে থাকে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

অর্থাৎ "মালের প্রতি আসক্তি এবং ওর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ওটা সে আল্লাহর পথে খরচ করে থাকে।" (২ঃ ১৭৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (৩ঃ ৯২)

হযরত নাফে (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইবনে উমার (রাঃ) রুগ্ন হয়ে পড়েন। আঙ্গুরের মৌসুমে আঙ্গুর পাকতে শুরু করলে তাঁর স্ত্রী হযরত সুফিয়া (রাঃ) লোক পাঠিয়ে এক দিরহামের আঙ্গুর আনিয়ে নেন। ঠিক ঐ সময়েই দরযায় এক ভিক্ষুক এসে পড়ে এবং ভিক্ষা চায়। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এই আঙ্গুর ভিক্ষুককে দিয়ে দিতে বলেন। সুতরাং তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আবার লোক গিয়ে আঙ্গুর ক্রয় করে আনে। কিন্তু এবারও ভিক্ষুক এসে পড়ে এবং ভিক্ষা চেয়ে বসে। এবারও হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তা ভিক্ষুককে দিয়ে দিবার নির্দেশ দেন। সুতরাং এবারও ঐ আঙ্গুর ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু হযরত সুফিয়া (রাঃ) এবার ঐ ভিক্ষুককে বলে দেনঃ "আল্লাহর কসম! এর পরেও তুমি ফিরে আসলে তোমাকে আর কিছুই দেয়া হবে না।" অতঃপর আবার তিনি এক দিরহামের আঙ্গুর আনিয়ে নেন।"[১]

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "উত্তম সাদকা হলো ঐ সাদকা যা তুমি এমন অবস্থায় করছো যে, তুমি সুস্থ শরীরে রয়েছো, মালের প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে, ধনী হওয়ার তোমার আকাঙ্খা আছে এবং গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ও তোমার রয়েছে (এতদসত্ত্বেও তুমি সাদকা করছো)।" অর্থাৎ মালের প্রতি লোভ-লালসাও রয়েছে, ভালবাসাও আছে এবং অভাব অনটনও রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহর পথে দান করা হচ্ছে।

ইয়াতীম ও মিসকীন কাকে বলে এর বর্ণনা ও বিশেষণ ইতিপূর্বে গত হয়েছে। আর বন্দী সম্পর্কে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হযরত হাসান (রঃ) এবং হযরত যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলমান আহলে কিবলা বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময় তো শুধু মুশরিক বন্দীরাই ছিল। এর প্রমাণ হলো ঐ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরী বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, তাঁরা যেন তাদের সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই নির্দেশ অনুসারে সাহাবীগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজেদের অপেক্ষা ঐ বন্দীদের প্রতিই বেশী লক্ষ্য রাখতেন। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এখানে বন্দী দ্বারা গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি আম বা সাধারণ হওয়ার কারণে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই

১. এটা ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পছন্দ করেছেন এবং মুসলমান ও মুশরিক সবকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। গোলাম ও অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগীদ বহু হাদীসেই রয়েছে। এমন কি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) স্বীয় উম্মতকে বিদায় উপদেশে বলেনঃ "তোমরা নামাযের হিফাযত করবে এবং তোমাদের অধীনস্থদের (গোলাম ও বাঁদীদের) সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"

মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা বলেঃ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। অর্থাৎ তারা এই সদ্ব্যবহারের কোন প্রতিদান মানুষের কাছে চায় না এবং তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক এ কামনাও তারা করে না। বরং তারা নিজেদের অবস্থা দ্বারা যেন এটাই ঘোষণা করে যে, তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খরচ করে থাকে। তারা যেন এর বিনিময়ে আল্লাহ পাকের নিকট পারলৌকিক পুণ্য লাভ করতে পারে।

হযরত সাঈদ (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম! ঐ পুণ্যময় লোকেরা উপরোক্ত কথা মুখে প্রকাশ করেন না, বরং এটা তাদের মনের ইচ্ছা, যা আল্লাহ পাক জানেন এবং তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন যাতে এতে জনগণের আগ্রহ জন্মে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই পবিত্র দলটি এই খায়রাত ও সাদকা করে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আযাব হতে বাঁচতে চায়, যা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্ধকার এবং সুদীর্ঘ। তাদের বিশ্বাস যে, এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন এবং ঐ ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর দিনে তাদের এই পুণ্যের কাজগুলো তাদের উপকারে আসবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, عَبُوْس -এর অর্থ হলো সংকীর্ণতা এবং قَمْطَرِيْر -এর অর্থ হলো দীর্ঘতা। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ঐদিন কাফিরদের মুখ বিকৃত হয়ে যাবে, ভ্রূকুঞ্চিত হবে এবং তাদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে ঘর্ম বইতে থাকবে যা রওগণ গন্ধকের মত হবে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তাদের ওষ্ঠ উপরের দিকে উঠে যাবে এবং চেহারা জড় হয়ে যাবে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, ভয় সন্ত্রাসের কারণে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং কপাল সংকীর্ণ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, ওটা হবে খুবই মন্দ ও কঠিন দিন। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিটি। ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) বলেন যে, قَمْطَرِيْر -এর আভিধানিক অর্থ হলো কাঠিণ্য। অর্থাৎ ঐদিন হবে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ।

মহান আল্লাহ বলেন যে, তাদের এ আন্তরিকতা ও সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ দিনের ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয়, এমন কি সেই দিনের দুরবস্থার স্থলে তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। এখানে কতই না অলংকার পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ـ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

অর্থাৎ "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল।" (৮০ ঃ ৩৮-৩৯) এটা প্রকাশমান কথা যে, মন আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকলে চেহারাও হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময়।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন সময় আনন্দিত হলে তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো এবং মনে হতো যেন চন্দ্রের খণ্ড।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন, ঐ সময় তাঁর চেহারা মুবারকের শিরাগুলো আনন্দে উজ্জ্বল ও চমকিত ছিল (শেষ পর্যন্ত)।"

আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফেরার জন্যে মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান করার জন্যে দিবেন রেশমী বস্ত্র। অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফেরার জন্যে মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান করার জন্যে দিবেন রেশমী বস্ত্র।

ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা সুলাইমান দারানীর (রঃ) সামনে هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ সূরাটি পাঠ করা হয়। কারী যখন وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا-এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন যে, তাঁরা পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিম্নের কবিতা পাঠ করেনঃ

كَمْ قَتِيْلٍ لِشَهْوَةٍ وَاَسِيْرٍ * اُفٍّ مِّنْ مُّشْتَهِىْ خِلَافِ الْجَمِيْلِ
شَهَوَاتُ الْاِنْسَانِ تُوْرِثُهُ الذُّلَّ * وَتُلْقِيْهِ فِى الْبَلَاءِ الطَّوِيْلِ

অর্থাৎ "বড়ই আফসোস যে, প্রবৃত্তির চাহিদা এবং মঙ্গলের স্থলে কামনা বহুজনকে গলাটিপে হত্যা করেছে। প্রবৃত্তির চাহিদা এমনই এক জিনিস যা মানুষকে নিকৃষ্টতম লাঞ্ছনা, অপমান এবং বিপদ আপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে থাকে।"

১৩। সেথায় তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না।

١٣- مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

১৪। সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্বাধীন করা হবে।

١٤- وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

১৫। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে --

١٥- وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ۝

১৬। রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

١٦- قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝

১৭। সেথায় তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়,

١٧- وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝

১৮। জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যার নাম সালসাবীল।

١٨- عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝

১৯। তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা,

١٩- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝

২০। তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

٢٠- وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا ۝

২১। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

٢١- عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝

২২। অবশ্য, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।

٢٢- اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

জান্নাতীদের নিয়ামতরাশি, তাদের সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সর্বপ্রকারের শান্তিতে ও মনের সুখে জান্নাতের সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবে। সূরা সাফফাতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, اِتِّكَاءً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়ন করা বা কনুই পেড়ে বসা বা চার জানু বসা অথবা কোমর লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসা। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, اَرَائِكَ বলা হয় ছাপর খাটকে।

অতঃপর এখানে আর একটি নিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের কোন কষ্ট হবে না বা সেখানে তারা অতিশয় শীতও বোধ করবে না। অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ করবে। বরং তথায় সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। জান্নাতী গাছের শাখাগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের উপর ছায়া করবে। গাছের ফলগুলো তাদের খুবই নিকটে থাকবে। ইচ্ছা করলে তারা শুয়ে শুয়েই ভেঙ্গে খাবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে ভেঙ্গে নিবে এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ভেঙ্গে খেতে পারবে। কষ্ট করে গাছে উঠবার কোন প্রয়োজনই হবে না। মাথার উপর ফলের ছড়া বা কাঁদি লটকে থাকবে। পাড়বে ও খাবে। দাঁড়ালে দেখবে যে, ডাল ঐ পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে, বসলে

দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুয়ে গেলে দেখবে যে, ফলসহ ডাল আরো নিকটে এসে গেছে। না কাঁটার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে থাকার কোন ঝামেলা রয়েছে।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, জান্নাতের যমীন হলো রৌপ্যের, ওর মাটি হলো খাঁটি মৃগনাভীর, ওর বৃক্ষের কাণ্ড হলো সোনা-চাঁদির, শাখা মণি-মুক্তা, যবরজদ ও ইয়াকূতের। এগুলোর মাঝে রয়েছে পাতা ও ফল, যেগুলো পেড়ে নিতে কোন কষ্ট ও কাঠিণ্য নেই। ইচ্ছা করলে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে পেড়ে নেয়া ও খাওয়া যাবে।

একদিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর পরিচারক নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে পরিবেশনকারীরা আদেশের জন্যে অপেক্ষমান রয়েছে। ঐ পানপাত্রগুলো পরিষ্কার ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাঁচের মত এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে রৌপ্যের মত। ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সমস্ত জিনিস শুধু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। কিন্তু আসলে ঐ রৌপ্য ও কাঁচের পানপাত্রগুলোর কোন তুলনা দুনিয়ায় নেই। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রথম قَوَارِيْرَ শব্দটির উপর كَانَ -এর خَبَر হিসেবে যবর হয়েছে এবং দ্বিতীয় قَوَارِيْرَ -এর উপর যবর হয়েছে تَمْيِيْز -এর ভিত্তিতে।

পরিবেশনকারীরা পানপাত্র যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ পানকারীরা যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় দ্বারাই ঐ পানপাত্রগুলো পূর্ণ করা হবে। ঐ পানীয় পান করার পর কিছু বাঁচবেও না, আবার তৃপ্তি সহকারে পান করতে গিয়ে তা কমেও যাবে না। জান্নাতীরা এই সব দুষ্প্রাপ্য পানপাত্রগুলোতেও এই যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা প্রাপ্ত হবে ওগুলো সালসাবীল নামক নহরের পানি দ্বারা মিশ্রিত করে তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন উপরে বর্ণনা গত হয়েছে যে, কাফূরের পানি দ্বারা মিশ্রিত করে দেয়া হবে। তাহলে ভাবার্থ এই যে, কখনো ঠাণ্ডা পানি মিশ্রিত করা হবে এবং কখনো গরম পানি মিশ্রিত করা হবে যাতে সমতা রক্ষা পায় এবং নাতিশীতুষ্ণ হয়ে যায়। এটা সৎকর্মশীল লোকদের বর্ণনা। খাস ও নৈকট্যলাভকারী বান্দারাই এই নহরের শরবত পান করবে।

হযরত ইকরামা (রঃ)-এর মতে 'সালসাবীল' হলো জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। কেননা, ওটা পর্যায়ক্রমে দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে। ওর পানি অত্যন্ত হালকা, খুবই মিষ্টি, সুস্বাদু এবং সুগন্ধময়। ওটা অতি সহজেই পান করা যাবে। এই নিয়ামতরাজির সাথে সাথে জান্নাতীদের জন্যে রয়েছে সুন্দর, সুশ্রী অল্প বয়স্ক কিশোরগণ, যারা তাদের খিদমতের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকবে। এই জান্নাতী বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে। তাদের বয়সের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এমন নয় যে, তারা বয়স্ক হয়ে যাবার ফলে তাদের আকৃতি বিকৃত হবে। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিহিত বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এ কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা। এরচেয়ে বড় উপমা তাদের জন্যে আর কিছু হতে পারে না। তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমতের জন্যে সদা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে এক হাজার করে খাদেম থাকবে যারা বিভিন্ন কাজ-কর্মে লেগে থাকবে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, সর্বশেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ বলবেনঃ "তোমার জন্যে রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ জিনিস এবং তারও দশগুণ।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে ঐ হাদীসটিও গত হয়েছে, যাতে রয়েছে যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর রাজ্য ও রাজত্বের মধ্যে ভ্রমণপথ হবে দু'হাজার বছর (অর্থাৎ দু'হাজার বছর ধরে ভ্রমণ করা যাবে)। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সব জিনিসই সে এক রকমই দেখবে। এই অবস্থা তো হবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর। তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন হাবশী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "তোমার যা কিছু জানবার ও বুঝবার আছে তা আমাকে প্রশ্ন কর।" তখন সে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রূপে ও রঙে এবং নবুওয়াতের দিক থেকে আপনাকে

আমাদের উপর ফযীলত দেয়া হয়েছে। এখন বলুন তো, যার উপর আপনি ঈমান এনেছেন তার উপর যদি আমিও ঈমান আনি এবং যার উপর আপনি আমল করছেন তার উপর যদি আমিও আমল করি তবে কি আমিও আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে পারি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কালো বর্ণের লোককে জান্নাতে ঐ সাদা রঙ দেয়া হবে যা হাজার বছরের পথের দূরত্ব হতে দেখা যাবে!" তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার জন্যে আল্লাহর আহদ বা প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলে তার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পুণ্য লিখা হয়।" লোকটি তখন বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরপরেও আমরা কি করে ধ্বংস হতে পারি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "একটা লোক এতো বেশী (সৎ) আমল নিয়ে আসবে যে, যদি ওগুলো কোন পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয় তবে ওর উপর অত্যন্ত ভারী বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলোর মুকাবিলায় যখন আল্লাহর নিয়ামতরাশি আসবে তখন ঐ সমুদয় আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু আল্লাহর দয়া হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।" ঐ সময় هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ হতে مُلْكًا كَبِيْرًا পর্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন হাবশী বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) জান্নাতে আপনার চক্ষু যা দেখবে তাই আমার চক্ষুও দেখবে কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" একথা শুনে লোকটি কাঁদতে লাগলো। এমন কি (কাঁদতে কাঁদতে) তার দেহ হতে প্রাণপাখী উড়ে গেল। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের হাতে তাকে দাফন করেন।"[১]

এরপর জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের দেহের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম। سُنْدُسٍ হলো ঐ উন্নত মানের রেশম যা খাঁটি ও নরম এবং যা দেহের সাথে লেগে থাকবে। আর اِسْتَبْرَقٍ হলো উত্তম ও অতি মূল্যবান রেশম যাতে উজ্জ্বল্য থাকবে এবং যা উপরে পরিধান করানো হবে। সাথে সাথে হাতে চাঁদীর কংকন থাকবে। এটা হলো সৎলোকদের পোশাক। আর বিশেষ নৈকট্যলাভকারীদের ব্যাপারে অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছেঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

অর্থাৎ "তাদেরকে জান্নাতে সোনা ও মুক্তার কংকন পরানো হবে এবং তাদের পোশাক হবে খাঁটি নরম রেশমের।" (২২ঃ ২৩)

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব হাদীস।

এই বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় যা তাদের বাইরের ও ভিতরের সমস্ত কলুষতাকে দূর করে দিবে। যেমন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন জান্নাতীরা জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন তারা দুটি নহর দেখতে পাবে, যার খেয়াল যেন তাদের মনেই জেগেছিল। একটির পানি তারা পান করবে। ফলে তাদের অন্তরের কালিমা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে। অন্যটিতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় সৌন্দর্যই তারা পুরো মাত্রায় লাভ করবে। এখানে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর তাদেরকে খুশী করার জন্যে এবং তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্যে বারবার বলা হবেঃ এটা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

অর্থাৎ "তোমরা পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।" (৬৯ঃ ২৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমাদেরকে এই জান্নাতের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।" (৭ঃ ৪৩) এখানেও বলা হয়েছেঃ তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কম আমলের বিনিময়ে বেশী প্রতিদান প্রদান করেছেন।

২৩। আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে,

٢٣- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ○

২৪। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার আনুগত্য করো না।

٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ○

٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝

২৫। এবং তোমাদের প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়,

٢٦- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

২৬। রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদায় নত হও, এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

٢٧- اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاۤءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝

২৭। তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে।

٢٨- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝

২৮। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।

٢٩- اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاۤءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

২৯। এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

٣٠- وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৩০। তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٣١- يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاۤءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ ع

৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমরা তাদের জন্যে তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর যে খাস অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ আমি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে এই কুরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এখন এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তুমি আমার পথে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও। আমার ফায়সালার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকো। তুমি দেখবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে মহাসম্মানিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবো। এই কাফির ও মুনাফিকদের কথার প্রতি তুমি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করবে না। তারা তোমাকে এই তাবলীগের কাজে বাধা দিলেও তুমি তাদের বাধা মানবে না। বরং তাবলীগের কাজে তুমি নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাবে। তুমি নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। আমার সত্ত্বার উপর তুমি ভরসা রাখবে। আমি তোমাকে লোকদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবো। তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

اٰثِم বলা হয় فَاجِر বা দুষ্কর্মশীল নাফরমানকে। আর كَفُوْر হলো ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে আল্লাহর নাম স্মরণ কর।

আর রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদায় নত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেনঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

অর্থাৎ “রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।” (১৭ ঃ ৭৯) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا - نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا - اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا-

অর্থাৎ “হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।” (৭৩ঃ ১-৪)

এরপর কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তোমরা দুনিয়ার প্রেমে পড়ে আখিরাতকে পরিত্যাগ করো না। ওটা বড়ই কঠিন দিন। এই নশ্বর জগতের পিছনে পড়ে ঐ ভয়াবহ দিন হতে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সবারই সৃষ্টিকর্তা আমিই। সবারই গঠন সুদৃঢ় আমিই করেছি। কিয়ামতের দিন তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এটাকে অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃষ্টিকরণের দলীল বানানো হয়েছে। আবার এর ভাবার্থ এও হবেঃ আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذٰلِكَ قَدِيرًا ـ

অর্থাৎ "হে লোক সকল! তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে অন্যদেরকে আনয়ন করবেন এবং এর উপর আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (৪ঃ ১৩৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

অর্থাৎ "তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অন্য জাতি আনয়ন করবেন এবং ওটা আল্লাহর উপর মোটেই কঠিন কাজ নয়।" (১৪ঃ ১৯-২০)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ....

অর্থাৎ "যদি তারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান আনতো তবে তাদের উপর কি বোঝা চাপতো? (শেষ পর্যন্ত)!" (৪ঃ ৩৯)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ব্যাপার এই যে, তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা হিদায়াত লাভের যোগ্য পাত্র তাদের জন্যে তিনি হিদায়াতের পথ সহজ করে দেন এবং হিদায়াতের উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্টতার পাত্র বানিয়ে নেয় তাকে তিনি হিদায়াত হতে দূরে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক কাজেই তাঁর পূর্ণ নিপুণতা ও পুরো যুক্তি রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং সরল সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। তাঁর হিদায়াতকে না কেউ হারিয়ে দিতে পারে এবং না কেউ তাঁর গুমরাহীকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করতে পারে। তাঁর শাস্তি পাপী, যালিম এবং অন্যায়কারীর জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে।

সূরা ঃ দাহ্‌র -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ মুরসালাত মাক্কী

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৫০, রুকূ' ঃ ২)

(اٰيَاتُهَا: ٥٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিনার গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় وَالْمُرْسَلٰتِ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন এবং আমি তা শুনে মুখস্থ করছিলাম। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। তখন নবী (সঃ) বলেনঃ "সাপটিকে মেরে ফেলো।" আমরা তাড়াতাড়ি করে সাপটিকে মারতে গেলাম, কিন্তু দেখি যে, সে পালিয়ে গেছে। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ "সে তোমাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়েছে এবং তোমরাও তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়েছো।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মাতা (হযরত উম্মে ফযল রাঃ) নবী (সঃ)-কে وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا সূরাটি মাগরিবের নামাযে পাঠ করতে শুনতে পান।

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ সূরাটি পড়তে শুনে হযরত উম্মে ফযল (রাঃ) বলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি শেষ বার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সূরাটি মাগরিবের নামাযে পাঠ করতে শুনেছি।"[১]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,

١- وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝

২। আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার,

٢- فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝

৩। শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর,

٣- وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝

৪। আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,

٤- فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝

৫। এবং তার যা মানুষের অন্তরে পৌঁছিয়ে দেয় উপদেশ --

٥- فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

٦- عذرا اونذرا ○	৬। অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।
٧-انما توعدون لواقع ○	৭। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।
٨- فاذا النجوم طمست ○	৮। যখন নক্ষত্র রাজির আলো নির্বাপিত হবে,
٩- واذا السماء فرجت ○	৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে
١٠- واذا الجبال نسفت ○	১০। এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে
١١- واذا الرسل اقتت ○	১১। এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে,
١٢-لاي يوم اجلت ○	১২। এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন দিবসের জন্যে?
١٣-ليوم الفصل ○	১৩। বিচার দিবসের জন্য।
١٤- وما ادرك ما يوم الفصل○	১৪। বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
١٥- ويل يومئذ للمكذبين○	১৫। সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

কতকগুলো বুযুর্গ সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখ হতে তো বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত শপথগুলো এসব গুণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের নামে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথম চারটি শপথ হলো বায়ুর এবং পঞ্চমটি হলো ফেরেশতাদের। وَالْمُرْسَلاتِ দ্বারা ফেরেশতারা উদ্দেশ্য কি বায়ু উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে কেউ কেউ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুলতবি রেখেছেন। আর عَاصِفَات -এর ব্যাপারে বলেন যে, এর দ্বারা বায়ু উদ্দেশ্য। কেউ عَاصِفَات -এর ব্যাপারে এটাই বলেছেন, কিন্তু نَاشِرَات -এর ব্যাপারে কোন ফায়সালা করেননি। এটাও বলা হয়েছে যে, نَاشِرَات দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য। বাহ্যতঃ তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, مُرْسَلَات দ্বারা বায়ু উদ্দেশ্য। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ وَاَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ অর্থাৎ "আমি বায়ু প্রবাহিত করে থাকি যা মেঘকে (বৃষ্টিতে) ভারী করে থাকে।" (১৫ঃ ২২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি তাঁর রহমত (বর্ষণের)-এর পূর্বে সুসংবাদদাতা হিসেবে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন।" عَاصِفَات দ্বারাও বায়ুকে বুঝানো হয়েছে। এটা হচ্ছে নরম, হালকা এবং মৃদু মন্দ বায়ু। এটা সামান্য জোরে প্রবহমান এবং অল্প শব্দকারী বায়ু। نَاشِرَات দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো বায়ু, যা মেঘমালাকে আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং আল্লাহ পাক যেদিকে হুকুম করেন সেই দিকে নিয়ে যায়। فَارِقَات এবং مُلْقِيَات দ্বারা অবশ্যই ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন। যার দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং গুমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যাতে লোকদের ওযরের কোন অবকাশ না থাকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সতর্ক হয়ে যায়।

এই শপথগুলোর পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেই দিনের তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যেই দিন তোমরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ কবর হতে পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে ও নিজেদের কৃতকর্মের ফল পাবে, পূণ্যকর্মের পুরস্কার ও পাপকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এক সমতল ময়দানে তোমরা সবাই একত্রিত হবে, এই ওয়াদা নিশ্চিত রূপে সত্য, এটা অবশ্যই হবে। ঐদিন তারকারাজি কিরণহীন হয়ে যাবে এবং ওগুলোর ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ

অর্থাৎ "যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।" (৮১ ঃ ২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

অর্থাৎ "যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।" (৮২ঃ ২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। এমনকি ওর কোন নাম নিশানাও থাকবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ـ

অর্থাৎ "তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও– আমার প্রতিপালক ওগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।" ২০ঃ ১০৫)

ইরশাদ হচ্ছেঃ রাসূলগণকে যখন নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ

অর্থাৎ "যেই দিন আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্রিত করবেন।" (৫ঃ ১০৯) যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যমীন স্বীয় প্রতিপালকের নূরে চমকিত হয়ে উঠবে, আমলনামা আনয়ন করা হবে এবং নবীগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। ও ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।" (৩৯ঃ ৬৯)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিবসের জন্যে? বিচার দিবসের জন্যে। বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে। ঐ রাসূলদেরকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল এই জন্যে যে, কিয়ামতের দিন ফায়সালা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ـ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থাৎ "তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। আল্লাহ পরাক্রমশালী, দণ্ড বিধায়ক। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও, আর মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সম্মুখে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।" (১৪ঃ ৪৭-৪৮) ঐদিনকেই এখানে ফায়সালার দিন বলা হয়েছে। স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমার জানিয়ে দেয়া ছাড়া তুমিও ঐ দিনের হাকীকত সম্বন্ধে অবগত হতে পার না। ঐদিনকে অস্বীকারকারীর জন্যে বড় দুর্ভোগ! একটি হাদীসে এটাও গত হয়েছে যে, 'অয়েল' জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

১৬। আমি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?

১৭। অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করবো।

١٦- اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ○

١٧- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ○

١٨- كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি এই রূপই করে থাকি।

١٩- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৯। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٢٠- اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

২০। আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?

٢١- فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○

২১। অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে,

٢٢- اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

٢٣- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○

২৩। আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!

٢٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৪। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٢٥- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ○

২৫। আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে,

٢٦- اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ○

২৬। জীবিত ও মৃতের জন্যে?

٢٧- وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ○

২৭। আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।

٢٨- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৮। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমাদের পূর্বেও যারা আমার রাসূলদের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে আমি তচনচ করেছি। তাদের পরে অন্যেরা এসেছিল এবং তারাও অনুরূপ কাজ করেছিল, ফলে তাদেরকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই করে থাকি। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসকারীদের কি দুর্গতিই না হবে!

অতঃপর স্বীয় মাখলূককে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং কিয়ামত অস্বীকারকারীদের সামনে দলীল পেশ করছেন যে, তিনি

তাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করেছেন যা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে ছিল অতি নগণ্য জিনিস। যেমন সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে হযরত বিশর ইবনে জাহহাশ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ "হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে অপারগ করতে পারবে? অথচ আমি তোমাকে এরূপ (তুচ্ছ ও নগণ্য) জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছি!"

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। অর্থাৎ ঐ পানিকে আমি রেহেমে জমা করেছি যা ঐ পানির জমা হওয়ার জায়গা। ওটাকে আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি ও নিরাপদে রেখেছি। অর্থাৎ ছয় মাস বা নয় মাস। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, কত নিপুণ স্রষ্টা আমি! এরপরেও যদি ঐ দিনকে বিশ্বাস না কর তবে বিশ্বাস রেখো যে, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে বড়ই আফসোস ও দুঃখ করতে হবে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি যমীনের উপর কি এই খিদমত অর্পণ করিনি যে, সে তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে? তারপর যমীন যেন হেলা-দোলা করতে না পারে তজ্জন্যে আমি ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে বর্ষিত পানি এবং ঝরণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নিয়ামত প্রাপ্তির পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে অবিশ্বাস কর তবে জেনে রেখো যে, এমন এক সময় আসছে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা কোনই কাজে আসবে না!

২৯। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে।

٢٩- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

৩০। চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে,

٣٠- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝

৩১। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে,

٣١- لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۝

৩২। এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য,

٣٢- اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝

٣٣- كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ○

৩৩। ওটা পীত বর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,

٣٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৩৪। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٣٥- هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

৩৫। এটা এমন একদিন যেদিন কারো বাক্যে স্ফূর্তি হবে না,

٣٦- وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○

৩৬। এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা অপরাধ স্খলনের।

٣٧- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৩৭। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٣٨- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ○

৩৮। এটাই ফায়সালার দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।

٣٩- فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ○

৩৯। তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।

٤٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৪০। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্যে।

যে কাফিররা কিয়ামতের দিনকে, পুরস্কার ও শাস্তিকে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অবিশ্বাস করতো, তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ তোমরা দুনিয়ায় যে শাস্তি ও জাহান্নামকে মানতে না তা আজ বিদ্যমান রয়েছে। তাতে প্রবেশ কর। ওর অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রয়েছে এবং উঁচু হয়ে হয়ে তাতে তিনটি টুকরো হয়ে গেছে। সাথে সাথে ধুম্রও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যেন নীচে ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়াও নয় এবং এটা আগুনের তেজস্বিতা বা প্রখরতাকে কিছু কমিয়েও দিচ্ছে না। এই জাহান্নাম এতো তেজ, গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, এর যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলো উড়ে যায় সেগুলো এক একটা দুর্গের মত এবং বড় বড় গাছের লম্বা চওড়া কাণ্ডের মত। দর্শকদের ওগুলোকে মনে হয় যেন কালো রঙের উট বা নৌকার রজ্জু অথবা তামার টুকরো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমরা শীতকালে তিন হাত বা তার চেয়ে বেশী লম্বা কাষ্ঠ নিয়ে উঁচু করে ধরতাম এবং ওটাকে আমরা 'কাসর'

বলতাম।"[১] নৌকার রশিগুলো একত্রিত করলে ওগুলো উঁচু দেহ বিশিষ্ট মানুষের সমান হয়ে যায়। এখানে এটাই উদ্দেশ্য। ঐদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্যে।

আজকের দিনে অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তারা কিছু বলতেও পারবে না এবং তাদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবে না। কেননা, তাদের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে এবং যালিমদের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আর তাদের কোন কথা বলার অনুমতি নেই।

কুরআন কারীমে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করারও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং তখন ভাবার্থ হবে এই যে, হুজ্জত বা যুক্তি-প্রমাণ কায়েম হয়ে যাওয়ার পূর্বে তারা ওযর ইত্যাদি পেশ করবে। অতঃপর যখন সবকিছু ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়ে যাবে তখন কথা বলার এবং ওযর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। মোটকথা, হাশরের ময়দানের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং জনগণের বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন সময় এটা হবে এবং কোন সময় ওটা হবে। এজন্যেই এখানে প্রত্যেক কথা বা বাক্যের শেষে অবিশ্বাসকারীদের দুর্ভোগের খবর দেয়া হয়েছে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এটাই ফায়সালার দিন। এখানে আমি তোমাদেরকে এবং পূর্বদেরকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একত্রিত করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর।. এটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি কঠোর ধমক সূচক বাণী। তিনি কিয়ামতের দিন স্বয়ং কাফিরদেরকে বলবেনঃ তোমরা এখন নীরব রয়েছো কেন? আজ তোমাদের চালাকী-চতুরতার, সাহসিকতা এবং চক্রান্ত কোথায় গেল? দেখো, আজ আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের সকলকেই এক ময়দানে একত্রিত করেছি। যদি কোন কৌশল করে আমার হাত হতে ছুটে যাবার কোন পথ বের করতে পার তবে তাতে কোন ক্রটি করো না। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ -

অর্থাৎ "হে দানব ও মানব! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে।" (৫৫ঃ ৩৩) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا - অর্থাৎ "তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।"

হযরত আবূ আবদিল্লাহ জাদালী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে দেখি যে, সেখানে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ),

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) এবং হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বসে রয়েছেন এবং পরস্পর আলাপ আলোচনা করছেন। আমিও তাঁদের পাশে বসে পড়লাম। হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) বললেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই এক সমতল ও পরিষ্কার ময়দানে একত্রিত করবেন। একজন আহ্বানকারী এসে সকলকে সতর্ক করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেনঃ 'এটাই ফায়সালার দিন, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একত্রিত করেছি। তোমাদের আমার বিরুদ্ধে কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর। জেনে রেখো যে, আজ কোন অহংকারী, উদ্ধত, অস্বীকারকারী এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারী আমার পাকড়াও হতে বাঁচতে পারে না। আর পারে না কোন নাফরমান শয়তান আমার আযাব হতে বাঁচতে।' তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ আমিও আপনাদেরকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। সেই দিন জাহান্নাম স্বীয় গ্রীবা উঁচু করে লোকদের মাঝে তা পৌঁছিয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে বলবেঃ 'হে লোক সকল! তিন শ্রেণীর লোককে এখনই পাকড়াও করার আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি তাদেরকে ভালরূপেই চিনি। কোন পিতা তার পুত্রকে এবং কোন ভাই তার ভাইকে ততটা চিনে না যতটা আমি তাদেরকে চিনি। আজ তারা না নিজেরা আমা হতে লুকাতে পারে, না অন্য কেউ তাদেরকে আমা হতে লুকিয়ে রাখতে পারে। একশ্রেণীর লোক হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হলো ঐ ব্যক্তি যে অবিশ্বাসকারী ও অহংকারী। আর তৃতীয় শ্রেণী হলো প্রত্যেক নাফরমান শয়তান।' অতঃপর সে ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে এই গুণাবলীর লোকদেরকে হাশরের ময়দান হতে বের করে নিবে এবং এক এক করে ধরে ধরে নিজের মধ্যে ফেলে দিবে। হিসাব গ্রহণের চল্লিশ বছর পূর্বেই তারা জাহান্নামের পেটে চলে যাবে।"[১]

৪১। মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে।

٤١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ○

৪২। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

٤٢- وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

৪৩। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

٤٣- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪৪। এই ভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

٤٤- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪৫। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٤٥- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৪৬। তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী।

٤٦- كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ○

৪৭। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٤٧- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৪৮। যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা আল্লাহর প্রতি নত হও, তখন তারা নত হয় না।

٤٨- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○

৪৯। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।

٤٩- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৫০। সুতরাং তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে!

٥٠- فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○ ع

উপরে অসৎ লোকদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখন এখানে সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে সদা লিপ্ত থাকতো, ফারায়েয ও ওয়াজেবাতের পাবন্দ থাকতো, আল্লাহর নাফরমানী ও হারাম কার্যাবলী হতে বেঁচে থাকতো, তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতে থাকবে। এখানে নানা প্রকারের নহর জারী রয়েছে। পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধূম্রের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে। আর পুণ্যবানরা জান্নাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে শুয়ে থাকবে। তাদের সামনে দিয়ে নির্মল প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফলাদি ও তরি-তরকারী বিদ্যমান থাকবে যেটা খাবার মন চাইবে খেতে পারবে। কোন বাধা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, না শেষ হয়ে যাবার আশংকা থাকবে। তারপর উৎসাহ বাড়াবার জন্যে ও মনের খুশী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বার বার বলবেনঃ হে আমার প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাত বাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাকো। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। হ্যাঁ, তবে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে আজ বড়ই দুর্ভোগ!

এরপর অবিশ্বাসকারীদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তোমরা পানাহার কর ও ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন, তোমরা তো অপরাধী। সুতরাং সত্বরই এসব নিয়ামত শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ

করতে হবে। অতঃপর পরিণামে তোমরা জাহান্নামেই যাবে। তোমাদের দুষ্কর্ম ও অন্যায় কার্যকলাপের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তৈরী রয়েছে। পাপীরা তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না, তাঁর নবী (সঃ)-কে মানে না এবং তাঁর অহীকে অবিশ্বাস করে, তারা কিয়ামতের দিন কঠিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জন্যে বড়ই দুর্ভোগ! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ـ

অর্থাৎ "অল্প কিছুদিন আমি তাদেরকে সুখ ভোগ করতে দিবো, অতঃপর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো"(৩১ঃ ২৪) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ـ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হয় না। দুনিয়ায় তারা সামান্য কয়েক দিন সুখ ভোগ করবে মাত্র, অতঃপর আমার নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। তাদের কুফরীর কারণে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।" (১০ঃ ৬৯-৭০)

এরপর মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ এই অজ্ঞ অস্বীকারকারীদেরকে যখন বলা হয়ঃ তোমরা আল্লাহ্র সামনে নত হয়ে যাও, জামাআতের সাথে নামায আদায় কর, তখন তা হতেও তারা বিমুখ হয়ে যায় এবং ওটাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ও অহংকারের সাথে অস্বীকার করে বসে। এই মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে কিয়ামতের দিন বড়ই দুর্ভোগ ও বিপদ রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এ লোকগুলো যখন এই পাক কালামের উপর ঈমান আনয়ন করছে না তখন আর কোন্ কালামের উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ـ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্র উপর ও তাঁর আয়াতসমূহের উপর যখন ঈমান আনছে না তখন আর কোন্ কালামের উপর তারা ঈমান আনয়ন করবে!" (৪৫ঃ ৬)

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি পাঠ করবে এবং فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ -এ আয়াতটিও পড়বে তখন সে যেন বলেঃ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا أَنْزَلَ অর্থাৎ "আমি আল্লাহ্র উপর এবং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান এনেছি"। এ হাদীসটি সূরা কিয়ামাহ্র তাফসীরে গত হয়েছে।

সূরাঃ মুরসালাত ও ২৯ পারা -এর তাফসীর সমাপ্ত

تفسير ابن كثير

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه اللّٰه

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش